প্রথম অধ্যায়
প্রাকৃতিক ভূগোল

পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶১ তুহিন নদ-নদী, পাহাড়, পর্বত, উদ্ভিদ ও মানুষের ছবি আঁকে এবং এগুলো সে তার বিদ্যালয়ে লাইব্রেরির দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখবে বলে প্রধান শিক্ষকের কাছে অনুমতি চেয়েছে।

◀ শিখনফল: ১ [অধ্যাপক মো: আবদুল কুদ্দুস; অনু-১]

ক. ভূগোল কাকে বলে? ১

খ. পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে কেন? ২

গ. তুহিন যেসব বিষয় নিয়ে ছবি আঁকে তার সাথে ভূগোলের সম্পর্ক উপস্থাপন করো– ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ভাষায় উল্লিখিত বিষয়গুলো পরিবেশের উপাদান? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্থান ও সময়ের প্রেক্ষিতে পরিবেশ ও মানুষের মিথস্ক্রিয়া (interaction) অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করাকেই ভূগোল বলে।

খ ভূপ্রকৃতির ওপর নির্ভর করে জনবসতির আধিক্য দেখা যায় আবার মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান। এসব দ্রব্য জলবায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এছাড়া মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও এসব উপাদানের ওপর নির্ভরশীল। এ জন্য পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে।

গ তুহিন যেসব বিষয়গুলো নিয়ে ছবি আঁকে তার মধ্যে রয়েছে নদ-নদী, পাহাড় পর্বত, উদ্ভিদ ও মানুষের ছবি। তুহিনের উক্ত ছবি আঁকার সবগুলো বিষয়ই পরিবেশের উপাদান। নিচে উক্ত বিষয়গুলোর সাথে ভূগোলের সম্পর্ক উপস্থাপন করা হলো:

মানুষ পৃথিবীতে বাস করে এবং এই পৃথিবীতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। পৃথিবীর জলবায়ু, ভূপ্রকৃতি, উদ্ভিদ, প্রাণী, নদ-নদী, সাগর, খনিজ সম্পদ মানুষের জীবনযাত্রাকে বিভিন্নভাবে প্রবাহিত করে। মানুষের ক্রিয়াকলাপ যেমন– ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, শহর-বন্দর প্রকৃতি ও পরিবেশের নানারকম পরিবর্তন ঘটায়। মানুষ ও পরিবেশের উপাদানের মধ্যে এই মিথস্ক্রিয়ার একটি সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্কের মূলে আছে কার্যকরণের খেলা। ভূগোলের প্রধান কাজ হলো এই কার্যকারণ উদঘাটন করা।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলতে পারি তুহিনের ছবি আঁকার বিষয়গুলো নদ-নদী, পাহাড়, পর্বত, উদ্ভিদ ও মানুষ অর্থাৎ পরিবেশের উপাদানগুলোর সাথে ভূগোলের সম্পর্ক রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়গুলো হলো- নদ-নদী, পাহাড়, পর্বত উদ্ভিদ ও মানুষ। উক্ত বিষয়গুলো পরিবেশের উপাদান।

পরিবেশের উপাদান দুই প্রকার যেমন— জড় ও জীব উপাদান। যাদের জীবন আছে, যারা খাবার খায়, যাদের বৃদ্ধি আছে, মৃত্যু আছে তাদের বলে জীব। গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী হলো জীব। এরা পরিবেশের জীব উপাদান। জীবদের নিয়ে গড়ে ওঠা পরিবেশ হলো জীব পরিবেশ।

অপরদিকে মাটি, পানি, বায়ু, পাহাড়, পর্বত, নদী, সাগর, আলো, উষ্ণতা পরিবেশের জড় উপাদান। এ জড় উপাদান নিয়ে গড়ে ওঠা পরিবেশ হলো জড় পরিবেশ।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, নদ-নদী, পাহাড়, পর্বত, উদ্ভিদ ও মানুষ যথাক্রমে জীব ও জড় উপাদান হওয়ায় এগুলো পরিবেশের উপাদান।

প্রশ্ন ▶২ তারেক স্যার ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বললেন ভূমিরূপবিদ্যা, সমুদ্রবিদ্যা, জলবায়ুবিদ্যা সম্পর্কে সকলের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আলোচনা থেকে ছাত্র-ছাত্রী উপলব্ধি করল এ বিষয়গুলো জানতে হলে প্রাকৃতিক ভূগোল পাঠ অতি প্রয়োজন।

◀ শিখনফল: ২ [তাপস কুমার মজুমদার; অনু-২]

ক. প্রাকৃতিক ভূগোল কাকে বলে? ১

খ. বৃষ্টিপাত প্রাকৃতিক ভূগোলের কোন শাখার আলোচ্য বিষয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয় ছাড়াও প্রাকৃতিক ভূগোল পাঠে আরও যা জানা যায় তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়গুলোর সাথে প্রাকৃতিক ভূগোলের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাকৃতিক উপাদানসমূহের স্থান ও কালভিত্তিক বিশ্লেষণকে প্রাকৃতিক ভূগোল বলে।

খ বৃষ্টিপাত প্রাকৃতিক ভূগোলের জলবায়ুবিদ্যায় আলোচনা করা হয়।

জলবায়ুবিদ্যায় বায়ুর গঠন উপাদান, বায়ুস্তর, বায়ুর ধর্ম, তাপমাত্রা, বায়ুচাপ, বায়ুপ্রবাহ, বায়ুপুঞ্জ, বায়ুমণ্ডলের জলীয়বাষ্প, বৃষ্টিপাতের কারণ, শ্রেণিবিভাগ, আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রকারভেদ এবং জলবায়ু অঞ্চল প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

গ প্রাকৃতিক ভূগোল যেহেতু স্থানিকভাবে প্রাকৃতিক উপাদান পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করে থাকে; সেহেতু বলা যায় প্রাকৃতিক ভূগোল ভূমিরূপ, জলবায়ু ও সমুদ্রবিজ্ঞান ছাড়াও জীবতত্ত্ব, বারিতত্ত্ব, হিমবাহতত্ত্ব, বারিতত্ত্ব, পরিবেশ ভূগোলসহ আরো বিভিন্ন বিষয়ের স্থানিক প্যার্টান নিয়ে আলোচনা করে থাকে।

পৃথিবী পৃষ্ঠের শতকরা প্রায় ৭১ ভাগ পানি। এই বিশাল পানিরাশি বারিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। সাধারণত বারিতত্ত্ব পানির উৎস ও বণ্টন নিয়ে আলোচনা করে। এছাড়া কীভাবে নদী ও হ্রদ সৃষ্টি হয় এবং নদী সৃষ্টির সময় ক্ষয় ও সঞ্চয় কার্যের ফলে যে ভূমিরূপের সৃষ্টি হয় তা নিয়ে আলোচনা করে। প্রাকৃতিক ভূগোলে হিমবাহতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়। হিমবাহ, বরফ খণ্ড, সামুদ্রিক শৈলশিরা, হিমবাহের কার্যের ফলে সৃষ্ট ক্ষয় ও সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ নিয়েও হিমবাহতত্ত্ব আলোচনা করে।

যেহেতু প্রাকৃতিক ভূগোল মানুষ ও পরিবেশ নিয়ে আলোচনা করে তাই এখানে জীবমণ্ডল নিয়েও আলোচনা করা হয়। এই জীবমণ্ডলকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর বিভিন্ন বনাঞ্চল, ইকোসিস্টেম, বায়োম, কার্বন চক্র ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয় প্রাকৃতিক ভূগোলে। সমুদ্র এবং ভূমির মধ্যে যে গতিশীল আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে এই আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ নিয়েও প্রাকৃতিক ভূগোল আলোচনা করে থাকে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়গুলো হলো ভূমিরূপবিদ্যা, সমুদ্রবিদ্যা, এবং জলবায়ুবিদ্যা। উক্ত বিষয়গুলো প্রাকৃতিক ভূগোলের অন্তর্ভুক্ত।

প্রাকৃতিক ভূগোলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভূমিরূপবিদ্যা। পৃথিবীর কোথায় কী ধরনের ভূমিরূপ এবং তা কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গঠিত হয়েছে সে সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা যায় প্রাকৃতিক ভূগোল পাঠের মাধ্যমে। পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ অবস্থা, শিলা ও খনিজের উৎপত্তি, ভূমিকম্প, ভূআলোড়ন ও তার ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপও এর আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

আবার প্রাকৃতিক ভূগোল পাঠের মাধ্যমে জলবায়ুবিদ্যা সম্পর্কে বিশদভাবে জানা যায়। পৃথিবীর কোথায় কী ধরনের জলবায়ু জানতে হলে জলবায়ুবিদ্যা অধ্যয়নের গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়াও পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের পানিরাশি ও পানিরাশির বিন্যাস ও গভীরতা, সাগর, মহাসাগর ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে হলে প্রাকৃতিক ভূগোলের সমুদ্রবিদ্যা পাঠ প্রয়োজন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, ভূমিরূপবিদ্যা, সমুদ্রবিদ্যা এবং জলবায়ুবিদ্যা বিষয়গুলোর সাথে প্রাকৃতিক ভূগোলের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে।

প্রশ্ন ▶৩ জনাব কামালের বাড়ি ঠাকুরগাঁও। তিনি সপরিবারে ঢাকায়; তাঁর মা বাড়িতে থাকেন। এবার শীত আসার আগেই মাকে তিনি নিজের কাছে নিয়ে আসেন। তিনি আশঙ্কা করছেন, গতবারের মতো এবারও সেখানে তীব্র শৈত্যপ্রবাহ হবে।

◀ শিখনফল: ২

ক. অশ্মমণ্ডল কী? ১

খ. জলবায়ুর নিয়ামক বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে প্রাকৃতিক ভূগোলের কোন শাখা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত শাখাটি পাঠের মাধ্যমে তুমি যে বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত হবে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৃথিবীর উপরের কঠিন ও পাতলা শিলাস্তরই অশ্মমণ্ডল।

খ যেসব অবস্থা কোনো একটি দেশের বা অঞ্চলের জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলোকে জলবায়ুর নিয়ামক বলে।

জলবায়ুর নিয়ামকগুলো হলো— অক্ষাংশ, উচ্চতা, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, সমুদ্রস্রোত, সমুদ্র থেকে দূরত্ব, ভূমির ঢাল ও বন্ধুরতা, মৃত্তিকা প্রভৃতি। এছাড়া অন্যান্য নিয়ামকের মধ্যে উচ্চ ও নিম্নচাপ বলয়, বায়ুমণ্ডলের গভীরতা, পর্বতের অবস্থান, দিবাভাগের দৈর্ঘ্য, হিমবাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকে প্রাকৃতিক ভূগোলের জলবায়ুবিদ্যা শাখা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জলবায়ুবিদ্যা বায়ুর গঠন উপাদান, তাপ, চাপ, প্রবাহ, জলীয়বাষ্প, বৃষ্টিপাত, জলবায়ু পরিবর্তন, পৃথিবীর জলবায়ু অঞ্চল প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

উদ্দীপকে জনাব কামালের এলাকায় তীব্র শৈত্যপ্রবাহের কথা বলা হয়েছে। এটি জলবায়ুর উপাদান। বর্তমানে বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রেক্ষিতে জলবায়ুর উপাদানগুলোর তারতম্য পরিলক্ষিত হয়; যা জলবায়ুবিদ্যার আলোচিত বিষয়। সুতরাং বলা যায় উদ্দীপকে প্রাকৃতিক ভূগোলের জলবায়ুবিদ্যা শাখা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে জলবায়ুবিদ্যা শাখা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

কোনো স্থানের জলবায়ুবিদ্যা পাঠের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলের ভৌত উপাদানগুলোর সাধারণ অবস্থা জানা যায়। পৃথিবীব্যাপী জলবায়ুর পরিবর্তনশীল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

জলবায়ুবিদ্যা পাঠের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাস, বায়ুর উপাদান, তাপ ও চাপ, বায়ুপ্রবাহের কারণ, শ্রেণিবিভাগ ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারা যায়। এছাড়া জলীয়বাষ্প, বায়ুর আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাতের কারণ ও প্রকারভেদ, আবহাওয়া ও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু সম্পর্কেও আমরা অবগত হতে পারি।

প্রশ্ন ▶৪

গ্রুপ 'ক'	গ্রুপ 'খ'
হিমবাহ	ভূমিরূপবিদ্যা
ভূমিকম্প	হিমবাহতত্ত্ব
মহাকাশ	পরিবেশ ভূগোল
মালভূমি	জ্যোতির্বিদ্যা
পরিবেশ দূষণ	

◀ শিখনফল: ২

ক. পৃথিবীপৃষ্ঠে শতকরা কত ভাগ পানি? ১

খ. প্রাকৃতিক ভূগোলের কোন শাখায় পানিচক্র নিয়ে আলোচনা করা হয়? ২

গ. গ্রুপ 'খ' এর উপাদানগুলো কোন ভূগোলের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. গ্রুপ 'ক' এর উপাদানগুলো, গ্রুপ 'খ' এর কোন কোন উপাদানের সাথে সম্পর্কিত? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৃথিবীপৃষ্ঠে শতকরা ৭১ ভাগ পানি।

খ প্রাকৃতিক ভূগোলের বারিতত্ত্ব শাখায় পানিচক্র নিয়ে আলোচনা করা হয়।

প্রকৃতিতে পানি তিনটি অবস্থায় বিদ্যমান। যেমন: কঠিন, তরল ও বায়বীয়। ভূভাগে পানি কঠিন ও তরল অবস্থায় বিরাজ করে। সূর্যের তাপে তা বাষ্পে পরিণত হয়। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বাষ্পীভূত পানি আবার স্বস্থানে ফিরে আসে। একে পানিচক্র বলে। সাধারণভাবে বারিতত্ত্বে পানির উৎস ও বণ্টন, পানির স্রোত, জোয়ার-ভাটা, সামুদ্রিক সম্পদ প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ফলে পানিচক্রের আলোচনাও বারিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

গ সারণিতে গ্রুপ 'খ' এর উপাদানগুলো প্রাকৃতিক ভূগোলের অন্তর্গত। প্রাকৃতিক ভূগোলে প্রকৃতি ও পরিবেশ, ভূমিরূপের গঠন ও বিন্যাস, হিমবাহ, মহাকাশ প্রভৃতি আলোচনা করা হয়।

ভূমিরূপবিদ্যায় পৃথিবীর ভূমিরূপের গঠন সম্পর্কে পর্যালোচনা, হিমবাহতত্ত্বে হিমবাহ, বরফখণ্ড, সামুদ্রিক শৈলশিরা নিয়ে আলোচনা করা হয়। অন্যদিকে পরিবেশ ভূগোলে পরিবেশের সার্বিক অবস্থা, পরিবেশ দূষণের কারণ, ফলাফল, প্রতিকার এবং পরিবেশ ও মানুষের আন্তঃসম্পর্ক আলোচনা করা হয়। আবার জ্যোতির্বিদ্যায় মহাকাশ ও মহাজাগতিক বস্তু, পৃথিবীর গতি, সৌরজগতের গ্রহ ও উপগ্রহের সাথে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে।

উপরিউক্ত উপাদানগুলো নিয়ে প্রাকৃতিক ভূগোলের পরিধি গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ ভূমিরূপবিদ্যা, হিমবাহতত্ত্ব, পরিবেশ ভূগোল ও জ্যোতির্বিদ্যা প্রাকৃতিক ভূগোলের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ গ্রুপ 'ক' এর উপাদানগুলো হলো– হিমবাহ, ভূমিকম্প, মহাকাশ, মালভূমি, পরিবেশ দূষণ যা প্রাকৃতিক ভূগোলের উপাদান।

গ্রুপ 'খ' এর উপাদানগুলো হলো– ভূমিরূপবিদ্যা, হিমবাহতত্ত্ব, পরিবেশ ভূগোল ও জ্যোতির্বিদ্যা যা প্রাকৃতিক ভূগোলের বিভিন্ন শাখা। সুতরাং গ্রুপ 'ক' এর সাথে 'খ' এর উপাদানগুলো গভীরভাবে জড়িত।

গ্রুপ 'ক' এর হিমবাহ 'খ' এর হিমবাহতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। হিমবাহতত্ত্ব হিমবাহ, বরফ খন্ড, সামুদ্রিক শৈলশিরা নিয়ে আলোচনা করে। গ্রুপ 'ক' এর ভূমিকম্প ও মালভূমি ভূমিরূপবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। যেখানে ভূমিরূপের গঠন, প্লেট সঞ্চালন, ভূআলোড়ন, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। গ্রুপ 'ক' এর মহাকাশ 'খ' এর জ্যোতির্বিদ্যার আলোচ্য বিষয়। যেখানে মহাজাগতিক বিভিন্ন বিষয়, গ্রহ ও উপগ্রহ নিয়ে আলোচনা করা হয়। গ্রুপ 'ক' এর উপাদান পরিবেশ দূষণ 'খ' এর পরিবেশ ভূগোলের আলোচ্য বিষয়। এখানে পরিবেশের সার্বিক অবস্থা, দূষণ, এর কারণ ও প্রতিকার এবং পরিবেশ ও মানুষের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়। উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, গ্রুপ 'ক' এর উপাদানগুলো গ্রুপ 'খ' এর আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যা প্রাকৃতিক ভূগোলের আওতাভুক্ত।

প্রশ্ন ▶৫ রুমেল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরে গিয়ে ঢুকতেই একটি প্লেটে দুটি খণ্ডবস্তু দেখতে পেল। জাদুঘরের তত্ত্বাবধায়ক তাকে বললেন, "এদের একটি খণ্ড বিভিন্ন খনিজের মিশ্রণে তৈরি; কিন্তু রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না এবং অন্য খণ্ডটি বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান দ্বারা তৈরি, যা বিক্রিয়ায় অংশ নেয়। এ বস্তুগুলো আবার প্রাকৃতিক ভূগোলের অন্যতম উপাদান।" ওই দিন রুমেল পাহাড়, সমভূমি প্রভৃতির মতো পৃথিবীর নানা উঁচু-নিচু নিয়ে আয়োজিত একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনীতেও অংশ নেয়। ◀ *শিখনফল: ২*

ক. বায়ুমণ্ডল কী? ১

খ. প্রাকৃতিক ভূগোলের মূল বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রুমেলের দেখা বস্তুগুলো মানবজীবনে বিশেষ ভূমিকা রাখে।—ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মানবজীবনের অর্থনৈতিক কার্যাবলি আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে দেখানো বিষয়গুলোর উপর নির্ভরশীল।—বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৃথিবীর চারপাশে হাজার হাজার কিলোমিটার পুরু বায়ুর স্তরই বায়ুমণ্ডল।

খ প্রাকৃতিক ভূগোলের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে আমাদের এ পৃথিবী নামক গ্রহ, যা জীবন, সম্পদ ও বাস্তুতন্ত্রের উৎস।

পৃথিবীর পরিবেশ তিনটি জড় উপাদান– বায়ুমণ্ডল, বারিমণ্ডল, অশ্মমণ্ডল এবং একটি সজীব উপাদান জীবমণ্ডল এই মোট চারটি উপাদান দ্বারা গঠিত। এ উপাদানগুলোর অবস্থান, বৈশিষ্ট্য এবং পরিবেশে এগুলোর গুরুত্ব কী, সে সম্পর্কে আলোকপাত করাই প্রাকৃতিক ভূগোলের মূলবিষয়বস্তু।

গ রুমেলের দেখা বস্তুগুলো হলো খনিজ ও শিলা। প্রাকৃতিক ভূগোলের উপাদানসমূহের মধ্যে খনিজ ও শিলা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

শিলা মানুষের জীবনে অপরিহার্য। এর অর্থনৈতিক গুরুত্বও অপরিসীম। শিলার একটি বিশেষ রূপ হলো মৃত্তিকা। এ মৃত্তিকার উপর নির্ভর করে কৃষিকাজ গড়ে ওঠে। বেঁচে থাকার জন্য, বিশ্রামের জন্য গৃহনির্মাণের প্রয়োজন হয়। আর মৃত্তিকার উপরই মানুষ গৃহনির্মাণ করে। মৃত্তিকা না থাকলে মানুষ গৃহনির্মাণ করতে পারত না। সছিদ্র ও প্রবেশ্য শিলাস্তরে ভূগর্ভস্থ পানি জমা হয়। এ ভূগর্ভস্থ পানি গভীর ও অগভীর নলকূপ খনন করে ব্যবহার উপযোগী করে তোলা হয়, যা মানবজীবনে বেঁচে থাকার জন্য বিশেষ ভূমিকা রাখে।

খনিজগুলো আধুনিক শ্রমশিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতায় জ্বালানি হিসেবে কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য খনিজ, যথা– কয়লা ও লিগনাইট, তেল ও গ্যাস, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি একান্ত প্রয়োজন। আধুনিক সভ্যতার যাবতীয় কার্য বিদ্যুৎসংশ্লিষ্ট। খনিজ উপাদান ছাড়া সব শিল্পই অচল। আর শিল্পের সাথে মানবজীবনের একটি সম্পর্ক বিদ্যমান। এভাবেই খনিজ ও শিলা মানজীবনে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

ঘ আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে মূলত পৃথিবীর নানা ভূমিরূপ দেখানো হচ্ছিল।

কোনো অঞ্চলের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের বণ্টন, ধরন ও নিবিড়তা সে অঞ্চলের ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের ভূমিরূপের উপর নির্ভর করে।

ভূগঠনকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়; যথা– (ক) সমভূমি, (খ) পর্বত, (গ) মালভূমি এবং (ঘ) উপত্যকা। মানবজীবনের অর্থনৈতিক কার্যাবলি উল্লিখিত ভূমিরূপগুলোর গঠনের উপর নির্ভরশীল। নিচে এ বিষয়ে বিশ্লেষণ করা হলো–

ভূগঠনের চারটি উপাদানের মধ্যে সমভূমি একটি। সমভূমিতে অতি সহজেই কৃষিকাজ করা সম্ভব হয়। ফলে সমভূমি এলাকায় মানুষের বসবাস বেশি হয় এবং এ এলাকায় মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলি কৃষিনির্ভর ও অনেক ক্ষেত্রে শিল্পনির্ভর হয়ে থাকে। পার্বত্য এলাকায় ভূমির বন্ধুরতার জন্য কৃষিকাজ সম্ভব হয় না। এছাড়া এ এলাকায় কোনো শিল্প-কারখানা গড়ে তোলাও সম্ভব নয়। যে অঞ্চলে মালভূমি ও উপত্যকা রয়েছে, সে অঞ্চলের মানুষ সামান্য কৃষি পেশার সাথে জড়িত। কারণ মালভূমি ও উপত্যকা এলাকায় ব্যাপকভাবে কৃষিকাজ করা সম্ভব নয়।

উপরের আলোচনায় দেখা যায়, ভূমিরূপের পার্থক্যের কারণে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলিতেও পার্থক্য হয়। তাই বলা যায়, মানবজীবনে অর্থনৈতিক কার্যাবলি অনেকটা ভূমিরূপের উপর নির্ভরশীল।

প্রশ্ন ▶ ৬ আদিত্য তার বন্ধু তালহাকে নিয়ে জয়পুরহাট থেকে গ্রীষ্মকালে একটি দর্শনীয় স্থানে বেড়াতে যায়। প্রথম দিন উঁচু ভূমির মধ্যদিয়ে প্রবাহিত পাহাড়, নদী ও জলপ্রপাত দেখতে পায়। দ্বিতীয় দিনে জোয়ার ভাটা বিস্তীর্ণ সৈকত ও সাগরের জলরাশি তাকে মুগ্ধ করে। *◀ শিখনফল: ২*

ক. প্রাকৃতিক ভূগোলের মূল বিষয়বস্তু কী? ১

খ. ভূপৃষ্ঠের ধীর পরিবর্তন সাধনে কোন শক্তির ভূমিকা সর্বাধিক এবং কেন? ২

গ. আদিত্যের প্রথম দিনের দর্শনীয় বিষয়সমূহ ভূগোলের কোন শাখার আলোচ্য বিষয় ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উল্লিখিত সাগরের জলরাশি ভূগোলের যে শাখার আওতাভুক্ত তা অধ্যয়নের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভূমিরূপবিদ্যা, জলবায়ুবিদ্যা ও সমুদ্রবিদ্যা এই তিনটি প্রাকৃতিক ভূগোলের মূল বিষয়বস্তু।

খ সুদীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা প্রতিনিয়ত ভূপৃষ্ঠ ধীরে ধীরে ব্যাপক পরিবর্তিত হয়। ভূপৃষ্ঠের বিস্তৃত অঞ্চলে স্থান-কালভেদে এ প্রক্রিয়ায় নানারূপ প্রভাব পড়ে।

সাধারণত বিচূর্ণীভবন ও নগ্নীভবন এর মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠের ধীর পরিবর্তন সবচেয়ে বেশি হয়। ধীর পরিবর্তনের সহায়ক শক্তিগুলো হলো নদী প্রবাহ, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, হিমবাহ, সৌরতাপ, সমুদ্রস্রোত ইত্যাদি।

গ আদিত্যের প্রথম দিনের দর্শনীয় বিষয়সমূহ হলো নদী, জলপ্রপাত যা ভূগোলের ভূমিরূপবিদ্যায় আলোচনা করা হয়েছে।

তাই বলা যায়, আদিত্যের দেখা দর্শনীয় বিষয়সমূহ ভূগোলের ভূমিরূপবিদ্যা শাখার আলোচনার বিষয়।

ঘ দ্বিতীয় দিন আদিত্য জোয়ার-ভাটা, বিস্তীর্ণ সৈকত ও সাগরের জলরাশি দেখতে পায়। বিষয়গুলো প্রাকৃতিক ভূগোলের বারিতত্ত্বে আলোচনা করা হয়।

সৃষ্টির আদিতে পৃথিবী গ্যাসীয় অবস্থা হতে বর্তমান কঠিন অবস্থায় উপনীত হওয়ার সময় ভূপৃষ্ঠ অসমভাবে সংকুচিত হয়েছে বলে তার কতক অংশ উঁচু ও কতক অংশ নিচু। যে বিশাল পানিরাশিতে ভূত্বকের নিচু অংশগুলো পরিপূর্ণ ও আবৃত হয়ে রয়েছে তাকে বারিমণ্ডল বলে। আর এ বারিমণ্ডল মহাসাগর, উপসাগর ও হ্রদ নামে অবস্থান করছে।

বারিমণ্ডলের আলোচ্য বিষয়গুলো হলো- পৃথিবীর মহাসাগরের অবস্থান, আকৃতি, স্রোতধারা, মহাসাগরের তলদেশের বৈশিষ্ট্য, জোয়ার-ভাটা, সমুদ্রস্রোত ও জোয়ার ভাটার প্রভাব ইত্যাদি। জীবন জীবিকা, কর্মকাণ্ড, বাসস্থান, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এসব কিছুর ওপর বারিমণ্ডলের প্রভাব অপরিসীম। আবার তার সাথে প্রতিপালন হচ্ছে বিপুল জীববৈচিত্র্য।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, বারিমণ্ডল অধ্যয়নের গুরুত্ব অনেক বেশি।

প্রশ্ন ▶ ৭ ভূগোল শিক্ষক সমিতির সভাপতি এক সেমিনারে তার ভাষণে বলেন, বর্তমানে ভূগোল শুধু প্রাকৃতিক ভূগোলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। ভূগোলের পরিধি, পরিসর সম্প্রসারিত হয়েছে। *◀ শিখনফল: ১ ও ২*

ক. প্রাকৃতিক ভূগোলের প্রকৃতি কী? ১

খ. বায়ুমণ্ডল কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক মতে ভূগোলের পরিধি সম্প্রসারিত হয়েছে কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সভাপতির ভাষণে তুমি কোন বিষয়ের সম্বন্ধে অবগত হয়েছ? তা নিজের ভাষায় বুঝিয়ে লেখো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাকৃতিক ভূগোলের প্রকৃতি হলো পৃথিবীতে প্রাকৃতিক বিষয়ের মধ্যে কী ধরনের কার্যকরণ সে সম্পর্কে পর্যালোচনা করা।

খ পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে উর্ধ্বদিকে যে বায়বীয় আবরণ সমগ্র পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে তাকেই বায়ুমণ্ডল বলে।

বায়ুমণ্ডল নানাপ্রকার গ্যাসীয় উপাদান দ্বারা গঠিত। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ফলে বায়ুরাশি পৃথিবীর সাথে লেগে আছে এবং পৃথিবীর সাথে আবর্তন করছে।

গ উদ্দীপকে শিক্ষক সমিতির সভাপতি তার ভাষণে বললেন, বর্তমানে ভূগোল শুধু প্রাকৃতিক ভূগোলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বর্তমানে ভূগোল মানব ভূগোলেও বিস্তৃতি লাভ করেছে।

পূর্বে ভূগোলে শুধু ভৌত পরিবেশ ও এর মধ্যে কার্যরত বিভিন্ন প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত থাকত যা প্রাকৃতিক ভূগোলের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু বর্তমানে ভূগোল প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ যেসব অর্থনৈতিক

কাজ করে তা নিয়েও আলোচনা করে। যা ভূগোলের মানব ভূগোল শাখা নামে পরিচিত। এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ কীভাবে বসবাস করছে, কীভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে, কেন এভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে তার কার্যকরণ অনুসন্ধানই মানব ভূগোলের আলোচ্য বিষয়। আর ভূগোলের এ পরিধি প্রাকৃতিক ভূগোল থেকে মানব ভূগোলে বিস্তৃতি লাভ করার কারণগুলো হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ, নতুন নতুন আবিষ্কার, উদ্ভাবন, চিন্তাধারার বিকাশ, সমাজের মূল্যবোধের পরিবর্তন ইত্যাদি।

মূলত এসব কারণেই ভূগোলের পরিধি সম্প্রসারিত হয়েছে।

ঘ সভাপতি তার ভাষণে বললেন, বর্তমানে ভূগোল প্রাকৃতিক ভূগোলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। ভূগোলের পরিধি ও পরিসর সম্প্রসারিত হয়েছে। সভাপতির ভাষণে আমি অবগত হয়েছি যে বর্তমানে ভূগোলের পরিধি অনেক বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং এর পরিসর সম্প্রসারিত হয়েছে।

পূর্বে ভূগোলের পরিধি শুধু পৃথিবীর ভৌত পরিবেশ ও এর মধ্যে কার্যকর বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ, নতুন নতুন আবিষ্কার, উদ্ভাবন, চিন্তাধারার বিকাশ, সমাজের মূল্যবোধের পরিবর্তন ইত্যাদির ফলে ভূগোলের পরিধি অনেক বিস্তৃতি লাভ করেছে। যেমন– ভূমিরূপবিদ্যা, আবহাওয়াবিদ্যা, মৃত্তিকাবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, সমাজবিদ্যা, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি ভূগোল বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এর পরিধি অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে।

ভূগোলের পরিসর ব্যাপক। বর্তমানে ভূগোলের পরিসর প্রতিনিয়ত পরিবর্তন, পরিবর্ধন হচ্ছে। এর ফলে ভূপৃষ্ঠের জীবজগতের ওপর প্রভাব পড়ছে। এছাড়া বর্তমানে ভূগোলে সমুদ্রভূগোল, জীবভূগোল, অর্থনৈতিক ভূগোল, রাজনৈতিক ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি ভূগোলের পরিসরকে আরও সম্প্রসারিত করেছে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, সভাপতির ভাষণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ভূগোলের পরিধি ও পরিসর সম্প্রসারিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৮ রতন ও রহিম এস.এস.সি পরীক্ষা শেষে বান্দরবান বেড়াতে গেল। তারা সেখানে লক্ষ করল এখানকার ভূমিরূপ তাদের গ্রামের বাড়ি নরসিংদীর মতো নয়। তারা আরও লক্ষ করল এখানকার মানুষের কর্মকাণ্ডের ধরনও তাদের এলাকার মতো নয়। তারা এই বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চায়। তাই তারা বাড়ি এসে ভূগোল প্রভাষকের সাথে যোগাযোগ করে। প্রভাষক তাদের প্রাকৃতিক ভূগোল পাঠের পরামর্শ দিলেন।

◀ শিখনফল: ২ ৩ ৩

ক. Geography কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন কে? ১

খ. প্রাকৃতিক ভূগোলের আলোচ্য বিষয়সমূহ লেখো। ২

গ. বান্দরবান ও নরসিংদীর ভূমিরূপের তুলনামূলক বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. প্রভাষক রতন ও রহিমকে কেন প্রাকৃতিক ভূগোল পাঠের পরামর্শ দিলেন? বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Geography কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন গ্রিক ভূগোলবিদ ইরাটোসথেনিস।

খ প্রাকৃতিক ভূগোলে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের ভৌত পরিবেশ ও এর মধ্যে কার্যরত বিভিন্ন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে।

এছাড়া ভূঅভ্যন্তরের গঠন, স্তরবিন্যাস, উপাদান, শিলা, খনিজ, বায়ুমণ্ডল, বারিমণ্ডল, আবহাওয়াবিদ্যা, জলবায়ুবিদ্যা, সমুদ্রতত্ত্ব, ভূমিরূপতত্ত্ব, মৃত্তিকাবিদ্যা, জীববিদ্যা প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়।

গ ভূপৃষ্ঠের গঠন সর্বত্র এক রকম নয়। পৃথিবীর কোনো ভূমিরূপই স্থিতিশীল বা স্থায়ী নয়, সর্বদা পরিবর্তনশীল। ভূপৃষ্ঠের এই পরিবর্তন বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংঘটিত হয়। বান্দরবান ও নরসিংদীতে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিরূপ দেখা যায়।

বান্দরবানে সাধারণত ভঙ্গিল পর্বতের প্রাধান্য দেখা যায়। গিরিজনি আলোড়নের ফলে এ ধরনের পর্বতের সৃষ্টি হয়েছে। এ অঞ্চলের পাহাড়গুলো পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে বেশি উঁচু। এ পাহাড়ি এলাকা কাদা, বেলে পাথর ও শেল পাথর দ্বারা গঠিত। এ অঞ্চলের জনবসতি অত্যন্ত কম।

অপরদিকে নরসিংদী সমভূমির অন্তর্গত। এ অঞ্চলের মাটি উর্বর। তাই এ অঞ্চল কৃষিসমৃদ্ধ। অনেক সময় এ জাতীয় ভূমিরূপের উপরিভাগ সামান্য উঁচু-নিচু ও ঢালু হয়ে থাকে। পৃথিবীর সকল প্রকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সমভূমিতেই সংঘটিত হয়। তাছাড়া এ অঞ্চলের জনবসতিও খুব বেশি। সুতরাং বলা যায় যে, উদ্দীপকের অঞ্চল দুটির মধ্যে যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘ ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের ভৌত পরিবেশ ও এর মধ্যে কার্যরত বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানার জন্য প্রভাষক রতন ও রহিমকে প্রাকৃতিক ভূগোল পাঠের পরামর্শ দিলেন।

প্রাকৃতিক ভূগোল পাঠের মাধ্যমে পৃথিবীর জন্ম, বর্তমান অবস্থা, বিবর্তন ধারা, ভূঅভ্যন্তরের গঠন, স্তরবিন্যাস, উপাদান, শিলা, খনিজ, বায়ুমণ্ডল, বারিমণ্ডল, আবহাওয়াবিদ্যা, জলবায়ুবিদ্যা, সমুদ্রতত্ত্ব, ভূমিরূপতত্ত্ব, মৃত্তিকাবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে জানা যায়। এছাড়া প্রাকৃতিক ভূগোল পাঠের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান ও জরিপ করে আহরণের মাধ্যমে মানব কল্যাণে ব্যবহার করা যায়।

প্রাকৃতিক সম্পদের বর্তমান অবস্থা মূল্যায়ন করে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন সম্পর্কিত বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়। প্রাকৃতিক অবস্থা ও পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে কৃষিজদ্রব্য উৎপাদনে কোন প্রকার মৃত্তিকা, কোন ধরনের জলবায়ু, কী পরিমাণ সেচ প্রয়োজন তা জানা যায়। এছাড়াও ভূমিরূপতত্ত্বের বিবরণ জেনে অবকাঠামো নির্মাণ করলে তা ভূমিকম্প ও অন্যান্য প্রতিকূল অবস্থা থেকে রক্ষা করা সম্ভব। প্রাকৃতিক ভূগোল পাঠের মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন জেনে অবকাঠামো নির্মাণে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি।

এ কারণে প্রভাষক রতন ও রহিমকে প্রাকৃতিক ভূগোল পাঠের পরামর্শ দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ৯ আকাশ শীতের ছুটিতে বান্দরবানে ঘুরতে গেল। সে এখানে উঁচু উঁচু পাহাড়, পাহাড়ি নদী এবং পাহাড়ি বনাঞ্চল দেখে মুগ্ধ হলো। সে ভাবল ঢাকা শহর থেকে এখানের পরিবেশ কত আলাদা। ◀ *শিখনফল: ২ ও ৩*

ক. আধুনিক প্রাকৃতিক ভূগোলের রূপকার কে? ১

খ. প্রাকৃতিক ভূগোলের আলোচ্য বিষয় কী? ২

গ. আকাশ বান্দরবানে যে প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখেছে তা ভূগোলের কোন অংশে কীভাবে আলোচিত হয়? ৩

ঘ. প্রাকৃতিক ভূগোল অধ্যয়নের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জার্মান ভূগোলবিদ আলেকজান্ডার ভন হামবোল্ট।

খ প্রাকৃতিক ভূগোলে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের ভৌত পরিবেশ ও এর মধ্যে কার্যরত বিভিন্ন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে।

এছাড়া ভূঅভ্যন্তরের গঠন, স্তরবিন্যাস, উপাদান, শিলা, খনিজ, বায়ুমণ্ডল, বারিমণ্ডল, আবহাওয়াবিদ্যা, জলবায়ুবিদ্যা, সমুদ্রতত্ত্ব, ভূমিরূপতত্ত্ব, মৃত্তিকাবিদ্যা, জীববিদ্যা প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়।

গ আকাশ বান্দরবানে উঁচু উঁচু পাহাড়, পাহাড়ি নদী এবং পাহাড়ি বনাঞ্চল দেখেছিল। এ প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রাকৃতিক ভূগোলে আলোচিত হয়।

প্রাকৃতিক ভূগোল মূলত মানুষের পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিয়ে অনুশীলন করে থাকে। প্রকৃতির দেয়া সমস্ত জৈব ও অজৈব উপাদান, যার উৎপাদনে বা সৃষ্টিতে মানুষের কোনো সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকে না তাদের নিয়েই গঠিত হয় প্রাকৃতিক পরিবেশ।

বান্দরবানে উঁচু উঁচু পাহাড়, পাহাড়ি নদী এবং বনাঞ্চল প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে। এখানে মানুষের কোনো হস্তক্ষেপ নেই। প্রাকৃতিক পরিবেশের এই উপাদানগুলোই প্রাকৃতিক ভূগোলের আলোচনার বিষয়।

ঘ প্রাকৃতিক উপাদানের স্থান ও কালভিত্তিক বিশ্লেষণকে প্রাকৃতিক ভূগোল বলে। প্রাকৃতিক ভূগোল অধ্যয়নের তাৎপর্য নিম্নরূপ :

পৃথিবীর জন্ম রহস্য সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা লাভ : ভূগোলের এ শাখার মাধ্যমে পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য ভালোভাবে জানা যায়। কীভাবে পৃথিবী বিভিন্ন বাষ্পীয় ও তরল অবস্থার মধ্য দিয়ে বর্তমান রূপ ধারণ করেছে তা আমরা প্রাকৃতিক ভূগোল পাঠে জানতে পারি।

ভূত্বকের গঠন সম্পর্কে জানা : প্রাকৃতিক ভূগোল পাঠের মাধ্যমে ভূত্বকের গঠন সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়। ভূত্বক অনেকগুলো প্লেটের সমন্বয়ে গঠিত। বিভিন্ন জায়গায় এ প্লেটগুলোর চলন বিভিন্ন। প্রাকৃতিক ভূগোল পাঠের মাধ্যমে এ প্লেটগুলোর চলনের ধরন সম্পর্কে জানতে পারা যায়।

জলবায়ুর গুরুত্ব অনুধাবন : প্রাকৃতিক ভূগোল পাঠের অন্যতম গুরুত্ব হলো পৃথিবীর জলবায়ু সম্পর্কে বিশদভাবে জানা। এক্ষেত্রে বায়ুমণ্ডলের গভীরতা, বায়ুর স্তরবিন্যাস, বায়ুর উপাদান, বায়ুর তাপ ও চাপ প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারি। এমনকি বায়ুমণ্ডলের জলীয়বাষ্প, বায়ুর আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাতের কারণ ও এর প্রকারভেদ প্রভৃতি বিষয়ও জানা যায়।

সমুদ্র সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ : প্রাকৃতিক ভূগোল পাঠের মাধ্যমে সমুদ্র সম্পর্কে জানা যায়। ভূপৃষ্ঠের শতকরা ৭২ ভাগ পানি। এছাড়া পৃথিবীর মহাসাগরসমূহের অবস্থান, আকৃতি, জোয়ার-ভাটা, সমুদ্রস্রোত এবং এদের প্রভাব প্রভৃতি সম্পর্কে জানা যায়। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, প্রাকৃতিক ভূগোল অধ্যয়নের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ১০

A	ভূত্বকের উপরের পাতলা স্তর যা মূলত শিলা ক্ষয় ও জৈব পদার্থের মিশ্রণ।
B	মাটি ভেদ করে উঠে যা চলাফেরা করে না তার কাজ CO_2 গ্রহণ, আর O_2 সরবরাহ করা।

◀ *শিখনফল: ২ ও ৩*

ক. প্রাকৃতিক ভূগোলের বিষয়বস্তুকে কয়টি অজৈব পরিবেশে ভাগ করা যায়? ১

খ. অশ্মমণ্ডলকে সিয়াল স্তর বলে কেন? ২

গ. মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলিতে 'A' এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'B'-এর গুরুত্ব নিজের ভাষায় বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাকৃতিক ভূগোলের বিষয়বস্তুকে প্রধানত তিনটি অজৈব পরিবেশে ভাগ করা যায়।

খ পৃথিবীর উপরের আবরণ কয়েকটি স্তরের সমষ্টি। সবচেয়ে বাইরের স্তরটির নাম অশ্মমণ্ডল।

অশ্মমণ্ডলের উপরিভাগে জীবজগৎ গড়ে উঠেছে। এ মণ্ডলটি অপেক্ষাকৃত লঘু উপাদান দ্বারা গঠিত। এর মধ্যে সিলিকন (Si) ও অ্যালুমিনিয়ামই (Al) অধিক। এজন্য এ স্তরকে সিয়াল (Sial) স্তর বলে।

গ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত 'A' বিষয়টি হলো মৃত্তিকা। ক্ষয়ীভূত শিলা ও জৈব পদার্থের মিশ্রণে মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়। মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মৃত্তিকার প্রভাব অপরিসীম।

মৃত্তিকা না থাকলে প্রাকৃতিক ভূগোলের অন্যান্য উপাদান মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সাহায্য করতে পারে না। মৃত্তিকার উর্বরতা বা অনুর্বরতা কৃষিকাজের মান নিয়ন্ত্রণ করে বলে এটি পরোক্ষভাবে মানুষের কার্যাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করে; যেমন– গাঙ্গেয় সমভূমির মৃত্তিকা পলি দ্বারা গঠিত হওয়ায় অত্যন্ত উর্বর। তাই এ ঞ্চলের অধিবাসীরা মূলত কৃষিজীবী। এছাড়া উপকূলবর্তী অঞ্চলের মাটি সমতল এবং অধিক উর্বর বলে এখানকার অধিবাসীরাও কৃষিজীবী। আবার পার্বত্য বা মালভূমি এলাকায় ভূমি খাড়া এবং অনুর্বর হওয়ায় এখানকার অধিবাসীরা কৃষির উপর নির্ভর করে না। যে মাটিতে চাষাবাদ করা সহজ সেখানেই বেশির ভাগ চাষাবাদ হয়ে থাকে, আর যে অঞ্চলের মাটিতে চাষাবাদ কষ্টসাধ্য সাধারণত সে অঞ্চলে তেমন কৃষিকাজ হয় না। মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলির উপর এভাবেই মৃত্তিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত 'B' বিষয়টি হলো প্রাকৃতিক উদ্ভিদ।

মানুষ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান সবকিছুর জন্য উদ্ভিদের সহায়তা নেয়। প্রাকৃতিক বা সুচিন্তিত কর্ষণের ফল যেভাবেই আসুক না কেন, এটিই তার সকল অভাব মোচনের উৎস। উদ্ভিদ মানুষকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করে।

উদ্ভিদ পরিবেশ সুন্দর রাখে, বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং এটি পরিবেশ সুরক্ষিত রাখে। উদ্ভিদ সম্প্রদায় অঞ্চলে বায়ুমণ্ডল সর্বদা আর্দ্রতাসমৃদ্ধ হয়; ফলে সামান্য বাষ্পীভবনেই বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়। উদ্ভিদের শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করায় বৃষ্টিপাত বা অন্য কিছুতে মাটি তেমন ক্ষয় হয় না। শিকড়ে আটকে পড়ে মাটি অন্যত্র সরে যেতে পারে না। ফলে উদ্ভিদ মাটির ক্ষয়রোধ করে। আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান আমরা উদ্ভিদ থেকেই পেয়ে থাকি। পরিবেশের দূষণ রোধে উদ্ভিদ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। উদ্ভিদ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে এবং বায়ুতে অক্সিজেন ছেড়ে দিয়ে বায়ুমণ্ডলের ভারসাম্য রক্ষা করে। উদ্ভিদ মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ করে।

প্রশ্ন ▶ ১১

অজৈব উপাদান	জৈব উপাদান
১. ভূপ্রকৃতি	১. স্বাভাবিক উদ্ভিদ
২. নদ-নদী	২. জীবজন্তু
৩. জলবায়ু	

◀ শিখনফল: ২ ও ৩

ক. বারিতত্ত্ব কী? ১

খ. অজৈব উপাদানগুলো কোন ভূগোলের অন্তর্গত? ২

গ. উদ্দীপক অনুসারে উল্লিখিত অজৈব উপাদান প্রাকৃতিক ভূগোল অধ্যয়নে গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অজৈব ও জৈব উপাদানগুলো উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পানির উৎস, বণ্টন নিয়ে যে তত্ত্ব আলোচনা করে তাই বারিতত্ত্ব।

খ অজৈব উপাদানগুলো হলো ভূপ্রকৃতি, নদ-নদী এবং জলবায়ু। এগুলো প্রাকৃতিক ভূগোলের অন্তর্ভুক্ত।

তবে ভূপ্রকৃতি এবং নদ-নদী উপাদানটি প্রাকৃতিক ভূগোলের ভূমিরূপবিদ্যা শাখার এবং জলবায়ু উপাদানটি জলবায়ুবিদ্যা শাখার অন্তর্ভুক্ত।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত অজৈব উপাদানগুলো হলো ভূপ্রকৃতি, নদ-নদী এবং জলবায়ু। এ উপাদানগুলো প্রাকৃতিক ভূগোল অধ্যয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ভূপ্রকৃতি প্রাকৃতিক ভূগোলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ভূপৃষ্ঠের প্রকৃতি বা ধরনকে ভূপ্রকৃতি বলে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি বিভিন্ন ধরনের। এসব ভূপ্রকৃতি মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তথা জীবনপ্রণালির ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে। আবার নদ-নদী প্রাকৃতিক ভূগোলের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কোনো দেশের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ওপর নদ-নদীর প্রভাব অত্যন্ত গভীর। প্রাচীন ইতিহাস হতেও বোঝা যায়, নদীমাতৃক দেশগুলোতে বড় বড় নদীর তীরে সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল। অন্যদিকে জলবায়ু, প্রাকৃতিক ভূগোলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলোর মধ্যে একটি। এ জন্য মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ওপর জলবায়ু যতটা প্রভাব বিস্তার করে অন্য কোনো প্রাকৃতিক পরিবেশ ততটা করে না। জলবায়ুর পার্থক্যের দরুন বিভিন্ন দেশের মানুষের খাদ্য, পরিধেয় এবং বাসগৃহ নির্মাণ প্রণালির তারতম্য ঘটে থাকে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, উল্লিখিত অজৈব উপাদানগুলো মানবজীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যা প্রাকৃতিক ভূগোলে আলোচিত হয়ে থাকে। তাই উল্লিখিত অজৈব উপাদান প্রাকৃতিক ভূগোল অধ্যয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ঘ উদ্দীপকে অজৈব উপাদানগুলো হলো ভূপ্রকৃতি, নদ-নদী ও জলবায়ু এবং জৈব উপাদানগুলো হলো স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও জীবজন্তু। নিচে অজৈব ও জৈব উপাদানগুলো বিশ্লেষণ করা হলো:

অজৈব উপাদান

ভূপ্রকৃতি: ভূপৃষ্ঠের প্রকৃতি বা ধরনকে ভূপ্রকৃতি বলে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি বিভিন্ন ধরনের। ভূপ্রকৃতিকে ভূপৃষ্ঠের বন্ধুরতার তারতম্য ও বৈচিত্র্য অনুসারে প্রধানত পর্বত, মালভূমি এবং সমভূমি এ তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

নদ-নদী: কোনো দেশের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ওপর নদ-নদীর প্রভাব অত্যন্ত গভীর। ভারতীয় সভ্যতার সূতিকাগার গঙ্গা ও সিন্ধুনদের তীরে, চীনের সভ্যতা হোয়াংহো এবং ব্যাবিলনের সভ্যতা ইউফ্রেটিস নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল।

জলবায়ু: মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ওপর জলবায়ু যতটা প্রভাব বিস্তার করে, অন্য কোনো প্রাকৃতিক পরিবেশ ততটা করে না। জলবায়ুর পার্থক্যের দরুন বিভিন্ন দেশের মানুষের খাদ্য, পরিধেয় এবং বাসগৃহ নির্মাণপ্রণালির তারতম্য ঘটে থাকে।

জৈব উপাদান

স্বাভাবিক উদ্ভিদ: প্রাকৃতিক ভূগোলের জৈব শাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো উদ্ভিজ্জ। দেশের মঙ্গল ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলে উদ্ভিজ্জের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। উদ্ভিজ্জ সম্পদ জ্বালানি কাঠ, চেরাই কাঠ ও কাগজ শিল্পের কাঁচামালের উৎস।

জীবজন্তু: জীবজন্তু অর্থাৎ প্রাণিজগতও মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিতে সহায়তা করে থাকে। এরা প্রয়োজনীয় খাদ্য, পানীয়, পরিধেয় প্রভৃতি যোগান দিয়ে মানুষের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। মাছ, মাংস, রেশম প্রভৃতি প্রাণিজগৎ হতে পাওয়া যায়।

সুতরাং উপরিউক্ত অজৈব ও জৈব উপাদানগুলো বিশ্লেষণ করে বলা যায়, উক্ত উপাদানগুলো মানুষের জীবনধারণের জন্য এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ যা প্রাকৃতিক ভূগোলের আলোচ্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়
পৃথিবীর গঠন

পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶ ১ জনাব মনিরুজ্জামান তার ভূগোল ক্লাসে একটি ভূগোলক (globe) নিয়ে আসলেন এবং এর উপরের স্তর নিয়ে আলোচনা করলেন। ◀ *শিখনফল: ১*

ক. পৃথিবীর মোট ভূমির শতকরা কত ভাগ মালভূমির আওতাভুক্ত? ১

খ. গুরুমণ্ডল বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ভূগোল ক্লাসের আলোচ্য বিষয় মূলত কী ছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোচ্য স্তরটি একাধিক শিলা দ্বারা গঠিত— উক্তিটির পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৃথিবীর মোট ভূমির শতকরা প্রায় ২৪ ভাগ মালভূমির আওতাভুক্ত।

খ কেন্দ্রমণ্ডলের বহিঃভাগ থেকে অশ্মমণ্ডলের নিম্নদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত স্তরকে গুরুমণ্ডল বলে।

গুরুমণ্ডলের পুরুত্ব প্রায় ২,৮৮৫ কিলোমিটার। এটি পৃথিবীর মোট আয়তনের শতকরা ৮২ ভাগ এবং ওজনের ৬৮ ভাগ দখল করে আছে। গুরুমণ্ডল সিলিকন, ম্যাগনেসিয়াম, লোহা ও কার্বন দ্বারা গঠিত।

গ জনাব মনিরুজ্জামান ক্লাসে একটি ভূগোলক নিয়ে এসেছিলেন। এর উপরের স্তর মূলত ভূত্বক। ভূপৃষ্ঠের উপরের কঠিন ও পাতলা আবরণই ভূত্বক নামে পরিচিত, যা জীবজগতের আবাসস্থল।

ভূত্বক পৃথিবীর মোট আয়তনের শতকরা ১.৫৫ ভাগ, যা নানা প্রকার শিলা ও খনিজ উপাদান দ্বারা গঠিত। এর গড় পুরুত্ব ১৭ কি.মি.। মহাদেশীয় ভূত্বকের পুরুত্ব গড়ে ৩৫ কি.মি. এবং সমুদ্র তলদেশে তা ৫ কি.মি.। এর ঘনত্ব ২.৮ হতে ৩.৪। মহাদেশীয় ভূত্বকের স্তরকে সিয়াল (Sial) বলে, যা সিলিকন (Si) ও অ্যালুমিনিয়াম (Al) দ্বারা গঠিত। সমুদ্রের তলদেশের ভূত্বকের স্তরকে সিমা (Sima) বলে, যা প্রধানত সিলিকন (Si) ও ম্যাগনেসিয়াম (Mg) দ্বারা গঠিত। ভূত্বকের তাপমাত্রা ভূঅভ্যন্তরীণ স্তরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম। এ স্তরে নিচের দিকে প্রতি কিলোমিটারে ৩০° সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়।

ঘ জনাব মনিরুজ্জামানের আলোচ্য স্তরটি হলো ভূত্বক।

ভূত্বক মহাদেশীয় ভূভাগে 'সিয়াল' এবং সমুদ্রের তলদেশে 'সিমা' স্তর নামে পরিচিত। উক্ত 'সিয়াল' ও 'সিমা' স্তর দুটি বিভিন্ন খনিজের সংমিশ্রণে গঠিত।

ভূকম্পনীয় তরঙ্গের গতিবেগ পর্যালোচনা করে ভূত্বক গঠনকারী শিলাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা—

উপরের লঘু শিলাস্তর বা ফেলসিক: এটি ভূত্বকের উপরের স্তর, যা লঘু গ্রানাইট জাতীয় অম্লিক (Acidic) শিলায় গঠিত। সিলিকন ও অ্যালুমিনিয়াম দ্বারা গঠিত বলে একে সিয়াল স্তর বলে। এ স্তরের মধ্য দিয়ে ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট 'P' তরঙ্গ প্রতি সেকেন্ড ৬.২ কি.মি. বেগে প্রবাহিত হয়।

মধ্যবর্তী গুরু শিলাস্তর বা মেফিক: এটি ভূত্বকের দ্বিতীয় স্তর, যাতে সিলিকন ও ম্যাগনেসিয়ামের পরিমাণ অধিক। এটি 'সিমা' নামে পরিচিত। এ স্তরে ভূকম্পনীয় তরঙ্গের গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে ৭ কি.মি.।

নিচের অলিভিন জাতীয় শিলাস্তর: অলিভিন নামক খনিজের পরিমাণ বেশি থাকায় এ স্তরকে অতিক্ষারকীয় শিলাস্তর বলে। এ স্তরে ভূমিকম্পের 'P' তরঙ্গের গতিবেগ বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি সেকেন্ড ৮. কি.মি. পর্যন্ত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, ভূত্বক বিভিন্ন শিলা দ্বারা গঠিত।

প্রশ্ন ▶ ২

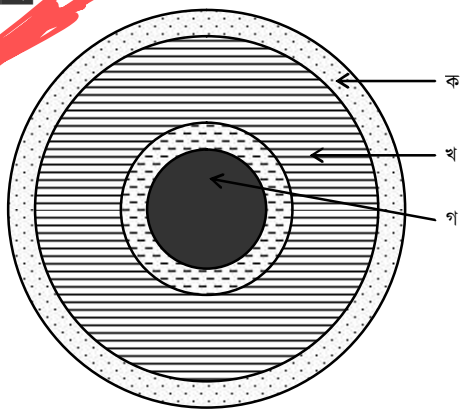

◀ *শিখনফল: ১ [প্রফেসর মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী, অনু-১]*

ক. পর্বত কাকে বলে? ১

খ. স্রস্ত উপত্যকা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. চিত্রে 'ক' স্তরের গঠন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে 'খ' ও 'গ' স্তরের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভূপৃষ্ঠের অতি উচ্চ, সুবিস্তৃত ও খাড়া ঢালবিশিষ্ট শিলাস্তূপকে পর্বত বলে। যেমন— হিমালয়।

খ চ্যুতি-স্তূপ পর্বত সৃষ্টির সময় শিলাস্তর দুই পাশে সরে গেলে স্রস্ত উপত্যকার সৃষ্টি হয়।

দুটি চ্যুতির মাঝের অংশ পাশের অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চাপের ফলে উপরে খাড়াভাবে উঠে আসে এবং দুই পাশ নিচে বসে যায়। এই উঠে আসাকে স্তূপ পর্বত বা হোস্ট এবং বসে যাওয়া অংশকে স্রস্ত উপত্যকা (rift valley) বলা হয়।

গ চিত্রের 'ক' স্তরটি অশ্মমণ্ডল।

অশ্মমণ্ডল মহাদেশের তলদেশে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ কি. মি. এবং গড়ে প্রায় ৩৫ কি.মি. পুরু। সমুদ্রের তলদেশে এ স্তর ৩ থেকে ১০ কি.মি. এবং গড়ে ৫ কি.মি. পর্যন্ত পুরু। অশ্মমণ্ডলকে ২টি স্তরে ভাগ করা হয়েছে যথা: ক. লঘু শিলাস্তর ও (খ) গুরু শিলাস্তর। লঘু শিলাস্তরটি ভূপৃষ্ঠ থেকে গড়ে ১২.৮ কি.মি. গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং গুরু শিলাস্তরটির ঘনত্ব ২.৯৫-৩ কি. গ্রা/ঘনমিটার।

ঘ চিত্রের 'খ' ও 'গ' স্তর দুইটি যথাক্রমে গুরুমণ্ডল ও কেন্দ্রমণ্ডল।

গুরুমণ্ডল স্তরের গভীরতা ১৫ কি.মি. থেকে ২,৯০০ কি.মি. পর্যন্ত।

এটি মূলত ব্যাসল্ট শিলায় গঠিত। গুরুমণ্ডলকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- (ক) বহিঃগুরুমণ্ডল এবং (খ) অন্তঃগুরুমণ্ডল। বহিঃগুরুমণ্ডল স্তরটি ১০০ কি.মি. থেকে ৭০০ কি.মি. পর্যন্ত বিস্তৃত। অন্তঃগুরুমণ্ডল ৭০০ কি.মি. থেকে ২৯,০০ কি.মি. পর্যন্ত বিস্তৃত।

কেন্দ্রমণ্ডলটি গুরুমণ্ডল (২৮৮৫ কি.মি.) থেকে পৃথিবীর কেন্দ্র (৬,৩৭১ কি.মি.) পর্যন্ত বিস্তৃত। গুটেনবার্গ বিযুক্তি থেকে এর গভীরতা ৩,৪৮৬ কি.মি.। এর মূল উপাদান নিকেল ও লোহা।

এ থেকে বোঝা যায়, গুরুমণ্ডল ও কেন্দ্রমণ্ডলের বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা আছে।

প্রশ্ন ▶৩

◀ *শিখনফল: ১ [অবনীন্দ্রনাথ বৈদ্য; অনু-২]*

ক. শিলা কাকে বলে? ১

খ. আগ্নেয় শিলার সৃষ্টি কিরূপে? ২

গ. 'ক' ও 'খ' শিলার বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. 'পাললিক শিলার জীবাশ্ম থাকে কিন্তু আগ্নেয় শিলার জীবাশ্ম থাকে না।'- ব্যাখ্যা করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভূত্বক যে সমস্ত উপাদানে গঠিত তাদেরকে শিলা বলে।

খ পৃথিবী আদিতে অত্যন্ত উষ্ণ ও গ্যাসীয় অবস্থায় ছিল। অবিরাম তাপ বিকিরণের ফলে পৃথিবী ক্রমশ শীতল ও কঠিন অবস্থায় আসে। এভাবে গলিত অবস্থা থেকে ঘনীভূত বা কঠিন হয়ে আগ্নেয় শিলার সৃষ্টি হয়।

গ চিত্রের 'ক' উপপাতালিক এবং 'খ' পাতালিক শিলা।

উপপাতালিক শিলা: যে শিলা ভূঅভ্যন্তরের গভীরতায় সৃষ্টি হয় তাকে উপপাতালিক শিলা বলে। যেমন: ডোলেরাইট, পরফিরি, গ্রানোপার প্রভৃতি উপপাতালিক শিলার অন্তর্গত। ভূগর্ভস্থ গলিত ম্যাগমা ভূপৃষ্ঠে পৌঁছালে তা লাভায় পরিণত হয়। এ সকল লাভা সব সময় বাইরে আসে না, ভূপৃষ্ঠের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করে শীতল হয়ে শিলার সৃষ্টি করে। এ ধরনের শিলাকে উপপাতালিক শিলা বলে।

পাতালিক শিলা: যে শিলা ভূগর্ভের অত্যন্ত গভীরে সৃষ্টি হয় তাকে পাতালিক শিলা বলে। যেমন: গ্রানাইট, গ্যাব্রো, ডায়োরাইট ইত্যাদি। ভূগর্ভে সৃষ্ট গলিত ম্যাগমা সব সময় ভূপৃষ্ঠে পৌঁছাতে পারে না। এগুলো ভূপৃষ্ঠের নিচে বিভিন্ন আকারে ও আকৃতিতে ভূগর্ভে অবস্থান করে শীতল হয়ে জমাট বেঁধে এক প্রকার শিলার সৃষ্টি করে। এদেরকে পাতালিক শিলা বলে।

ঘ গঠন প্রক্রিয়ার ভিন্নতার কারণে পাললিক শিলায় জীবাশ্ম থাকে কিন্তু আগ্নেয়শিলায় থাকে না।

আগ্নেয় শিলা অগ্নি বা উত্তাপের ফলে সৃষ্টি হয়। আদিতে পৃথিবী একটি বাষ্পপিণ্ড ছিল। ক্রমান্বয়ে তাপ বিকিরণের মাধ্যমে প্রথমে তরল ও পরে জমাট বেঁধে পৃথিবী পৃষ্ঠে শিলার সৃষ্টি হয়। উত্তপ্ত পদার্থ থেকে এই শিলার সৃষ্টি হয় বলে একে আগ্নেয় শিলা বলে। এছাড়া অগ্ন্যুৎপাতের ফলেও আগ্নেয় শিলার সৃষ্টি হয়। এ জন্য আগ্নেয় শিলার কানো স্তর ও জীবাশ্ম নেই।

উত্তাপ, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, উদ্ভিদ, জীবজন্তু প্রভৃতির দ্বারা ভূপৃষ্ঠে সব সময় ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে কাঁকর, বালি, কাদা, নানা প্রকার সূক্ষ্ম পদার্থে পরিণত হয়। পরে এসব সূক্ষ্ম পদার্থ নদী, বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্র, হিমবাহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা বাহিত হয়ে সমুদ্রে বা হ্রদে পলিরূপে জমা হয়। এভাবে হাজার হাজার বছর ধরে পলির স্তর পড়তে থাকে। কালক্রমে নিচের পলির স্তরগুলো ওপরের পলিস্তরের ও সমুদ্রের পানির বিশাল পানিরাশির চাপে এবং ভূগর্ভের তাপে জমাট বেঁধে শিলায় পরিণত হয়। এভাবে দীর্ঘকাল ধরে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয় বলে পাললিক শিলায় জীবাশ্ম দেখা যায়।

সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, পাললিক শিলায় জীবাশ্ম থাকে কিন্তু আগ্নেয় শিলায় জীবাশ্ম থাকে না।

প্রশ্ন ▶৪ রহিম পরিবারের সঙ্গে টিভিতে নাটক দেখছিল। হঠাৎ টিভির পর্দার নিচের অংশে সংবাদ শিরোনাম ভেসে আসছে। চীনের একটি কয়লা খনিতে ১৫ জন শ্রমিকের মৃত্যু। শ্রমিকের মৃত্যু সংবাদে রহিম ব্যথিত হলো।

◀ *শিখনফল: ১ [অবনীন্দ্রনাথ বৈদ্য; অনু-৫]*

ক. খনিজ কী? ১
খ. শিলা ও খনিজের বৈসাদৃশ্য লেখো। ২
গ. খনিজের বৈশিষ্ট্য লিখো। ৩
ঘ. খনিজের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কতকগুলো মৌলিক উপাদান প্রাকৃতিক উপায়ে মিলিত হয়ে যে যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করে তাই খনিজ। যেমন– ট্যালক।

খ খনিজ ও শিলার বৈসাদৃশ্য–

i. খনিজ বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানে গঠিত। পক্ষান্তরে শিলা বিভিন্ন খনিজের সংমিশ্রণে গঠিত। ii. খনিজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্ফটিকাকার। অন্যদিকে শিলার নির্দিষ্ট কোনো আকার ও আয়তন নেই। iii. খনিজ সহজেই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। শিলা সহজে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না।

গ কতকগুলো মৌলিক উপাদান প্রাকৃতিক উপায়ে মিলিত হয়ে যে যৌগ গঠন করে তাকে খনিজ বলে।
খনিজ এক বা একাধিক মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। আবার খনিজ একটি মাত্র মৌল দ্বারাও গঠিত হতে পারে। খনিজের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

i. খনিজ প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট অজৈব কঠিনবস্তু ও স্ফটিকার;
ii. এর নির্দিষ্ট রাসায়নিক গঠন ও ভৌত ধর্ম আছে;
iii. খনিজের ধর্ম এর গঠনকারী মৌলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত;
iv. এর অভ্যন্তরীণ গঠন সুনির্দিষ্ট;
v. এর রাসায়নিক ও ভৌত ধর্ম, রাসায়নিক গঠন ও আণবিক কাঠামোর ওপর নির্ভর করে;
vi. এর প্রোটনের সংখ্যা দ্বারা পারমাণবিক সংখ্যা ও মৌলের নাম নির্ধারিত হয়।

ঘ খনিজ হলো একটি প্রাকৃতিক অজৈব পদার্থ যার সুনির্দিষ্ট রাসায়নিক গঠন এবং ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম রয়েছে। খনিজের অর্থনৈতিক গুরুত্ব নিম্নরূপ:

ধাতব খনিজ: ধাতব খনিজ দ্রব্যের মধ্যে আকরিক লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, টাংস্টেন, নিকেল, ক্রোমিয়াম, তামা, সীসা, টিন, দস্তা, অ্যালুমিনিয়াম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এসব দ্রব্যের মধ্যে আকরিক লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, টাংস্টেন, নিকেল ও ক্রোমিয়াম প্রভৃতি ভারী শিল্পে (যেমন– লোহা ও ইস্পাত) ব্যবহৃত হয়। তামা, সীসা, টিন, দস্তা, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, যানবাহন ইত্যাদি প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়।

অধাতব খনিজ: চুনাপাথর, মার্বেল, জিপসাম, অভ্র, গ্রাফাইট ইত্যাদি অধাতব খনিজ। সোনা, রূপা, অলঙ্কার নির্মাণে; চুনাপাথর, মার্বেল, জিপসাম ইত্যাদি লোহা গলানো, সিমেন্ট প্রস্তুত ও অবকাঠামো নির্মাণে ব্যবহৃত হয়; অভ্র, গ্রাফাইট ইত্যাদি বৈদ্যুতিক ও অন্যান্য শিল্পের জন্য ব্যবহৃত হয়।

জ্বালানি খনিজ: জ্বালানি খনিজ শিল্পক্ষেত্রে তাপ উৎপাদনে একমাত্র বিকল্প। যেমন– কয়লা, তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস। উপরন্তু শিল্পের জ্বালানি হিসেবে খনিজ তেল যানবাহন ও জেনারেটর চালাতে, গ্যাস বিদ্যুৎ উৎপাদনে এবং পারমাণবিক ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম ইত্যাদি শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।
যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে খনিজ সম্পদের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। পৃথিবীর যে দেশ খনিজ সম্পদে যত সমৃদ্ধ সে দেশ অর্থনৈতিকভাবে তত বেশি উন্নত।

প্রশ্ন ▶ ৫

◀ *শিখনফল: ১ [ড. মো. মনিরুজ্জামান; অনু-২]*

ক. ভূঅভ্যন্তর কয়টি স্তরে গঠিত? ১
খ. ভূঅভ্যন্তরের গঠন কাঠামো ব্যাখ্যা করো। ২
গ. অশ্মমণ্ডল হতে কেন্দ্রমণ্ডলের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন হবে কী? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. কেন্দ্রমণ্ডলের অংশসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভূঅভ্যন্তর তিনটি স্তরে গঠিত।

খ ভূঅভ্যন্তরের গঠন কাঠামো তিনটি স্তরে বিন্যস্ত।

ভূপৃষ্ঠে শিলার যে কঠিন বহিরাবরণ তাকে অশ্মমণ্ডল বলে। অশ্মমণ্ডলের নিচে প্রায় ২৮৮৫ কিলোমিটার পর্যন্ত পুরু মণ্ডলকে গুরুমণ্ডল বলে। এর নিচ থেকে পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত রয়েছে কেন্দ্রমণ্ডল।

গ ভূপৃষ্ঠের শিলাগঠিত কঠিন বহিরাবরণকে অশ্মমণ্ডল বলে। পৃথিবী পৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা ১৩.৯০°সে.। অশ্মমণ্ডলে প্রতি কিলোমিটার গভীরতায় ৩০° সে. তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়।
কেন্দ্রমণ্ডলের বহির্ভাগ থেকে অশ্মমণ্ডলের নিম্নস্তর পর্যন্ত বিস্তৃত স্তরকে গুরুমণ্ডল বলে। এখানে ১০০ কি.মি. গভীরতায় তাপমাত্রা ১১০০°-১২০০° সে. এবং ৭০০ কি.মি. গভীরতায় তাপমাত্রা ১৯০০° সে. বলে অনুমান করা হয়। তবে গুরুমণ্ডলের নিম্নাংশের তাপমাত্রা প্রায় ৩০০০° সে. এর বেশি। পৃথিবীর কেন্দ্রে কেন্দ্রমণ্ডল অবস্থিত। কেন্দ্রমণ্ডলের স্থানভেদে তাপমাত্রা ৩০০০° থেকে ৫০০০°সে. বা তারও বেশি।
উপরিউক্ত আলোচনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অশ্মমণ্ডল থেকে যত ভিতরের দিকে যাওয়া যায় অর্থাৎ কেন্দ্রমণ্ডল পর্যন্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়।

ঘ পৃথিবীর কেন্দ্রে কেন্দ্রমণ্ডল অবস্থিত। এ মণ্ডলটি প্রায় ৩,৪৮৬ কি.মি. পুরু।

পৃথিবীর আয়তনের তুলনায় এ স্তর ১৬.২ শতাংশ হলেও মোট ওজনের শতকরা প্রায় ৩১.৫ ভাগ দখল করে আছে। এ স্তরের কঠিন অন্তঃকেন্দ্র প্রধানত লোহা ও নিকেল সমন্বয়ে গঠিত; তরল বহিঃকেন্দ্র লোহা ও নিকেল দ্বারা গঠিত। এ মণ্ডলের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০ থেকে ১৩.৬।

কেন্দ্রমণ্ডলকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা— অন্তঃকেন্দ্রমণ্ডল ও বহিঃকেন্দ্রমণ্ডল। অন্তঃকেন্দ্রমণ্ডল পৃথিবী কেন্দ্র থেকে ১,২২১ কিমি পুরুত্ববিশিষ্ট। কেন্দ্রমণ্ডলের বাইরের অংশ অপেক্ষাকৃত তরল বলে 'S' তরঙ্গ প্রবেশ করে না। এ স্তরের ৫,১৫০ কি.মি. গভীরে একটি বিযুক্তি রয়েছে। বহিঃকেন্দ্রমণ্ডলের পুরুত্ব আনুমানিক ২,২৭০ কি.মি.। এ স্তরে 'S' তরঙ্গ প্রবেশ করে না। 'P' তরঙ্গের গতিবেগ কেন্দ্রমণ্ডলের শুরুতে ৮.১ কি.মি./সে. থাকে। পরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১১.২ কি.মি./সে. পর্যন্ত হয়।

কেন্দ্রমণ্ডলের তাপমাত্রা স্থানভেদে ৩,০০০° থেকে ৫,০০০° সে. বা তারও বেশি। কেন্দ্রমণ্ডলের ঘনত্বের চাপ অন্তঃকেন্দ্রে ৩,৭০০ এবং বহিঃকেন্দ্রে ৩,৩৪০ কিলোবার। অর্থাৎ গড় চাপের পরিমাণ ৩,৬৮০ কিলোবার।

প্রশ্ন ▶ ৬ ফারুক স্যার ক্লাসে একটি অমসৃণ অভিগত গোলক এঁকে বললেন, "এটি মানবজাতির জন্য একটি বহুল আলোচিত বস্তু, যার উপরের আবরণটির গড় গভীরতা প্রায় ১৭ কিলোমিটার এবং ঘনত্ব প্রায় ২.৮ থেকে ৩.৪।"

◀ শিখনফল-১ [ড. সৈয়দ শাহজাহান আহমেদ; অনু-৬]

ক. পৃথিবীর মোট ভূমির কত ভাগ মালভূমির আওতাভুক্ত? ১

খ. গুরুমণ্ডল বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ফারুক স্যারের আলোচ্য বিষয় মূলত কী ছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "ফারুক স্যারের আলোচ্য বস্তুর আবরণটি একাধিক শিলা দ্বারা গঠিত।"- উক্তিটির পক্ষে বা বিপক্ষে তোমার মতামত বিস্তারিত তুলে ধর। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৃথিবীর মোট ভূমির প্রায় ৫ ভাগ মালভূমির আওতাভুক্ত।

খ কেন্দ্রমণ্ডলের বহিঃভাগ থেকে অশ্মমণ্ডলের নিম্নস্তর পর্যন্ত বিস্তৃত স্তরকে গুরুমণ্ডল বলে।

গুরুমণ্ডলের স্তরটি প্রায় ২,৮৮৫ কি.মি. পুরু। এটি পৃথিবীর আয়তনের ৮২ শতাংশ এবং ওজনের শতকরা ৬৮ ভাগ দখল করে আছে। তবে, ভূত্বক ও গুরুমণ্ডলের মাঝে একটি পাতলা স্তর আছে। এটি মোহোরোভিসিক (moho) নামে পরিচিত।

গ ফারুক স্যারের আলোচ্য বিষয় হলো পৃথিবী।

সমুদ্রতল, পাহাড়-পর্বত এবং মালভূমির জন্য পৃথিবীপৃষ্ঠ উঁচু-নিচু, ঢেউ খেলানো এবং বন্ধুর প্রকৃতির। হিমালয়ের মাউন্ট এভারেস্ট (৮,৮৫৮ মি.) হলো পৃথিবীর উচ্চতম স্থান। আর প্রশান্ত মহাসাগরের গভীর সমুদ্রতলে অবস্থিত ম্যারিয়ানা খাত (১০,৮৭০ মিটারের অধিক) হলো পৃথিবীর নিম্নতম অঞ্চল। এতে বোঝা যায়, পৃথিবীপৃষ্ঠ যথেষ্ট বন্ধুর বা অমসৃণ।

মহাশূন্যে প্রেরিত কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে সংগৃহীত তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, পৃথিবীর দক্ষিণ মেরু চাপা (২০ মিটার নিচু) আর উত্তর গোলার্ধের মধ্য অক্ষাংশ ৮ মিটার নিচু। এতে বোঝা যায় যে, পৃথিবীর আকৃতি অনেকটা অভিগত গোলকের মতো।

পৃথিবীর উপরের কঠিন আবরণটি হলো ভূত্বক যা গুরুমণ্ডলের উপর অবস্থিত। এর গভীরতা ৩ কি.মি. (সমুদ্র তলদেশ) থেকে ৪০ কি.মি. (পর্বতের তলদেশে) এবং গড় গভীরতা প্রায় ১৭ কি.মি.। ২.৮ থেকে ৩.৪ ঘনত্ববিশিষ্ট ভূত্বকটি নানা প্রকার খনিজ ও শিলা (কর্দম, ব্যাসল্ট, গ্রানাইট) নিয়ে গঠিত। এর নিচের অংশ প্রায় একই প্রকার সমসত্ত্ব উপাদান (সিলিকেট গঠিত খনিজ) দিয়ে গঠিত এবং এ আবরণটি অশ্মমণ্ডল নামেও পরিচিত।

ঘ "ফারুক স্যারের আলোচ্য বস্তুর আবরণটি একাধিক শিলা দ্বারা গঠিত।"- বাক্যটির পক্ষে আমার মতামত বিস্তারিত তুলে ধরা হলো—

উদ্দীপক থেকে বোঝা যায়, ফারুক স্যারের আলোচ্য বিষয়টি হলো পৃথিবী। পৃথিবীর বাইরের আবরণটি ভূত্বক নামে পরিচিত, যা নানা প্রকার শিলা কাদা পাথর, (ব্যাসল্টি, গ্রাফাইট) দ্বারা গঠিত। ভূকম্পন তরঙ্গের গতিবেগ লক্ষ করে ভূত্বক গঠনকারী শিলাকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- উপরের লঘু (light) শিলা এবং নিচের গুরু (heavy) শিলা।

ভূত্বকের লঘু শিলাস্তরের উপরই গাছপালা ও তৃণ জন্মায়, যেখানে গ্রানাইট শিলার পরিমাণ বেশি থাকে। এ জাতীয় শিলায় সিলিকন ও অ্যালুমিনিয়ামের আধিক্য থাকে বলে একে সিয়াল (SiAl) স্তর নামেও অভিহিত করা হয়। মহাদেশীয় ভূভাগ গুলো প্রধানত এ জাতীয় শিলায় গঠিত। সিয়ালের নিচের ভূত্বকের গুরু শিলাস্তরটি অবস্থিত, যা ব্যাসল্ট জাতীয় শিলা দ্বারা গঠিত। এ ধরনের শিলায় সিলিকন ও ম্যাগনেসিয়ামের পরিমাণ বেশি থাকায় এ স্তরটি সিমা (SiMa) নামেও পরিচিত। মহাদেশগুলোর তলদেশে যেখানে গ্রানাইট শিলাস্তর শেষ হয়েছে সেখানে এ শিলাস্তর দেখা যায়।

উপরে বর্ণিত লঘু এবং গুরু স্তরদ্বয়ের আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ভূত্বক অর্থাৎ ফারুক স্যারের আলোচ্য বস্তুর আবরণটি একাধিক শিলা দ্বারা গঠিত।

প্রশ্ন ▶ ৭ বাবার কাছে গল্প শুনতে শুনতে টুকু আজ দুই প্রকারের ভূমিরূপ সম্পর্কে জানতে পেরেছে, যার এক প্রকারের উচ্চতা ১ কি. মি.- এরও বেশি হতে পারে। সে আরও জানল যে, অন্য আরেক শ্রেণির ভূমিরূপগুলোতেই পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষ বসবাস করে যেগুলোর উচ্চতা সাধারণত দেড়শ মিটারের মধ্যে থাকে।

◀ শিখনফল-২ [ড. সৈয়দ শাহজাহান আহমেদ; অনু-১০]

ক. Fold Mountain কী? ১

খ. সম-মালভূমি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত ভূমিরূপ দুটির বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত ভূমিরূপ দুটি মানবজীবনে কীরূপ প্রভাব ফেলতে পারে তার বিস্তারিত বিবরণ দাও। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Fold Mountain হলো ভঙ্গিল পর্বত।

খ শুষ্ক মরুপ্রায় মালভূমি অঞ্চল অনেক সময় ক্যানিয়ন বা গভীর গিরিখাত দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়। ফলে মালভূমির উপরিভাগ আলাদা উচ্চ সম-মালভূমিতে পরিণত হয়। এ ধরনের মালভূমিকে সম-মালভূমি বলা হয়। যেমন- দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন মালভূমি ও আরব মালভূমি।

গ উদ্দীপক থেকে বোঝা যাচ্ছে, ১ কিলোমিটারেরও বেশি উচ্চতাসম্পন্ন ভূমিরূপ দ্বারা পর্বত এবং দেড়শ মিটারের মধ্যকার ভূমিরূপটি দ্বারা সমভূমির প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে। নিচে এ ভূমিদ্বয়ের মধ্যকার বৈসাদৃশ্য বর্ণনা করা হলো-

ভূপৃষ্ঠের অতি উচ্চ, সুবিস্তৃত এবং খাড়া ঢালবিশিষ্ট শিলাস্তূপই হলো পর্বত। অন্যদিকে সমুদ্রপৃষ্ঠের ন্যায় একই সমতলে বা সামান্য উঁচুতে অবস্থিত বিস্তীর্ণ স্থলভাগই সমভূমি। পর্বতের ভূমিভাগ খুবই বন্ধুর কিন্তু সমভূমির ভূমিভাগ একঘেয়ে ও বন্ধুরতাবিহীন। পার্বত্য ভূমি প্রধানত শিলাময় এবং সমভূমি মৃত্তিকাময়। পার্বত্য নদী খুবই খরস্রোতা; সমভূমিতে নদী ধীর গতিসম্পন্ন। পর্বতে বসতি ও শিল্প গড়ে ওঠার উপযোগী নয়; সমভূমির সর্বত্র উপযুক্ত। পর্বতে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ কম, অর্থাৎ জীবনসংগ্রাম কঠিন হলেও সমভূমিতে জীবনযাত্রার সুযোগ অধিক। পর্বতের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে পর্যটন ব্যবসায় গড়ে ওঠে। সমভূমিতে ভূপ্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বিশেষ থাকে না।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত উঁচু ভূমিটি দ্বারা পর্বত এবং কম উচ্চতাসম্পন্ন ভূমিটি দ্বারা সমভূমি বোঝানো হয়েছে। উভয় ভূমিরূপেরই মানবজীবনে উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে।

ভূপৃষ্ঠের উপর খাড়ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে উচ্চ পর্বতশ্রেণিগুলো বিভিন্ন দেশের জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হিমালয় পর্বতের অবস্থানের ফলে মৌসুমি বায়ু বাধা পেয়ে ভারত ও বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টি হয়। আবার শীতকালে এ দেশ দুটি তীব্র শৈত্যপ্রবাহ থেকে রক্ষা পায়। পর্বতের হিমবাহ এবং তুষারগলা পানিতে অনেক নদীর উৎপত্তি হয়েছে। যেগুলোর পানি সেচকাজে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বৃষ্টিবহুল পার্বত্য অঞ্চলেই পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য বনভূমির সৃষ্টি হয়েছে। যেখানে কাঠ সংগ্রহ এবং পশুপালন পর্বতবাসীদের প্রধান জীবিকা। পার্বত্য নদীগুলো খরস্রোতা হয় বলে ঐসব নদী থেকে সহজে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়। যেমন– বাংলাদেশের কর্ণফুলী পানিবিদ্যুৎ প্রকল্প। বন্ধুর প্রকৃতি, অনুন্নত যোগাযোগব্যবস্থা, বিরল বসতি এবং স্বল্প চাহিদার জন্য পার্বত্য অঞ্চল শিল্পে অনুন্নত হয়।

সমভূমির উর্বর মৃত্তিকা, সেচ ও পানীয় জলের সহজলভ্যতা কৃষিকাজে সহায়ক। ফলে প্রাচীনকাল থেকে নদী গঠিত সমভূমি মানুষকে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে উৎসাহিত করেছে। সমভূমির নদীগুলো নাব্য হয়। উপকূলীয় সমভূমিতে সমুদ্রপথে যোগাযোগের সুবিধা পাওয়া যায়। সমতল ভূপ্রকৃতির জন্য রাস্তাঘাট ও রেলপথ নির্মাণ সহজসাধ্য হওয়ায় সমভূমিতে উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। সমভূমি অঞ্চলের সুষ্ঠু যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা, কাঁচামালের প্রাচুর্য এবং ঘনবসতির ফলে সৃষ্ট ব্যাপক চাহিদা সেখানে নগর ও শিল্পকেন্দ্র গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। নদী গঠিত সমভূমিগুলোতে নানাবিধ খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়। যা মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। কৃষি ফসল, শিল্পদ্রব্য, খনিজ দ্রব্য প্রভৃতির উৎপাদন ও সুষ্ঠু পরিবহনব্যবস্থা আছে বলে সমভূমি অঞ্চলে অনেক ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে উঠেছে।

প্রশ্ন ▶ ৮

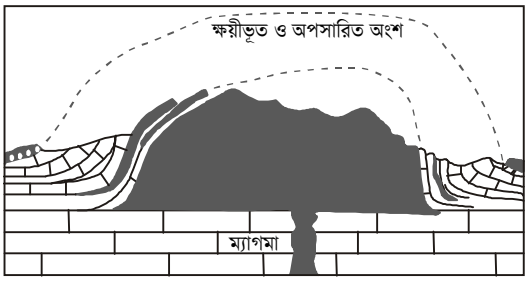

চিত্র : ক

চিত্র : খ

◀ শিখনফল: ২

ক. জাপানের ফুজিয়ামা কী ধরনের পর্বত? ১

খ. ভঙ্গিল পর্বতে অনেক শৃঙ্গ থাকে কেন? ২

গ. চিত্র-'খ' এর ভূমিরূপটির গঠন প্রক্রিয়ার পর্যায়গুলো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. চিত্র-'ক' এর ভূমিরূপটির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাপানের ফুজিয়ামা এক ধরনের আগ্নেয় পর্বত।

খ কোমল পাললিক শিলায় ভাঁজ পড়ে যে পর্বতের সৃষ্টি হয় তাকে ভঙ্গিল পর্বত বলে।

ভঙ্গিল পর্বত ভাঁজের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। মূলত অনেকগুলো ঊর্ধ্ব ও অধঃভাঁজের সমন্বয়ে গঠিত বলে এ পর্বতে অনেক শৃঙ্গ থাকে। যেমন– হিমালয়।

গ চিত্র 'খ' ভূমিরূপটি হলো ভজ্জিল পর্বত।

গিরিজনি আলোড়নের ফলে কোমল পাললিক শিলায় ভাঁজ পড়ে ভজ্জিল পর্বতের সৃষ্টি হয়েছে। ভজ্জিল পর্বত গঠনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করে একে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

নিচে ভজ্জিল পর্বতের গঠন প্রক্রিয়ার পর্যায়গুলো ব্যাখ্যা করা হলো—

১ম পর্যায় : সমুদ্রখাতের দুই দিক থেকে সংকোচনের ফলে নিম্ন অংশের অবনমন বা নিচে নেমে যায়।

২য় পর্যায় : সমুদ্রখাতের অবনত অংশে পলি জমা হওয়া এবং ধীরে ধীরে পলির ভারে নিচের দিকে দেবে যাওয়া; এর ফলে ভূঅধঃভাঁজের সৃষ্টি হয়।

৩য় পর্যায় : অবনমিত খাতের তলদেশ রূপান্তরিত শিলায় পরিণত হয় এবং আগ্নেয় শিলা পলির ভিতরে প্রবেশ করে।

৪র্থ পর্যায় : এ পর্যায়ে নতুন করে সংকোচনজনিত চাপের কারণে পলিতে ভাঁজের সৃষ্টি হয়।

শেষ পর্যায় : এ পর্যায়ে সংকোচন হ্রাস পায় এবং সম্পূর্ণ খাত উপরে উত্থিত হয়ে ভজ্জিল পর্বতমালা গঠন করে।

ঘ চিত্র 'ক' এর ভূমিরূপটি হলো ল্যাকোলিথ পর্বত।

পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে গলিত শিলা বা ম্যাগমা বিভিন্ন গ্যাসের দ্বারা স্থানান্তরিত হয়ে ভূপৃষ্ঠে বের হয়ে আসার চেষ্টা করে। কিন্তু কোনো কোনো সময় বাধা পেয়ে এগুলো ভূপৃষ্ঠের উপরে না এসে ভূত্বকের নিচে জমাট বাঁধে। এসময় ঊর্ধ্বমুখী চাপের কারণে স্ফীত হয়ে ভূত্বকের অংশবিশেষ গম্বুজ আকার ধারণ করে। এভাবে সৃষ্ট পর্বতকে ল্যাকোলিথ পর্বত বলে। যুক্তরাষ্ট্রের হেনরী পর্বত এর উদাহরণ।

এ পর্বতের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো —

i. এ পর্বত অল্প স্থানব্যাপী অবস্থান করে;
ii. পর্বতের ঢাল সামান্য খাড়া থাকে;
iii. সাধারণত এ পর্বতগুলো গম্বুজাকৃতির হয়ে থাকে;
iv. এ ধরনের পর্বতের কোনো শৃঙ্গ থাকে না এবং
v. এ পর্বতের উচ্চতা কম থাকে।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, ল্যাকোলিথ পর্বতের বৈশিষ্ট্যগুলো বৈচিত্র্যময়।

প্রশ্ন ▶ ৯ শ্রেণিকক্ষে টেবিলের উপর কয়েক আস্তর কাপড় রেখে কাপড়ের দুই পাশ থেকে পার্শ্বচাপ দিয়ে একটি পর্বত সৃষ্টির নমুনা দেখিয়ে শিক্ষক বললেন, উক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই পৃথিবীর উঁচু পর্বতগুলো গঠিত হয়েছে। ◀ *শিখনফল: ২*

ক. ভজ্জিল পর্বত কাকে বলে? ১
খ. কীভাবে আগ্নেয় পর্বত গঠিত হয়? ২
গ. উক্ত নমুনার চিত্র অংকন করে পর্বতটির গঠন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত পর্বত ও ল্যাকোলিথ পর্বতের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোমল পাললিক শিলায় ভাঁজ পড়ে যে পর্বত গঠিত হয়েছে তাকে ভজ্জিল পর্বত বলে। যেমন : হিমালয়।

খ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত থেকে যে পর্বতের সৃষ্টি হয় তাকে আগ্নেয় পর্বত বলে।

ভূত্বকের ফাটল বা ছিদ্র পথে ভূঅভ্যন্তরের গলিত লাভা, ধূম্র বো ধোঁয়া, ভস্ম বা ছাই প্রবল বেগে ভূপৃষ্ঠে এসে উপনীত হয় এবং ফাটলের চারদিকে সঞ্চিত হয়ে আগ্নেয় পর্বত গঠিত হয়। যেমন : জাপানের ফুজিয়ামা।

গ উদ্দীপকে শিক্ষক ভজ্জিল পর্বত সৃষ্টির নমুনা দেখান।

নিচে ভজ্জিল পর্বতের চিত্র অঙ্কন করা হলো—

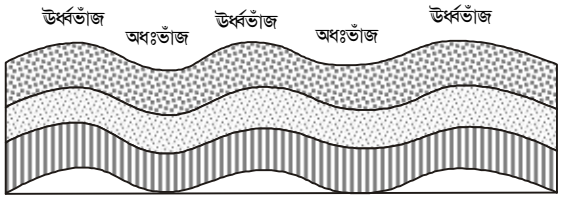

চিত্র : ভজ্জিল পর্বত সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থা

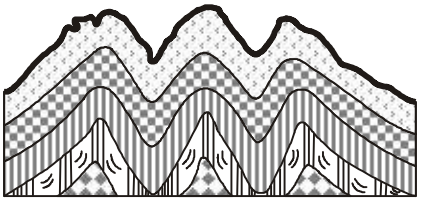

চিত্র : ভজ্জিল পর্বত

গঠন প্রক্রিয়া : গিরিজনি আলোড়নের ফলে কোমল পাললিক শিলায় ভাঁজ পড়ে ভজ্জিল পর্বতের সৃষ্টি হয়। এ পর্বতের প্রধান বৈশিষ্ট্য ভাঁজ। সমুদ্র তলদেশের অবনমিত স্থানে দীর্ঘকাল ধরে বিপুল পরিমাণ পলি এসে জমা হয়। এর চাপে অবনমিত স্থান আরো নিচে নেমে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে ভূআলোড়ন বা ভূমিকম্পের ফলে এবং পার্শ্ববর্তী সুদৃঢ় ভূমিখণ্ডের প্রবল পার্শ্বচাপের কারণে ঊর্ধ্ব ও নিম্নভাঁজের সৃষ্টি হয়। বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এ সমস্ত ভাঁজ সংবলিত ভূমিরূপ মিলেই ভজ্জিল পর্বত গঠিত হয়। যেমন— হিমালয় পর্বতমালা।

ঘ পাললিক শিলায় ভাঁজ পড়ে ভজ্জিল পর্বত গঠিত হয়। অন্যদিকে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের গলিত শিলা ও ম্যাগমা ভূপৃষ্ঠে ঊর্ধ্বচাপের সৃষ্টি করলে ল্যাকোলিথ পর্বত গঠিত হয়। রকি, হিমালয় ভজ্জিল পর্বতের এবং যুক্তরাষ্ট্রের হেনরি ল্যাকোলিথ পর্বতের উদাহরণ।

নিচে ভজ্জিল ও ল্যাকোলিথ পর্বতের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হলো—

i. পাললিক শিলাস্তরে ভূআলোড়ন ও ভূমিকম্পের ফলে এবং পার্শ্ববর্তী সুদৃঢ় ভূমিখণ্ডের প্রবল পার্শ্বচাপের কারণে ঊর্ধ্ব ও নিম্নভাঁজের সৃষ্টি হয়। বিস্তৃত এলাকাজুড়ে এ সমস্ত ভাঁজ সংবলিত ভূমিরূপ মিলে ভজ্জিল পর্বত গঠিত হয়েছে।

অন্যদিকে, ভূঅভ্যন্তরের ম্যাগমা কোনো কারণে বেরিয়ে আসতে না পারলে ভূত্বকের নিচে এক স্থানে জমাট বাঁধে। এমতাবস্থায় ঊর্ধ্বমুখী চাপের কারণে ভূত্বকের অংশবিশেষ স্ফীত হয়ে গম্বুজ আকার ধারণ করে ল্যাকোলিথ পর্বত গঠিত হয়।

ii. ভঙ্গিল পর্বতের শৃঙ্গ থাকে কিন্তু ল্যাকোলিথ পর্বতের থাকে না।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, ভঙ্গিল ও ল্যাকোলিথ পর্বতের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১০

◀ *শিখনফল: ২ [স্যাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. সমভূমি কাকে বলে? ১

খ. পাহাড় ও পর্বতের বৈসাদৃশ্য লেখো। ২

গ. শ্রেণিবিভাগসহ 'A' চিহ্নিত ভূমিরূপের ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. 'C' ও 'D' ভূমিরূপ দুইটির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অল্প উঁচু মৃদু ঢালবিশিষ্ট সুবিস্তৃত ভূমিকে সমভূমি বলে।

খ ৬০০ থেকে ১০০০ মিটার উঁচু স্বল্প বিস্তৃত শিলাস্তূপকে পাহাড় বলে।

যেমন- ময়মনসিংহের গারো পাহাড়। পক্ষান্তরে ১০০০ মিটারের বেশি উঁচু সুবিস্তৃত ও খাড়া ঢালবিশিষ্ট শিলাস্তূপকে পর্বত বলে। যেমন- ভারতের বিন্ধ্যা পর্বত।

পাহাড় সাধারণত গম্বুজাকৃতি হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে পর্বত দীর্ঘ সংকীর্ণ বা চূড়া বিশিষ্ট হয়।

গ চিত্রে 'A' চিহ্নিত ভূমিরূপটি হলো পর্বত।

সমুদ্র সমতল থেকে অন্তত ১০০০ মিটারের বেশি উঁচু সুবিস্তৃত ও খাড়া ঢালবিশিষ্ট শিলাস্তূপকে পর্বত বলে। পর্বতের ভূপ্রকৃতি বন্ধুর, ঢাল খুব খাড়া এবং সাধারণত চূড়াবিশিষ্ট হয়। কিছু পর্বত বিচ্ছিন্নভাবে আবার কিছু পৃথক শৃঙ্গসহ ব্যাপক এলাকা জুড়ে অবস্থান করে।

পর্বতকে চার শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা:

ভঙ্গিল পর্বত: সমুদ্র তলদেশের বিস্তারিত অবনমিত স্থানে দীর্ঘকাল ধরে বিপুল পরিমাণ পলি এসে জমা হয়। পরবর্তীতে ভূমিকম্পের ফলে ভূমিখণ্ডের প্রবল পার্শ্বচাপের কারণে ঊর্ধ্ব ও নিম্নভাঁজের সৃষ্টি হয়। এ সমস্ত ভাজবিশিষ্ট ভূমিরূপ মিলেই ভঙ্গিল পর্বত গঠিত হয়। যেমন– হিমালয়।

আগ্নেয় পর্বত: আগ্নেয়গিরি থেকে উদগিরিত পদার্থ সঞ্চিত ও জমাট বেঁধে আগ্নেয় পর্বত সৃষ্টি হয়। এই পর্বত মোচাকৃতির (conical) হয়ে থাকে। যেমন– ইতালির ভিসুভিয়াস।

স্তূপ পর্বত: ভূআলোড়নের সময় ভূপৃষ্ঠের শিলাস্তরে প্রসারণ এবং সংকোচনের সৃষ্টি হয়। ফলে ভূত্বকে ফাটলের সৃষ্টি হয়। এ ফাটল বরাবর ভূত্বক ক্রমে স্থানচ্যুতির মাধ্যমে কোথাও উঁচু, আবার কোথাও নিচু হয়। চ্যুতির ফলে উঁচু হওয়া অংশকে স্তূপ পর্বত বলে। যেমন– জার্মানির ব্লাক ফরেস্ট।

ল্যাকোলিথ পর্বত: পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে গলিত ম্যাগমা বিভিন্ন গ্যাসের দ্বারা স্থানান্তরিত হয়ে ভূপৃষ্ঠে আসার সময় বাধা পেয়ে ভূত্বকের নিচে জমাট বাঁধে। এ সময় ঊর্ধ্বমুখী চাপের কারণে স্ফীত হয়ে ভূত্বকের অংশবিশেষ গম্বুজ আকার ধারণ করে। এভাবে সৃষ্ট পর্বতকে ল্যাকোলিথ পর্বত বলে। যেমন– যুক্তরাষ্ট্রের হেনরি।

ঘ চিত্রে 'C' এবং 'D' ভূমিরূপ দুটি হলো সমভূমি এবং মালভূমি।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অল্প উঁচু মৃদু ঢালবিশিষ্ট সুবিস্তৃত ভূমিকে সমভূমি বলে। পক্ষান্তরে, পর্বত থেকে নিচু কিন্তু সমভূমি থেকে উঁচু খাড়া ঢালযুক্ত ঢেউ খেলানো বিস্তীর্ণ সমতলভূমিকে মালভূমি বলে।

নিচে সমভূমি ও মালভূমির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হলো–

সমভূমির উচ্চতা কয়েকশ মিটার হতে পারে। পক্ষান্তরে, মালভূমি কয়েকশ থেকে কয়েক হাজার মিটার পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। সমভূমিতে সবচেয়ে ঘন জনবসতি গড়ে উঠেছে। পক্ষান্তরে, মালভূমিতে জনবসতি খুবই কম। সমভূমি সম্পূর্ণ সমতল হয় না। পক্ষান্তরে, মালভূমির উপরিভাগ প্রায় সমতল। সমভূমি কখনো খাড়া ঢাল বিশিষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে, মালভূমির চারদিক থেকে ঢাল খাঁড়াভাবে নিম্নভূমিতে নেমে যায়। সমভূমি পৃথিবীর স্থলভাগের শতকরা ৫৮ ভাগ স্থান জুড়ে রয়েছে। মালভূমি ভূপৃষ্ঠের শতকরা ২৪ ভাগ জুড়ে রয়েছে। সমভূমি কৃষিকাজ, রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য উপযোগী। পক্ষান্তরে, মালভূমিতে স্বল্প কৃষিকাজ, অনুন্নত যোগাযোগ ও প্রতিকূল জলবায়ু বিদ্যমান।

ভূপ্রাকৃতিক প্রক্রিয়া যেমন– নদী, হিমবাহ এবং বায়ুর ক্ষয় ও সঞ্চয় ক্রিয়ার ফলে সমভূমি সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে, ভূঅভ্যন্তরস্থ ও ভূপৃষ্ঠস্থ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মালভূমি সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন ▶ ১১ মোস্তাফিজ স্যার ভূগোল ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বললেন, ভূপৃষ্ঠের গঠন সব জায়গায় সমান নয়। কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু, কোথাও সমতলভূমি আবার কোথাও গভীর খাত। তিনি আরও বললেন, "শুধু যে ভূপৃষ্ঠে এরূপ দেখা যায় তা নয় সমুদ্রের তলদেশেও এমনটি রয়েছে।"

◀ *শিখনফল: ২ [তাপস কুমার মজুমদার; অনু-২]*

ক. পর্বত কাকে বলে? ১

খ. ভূঅভ্যন্তরে ম্যাগমা সঞ্চিত হয়ে যে পর্বতের সৃষ্টি হয় তা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মোস্তাফিজ স্যারের আলোচনা থেকে ভূপৃষ্ঠের ভূমিরূপ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ভূপৃষ্ঠের গঠন সম্পর্কে মোস্তাফিজ স্যারের আলোচনা কি সঠিক? তোমার যুক্তিতে যথাযথ কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভূপৃষ্ঠের অতি উচ্চ, সুবিস্তৃত এবং খাড়া ঢালবিশিষ্ট শিলাস্তূপকে পর্বত বলে।

খ ভূঅভ্যন্তরে ম্যাগমা সঞ্চিত হয়ে ল্যাকোলিথ পবর্ত সৃষ্টি হয়।
পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে গলিত ম্যাগমা বিভিন্ন গ্যাসের দ্বারা স্থানান্তরিত হয়ে ভূপৃষ্ঠে আসার সময় বাধা পেয়ে ভূত্বকের নিচে জমাট বাঁধে। এ সময় ঊর্ধ্বমুখী চাপের কারণে স্ফীত হয়ে ভূত্বকের অংশবিশেষ গম্বুজ আকার ধারণ করে। এভাবে সৃষ্ট পর্বতকে ল্যাকোলিথ পর্বত বলে। যেমন– যুক্তরাষ্ট্রের হেনরি।

গ মোস্তাফিজ স্যারের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল ভূপৃষ্ঠের গঠন সব জায়গায় সমান নয়। কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু, কোথাও সমতল ভূমি আবার কোথাও গভীর খাত।

পৃথিবীর ভূমির এ বৈচিত্র্যতা ও গঠন প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে ভূমিরূপকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা-(১) পর্বত, (২) মালভূমি ও (৩) সমভূমি।

পর্বত: ভূপৃষ্ঠের অতি উচু, সুবিস্তৃত এবং খাড়া ঢালবিশিষ্ট শিলাস্তূপকে পর্বত বলে। পর্বত সাধারণত ১০০০ মিটারের অধিক উঁচু হয়। আর ৬০০-১০০০ মিটার উচ্চ ও বিস্তৃত শিলাস্তুপকে পাহাড় বলে।

মালভূমি: সমুদ্র সমতল হতে বিস্তীর্ণ সমভূমিকে মালভূমি বলে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে এর উচ্চতা কয়েক শত মিটার হতে কয়েক হাজার মিটার পর্যন্ত হয়। মালভূমি প্রায়ই পর্বতবেসিত হয়।

সমভূমি: সমুদ্রপৃষ্ঠের ন্যায় একই সমতলে বা সামান্য উচ্চে অবস্থিত বিস্তীর্ণ স্থলভাগকে সমভূমি বলে। পৃথিবীর মোট স্থলভাগের প্রায় অর্ধেক হলো সমভূমি। পৃথিবীর বেশিরভাগ সমভূমি উপকূল ও নদী অববাহিকায় অবস্থিত।

ঘ ভূপৃষ্ঠের গঠন সম্পর্কে মোস্তাফিজ স্যারের পর্যালোচনা সঠিক। কারণ ভূপৃষ্ঠের গঠন সর্বত্র একরকম নয়। স্থলভাগের কোথাও সুউচ্চ পর্বত, কোথাও মালভূমি, কোথাও পাহাড়, কোথাও আবার হাজার হাজার বর্গ কি.মি. বিস্তৃত বিশাল সমভূমি রয়েছে। পৃথিবীর শতকরা ৫৪ ভাগ এলাকা সমভূমি, ১৮ ভাগ পর্বত্যময় এবং বাকি ২৪ ভাগ মালভূমি ও পাহাড় দ্বারা বিস্তৃত।

শুধু ভূপৃষ্ঠে এরূপ ভূমিরূপ দেখা যায় তা নয় সমুদ্রের তলদেশও স্থলভাগের মত খুবই অসমতল। পৃথিবীর জলভাগের সমস্ত পানি শুকিয়ে ফেলে সমুদ্রপৃষ্ঠের দিকে তাকালে যে প্রাকৃতিক অবয়ব দৃষ্টিগোচরে আসবে তা ভূমিরূপের চেয়েও বৈচিত্র্যপূর্ণ। মহাসাগরের তলদেশে রয়েছে মৃদু ঢালবিশিষ্ট মহীসোপান, খাড়া মহীঢাল, গভীর সমুদ্রের সমভূমি, সমুদ্রখাত, নিমজ্জিত শৈলশিরা প্রভৃতি ভূমিরূপ।
উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে ভূপৃষ্ঠের গঠন সম্পর্কে মোস্তাফিজ স্যারের আলোচনা সঠিক।

প্রশ্ন ▶ ১২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষামূলক সফরের জন্য বান্দরবান জেলায় গিয়েছে। শিক্ষক তাদের বলল, এখানকার পাহাড়গুলো কর্দম, শেল ও বেলে পাথর দ্বারা গঠিত। একজন ছাত্র-শিক্ষকের কাছে জানতে চাইলো, পৃথিবীর সব পাহাড় কী একই শিলায় গঠিত?

◀ *শিখনফল: ২ [অধ্যাপক মো. আব্দুল কুদ্দুস; অনু-১]*

ক. পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কী? ১
খ. ভঙ্গিল পর্বত কাকে বলে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অঞ্চল ব্যতীত পাহাড়গুলোর গঠন বাংলাদেশের আর কোন অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে শিক্ষক ছাত্রদের যা বলেছে স্তূপ পর্বত ও আগ্নেয় পর্বত তদ্রুপ নয়। তোমার যুক্তি দেখাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম মাউন্ট এভারেস্ট।

খ ভঙ্গ বা ভাঁজ থেকে ভঙ্গিল শব্দটির উৎপত্তি। কোমল পাললিক শিলায় ভাঁজ পড়ে যে পর্বত গঠিত হয়েছে তাকে ভঙ্গিল পর্বত বলে।
এশিয়ার হিমালয়, ইউরোপের আল্পস, উত্তর আমেরিকার রকি, দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্বত প্রভৃতি ভঙ্গিল পর্বতের উদাহরণ।

গ শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সফরে বান্দরবান জেলায় ঘুরতে গিয়েছিল। উক্ত জেলার পাহাড়গুলো টারশিয়ারি যুগে গঠিত। এখানকার পাহাড়গুলো কর্দম, শেল ও বেলে পাথর প্রভৃতি দ্বারা গঠিত।
বান্দরবান ছাড়াও চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, কুমিল্লা ও সিলেটের পাহাড়িয়া অঞ্চলগুলো নিয়ে টারশিয়ারি যুগের পাহাড়িয়া অঞ্চল গঠিত। সম্ভবত ভূমি গঠনের তৃতীয় পর্যায়ে হিমালয় গঠনের সময় বাংলাদেশের পাহাড়সমূহ সৃষ্টি হয়েছে। তাই এদের Tertiary hills বলা হয়।
এছাড়া মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, শেরপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, জেলায় ছোট-বড় বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত পাহাড়গুলো এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এ পাহাড়সমূহে ছোট-বড় অসংখ্য সবুজ বৃক্ষের বন গড়ে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে শিক্ষক ছাত্রদের টারশিয়ারি যুগের ভঙ্গিল পর্বতের কথা বলেছেন। স্তূপ পর্বত ও আগ্নেয় পর্বত তদ্রুপ নয়।
স্তূপ পর্বতে কোনো শৃঙ্গ বা চূড়া দেখা যায় না। এ পর্বতের উচ্চতা বেশি হয় না। স্তূপ পর্বতের উপরিভাগ চ্যাপ্টা প্রকৃতির হয়। এ পর্বত সাধারণত কঠিন শিলাস্তরে গঠিত এবং স্বল্প পরিসর স্থান জুড়ে অবস্থান করে।
পক্ষান্তরে, আগ্নেয় পর্বত পৃথিবীর অগ্ন্যুৎপাতপ্রবণ অঞ্চলে গঠিত হয়। এ পর্বতগুলো কোণাকৃতি আকৃতির হয়। এ জাতীয় পর্বতের উচ্চতা বেশি হয় না। আগ্নেয়গিরি উদগীরণের লাভা, ছাই, ভস্ম, কর্দম প্রভৃতি পদার্থ গঠিত বলে এটি আগ্নেয়শিলা স্তর দ্বারা গঠিত।
উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় স্তূপ ও আগ্নেয় পর্বত ভঙ্গিল পর্বতের মতো নয়।

প্রশ্ন ▶ ১৩ সাব্বির ও বাপ্পি দুই বন্ধু। তারা ট্রেনে করে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে যাচ্ছিল। তাদের ট্রেন যখন কুমিল্লার লালমাই টিলার কাছে পৌঁছল তখন সাব্বির বলল, দেখ ঐ যে কুমিল্লার লালমাই পাহাড়। বাপ্পি তখন তার বন্ধুকে বলল, বাংলাদেশে কোন মালভূমির অবস্থান নেই। স্যার একদিন ক্লাসে মালভূমির সৃষ্টি সম্পর্কে বলেছিলেন, আগ্নেয়জাত লাভা উদগীরণের ফলে কখনো কখনো বিস্তৃত ভূমিরূপের সৃষ্টি করে। যেমন— ভারতের দাক্ষিণাত্য লাভা গঠিত মালভূমি। ইহা ছাড়া প্রাচীন পার্বত্য এলাকাও ব্যাপক ক্ষয়কার্যের ফলে উচ্চতা হ্রাস পেয়ে মালভূমিতে পরিণত হয়। *◀ শিখনফল: ২ /অধ্যাপক মো. আব্দুল কুদ্দুস: অনু-৩/*

ক. এশিয়া মহাদেশের দুটি মালভূমির নাম লিখো। ১

খ. পর্বত ও মালভূমি কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. পর্বতবেষ্টিত মালভূমি পাদদেশীয় মালভূমির মতো নয়— যুক্তি দেখাও। ৩

ঘ. পাদদেশীয় মালভূমির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এশিয়া মহাদেশের দুইটি মালভূমি হলো তিব্বত এবং ভারতের দাক্ষিণাত্য।

খ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অন্তত ১,০০০ মিটারের বেশি উঁচু সুবিস্তৃত ও খাড়া ঢালবিশিষ্ট শিলাস্তূপকে পর্বত বলে। পর্বতের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কয়েক হাজার মিটার হতে পারে। যেমন- উত্তর আমেরিকার রকি।

অন্যদিকে, পর্বত থেকে নিচু কিন্তু সমভূমি থেকে উঁচু খাড়া ঢালযুক্ত ঢেউ খেলানো বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিকে মালভূমি বলে। মালভূমির উচ্চতা কয়েক শত মিটার থেকে কয়েক হাজার মিটার পর্যন্ত হতে পারে। যেমন- হিমালয়ের পামির।

গ পর্বতবেষ্টিত মালভূমি পাদদেশীয় মালভূমির মতো নয়।

যেসব মালভূমি চতুর্দিকে পর্বত দ্বারা বেষ্টিত থাকে তাকে পর্বত বেষ্টিত মালভূমি বলে। পর্বত সৃষ্টির অনুরূপ এ জাতীয় মালভূমির সৃষ্টি হয়। পৃথিবীতে এ মালভূমিগুলো সর্ববৃহৎ, অধিক উচ্চ। যেমন– তিব্বতের মালভূমি।

পক্ষান্তরে পর্বতের পাদদেশে যে মালভূমির সৃষ্টি হয় তাকে পাদদেশীয় মালভূমি বলে। বৃষ্টি ও নদীর পানি, হিমবাহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা পর্বতগাত্র থেকে নানা প্রকার পদার্থ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পর্বতের পাদদেশে সঞ্চিত হয়। এ সঞ্চিত পদার্থসমূহ ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে মালভূমির আকৃতি ধারণ করে। পর্বতের পাদদেশে এ মালভূমি গঠিত হয় বলে একে পাদদেশীয় মালভূমি বলে। যেমন– দক্ষিণ আমেরিকার পাতাগোনিয়া। সুতরাং আলোচনা থেকে বলা যায়, পর্বতবেষ্টিত মালভূমি পাদদেশীয় মালভূমির মতো নয়।

ঘ পর্বতের পাদদেশে যে মালভূমির সৃষ্টি হয় তাকে পাদদেশীয় মালভূমি বলে।

নদীর সোত, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টি, সূর্যতাপ, হিমবাহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা পর্বতগাত্র প্রতিনিয়ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এ ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থগুলো পর্বতের পাদদেশে সঞ্চিত বা জমা হয়ে মালভূমির সৃষ্টি করে। এ জাতীয় মালভূমিকে পাদদেশীয় মালভূমি বলে।

পাদদেশীয় মালভূমির বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

i. এ মালভূমির এক প্রান্তে সমতলভূমি বা সাগর অবস্থান করে;

ii. এ মালভূমি ১৫২৫-৩৩৫০ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট হয়; এবং

iii. এ মালভূমিতে পৃথিবীর দীর্ঘতম ও গভীরতম গিরিখাত গ্রান্ড ক্যানিয়ন অবস্থিত।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, পাদদেশীয় মালভূমির বৈশিষ্ট্য বৈচিত্র্যময়।

প্রশ্ন ▶ ১৪ মুকুল দৈনিক পত্রিকা পড়ে এমন একটি ভূমিরূপ সম্পর্কে জানতে পারল যা, সাধারণত সমুদ্র সমতল থেকে সামান্য উঁচু এবং কোনো কোনো সময় কয়েক মিটার উঁচুতে গঠিত হয়। এ ভূমিরূপ সৃষ্টিতে ক্ষয় ও সঞ্চয় কাজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং পৃথিবীর মোট ভূমিরূপের শতকরা ৩৬ ভাগ এ ভূমিরূপ দ্বারা গঠিত। *◀ শিখনফল: ২ /ড. সৈয়দ শাহজাহান আহমেদ: অনু-২/*

ক. ভূত্বক কী? ১

খ. অ্যাসথেনোস্ফিয়ার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে মুকুল দৈনিক পত্রিকা পড়ে কোন ভূমিরূপ সম্পর্কে জানতে পেরেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মানবজীবনে উল্লিখিত ভূমিরূপের প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৃথিবীর উপরিভাগের পাতলা কঠিন আবরণই ভূত্বক ।

খ ভূত্বকের ঠিক নিচে এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের গুরুমণ্ডলের উপরের অংশ অ্যাসথেনোস্ফিয়ার (Agsthenosphere) নামে পরিচিত।

এ স্তরটি ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০০-৩৫০ কি.মি. গভীরে বিস্তৃত। এ স্তর মূলত অলিভিন ও পাইরক্সিন জাতীয় খনিজের সমন্বয়ে গঠিত।

গ উদ্দীপকে মুকুল দৈনিক পত্রিকা পড়ে সমভূমি সম্পর্কে জানতে পেরেছে।

সমুদ্রপৃষ্ঠের সাথে প্রায় সমউচ্চতাবিশিষ্ট বিস্তীর্ণ এবং মৃদু ঢালবিশিষ্ট বিস্তৃত প্রান্তরকে সমভূমি বলে।

সমভূমি সাধারণত সমুদ্র সমতল থেকে সামান্য উঁচু হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কয়েক মিটার (যেমন– বগুড়া ও যশোরের উচ্চতা যথাক্রমে ২০ ও ৮ মিটার) উঁচুতে গঠিত হয়। এ ভূমিরূপ সৃষ্টিতে নদীর ক্ষয় ও সঞ্চয় কাজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পৃথিবীর মোট ভূমিরূপের শতকরা প্রায় ৫৪ ভাগ সমভূমি দ্বারা গঠিত।

সমভূমি মূলত তিন প্রকারের হয়। যথা–

i. বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক শক্তি যেমন- বায়ুপ্রবাহ, নদী, হিমবাহ দ্বারা কোনো উঁচুভূমি ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সমভূমিতে পরিণত হলে তাকে ক্ষয়জাত সমভূমি বলে। যেমন– বাংলাদেশের বরেন্দ্রভূমি।

ii. আবার নদী, বায়ু, তরঙ্গ ও হিমবাহ প্রভৃতি শক্তি দ্বারা ক্ষয়ক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট পলি নিম্নভূমিতে পরিবহনের মাধ্যমে সঞ্চিত হয়ে সঞ্চয়জাত সমভূমি সৃষ্টি করে। যেমন– বাংলাদেশের প্লাবন সমভূমি।

iii. ভূআলোড়নের কারণে সমুদ্র সমতলের দুর্বল অংশের পতন বা মহাদেশের কোনো নিচুভূমি উত্থিত হয়ে ভূআলোড়নজনিত সমভূমি গঠন করে। যেমন- মালয়েশিয়ার কেদু।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ভূমিরূপটি হলো সমভূমি।

মানবজীবনে সমভূমির প্রভাব নিচে আলোচনা করা হলো–

স্থায়ী বসতি স্থাপন: সমভূমিগুলোর উর্বর মৃত্তিকা কৃষিকাজের জন্য সুবিধাজনক; এখানে সেচ ও পানীয়জল সহজলভ্য। তাই প্রাচীনকাল হতে নদী গঠিত সমভূমি মানুষকে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে উৎসাহিত করেছে। যেমন– নীল নদের তীরে মিসরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায়: সমভূমিতে উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে উঠে। সমতল ভূপ্রকৃতিতে রাস্তাঘাট ও রেলপথ নির্মাণ সহজসাধ্য। যেমন– বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ সমভূমিতে সহজেই সড়ক যোগাযোগ গড়ে উঠেছে কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে তা সম্ভব হয় নি।

নগর ও শিল্পকেন্দ্র গড়ে তুলতে: সমভূমি অঞ্চলের সুষ্ঠু যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা এবং ঘনবসতি থাকে বলে সেখানে নগর ও শিল্পকেন্দ্র গড়ে ওঠে। বাংলাদেশে শ্রমনির্ভর পোশাক শিল্পের বিকাশ এর বড় উদাহরণ।

ব্যবসা বাণিজ্যে: কৃষি ফসল, শিল্প ও খনিজ দ্রব্য প্রভৃতির উৎপাদন ও সুষ্ঠু পরিবহন ব্যবস্থা আছে বলে সমভূমি অঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্যের বিস্তার ঘটে। যেমন– ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, চাঁদপুর, নরসিংদী, বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র।

সর্বোপরি বলা যায়, মানুষের জীবনযাত্রা নির্বাহের সকল সুযোগ-সুবিধা যেভাবে সমভূমি থেকে পাওয়া যায়, পার্বত্য বা মালভূমি থেকে তা পাওয়া সম্ভব না। অতএব মানুষের জীবনযাত্রার ওপর সমভূমির প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ১৫

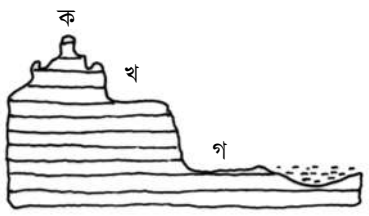

◀ *শিখনফল: ২ ও ৩ [বি.এ.এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. ভূঅভ্যন্তরের গঠন প্রণালিকে কয়ভাবে ভাগ করা হয়েছে? ১

খ. লোহা ও নিকেল কেন্দ্রে সঞ্চিত হওয়ার কারণ কী? ২

গ. 'খ' ভূপ্রকৃতির ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. চিত্রের কোন ধরনের ভূপ্রকৃতির সাথে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের ভূপ্রকৃতির মিল আছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভূঅভ্যন্তরের গঠন প্রণালিকে অশ্মমণ্ডল, গুরুমণ্ডল ও কেন্দ্রমণ্ডল এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

খ লোহা ও নিকেল পৃথিবীর কেন্দ্রমণ্ডলে সঞ্চিত।

সৃষ্টির সময় পৃথিবী জ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ড ছিল। সেখান থেকে তাপ বিকিরণের মাধ্যমে কালক্রমে পৃথিবী তরল ও কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সৃষ্টির এ প্রক্রিয়ায় ভারী উপাদানসমূহ পৃথিবীর কেন্দ্রে এবং হালকা উপাদানসমূহ পৃথিবীর উপরিভাগে অবস্থান করে। লোহা ও নিকেল ভারী হওয়ার কারণে পৃথিবীর কেন্দ্রে সঞ্চিত হয়েছে।

গ চিত্রে 'খ' ভূপ্রকৃতি হচ্ছে মালভূমি।

পর্বত থেকে নিচু কিন্তু সমভূমি থেকে উঁচু খাড়া ঢালযুক্ত ঢেউ খেলানো বিস্তীর্ণ সমতলভূমিকে মালভূমি বলে। মালভূমি তিন ধরনের হয়ে থাকে। যথা- পর্বত মধ্যবর্তী মালভূমি, পাদদেশীয় মালভূমি ও মহাদেশীয় মালভূমি।

পর্বত মধ্যবর্তী মালভূমি: ভঙ্গিল পর্বত সৃষ্টির সময় সংকোচনজনিত চাপের কারণে পর্বতের মধ্যবর্তী নিম্নভূমি উঁচু হয়ে যে মালভূমি গঠিত হয়েছে তাকে পর্বত মধ্যবর্তী মালভূমি বলে। যেমন– তিব্বতের মালভূমি।

পাদদেশীয় মালভূমি: উচ্চ পর্বত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে এর পাদদেশে তলানি জমে যে মালভূমির সৃষ্টি হয় তাকে পাদদেশীয় মালভূমি বলে। যেমন– যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো মালভূমি।

মহাদেশীয় মালভূমি: সাগর বা নিম্নভূমি পরিবেষ্টিত বিস্তীর্ণ উচ্চ ভূমিকে মহাদেশীয় মালভূমি বলে। এ ধরনের মালভূমির সঙ্গে পর্বতের কোনো সংযোগ থাকে না। যেমন– স্পেনের মালভূমি।

ঘ চিত্রে 'ক' ভূপ্রকৃতির সাথে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের ভূপ্রকৃতির মিল রয়েছে।

চিত্রের 'ক', 'খ' এবং 'গ' অংশগুলো যথাক্রমে পাহাড়-পর্বত, মালভূমি এবং সমভূমি।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়গুলো হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ির পাহাড়। এগুলো টারশিয়ারি যুগে গঠিত হয়েছে। এ যুগে হিমালয় পর্বত উত্থিত হওয়ার সময় এ পাহাড়সমূহ সৃষ্টি হয়েছে। এ পাহাড়গুলোকে আসামের লুসাই ও মায়ানমারের আরাকান পাহাড়ের সমগোত্রীয় ধরা হয়। বেলেপাথর, শেল ও কর্দমের সংমিশ্রণে এ পাহাড়সমূহ গঠিত হয়েছে। এ অঞ্চলে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ (সেগুন, গর্জন) ও পাতাঝরা (শাল) বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, চিত্রের 'ক' ভূপ্রকৃতির সাথে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের ভূপ্রকৃতির যথেষ্ট মিল রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৬

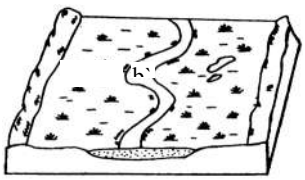

চিত্র : ক

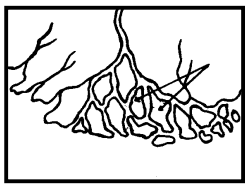

চিত্র : খ

◀ শিখনফল: ৩

ক. সৌদি আরব কোন ধরনের ভূমিরূপের অন্তর্গত? ১

খ. বদ্বীপ সমভূমি নদীর মোহনায় গড়ে ওঠে কেন? ২

গ. 'খ' চিহ্নিত ভূমিরূপটির গঠনপ্রণালি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'ক' ও 'খ' চিহ্নিত ভূমিরূপের সাদৃশ্যগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সৌদি আরব মহাদেশীয় মালভূমির অন্তর্গত।

খ বদ্বীপ এক প্রকার সঞ্চয়জাত সমভূমি।

নদীর মোহনায় তলানি সঞ্চিত হয়ে কালক্রমে বদ্বীপ সৃষ্টি হয়। নদী প্রবাহের সময় পলি, বালি, কাকর প্রভৃতি বহন করে নিয়ে আসে। গতির শেষ পর্যায়ে নদী বহনের শক্তি হারিয়ে ফেলে। তখন এ সকল তলানি মোহনায় সঞ্চিত হয়ে বদ্বীপ সৃষ্টি করে।

গ 'খ' চিহ্নিত ভূমিরূপটি হলো বদ্বীপ সমভূমি, যা ভূপৃষ্ঠের বৈচিত্র্যময় ভূমিরূপের একটি। যেমন- বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ।

নদীর মোহনায় তলানি সঞ্চিত হয়ে কালক্রমে বদ্বীপ সৃষ্টি হয়। তাই এ ভূমিরূপকে সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ বলে।

কখনও কখনও নদীর নিম্নগতিতে স্রোতের বেগ খুব কমে যায়। ফলে নদীর পানির সাথে মিশ্রিত পলি, বালি, কাদা প্রভৃতি তলানিরূপে তলদেশে জমা হতে থাকে। নদী যখন সমুদ্রে পড়ে তখন ঐ সমস্ত তলানি মোহনায় জমতে থাকে এবং নদীমুখ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ফলে নদী মোহনায় ত্রিকোণাকার ভূমিরূপের সৃষ্টি হয় এবং তা কালক্রমে পানির ওপরে উঁচু হয়ে ওঠে। ত্রিকোণাকার এ ভূমিকে ডেলটা 'Δ' অক্ষরের মতো দেখায় বলে একে বদ্বীপ বলা হয়। এ প্রক্রিয়ায় বদ্বীপ গঠিত হয়।

ঘ চিত্রে উল্লিখিত 'ক' এবং 'খ' ভূমিরূপ দুটি হলো যথাক্রমে প্লাবন সমভূমি এবং বদ্বীপ।

বন্যার ফলে নদীর উভয়কূলের নিম্নভূমিতে পলি জমা হয়ে সমভূমি সৃষ্টি হয় যা প্লাবন সমভূমি (সিরাজগঞ্জ, পাবনা প্রভৃতি জেলা) নামে পরিচিত। অপরদিকে নদীবাহিত তলানি নদীর মোহনায় সঞ্চিত হয়ে যে সমভূমি সৃষ্টি করে তা হলো বদ্বীপ সমভূমি (ভোলা, বরগুনা প্রভৃতি জেলা)।

প্লাবন সমভূমি এবং বদ্বীপ উভয়ই সঞ্চয়জাত সমভূমির অন্তর্ভুক্ত। তাই এদের গঠন ও বৈশিষ্ট্যে বেশ কিছু সাদৃশ্য বিদ্যমান। নিচে এ দুটি ভূমিরূপের সাদৃশ্য তুলে ধরা হলো :

১. প্লাবন সমভূমি এবং বদ্বীপ উভয়ে সঞ্চয়জাত সমভূমি।

২. নদী বাহিত পলল সঞ্চিত হয়ে এ ধরনের ভূমিরূপ গঠিত হয়।

৩. নদীর পরিবাহিতা কমে গেলে উভয় প্রকার ভূমির গঠন ত্বরান্বিত হয়।

৪. প্লাবন সমভূমি এবং বদ্বীপ উভয় ভূমিরূপই খুব উর্বর।

৫. নদীর তীরবর্তী হওয়ায় উভয় ভূমিরূপই জোয়ার-ভাটা দ্বারা প্রভাবিত।

প্রশ্ন ▶ ১৭

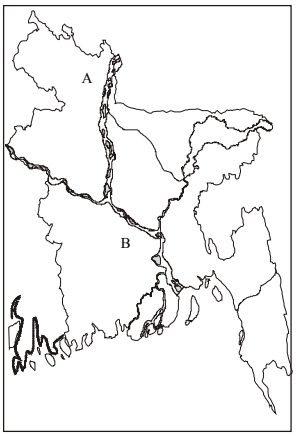

◀ শিখনফল: ৩ [অধ্যাপক মো: আবদুল কুদ্দুস: অনু-১]

ক. বাংলাদেশ এশিয়ার কোন অঞ্চলে অবস্থিত? ১

খ. বাংলাদেশে কীভাবে সুবিশাল বদ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের B অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি কীভাবে গঠিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মানচিত্রের A এবং B অঞ্চলের ভূমিরূপ বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ এশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত।

খ কখনও কখনও নদীর নিম্নগতিতে স্রোতের বেগ খুব কমে যায়। ফলে নদীর পানির সাথে মিশ্রিত পলি, বালি, কাদা প্রভৃতি তলানিরূপে তলদেশে জমা হতে থাকে। নদী যখন সমুদ্রে পড়ে ঐ সমস্ত তলানি মোহনায় জমতে থাকে এবং নদীমুখ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ফলে নদী মোহনায় ত্রিকোণাকার ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়; তা কালক্রমে পানির ওপরে উঁচু হয়ে ওঠে। ত্রিকোণাকার এ ভূমিকে ডেলটা 'Δ' অক্ষরের মতো দেখায় বলে একে বদ্বীপ বলা হয়। এ প্রক্রিয়ায় বদ্বীপ গঠিত হয়।

এভাবে বাংলাদেশের পদ্মা ও মেঘনা নদীর মোহনায় সুবিশাল বদ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে।

গ উদ্দীপকে 'B' অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি বৃহৎ পরিসরে সাম্প্রতিক কালের প্লাবন সমভূমির অন্তর্গত।

বাংলাদেশ নদীবিধৌত এক বিস্তীর্ণ সমভূমি। অসংখ্য ছোট-বড় নদী, বাংলাদেশের সর্বত্র জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। সমভূমির উপর দিয়ে এ নদীগুলো প্রবাহিত হওয়ার কারণে বর্ষাকালে বন্যার

সৃষ্টি হয়। বছরের পর বছর এভাবে বন্যার সঙ্গে পরিবাহিত মাটি সঞ্চিত হয়ে এ সমভূমি গঠিত হয়েছে।
প্লাবন সমভূমি বাংলাদেশের উত্তর অংশ থেকে উপকূলের দিকে ক্রমনিম্ন। সমগ্র সমভূমির মাটির স্তর খুব গভীর এবং ভূমি খুবই উর্বর। এ অঞ্চলের মাটি খুব উর্বর বলে কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনে তা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

ঘ চিত্রের 'A' অঞ্চলটি পাদদেশীয় পলল সমভূমির অন্তর্গত এবং B অঞ্চলটি প্লাবন সমভূমিস্থ নদীর শেষ পর্যায়ে বদ্বীপ ভূমিরূপের অন্তর্গত।

বাংলাদেশের সর্বোত্তরে অবস্থিত রংপুর, লালমনিরহাট, নীলফামারী, পঞ্চগড় ও দিনাজপুর জেলার অধিকাংশ অঞ্চল নিয়ে 'A' অঞ্চল গঠিত। হিমালয়ের পর্বতমালা থেকে নেমে আসা পলি দ্বারা এ সমভূমি গঠিত। তিস্তা, আত্রাই, পুনর্ভবা প্রভৃতি নদীবাহিত পলি সঞ্চয়ে এ পাদদেশীয় ঢালু ভূমি গঠিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে এর গড় উচ্চতা ৩০ মি.। বর্ষাকালে এ অঞ্চলে কোনো কোনো স্থান প্লাবিত হয়। প্রধান ফসল ধান ও পাট। তবে তামাক ও ইক্ষু উৎপাদনে এ অঞ্চল বিখ্যাত। এ জাতীয় সমভূমিগুলো পাখাসদৃশ অর্ধবৃত্তাকার দেখায় বলে এ সমভূমিকে পলল পাখা বলে।

নিম্নগতিতে নদীর স্রোতবেগ খুবই কমে যায়। ফলে নদীবাহিত পলি, বালি, কাঁকর প্রভৃতি তলানিরূপে নদীতে সঞ্চিত হতে থাকে। এ তলানি প্রথমে নদীর মোহনায় বিভিন্ন চরের সৃষ্টি করে। পরে চরসমূহে বাধা পেয়ে নদীর স্রোতধারা বিচ্ছিন্ন হলে ত্রিকোণাকার এক নতুন ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়। এভাবে গঠিত ভূমিরূপই বদ্বীপ।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, পাদদেশীয় পলল সমভূমি ও বদ্বীপের মধ্যে গঠনগত পার্থক্য রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৮ আশ্রাফউদ্দিন সাহেব নতুন কর্মস্থলে এসেছেন। তিনি দেখলেন এখানকার কৃষি পদ্ধতি অন্যান্য এলাকার মতো নয়। এখানে পাহাড়ের গা কেটে কৃষিকাজ করা হয়। *◀ শিখনফল: ৩*

ক. কোন অঞ্চলের পাহাড়গুলো টিলা নামে পরিচিত? ১
খ. অশ্মমন্ডল কীভাবে সৃষ্টি হয়? ২
গ. আশ্রাফউদ্দিন সাহেবের বর্তমান কর্মস্থলের অঞ্চলটি কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে- ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত অঞ্চলের কৃষি পদ্ধতিটি আলোচনা করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উত্তর-পূর্বের (যেমন: সিলেট) পাহাড়গুলো টিলা নামে পরিচিত।

খ আদিতে পৃথিবী একটি জ্বলন্ত বাষ্পপিন্ড ছিল। ক্রমান্বয়ে তাপ বিকিরণের মাধ্যমে প্রথমে তরল ও পরে জমাট বেঁধে পৃথিবীর উপরিভাগে কঠিন পাতলা আবরণের সৃষ্টি হয়। এভাবে ভূত্বক বা অশ্মমন্ডলের সৃষ্টি হয়।

গ আশ্রাফউদ্দিন সাহেবের বর্তমান কর্মস্থলটি হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল।

পার্বত্য চট্টগ্রাম টারশিয়ারি যুগের ভূপ্রকৃতির অন্তর্গত। এ অঞ্চলের ভূমিরূপ ভঙ্গিল পর্বত শ্রেণির।

সমুদ্র তলদেশের বিস্তৃত অবনমিত স্থানে দীর্ঘকাল ধরে বিপুল পরিমাণ পলি জমা হওয়ায় এর চাপে অবনমিত স্থান আরও নিচে নেমে যায়। পরবর্তীতে ভূআলোড়ন বা ভূমিকম্পের ফলে এবং পার্শ্ববর্তী সুদৃঢ় ভূমিখণ্ডের প্রবল পার্শ্বচাপের কারণে উর্ধ্ব ও নিম্নভাঁজের সৃষ্টি হয়। বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এ সমস্ত ভাঁজ সংবলিত ভূমিরূপ মিলেই ভঙ্গিল পর্বত গঠিত হয়েছে। যেমন– হিমালয় পবর্তমালা।

টারশিয়ারি যুগে হিমালয় পর্বত গঠনের সময় একই প্রক্রিয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে আলোচিত পাহাড়ের গা কেটে কৃষিকাজ করার পদ্ধতি হলো জুম চাষ।
বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান জেলার এলাকাগুলোতে স্থানীয়রা জুম প্রথায় কৃষিকাজ করে।
জুম চাষ পদ্ধতিতে পাহাড়ের গা কেটে, বনভূমি পরিষ্কার করে কৃষিকাজ করা হয়। কয়েক বছর পর উক্ত জমি ত্যাগ করে অন্যস্থান পরিষ্কার করে চাষাবাদ করা হয়।
উপরোক্ত চাষাবাদ পদ্ধতি জুম চাষ নামে পরিচিত। এভাবে পাহাড়ের গায়ে একই সাথে ধান, রাবার, তুলা, চা, আনারস প্রভৃতি চাষ করা হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৯ টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী কলেজের ছাত্রীরা গ্রীষ্মের ছুটিতে শিক্ষাসফরে রাঙামাটি যায়। তারা সেখানে মাটির রং, গঠন ও ঢালের ভিন্নতা দেখতে পায়। কলেজের আরেক দল শিক্ষার্থী বরিশাল অঞ্চলে গেল। সেখানে তারা নিজেদের এলাকা থেকে ভিন্ন প্রকৃতির মৃত্তিকা দেখতে পেল। *◀ শিখনফল: ৩*

ক. উত্তরের পাহাড়গুলো স্থানীয়ভাবে কী নামে পরিচিত? ১
খ. গ্রীষ্মকালে বাংলাদেশে বৃষ্টিপাত বেশি হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কলেজটি যে অঞ্চলে অবস্থিত সে অঞ্চলের ভূমিরূপটি কীভাবে গঠিত হয়েছে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. প্রথম দলটির ভ্রমণকৃত অঞ্চলটির সাথে দ্বিতীয় দলটির দেখা অঞ্চলটির ভূপ্রকৃতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উত্তরের পাহাড়গুলো স্থানীয়ভাবে টিলা নামে পরিচিত।

খ বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালীন গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৫১ সে.মি.।
গ্রীষ্মকালে বাংলাদেশের উপর দিয়ে উষ্ণ ও আর্দ্র দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয়। অন্যদিকে এ সময় পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিক হতে শুষ্ক ও শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়। এ দুই বায়ুর সংঘর্ষে গ্রীষ্মকালে বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টি হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত টাঙ্গাইল জেলার বিন্দুবাসিনী কলেজটি মধুপুর ও ভাওয়াল গড় অঞ্চলে অবস্থিত, যা প্লাইস্টোসিনকালের সোপান সমূহের অন্তর্গত। আনুমানিক ২৫,০০০ বছর পূর্বের সময়কে প্লাইস্টোসিনকাল বলে।

মধুপুর ও ভাওয়াল গড় অঞ্চলটি প্লাইস্টোসিন যুগে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ৫ মিলিয়ন বছর পূর্বে বরফ যুগের পরোক্ষ প্রভাবের ফলে গঠিত হয়েছিল। এ অঞ্চলের মাটির রং লালচে ও ধূসর।

মধুপুর ও ভাওয়াল গড় অঞ্চলটির উত্তরাংশ পার্শ্ববর্তী প্লাবনভূমি থেকে উঁচু এবং প্রান্তভাগ খাড়া ঢালবিশিষ্ট। এ অঞ্চলটি গাজীপুর, টাংগাইল ও ময়মনসিংহ জুড়ে বিস্তৃত।

ঘ উদ্দীপকে প্রথম দলটির ভ্রমণকৃত অঞ্চল হলো রাঙ্গামাটি যা টারশিয়ারি যুগের এবং দ্বিতীয় দলটির দেখা অঞ্চলটি হলো বরিশাল যা প্লাবন সমভূমির অন্তর্ভুক্ত।

টারশিয়ারি যুগে হিমালয় পর্বত উত্থিত হওয়ার সময় মায়ানমারের দিক থেকে আগত গিরিজনি আলোড়নের ধাক্কায় ভাঁজ সৃষ্টি হয়ে উক্ত অঞ্চলটি গঠিত হয়। এ অঞ্চলের মাটি বেলে পাথর, শেল ও কর্দম দ্বারা গঠিত।

অপরদিকে, বরিশালে অসংখ্য ছোট-বড় নদী ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সমভূমির উপর এ নদীগুলো প্রবাহিত হওয়ার কারণে বর্ষাকালে বন্যার সৃষ্টি হয়। বছরের পর বছর এভাবে বন্যার সঙ্গে পরিবাহিত পলি, কর্দম সঞ্চিত হয়ে এ প্লাবন সমভূমি গঠিত হয়।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকের প্রথম ও দ্বিতীয় দলটির দেখা ভূমিরূপ দুটির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২০ একটি মানচিত্রে দুটি ভূমিরূপ দেখানো হলো। প্রথম ভূমিরূপটি বিস্তৃত পার্বত্য অঞ্চলে যার দুটি শৃঙ্গ রয়েছে। দ্বিতীয় ভূমিরূপটি বিস্তীর্ণ স্থান জুড়ে উন্মুক্ত সমতলভূমি যার পার্শ্বদেশ অত্যন্ত খাড়া। *◀ শিখনফল: ৪*

ক. দুই শৃঙ্গ বিশিষ্ট বৃহৎ খাড়া পাহাড়কে কী বলে? ১

খ. শাঙ্কব আকৃতির পাহাড় ও আগ্নেয়গিরির মধ্যে পার্থক্য লেখো? ২

গ. দ্বিতীয় ভূমিরূপটি সমোন্নতি রেখাসহ অঙ্কন করো। ৩

ঘ. মানচিত্রের ভূমিরূপ দুটির মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুই শৃঙ্গ বিশিষ্ট বৃহৎ খাড়া পাহাড়কে ম্যাসিফ বলে। যেমন– হিমালয়ের K2।

খ শাঙ্কব আকৃতির (Conical) পাহাড় ও আগ্নেয়গিরি দেখতে প্রায় একই রকম। কিন্তু এদের গঠন প্রক্রিয়ায় ভিন্নতা রয়েছে।

আগ্নেয়গিরির কেন্দ্রস্থলে একটি গহ্বর বা মুখ থাকে যা জ্বালামুখ নামে পরিচিত। কিন্তু শাঙ্কব আকৃতির পাহাড়ে এই জ্বালামুখ থাকে না। মূলত আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুৎপাতের ফলে এবং শাঙ্কব আকৃতির পাহাড় ম্যাগমার ঊর্ধ্বমুখী চাপের ফলে সৃষ্টি হয়।

গ দ্বিতীয় ভূমিরূপটি হলো মালভূমি।

পর্বত থেকে নিচু কিন্তু সমভূমি থেকে উঁচু খাড়া ঢালযুক্ত ঢেউ খেলানো বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিকে মালভূমি বলে।

নিচে মালভূমির সমোন্নতি রেখাসহ অঙ্কন করা হলো:

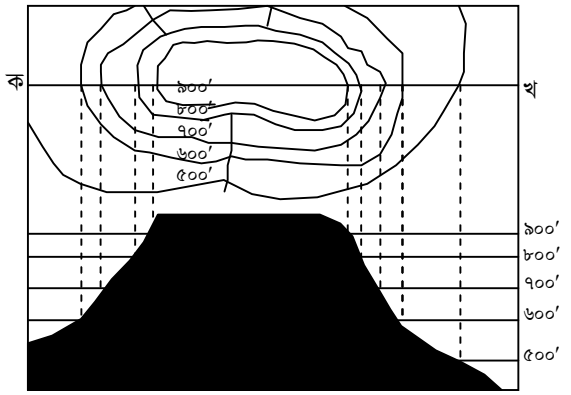

চিত্র : মালভূমি

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম ভূমিরূপটি বিস্তীর্ণ পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত, যার দুটি শৃঙ্গ রয়েছে। অর্থাৎ এটি দুই শৃঙ্গ বিশিষ্ট পাহাড় বা ম্যাসিফ। দ্বিতীয় ভূমিরূপটি বিস্তীর্ণ স্থান জুড়ে উন্মুক্ত সমতলভূমি যার পার্শ্বদেশ অত্যন্ত খাড়া। অর্থাৎ এটি মালভূমি।

নিচে ভূমিরূপ দুটির তুলনা করা হলো–

পর্বত হচ্ছে ভূপৃষ্ঠের অতি উচ্চ সুবিস্তৃত এবং খাড়া ঢালবিশিষ্ট শিলাস্তূপ। অপরদিকে, মালভূমি একটি বিস্তীর্ণ উচ্চভূমি। এর উপরিভাগ প্রায় সমতল, এটা চারদিক হতে খাড়াভাবে নিম্নভূমিতে নেমে যায়। সাধারণত পর্বত ও মালভূমির উচ্চতা যথাক্রমে প্রায় ৩০০০ এবং ৫০০ ফুট। সুতরাং দেখা যায় ভূমিরূপ দুটির মধ্যে গঠনগত পার্থক্য বিদ্যমান।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, ভূমিরূপ দুটির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২১

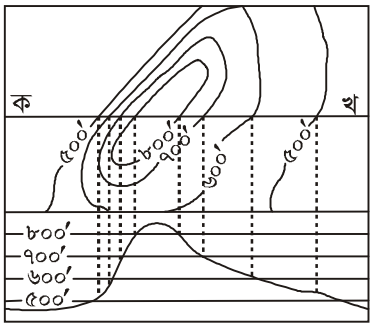

◀ শিখনফল: ৪

ক. উপত্যকা কী? ১

খ. শৈলশিরা বলতে কী বোঝ? ২

গ. ভূমিরূপটির সমোন্নিত রেখা কেমন হতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. চিত্রের ভূমিরূপটি কী ধরনের? বিশ্লেষণ করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুটি উন্নত (উঁচু) ভূমির মধ্যস্থিত নিম্নভূমিই উপত্যকা। যেমন– যমুনা নদী উপত্যকা।

খ দূরে দূরে বিন্যস্ত সমোন্নতি (contour) রেখার মধ্যে যদি কোথাও উচ্চ মানবিশিষ্ট সমোন্নতি রেখা থাকে তবে তা একটি উচ্চভূমি নির্দেশ করে। এইরূপ উচ্চভূমিকে শৈলশিরা বলে। যেমন– আটলান্টিক শৈলশিরা।

এ ধরনের ভূমিরূপের মধ্যে কোথাও দু'একটি উঁচু মানবিশিষ্ট গোলাকার সমোন্নতি রেখা দেখা যায়, যা শৈলশিরার শীর্ষ নির্দেশ করে।

গ উদ্দীপকের ভূমিরূপটি লক্ষ করলে দেখা যায় ভূমিরূপটি একদিকে খাড়া ঢালবিশিষ্ট অপরদিকে ঢালু।

ভূমিরূপটির বামদিকে যেহেতু খাড়া ঢালবিশিষ্ট তাই সেখানকার সমোন্নতি রেখাগুলো খুব ঘন হবে অর্থাৎ প্রায় লেগে থাকবে। ভূমিরূপটির মধ্যস্থলের বিস্তৃত অংশের উচ্চতা প্রায় সমান।

ভূমিরূপটির ডানদিকে ঢালু হওয়ায় সমোন্নতি রেখাগুলোর মধ্যে ব্যবধান বেশি থাকবে।

ঘ চিত্রের ভূমিরূপটি লক্ষ করলে দেখা যায় ভূমিরূপটির একদিকে খাড়া অপরদিকে ক্রমশ ঢালু।

সাধারণত উপকূলের সন্নিকটে এ ধরনের ভূমিরূপ দেখা যায়। এ ধরনের ভূমিরূপকে প্রণবভূমি বলে। যেমন : কক্সবাজারের চন্দ্রনাথ পাহাড়।

যে সব পানি বিভাজিকা উপকূলের সন্নিকটে সমান্তরালভাবে অবস্থান করে; সেখানে উপকূলের দিকে ভূমি অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত ও খাড়া হয় এবং বিপরীত দিকের অংশ প্রশস্ত ও ক্রমশ নিম্ন হয়। পানি বিভাজিকায় এরূপ অপ্রশস্ত খাড়া অংশকে প্রণবভূমি বলে।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল থাকায় বলা যায়, উদ্দীপকের ভূমিরূপটি একটি প্রণবভূমি।

প্রশ্ন ▶ ২২

i.

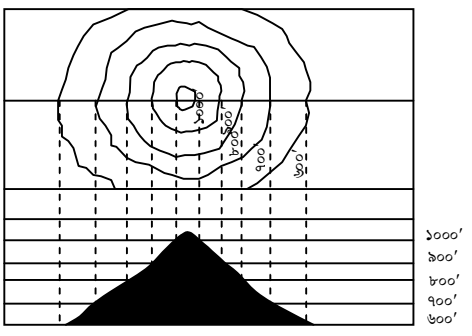

ii.

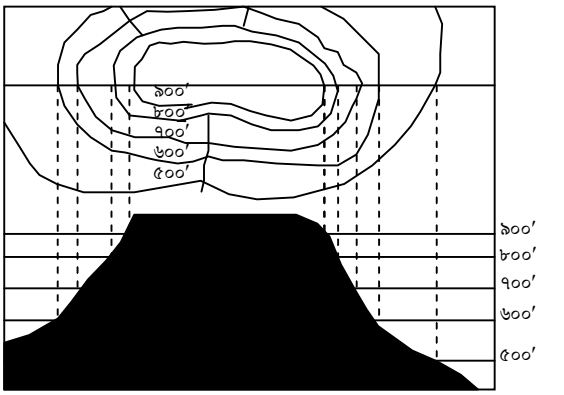

◀ *শিখনফল: ৪*

ক. রকি কী ধরনের পর্বত? ১

খ. সমোন্নতি রেখার সন্নিবেশ বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের ভূমিরূপ দুটির মধ্যে কোনটি শাঙ্কব পাহাড় এবং কেন— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'ii' ভূমিরূপটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রকি একটি ভঙ্গিল পর্বত।

খ সমুদ্র সমতল থেকে সমান উচ্চতাবিশিষ্ট স্থানগুলোর কাল্পনিক সংযোজক রেখাকে সমোন্নতি রেখা (Contour) বলে। কোনো মানচিত্রে বিভিন্ন স্থানের উচ্চতা দেওয়া থাকলে এগুলোর সাহায্যে বিভিন্ন সমোন্নতি রেখা অঙ্কনের কৌশলকে সমোন্নতি রেখার সন্নিবেশ (Contour interpolation) বলে।

গ উদ্দীপকের ভূমিরূপ দুটির মধ্যে 'ক' ভূমিরূপটি শাঙ্কব পাহাড়। সাধারণত চারিদিক থেকে ভূমির ঢাল প্রায় সমহারে উঁচু হয়ে যে পাহাড়ের সৃষ্টি করে তাকে শাঙ্কব পাহাড় বলে।

চিত্রের 'ক' ভূমিরূপের আকৃতি শাঙ্কব (Conical)। এ পাহাড়ের ঢাল সবদিকে সমান হওয়ায় সমোন্নতি রেখাগুলো বৃত্তাকার হয়ে থাকে। এ রেখাগুলোর কেন্দ্রে একটি বিন্দু থাকে এবং এর উচ্চতা লেখা থাকে যা পাহাড়ের চূড়া নির্দেশ করে।

ঘ সমোন্নতি রেখা সংবলিত দ্বিতীয় ভূমিরূপটি হলো মালভূমি।

দ্বিতীয় চিত্রটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সমোন্নতি রেখার মান বৃত্তাকারে ক্রমান্বয়ে কেন্দ্রের দিকে বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার কেন্দ্রস্থিত বিস্তৃত জায়গা জুড়ে রেখার মান স্থির। অর্থাৎ ভূমিরূপটির চতুর্দিক প্রায় খাড়া ঢালবিশিষ্ট এবং মাঝখানে বহুদূর পর্যন্ত প্রায় সমতল। মালভূমিও একটি বিস্তীর্ণ উচ্চভূমি এবং এর চারদিক খাড়াভাবে নেমে গেছে।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, দ্বিতীয় চিত্রটি একটি মালভূমি।

তৃতীয় অধ্যায়
ভূমিরূপ পরিবর্তন

পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶১ উমা তার পড়ার ঘরে টেবিলে বসে পড়ছিল। হঠাৎ সে ঝাঁকুনি অনুভব করে। সে দেখতে পায় তার ঘরের সকল জিনিসপত্র এদিক—ওদিক ঝুলছে। সে জানালা দিয়ে লক্ষ করল রাস্তার মানুষ ছোটাছুটি করছে। একটু পরে কম্পন বন্ধ হয়ে গেলে সে ঘরের বাইরে গিয়ে দেখতে পায় প্রতিবেশিদের দালানকোঠা কোনোটা ধ্বংস হয়েছে আবার কোনোটা হেলে পড়েছে। সে তার বাবার কাছ থেকে জানতে পারল এর কারণ ভূমিকম্প। *◀ শিখনফল: ২ [অবনীন্দ্রনাথ বৈদ্য; অনু-৫]*

ক. ভূমিকম্প কী? ১

খ. ভূমিকম্পের কারণ কী? ২

গ. ভূমিকম্প প্রবণ এলাকার বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. ভূমিকম্পের ক্ষয়-ক্ষতির একটি বিশ্লেষণ দাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভূমিকম্প হলো ভূত্বকের হঠাৎ কম্পন বা সঞ্চালন যা প্রাকৃতিক ভাবে ভূপৃষ্ঠে বা তার তলদেশে সংঘটিত হয়।

খ ভূমিকম্পন প্রধানত দুটি কারণে সংঘটিত হয়। যথা—

প্রাকৃতিক কারণ : প্লেট টেকটনিকস, শিলাচ্যুতি, অগ্ন্যুৎপাত, ভূআন্দোলন, তাপ বিকিরণ, সঞ্চিত বাষ্পের চাপ এবং সমুদ্রগর্ভে অবক্ষেপ প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণে ভূমিকম্প সংঘটিত হয়।

কৃত্রিম কারণ : নদীতে বাঁধ দিয়ে কৃত্রিম জলাধার নির্মাণ করে শিলাস্তরের উপর চাপ সৃষ্টি করলে, খনি অঞ্চলে খননকার্যের ফলে ভূমিধস হলে এবং ভূগর্ভে আণবিক বিস্ফোরণ ঘটলে ভূমিকম্প সংঘটিত হতে পারে। এগুলো ভূমিকম্পন সৃষ্ট হওয়ার কৃত্রিম কারণ।

গ ভূমিকম্পের প্রকোপ পৃথিবীর সর্বত্র সমান নয়। বেশির ভাগ ভূমিকম্প (প্রায় ৯৫%) শক্তি পৃথিবীর অল্পস্থান জুড়ে মুক্ত হয়, যা আয়তনে দীর্ঘ ও সরু। ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলগুলোকে তিনটি প্রধান অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়।

i. **প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল:** প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেটের বহিঃসীমানা বরাবর ভূমিকম্প প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। এখানে আগ্নেয়গিরিগুলো এ মহাসাগরকে মালার মতো বেষ্টন করে আছে বলে এ অঞ্চলকে আগ্নেয়মেখলা বলা হয়ে থাকে। এ অঞ্চলের জাপান, ফিলিপাইন, চিলি, অ্যালিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ এবং আলাস্কা প্রধান ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল।

ii. **ভূমধ্যসাগরীয়-হিমালয় অঞ্চল :** আল্পস পর্বত থেকে শুরু করে ভূমধ্যসাগরের উত্তর তীর হয়ে ককেশাস, ইরান মালভূমি, হিমালয় পর্বতমালা, ইন্দোচীন ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হয়ে নিউজিল্যান্ড পর্যন্ত এ অঞ্চলটি বিস্তৃত। অগভীর ও মাঝারি গভীরতার কেন্দ্রবিশিষ্ট ভূমিকম্প এ অঞ্চলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ভূমিকম্পপ্রবণ দেশ ইতালি এ অঞ্চলে অবস্থিত।

iii. **মধ্য আটলান্টিক ভারত মহাসাগরীয় শৈলশিরা অঞ্চল :** উত্তর-দক্ষিণ বরাবর মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরা এবং ভারত মহাসাগরীয় শৈলশিরার সাথে মিলে এ অঞ্চলটি লোহিত সাগর বরাবর ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সাথে মিশেছে। এ সমস্ত গভীর ভূমিকম্প কেন্দ্রের বেশির ভাগ স্বাভাবিক চ্যুতি বরাবর অবস্থিত।

ঘ ভূমিকম্পের ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিম্নরূপ:

i. ভূমিকম্পের ফলে বহুসংখ্যক ঘর-বাড়ি ধ্বংস, বহুলোকের প্রাণহানি এবং সম্পদ নষ্ট হয়। ১৯৭৮ সালে ইরানে তাবাস শহর নিশ্চিহ্ন হয় এবং প্রায় ২১,০০০ লোক প্রাণ হারায়। ১৯৩৪ সালে বিহারে ১২,০০০ এর বেশি লোকের মৃত্যু ঘটে। ১৯৮৮ সালে আর্মেনিয়ার একাধিক শহর প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে লক্ষাধিক প্রাণহানি হয়। ১৯৮৫-তে মেক্সিকোতে প্রায় ৮ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ১৯৮৮-তে ভারতের বিহারে প্রায় ১৫,০০০ লোক হতাহত হয়।

ii. ভূমিকম্পের ফলে ভাঁজ, চ্যুতি, ফাটলের সৃষ্টি হয়।

iii. ভূমিকম্পের ফলে ভূমিধস হতে পারে। ১৯২০ ও ১৯২৭ সালে উত্তর চীনের লোয়েস-এ এই জাতীয় ভূমিধস হয়েছিল।

iv. ভূমিকম্পের ফলে সমুদ্রের তলদেশ সমুদ্রের উপর জেগে উঠে আবার উপকূলের উচ্চভূমি সমুদ্রে ডুবে যায়। ১৯১৪ সালে জাপানের সাগামী উপসাগরের অংশবিশেষ ১২৫ মিটার উঠে এসেছিল। অপরদিকে, এর অন্য অংশ প্রায় ৩০০ মিটার বসে গিয়েছিল।

v. ১৭৮৭ সালে আসামে যে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়েছিল তাতে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের গতিপথের পরিবর্তন হয়। ১৯৫০ সালের ১৫ আগস্ট আসামে যে ভূমিকম্প হয় তাতে দিবং নদীর গতির পরিবর্তন হয়।

vi. শিলাচ্যুতি ও হিমানী সম্প্রপাত হতে পারে।

vii. ভূমিকম্পের সময় কখনও কখনও আগুন ধরে যায়। ১৯২৩ সালে জাপানে এমন একটি ভূমিকম্প হয়। এতে ৫ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করে এবং ১,৫০০ কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি জনজীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে।

প্রশ্ন ▶ ২ রিপন রাতে শুয়ে থেকে অনুভব করল তার খাট হঠাৎ কেঁপে উঠছে। অল্প সময় পর কাঁপা বন্ধ হয়ে গেল। পরদিন সকালে শুনল পুরান ঢাকার একটি বিল্ডিং ধসে পড়েছে। বাবার কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বললেন এটি একটি আকস্মিক পরিবর্তন। *◀ শিখনফল: ২ [তাপস কুমার মজুমদার; অনু-১]*

ক. সুনামি কী? ১

খ. যেসব আগ্নেয়গিরি হতে বিস্ফোরণ ঘটেই চলেছে তাকে কোন জাতীয় আগ্নেয়গিরি বলে?- ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে রিপনের খাট কেঁপে ওঠার কারণ বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বিল্ডিং ধসে পড়ার সাথে রিপনের বাবার ইঙ্গিতকৃত বিষয়টি বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাধারণত সমুদ্রের তলদেশে প্রবল ভূমিকম্প সংঘটিত হলে সমুদ্র পৃষ্ঠে প্রচণ্ড ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। এরূপ বিশাল ঢেউকে সুনামি বলে।

খ শুরু হতে এখন পর্যন্ত যে সমস্ত আগ্নেয়গিরি হতে বিস্ফোরণ ঘটে চলেছে তাদেরকে সক্রিয় অবিরাম আগ্নেয়গিরি বলে।

এ জাতীয় আগ্নেয়গিরির তলদেশে ম্যাগমা প্রকোষ্ঠ সাধারণত বৃহদাকার হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ক্যালিফোর্নিয়ার লাসেন পিক।

গ রিপনের খাট কেঁপে ওঠার কারণ হলো ভূমিকম্প।

ভূঅভ্যন্তরে সৃষ্ট কোনো কম্পন যখন ভূত্বককে আকস্মিকভাবে আন্দোলিত করে সাধারণত তাকেই ভূমিকম্প বলে। মৃদু ভূমিকম্প আমরা অনুভব করতে পারি না। কিন্তু অপেক্ষাকৃত প্রবল ভূমিকম্প আমরা সহজেই অনুভব করতে পারি।

সাধারণত ভূমিকম্প কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হয় এবং পর্যায়ক্রমে একাধিকবার ঘটতে পারে। যে সমস্ত অভ্যন্তরীণ ও আকস্মিক কারণে ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন সাধিত হয় তাদের মধ্যে ভূমিকম্প অন্যতম। ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি মাঝে মাঝে অত্যন্ত মারাত্মক আকার ধারণ করে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে কোনো একটি স্থানে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়।

ঘ উদ্দীপকের বিল্ডিং ধসে পড়ার কারণ হলো ভূমিকম্প। আর ভূমিকম্প হলো এক ধরনের আকস্মিক পরিবর্তন যা রিপনের বাবা ইঙ্গিত করেছেন।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প, পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের সংকোচন, ভূগর্ভের চাপ ও তাপ প্রভৃতি অভ্যন্তরীণ শক্তির প্রভাবে কখনো কখনো ভূত্বকের আকস্মিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। আকস্মিকভাবে ভূত্বক পরিবর্তনকারী শক্তির মাঝে ভূমিকম্প অন্যতম।

ভূমিকম্পের ভূমিকা সম্পর্কে বলতে গেলে বলা যায় প্রাকৃতিক কারণে পৃথিবীর কঠিন ভূত্বক সময়ে সময়ে ক্ষণিকের জন্য কেঁপে ওঠা। এই ভূমিকম্প মৃদুও হয় আবার মাঝে মাঝে প্রবল আকারও ধারণ করে। যখন এই ভূমিকম্প তীব্রতর আকার ধারণ করে তখন ঘরবাড়ি ধ্বংসসহ পৃথিবীর নানা ধরনের আকস্মিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। তাই উদ্দীপকের বিল্ডিং ধসে পড়াটিও ভূমিকম্পের ফলে সংঘটিত এক ধরনের আকস্মিক পরিবর্তন। আবার রিপনের বাবার ইঙ্গিতকৃত বিষয়টিও ছিল এক ধরনের আকস্মিক পরিবর্তন।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় বিল্ডিং ধসে পড়ার সাথে রিপনের বাবার ইঙ্গিতকৃত বিষয়টি সম্পর্কযুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ৩ বিশাল জলরাশির আধার হওয়া সত্ত্বেও মহাসাগরের তলদেশ থেকে মাঝেমধ্যে উত্তপ্ত পাথরখণ্ড, কাদা, ধোঁয়া, গলিত ধাতব পদার্থ ইত্যাদি প্রবলবেগে উৎক্ষিপ্ত হয় শুনে অনেকে অবাক হয়। *◀ শিখনফল-৩ [ড. সৈয়দ শাহজাহান আহমেদ; অনু-৬]*

ক. নদী তার সুদীর্ঘ গতিপথে ক্ষমতা অনুযায়ী কয় ধরনের কাজ করে থাকে? ১

খ. গোমতী নদী সম্পর্কে ধারণা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত মহাসাগরের তলদেশে সংঘটিত ঘটনাগুলোর স্বরূপ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনাটি ঘটার যথাযথ কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নদী তার সুদীর্ঘ গতিপথে পানির ক্ষমতা অনুযায়ী তিন ধরনের কাজ করে থাকে।

খ গোমতী মেঘনার উপনদী। কুমিল্লা জেলার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া গোমতী নদী দাউদকান্দির কাছে মেঘনা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। এ নদীর বন্যায় প্রতিবছর অত্র অঞ্চল প্লাবিত হয়।

গ উদ্দীপক পড়ে বোঝা যাচ্ছে যে, এখানে বর্ণিত ঘটনাগুলো হলো আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত। এসব ঘটনা কেবল মহাসাগরের তলদেশেই নয় বরং স্থলভাগেও ঘটে থাকে।

ভূত্বকের শিলাস্তর সর্বত্র সমান নয়। এতে কোনো কোনো সময় ভূগর্ভের চাপ প্রবল হয়ে শিলাস্তরের কোনো দুর্বল অংশ ফেটে

ভূগর্ভ থেকে ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত একটি বিরাট নলাকৃতি ছিদ্রপথের সৃষ্টি হয়। এ পথ দিয়ে ভূগর্ভস্থ বাষ্প, গলিত ধাতব পদার্থ, উত্তপ্ত প্রস্তরখণ্ড, কর্দম, ধূম, ভস্ম ইত্যাদি যখন প্রবলবেগে ভূপৃষ্ঠে নির্গত হয় তখন তাকে আগ্নেয়গিরি বলে। ছিদ্রপথের মুখের চারদিকে নির্গত পদার্থ ক্রমশ জমাট বেঁধে উঁচু শাঙ্কব বা মোচাকৃতি পর্বতের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ আগ্নেয়গিরি হলো সেই মোচাকৃতি পর্বত যার ভেতর দিয়ে অতীতে অগ্ন্যুৎপাত হয়েছিল এবং বর্তমানেও হচ্ছে। আগ্নেয়গিরি থেকে যে ছিদ্রপথে অগ্ন্যুৎপাত হয়ে থাকে সেটিকে জ্বালামুখ বলে। এ জ্বালামুখ থেকে নির্গত পদার্থকে লাভা নামে অভিহিত করা হয়। লাভার ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হওয়াই হলো অগ্ন্যুৎপাত। প্রত্যেক আগ্নেয়গিরির নিচে যে গহ্বরে লাভা সঞ্চিত থাকে তাকে ম্যাগমা চেম্বার বলে।

ঘ উদ্দীপকের ইঙ্গিতকৃত ঘটনাটি হলো আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, যা সংঘটিত হওয়ার নানাবিধ কারণ নিচে আলোচনা করা হলো–

ভূত্বকের কোনো কোনো স্থানে ফাটল বা দুর্বল শিলা থাকে, যার মধ্য দিয়ে ভূ-অভ্যন্তরের উত্তপ্ত গলিত ম্যাগমা ধাতু, ধূম্র ইত্যাদি প্রবলবেগে বের হয়ে অগ্ন্যুৎপাতের সৃষ্টি করে থাকে।

নদী, হিমবাহ, বৃষ্টি, বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা ভূপৃষ্ঠের কোনো অংশ ব্যাপকভাবে ক্ষয় হলে চাপ হ্রাস পায়। যখন ভূপৃষ্ঠের এ চাপ কমে যায়, তখন ভূগর্ভের শিলাসমূহ স্থিতিস্থাপক অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় পরিণত হয়। আবার ভূঅভ্যন্তরে ক্রমবর্ধমান সঞ্চিত বাষ্পরাশি সর্বদা বাইরে আসতে চায় বিধায় ভূত্বকের তলদেশে প্রবল ঊর্ধ্বচাপ পড়ে। ফলে উপরিস্থিত ভূত্বক নিম্নস্থ কঠিন শিলার উপর যে চাপ দেয় তা বহু গুণে কমে যায়। এ দুই উপায়ে কঠিন শিলার উপর চাপ হ্রাস পাওয়ায় কঠিন শিলা তরলে পরিণত হয়। এ তরল পদার্থ দুর্বল স্থান ভেদ করে প্রবলবেগে উৎক্ষিপ্ত হয়ে অগ্ন্যুৎপাতের সৃষ্টি করে। কখনো কখনো ভূত্বকের ফাটল দিয়ে নদীনালা, খালবিল এমনকি সমুদ্রের পানি ভূগর্ভে প্রবেশ করলে তা বাষ্পীভূত ও আয়তনে বৃদ্ধি পেয়ে ভূত্বক ফাটিয়ে দেয়। তখন ঐ ফাটলের ভেতর দিয়ে পানি, বাষ্প, তপ্ত শিলা প্রভৃতি নির্গত হয়ে অগ্ন্যুৎপাত ঘটায়।

ভূত্বকের চাপ হ্রাস পেলে, রাসায়নিক উপায়ে গ্যাস উৎপন্ন হলে বা তেজস্ক্রিয় পদার্থ দ্বারা তাপ বৃদ্ধি পেলে অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলো তরল ও আয়তনে বৃদ্ধি পেয়ে ভূগর্ভে প্রচণ্ড চাপ দেয়। এর ফলে ভূত্বক ফেটে অগ্ন্যুৎপাত হয়। অনেক সময় ভূ-আন্দোলনের পার্শ্বচাপে ভূত্বকের দুর্বল অংশ ভেদ করে তপ্ত তরল লাভা উপরে উত্থিত হয়।

তাপ বিকিরণের দরুন ভূত্বক সর্বদা শীতল ও সংকুচিত হওয়ায় ভূত্বকে ভাঁজের সৃষ্টি হয়, চাপ হ্রাস পায় এবং ভূত্বক ফেটে অগ্ন্যুৎপাত হয়।

প্রশ্ন ▶ ৪

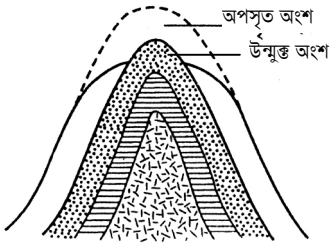

◀ *শিখনফল: ৫*

ক. আগ্নেয় শিলার প্রধান উপাদান কী? ১

খ. জৈবিক বিচূর্ণীভবন বলতে কী বোঝ? ২

গ. চিত্রে ভূপৃষ্ঠের ধীর পরিবর্তনকারী প্রক্রিয়ার কোন ধারণাটি দেখানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিচূর্ণীভবন উক্ত প্রক্রিয়ার একটি অংশ– বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আগ্নেয় শিলার প্রধান উপাদান ফেলস্পার (Feldspar) ও অভ্র।

খ মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তু, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষলতাদি প্রতিনিয়ত ভূপৃষ্ঠের ক্ষয়সাধন ও পরিবর্তন সাধন করছে। নানা প্রকার প্রাণী ও উদ্ভিদের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বলে এ প্রক্রিয়াকে জৈবিক বিচূর্ণীভবন (Biological weathering) বলে।

জৈবিক বিচূর্ণীভবন মানুষ, উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর দ্বারা সংঘটিত হয়। মানুষের দ্বারা শিলার বিচূর্ণীভবন আমাদের দৃষ্টিগোচর হলেও উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর দ্বারা বিচূর্ণীভবনে তা হয় না।

গ চিত্রে ভূপৃষ্ঠের ধীর পরিবর্তনকারী প্রক্রিয়া নগ্নীভবন (Denudation) দেখানো হয়েছে।

নগ্নীভবনে চার ধরনের প্রক্রিয়া কাজ করে। ১. বিচূর্ণীভবন (Weathering), ২. স্তূপ অপসারণ (eroded materials transfer) , ৩. ক্ষয়সাধন (Erosion) ও ৪. পরিবহন (Transportation)।

প্রথম পর্যায়: বিচূর্ণীভবন শিলার ক্ষয়সাধনে ভূমিকা রাখে। এর ফলে ভূত্বকের উপরিস্তরের শিলা ভেঙেচুরে শিথিল হয়ে পড়লেও অপসারিত হয় না।

দ্বিতীয় পর্যায়: উচ্চ ঢালে অবস্থিত বিচূর্ণীভূত শিলা মাধ্যাকর্ষণের টানে নিম্ন ঢালে নেমে আসে। শিলার এ নিম্ন ঢাল অভিমুখী যাত্রাকে স্তূপ অপসারণ বলে। বিচূর্ণীভূত শিলার সামান্য অংশ পানি বা বায়ুর মাধ্যমে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়।

তৃতীয় পর্যায়: বিচূর্ণীভবনের সময় ভূত্বকের উপরিস্তরের শিলা ভেঙেচুরে প্রস্তর খণ্ড, কংকর, নুড়ি, বালুকণা, কাদা প্রভৃতিতে পরিণত হয়। কিন্তু অপসৃত হয় না। এসব আলগা পদার্থ নানাবিধ প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা অপসারিত হলে তাকে ক্ষয়ীভবন বলে। যেসব প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ক্ষয়ীভবন সংঘটিত হয় তাদের মধ্যে বায়ু, বৃষ্টিপাত, হিমবাহ, সমুদ্রতরঙ্গ প্রভৃতি প্রধান।

চতুর্থ পর্যায়: নগ্নীভবনের চারটি প্রক্রিয়ার মধ্যে সর্বশেষ প্রক্রিয়াটি হলো পরিবহন। বিচূর্ণীভূত পদার্থসমূহ ক্ষয় হয়ে পরিবাহিত হলে নিচের অবিকৃত শিলা দৃষ্টিগোচর বা নগ্ন হয়ে পড়ে।
চিত্রে দেখা যাচ্ছে, বিচূর্ণীভূত শিলা বায়ু, বৃষ্টিপাত, হিমবাহ, সমুদ্র তরঙ্গ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা অপসারিত হয়ে উন্মুক্ত অবস্থায় রয়েছে। সুতরাং বলা যায় যে, চিত্রে ভূপৃষ্ঠের ধীর পরিবর্তনকারী প্রক্রিয়া নগ্নীভবন দেখানো হয়েছে।

ঘ বিচূর্ণীভবন চিত্রের নগ্নীভবন প্রক্রিয়ার একটি অংশ।

ভূপৃষ্ঠের ধীর পরিবর্তনে বিচূর্ণীভবন প্রক্রিয়া মূল ভূমিকা পালন করে থাকে। এ প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পর্যায়ে ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন সাধন হলে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকে একসাথে নগ্নীভবন বলে। আর এ অর্থেই বিচূর্ণীভবনকে নগ্নীভবনের একটি অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

যান্ত্রিক, রাসায়নিক ও জৈবিক প্রক্রিয়ায় ভূপৃষ্ঠের শিলারাশি চূর্ণ-বিচূর্ণ (Disintegration) হয়। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি (Gravitational force) ব্যতীত বিচূর্ণীভবনের সময় শিলারাশির কোনো অপসারণ বা ক্ষয় সাধন হয় না। এ প্রক্রিয়ায় নিচের শিলাস্তর উন্মুক্ত হয় না। সূর্যতাপ, তুষার, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রভৃতি যান্ত্রিক উপাদান; অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রভৃতি রাসায়নিক উপাদান এবং কতিপয় জৈবিক উপাদানের (যেমন– মানুষ, গাছপালা, জীবজন্তু প্রভৃতি) সাহায্যে বিচূর্ণীভবন সংঘটিত হয়। অপরদিকে, নগ্নীভবনে বিচূর্ণীভূত পদার্থসমূহ ক্ষয়সাধনের ফলে নিচের অবিকৃত শিলা দৃষ্টিগোচর বা নগ্ন হয়ে পড়ে। শিলারাশির অপসারণ বা ক্ষয়সাধনের ফলেই নগ্নীভবন দেখা যায়। এ প্রক্রিয়ায় নিচের শিলাস্তর উন্মুক্ত হয়। যান্ত্রিক উপাদান, অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রভৃতি নগ্নীভবন প্রক্রিয়া সূচনা করে মাত্র। এ কারণেই বিচূর্ণীভবন ব্যতীত নগ্নীভবন কখনও সম্ভব নয়।

সুতরাং আলোচনা হতে স্পষ্ট যে, নগ্নীভবন একটি সার্বিক প্রক্রিয়া হলেও এটি বিচূর্ণীভবন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন ঘটায়। অর্থাৎ বিচূর্ণীভবন হলো নগ্নীভবন প্রক্রিয়ার একটি অংশ।

প্রশ্ন ▶ ৫ প্রকৃতির মধ্যে অনেক ক্ষয়কারী শক্তি রয়েছে। এ সকল শক্তি ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন শিলাস্তরকে সর্বদা ক্ষয় করে চলছে। এ সকল প্রাকৃতিক শক্তি কতিপয় যান্ত্রিক, রাসায়নিক ও জৈবিক উপাদানের মাধ্যমে শিলাস্তরকে চূর্ণবিচূর্ণ বা বিশ্লিষ্ট করে। পরিশেষে এই ক্ষয়কারী শক্তিগুলোর বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ফলে নগ্নীভবন সংঘটিত হয়। ◀ *শিখনফল: ৫*

ক. বিচূর্ণীভবন কী? ১
খ. বিচূর্ণীভবন কত প্রকার ও কী কী? ২
গ. বিচূর্ণীভবন ও নগ্নীভবনের তুলনামূলক ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. পরিশেষে এই ক্ষয়কারী শক্তিগুলোর বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ফলে নগ্নীভবন সংঘটিত হয়। উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিলারাশির চূর্ণবিচূর্ণ ও বিশ্লিষ্ট হওয়ার প্রক্রিয়াই বিচূর্ণীভবন।

খ বিচূর্ণীভবন তিন প্রকার।

বিচূর্ণীভবনের প্রকারভেদগুলো হচ্ছে-

i. যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন
ii. রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন
iii. জৈবিক বিচূর্ণীভবন

গ নগ্নীভবন প্রক্রিয়ার একটি অংশ হিসেবে বিচূর্ণীভবন ও নগ্নীভবনে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

শিলারাশির চূর্ণবিচূর্ণ ও বিশ্লিষ্ট হওয়ার প্রক্রিয়াকে বিচূর্ণীভবন বলে। বিচূর্ণীভবনের ফলে ভূত্বকের উপরিস্তরের শিলা ভেঙেচুরে শিথিল হয়ে পড়ে, কিন্তু অপসারিত হয় না। কোনো স্থানের বায়ুর তাপ, বায়ুচাপ, বায়ুপ্রবাহ, বায়ুর আর্দ্রতা প্রভৃতির দৈনন্দিন অবস্থাকে আবহাওয়া বলে এবং এ আবহাওয়ার তারতম্যের জন্য বিচূর্ণীভবন হয় বলে বিচূর্ণীভবনকে আবহবিকারও বলা হয়।

অন্য দিকে, বিচূর্ণীভবনের সময় শিলা চূর্ণবিচূর্ণ ও বিশ্লিষ্ট হয় এবং পরে ক্ষয়ীভবনের দ্বারা এর শিলা অপসারিত হলে নিচের অধিকৃত শিলারাশি নগ্ন হয়ে পড়ে। এরূপ কার্যকে বলা হয় নগ্নীভবন। বিচূর্ণীভবন ও ক্ষয়ীভবনের মিলিত কাজই নগ্নীভবন।

ঘ নগ্নীভবন সমস্ত ভূমিরূপকে ক্ষয় করে সমুদ্র সমতলে নিয়ে আসার কাজে লিপ্ত থাকে এবং ভূত্বকে ক্ষয় সাধনের মাধ্যমে ভূমির উচ্চতা কমায়। তাই সাধারণভাবে বলা যায়, যে প্রক্রিয়ায় ভূপৃষ্ঠের শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় এবং ক্ষয়প্রাপ্ত শিলা অত্যন্ত অপসারিত হয় তাই নগ্নীভবন।

নগ্নীভবন চার ধরনের প্রক্রিয়ায় কাজ করে— i. বিচূর্ণীভবন ii. স্তূপ অপসারণ iii. ক্ষয় সাধন ঘ. পরিবহন।

বিচূর্ণীভবন শিলার ক্ষয়সাধনে প্রথম পর্যায় হিসাবে কাজ করে। বিচূর্ণীভূত শিলা উচ্চ ঢালে অবস্থিত হলে তা অবশ্যই মাধ্যাকর্ষণের টানে নিম্ন ঢালে নেমে আসে। শিলার এ নিম্নঢাল অভিমুখী যাত্রাকে স্তূপ অপসারণ বলে। শিলা ভেঙে চূড়ে আলগা পদার্থ নানাবিধ প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা অপসারিত হলে তাকে ক্ষয়ীভবন বলে। বিচূর্ণীভূত পদার্থসমূহ ক্ষয়সাধিত হয়ে পরিবাহিত হলে নিচের অবিকৃত শিলা দৃষ্টিগোচর বা নগ্ন হয়।

বিচূর্ণীভবন শিলা বায়ু, বৃষ্টিপাত, হিমবাহ, সমুদ্রতরঙ্গ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা অপসারিত হয়। এভাবে বিচূর্ণীভবনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষয়কারী শক্তিগুলো দ্বারা নগ্নীভবন সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন ▶ ৬ নয়ন সপরিবারে সিলেট শহরে বসবাস করে। গ্রামের বাড়িতে কেউ থাকে না। ঈদের ছুটিতে বাড়ি এসে নয়ন দেখে বাড়ির বিভিন্ন স্থানে ইঁদুর গর্ত করে মাটি তুলে রেখেছে।

◀ *শিখনফল: ৫*

ক. ধীর পরিবর্তন কাকে বলে? ১
খ. ধীর পরিবর্তনে কী কী নিয়ামক ভূমিকা রাখে? ২
গ. নয়নের দেখা বিচূর্ণীভবনের ধরনটি তোমার পঠিত পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত বিচূর্ণীভবনে বৃষ্টিপাতের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা ভূমিরূপের পরিবর্তন ধীরে ধীরে সংঘটিত হলে তাকে ধীর পরিবর্তন বলে।

খ ভূপৃষ্ঠে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে যে ব্যাপক পরিবর্তন হয় তাকে ধীর পরিবর্তন বলে।
ধীর পরিবর্তনে যে নিয়ামকগুলো প্রভাব রাখে তা হলো— বায়ু, বৃষ্টি, নদী, হিমবাহ ও সমুদ্রের কার্য ইত্যাদি।

গ নয়নের দেখা বিচূর্ণীভবনের ধরনটি জৈবিক বিচূর্ণীভবনের অন্তর্গত।
মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তু, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষলতাদি প্রতিনিয়ত ভূপৃষ্ঠের ক্ষয়সাধন ও পরিবর্তন সাধন করছে। বিভিন্ন প্রকার জীবজন্তুর মধ্যে কেঁচো, ছুঁচো, পিঁপড়া, শিয়াল, কুকুর, সজারু, ইঁদুর উঁইপোকা জৈবিক বিচূর্ণীভবনে ভূমিকা পালন করে। এরা গর্ত করে ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরের মাটি তুলে ভূত্বক চূর্ণবিচূর্ণ করছে।
উদ্দীপকে নয়ন ঈদের ছুটিতে বাড়ি এসে দেখে বাড়ির বিভিন্ন স্থানে ইঁদুর গর্ত করেছে। এক্ষেত্রে ইঁদুরের কার্যক্রম দ্বারা সংঘটিত হয়েছে জৈবিক বিচূর্ণীভবন। নয়ন এই জৈবিক বিচূর্ণীভবনই দেখেছে।

ঘ জৈবিক বিচূর্ণীভবনে বৃষ্টিপাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তু, বৃক্ষলতা প্রভৃতি দ্বারা প্রতিনিয়ত ভূপৃষ্ঠের ক্ষয়সাধন ও পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। আর এই প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বিচূর্ণীভবন জৈবিক বিচূর্ণীভবন নামে পরিচিত।
জীবজন্তুর দ্বারা মাটি বা শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত বা আলগা হলেও বৃষ্টির পানি শিলাকে বা মাটিকে আরো আলগা ও ক্ষয় করে এবং ক্ষয়প্রাপ্ত শিলাকে অপসারিত করে। জৈবিক বিচূর্ণীভবন ত্বরান্বিত করতেও বৃষ্টিপাত ভূমিকা রাখে। যেমন— বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে মস, শৈবাল থেকে শুরু করে বৃহৎ প্রজাতির বৃক্ষ অভিযোজিত হয়। ফলে সেখানে উদ্ভিদের কার্য দ্বারা ভূপৃষ্ঠের শিলারাশির বিচূর্ণীভবন ঘটে। এভাবে দেখা যায়, ভূপৃষ্ঠের বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চলে উদ্ভিদ ও প্রাণির আধিক্য রয়েছে। ফলে আর্দ্র অঞ্চলে জৈবিক বিচূর্ণীভবন বেশি দেখা যায়। অন্যদিকে শুষ্ক অঞ্চলে যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবনের প্রাধান্যই বেশি, অর্থাৎ বৃষ্টিপাত জৈবিক বিচূর্ণীভবনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোল ও পরিবেশ বিদ্যা বিভাগের শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সফরে চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান গেল। সেখানে গিয়ে দেখল সে অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু এবং ভূগঠন বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে আলাদা। শিক্ষার্থীরা ঐ অঞ্চলের নদী তীরের আকৃতি দেখলেন খাড়া ঢালবিশিষ্ট এবং নদীর পানির স্রোত অনেক বেশি। ঐ অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখে শিক্ষার্থীরা অনেক খুশি। ◀ *শিখনফল: ৭*

ক. জৈবিক বিচূর্ণীভবন কাকে বলে? ১
খ. ভূমিকম্প সৃষ্টির প্রধান একটি কারণ ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চল কোন ভূপ্রকৃতির আওতাভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নদী কোন পর্যায়ের? বিশ্লেষণসহ মতামত দাও। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিলারাশির চূর্ণবিচূর্ণ ও বিশ্লিষ্ট হওয়ার প্রক্রিয়াই বিচূর্ণীভবন।

খ ভূমিকম্প সৃষ্টির একটি প্রধান কারণ হলো ভূপাত (land slide)।
কোনো কারণে পাহাড়-পর্বত হতে বৃহৎ শিলাখণ্ড ভূত্বকের উপর ধসে পড়লে ভূমিকম্প হতে পারে। সাধারণত ভাঁজ পর্বতের (fold mountain) নিকট অধিক ভূমিকম্প হয়। কারণ নবীন ভাঁজ পর্বতের শিলাগুলো পরস্পর দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত না হওয়ায় সহজেই ভূপাত ঘটে এবং ভূমিকম্প হয়। যেমন— চট্টগ্রামের ভূমিকম্প সংঘটন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত অঞ্চলগুলো হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি এবং বান্দরবান জেলা। উক্ত ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলগুলো বাংলাদেশের টারশিয়ারি যুগের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহের অন্তর্ভুক্ত।
এ অঞ্চলের পাহাড়গুলো উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি এবং কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার পূর্বাংশ নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। এ অঞ্চলের পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা ৬১০ মিটার। এ অঞ্চলের পাহাড়গুলো পশ্চিম হতে পূর্বদিকে বেশি উঁচু। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ তাজিনডং (বিজয়) বান্দরবান জেলায় অবস্থিত। এর উচ্চতা ১,২৩১ মিটার। এ অঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে কিওক্রাডং পর্বত অবস্থিত। এর শৃঙ্গের উচ্চতা ১,২৩০ মিটার। এর নিকটে মায়ানমার সীমান্তে অবস্থিত মোদক মুয়ালের উচ্চতা ১,০০৩.৩৩ মিটার।
এ পাহাড়ি এলাকা কাদা, বেলে পাথর ও শ্লেট পাথর দ্বারা গঠিত। এ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে মাতামুহুরী, সাংগু, কর্ণফুলী, কাসালং, হালদা, চিরংগা প্রভৃতি নদী প্রবাহিত হয়েছে। এ অঞ্চল বাঁশ, গজারি, শাল, সেগুন প্রভৃতি বৃক্ষ দ্বারা আবৃত। এখানে রাবার, চা, আনারস প্রভৃতি ভালো জন্মে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত নদী খাড়া ঢালবিশিষ্ট এবং নদীর পানির স্রোত অনেক বেশি। তাই বলা যায় উক্ত অঞ্চলের নদীগুলো পার্বত্য বা প্রথম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।
পার্বত্য অবস্থা নদীর প্রাথমিক পর্যায়। পর্বতের উৎপত্তিস্থল হতে সমভূমিতে পৌঁছানো পর্যন্ত অংশকে নদীর পার্বত্য পর্যায় বা ঊর্ধ্বগতি বলা হয়। পার্বত্য অঞ্চলে ভূমিভাগ ঢালু ও উঁচু-নিচু থাকে। সে জন্য নদী উচ্চ স্থান থেকে পর্বতগাত্র বেয়ে নিচে নামতে থাকে।

এ সময় স্রোতের গতিবেগ ঘণ্টায় ২৪ থেকে ৩২ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। প্রবল স্রোতের আঘাতে ভূত্বক হতে শিলাখণ্ড ভেঙে পড়ে। এগুলো স্রোতের সাথে নিম্নদিকে গড়িয়ে অগ্রসর হতে থাকে। এ অবস্থায় যান্ত্রিক ও রাসায়নিক উভয় প্রকার ক্ষয় হয়ে থাকে। পার্বত্য অবস্থায় নদীর পার্শ্বক্ষয় অপেক্ষা নিম্নক্ষয়ই বেশি হয়ে থাকে। ফলে গিরিখাত, ক্যানিয়ন, খরস্রোত, জলপ্রপাত প্রভৃতির সৃষ্টি হয়।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষার্থীদের দেখা উদ্দীপকে উল্লিখিত নদীগুলো খাড়া ঢালবিশিষ্ট ও পানির স্রোত অধিক হওয়ায় তা পার্বত্য পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ৮ অশোক একবার চন্দ্রনাথ পাহাড়ে বেড়াতে গেল। তার গ্রামের বাড়ি নরসিংদী জেলায়। সে এখানে এসে বিস্মিত হয়ে গেল। তার এলাকার সাথে এখানকার ভূপ্রকৃতির কোনো প্রকার মিল নেই। জীবনযাপন প্রণালিও আলাদা।

◀ শিখনফল: ৭ [অবনীন্দ্রনাথ বৈদ্য; অনু-৩]

ক. ভূপ্রকৃতি কী? ১

খ. চন্দ্রনাথ বাংলাদেশের কোন শ্রেণির ভূপ্রকৃতি? ২

গ. বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি কত প্রকার ও কী কী? ৩

ঘ. অশোকের গ্রামের ভূপ্রকৃতি ও চন্দ্রনাথ পাহাড়ি এলাকার ভূপ্রকৃতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভূ-প্রকৃতি হলো একটি দেশের ভূমিরূপের সার্বিক অবস্থা।

খ চন্দ্রনাথ বাংলাদেশের টারশিয়ারি যুগের ভূপ্রকৃতি।

টারশিয়ারি যুগে সম্ভবত হিমালয় পর্বত উত্থিত হওয়ার সময় এ পাহাড় গঠিত হয়েছিল। এটি আসামের লুসাই ও মায়ানমারের আরাকান পাহাড়ের সমগোত্রীয়। এটি বেলেপাথর, শেল ও কর্দম দ্বারা গঠিত।

গ ভূমির অবস্থা ও গঠন অনুসারে বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতিকে প্রধান ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

i. টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ

ii. প্লাইস্টোসিন যুগের চত্বর বা সোপান এলাকা এবং

iii. নবীন বা সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি।

টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ : টারশিয়ারি যুগে সম্ভবত হিমালয় পর্বত উত্থিত হওয়ার সময় এ পাহাড়গুলো গঠিত হয়েছিল। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণ-পূর্বাংশ, সিলেট জেলার উত্তরাংশ এ অঞ্চলের অন্তর্গত। সমগ্র পার্বত্য এলাকার আয়তন প্রায় ১৮০০০ বর্গকিলোমিটার।

প্লাইস্টোসিন যুগের চত্বর বা সোপান এলাকা : বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাংশের সুবিশাল বরেন্দ্রভূমি, মধ্যভাগের মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং কুমিল্লা জেলার লালমাই উচ্চভূমি এ অঞ্চলের অন্তর্গত। সাধারণত বরফ যুগের পরোক্ষ প্রভাবের ফলে সোপান ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়েছিল। এ অঞ্চলের মোট আয়তন ১৩, ৪৬৬ বর্গকিলোমিটার।

সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি : টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ এবং প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ বাদে সমগ্র বাংলাদেশ সাম্প্রতিক কালের প্লাবন সমভূমির অন্তর্গত। পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা প্রভৃতি নদ-নদীর অসংখ্য উপনদী ও শাখানদীর বাহিত পলিমাটি দ্বারা প্লাবন সমভূমি অঞ্চল গঠিত। এ অঞ্চলের আয়তন ১২৪২৬৬ বর্গকিলোমিটার।

ঘ অশোকের গ্রাম নরসিংদী জেলায়, যা সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমির অন্তর্গত এবং চন্দ্রনাথ পাহাড়ি এলাকা টারশিয়ারি যুগের অন্তর্গত।

পদ্মা, মেঘনা, যমুনা নদী ও ব্রহ্মপুত্র নদের শাখা-উপশাখার বাহিত পলল দ্বারা সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি অঞ্চল গঠিত হয়েছে। এ এলাকাতে বিচ্ছিন্নভাবে বিল, ঝিল ও হাওর লক্ষ করা যায়। এ অঞ্চলের মাটি উর্বর। তাই এ অঞ্চল কৃষি সমৃদ্ধ। এখানে ধান ও পাট বেশি উৎপন্ন হয়। এ অঞ্চল মৎস্য সম্পদেও সমৃদ্ধশালী। এ অঞ্চলের দক্ষিণ পশ্চিমে প্রায় সমুদ্র সমতলে অবস্থিত সুন্দরবন। এখানকার মাটির স্তর খুবই গভীর এবং ভূমি খুব উর্বর। প্রতি বছর বন্যা বাহিত পলল দ্বারা এখানে নতুন ভূমিরূপ গঠিত হচ্ছে।

অপরদিকে, টারশিয়ারি যুগে সম্ভবত হিমালয় পর্বত উত্থিত হওয়ার সময় পাহাড়গুলো গঠিত হয়েছে। এ এলাকার পাহাড়গুলো বেলে পাথর, শ্লেট ও কাদার সমন্বয়ে গঠিত। দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহের স্থানীয় অধিবাসীগণ জুম পদ্ধতিতে চাষ করে। এখানে চা, আনারস, ধান প্রভৃতি জন্মে। পাহাড়ের গায়ে রাবার ও তুলা চাষ হয়। আবার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। পাহাড়ের ঢালে প্রচুর চা উৎপন্ন হয়।

মূলত টারশিয়ারি পাহাড় ও সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি ভূমিরূপগত, উৎপত্তিগত ও ব্যবহারিক সবদিক থেকেই পৃথক। এ ভিন্নতা বাংলাদেশের ভূমিরূপকে বৈচিত্র্য দিয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৯ যতীন পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাস করে। তার বাড়ির পাশের পাহাড় থেকে একটি নদী নেমে এসেছে। নদীর পানির সাথে প্রচুর নুড়ি, কাঁকর, বালি বাহিত হয়। ফলে পাহাড়ের পাদদেশে কিছু ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়েছে। *◀ শিখনফল: ৮*

ক. নদীগর্ভ কী? ১

খ. প্লাবন সমভূমি কীভাবে গঠিত হয়? ২

গ. যতীনের বাড়ির পাশের নদীটি কোন পর্যায়ের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে ধরনের ভূমিরূপ সৃষ্টি হয় তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নদী উপত্যকার তলদেশই নদীগর্ভ।

খ বর্ষাকালে পানি বৃদ্ধি পেয়ে যখন নদীর উভয় কূল প্লাবিত হয়ে প্রবাহিত হয় তখন তাকে প্লাবন বা বন্যা বলে। এর ফলে নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ডুবে যায়।

বন্যার পানি নেমে গেলে এ ভূমিতে খুব পুরু স্তরের কাদা, পলি প্রভৃতি দেখা যায়। এভাবে ক্রমান্বয়ে বহু বছরের ব্যবধানে এক বিস্তৃত ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়; যা প্লাবন সমভূমি নামে পরিচিত। যেমন– বাংলাদেশের সমভূমি (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, চাঁদপুর প্রভৃতি জেলা)।

গ যতীনের বাড়ির পাশের নদীটি ঊর্ধ্বগতি পর্যায়ের।
পর্বতের যে স্থান থেকে নদীর উৎপত্তি হয় সেখান থেকে সমভূমিতে পৌঁছানো পর্যন্ত অংশকে নদীর ঊর্ধ্বগতি বলে।
ঊর্ধ্বগতি অবস্থায় নদীর স্রোতের বেগ খুবই প্রবল হয়। এ অবস্থায় নদী প্রবাহ তলদেশকে ক্ষয় এবং ক্ষয়ীভূত পদার্থ (eroded materials) পরিবহন করে। অনেক সময় নদীর ঢাল (slope) হঠাৎ কমে গেলে পাথরের টুকরা, কাঁকর, বালি ইত্যাদি নদী বহন করতে না পেরে সঞ্চয় করে।
সুতরাং বলা যায়, যতীনের বাড়ির পাশের নদীটি ঊর্ধ্বগতি পর্যায়ের।

ঘ নদী যখন কোনো পাহাড় থেকে উৎপত্তি লাভ করে নিচের দিকে নামতে থাকে তখন এর স্রোতের সাথে প্রচুর পরিমাণ নুড়ি, কাঁকর, বালি ইত্যাদি পরিবাহিত হয়। এসব পরিবাহিত পদার্থ (transported materials) পাহাড়ের পাদদেশে জমা হয়ে বিভিন্ন ভূমিরূপ গঠন করে। যেমন– পলল পাখা বা পলল কোণ এবং পাদদেশীয় পলল সমভূমি।

পলল কোণ বা পলল পাখা : পার্বত্য অঞ্চল থেকে হঠাৎ করে কোনো নদী যখন সমভূমিতে পতিত হয়, তখন শিলাচূর্ণ, পলিমাটি প্রভৃতি পাহাড়ের পাদদেশে সমভূমিতে সঞ্চিত হয়ে পলল কোণ বা পলল পাখার ন্যায় ভূমিরূপ সৃষ্টি করে। যেমন : আফ্রিকার কঙ্গো নদী সৃষ্ট ভূমিরূপ।

পাদদেশীয় পলল সমভূমি : পার্বত্য পর্যায়ে নদী পলি সঞ্চয় করতে করতে পাহাড়ের পাদদেশে বিশাল সমভূমি গড়ে তুললে তাকে পাদদেশীয় পলল সমভূমি বলে। যেমন : বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার সমভূমি।

প্রশ্ন ▶ ১০

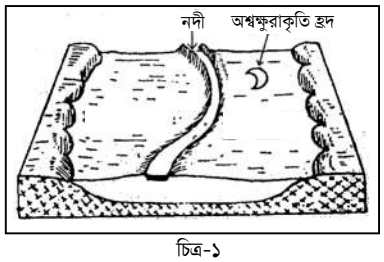

চিত্র-১

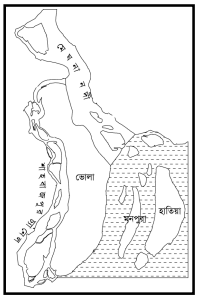

চিত্র-২

◀ *শিখনফল: ৮*

ক. পলল কোণ (Alluvial cone) কী? ১
খ. পাদদেশীয় পলল সমভূমি বলতে কী বোঝ ব্যাখ্যা করো। ২
গ. চিত্র-১ এর ভূমিরূপটি কীভাবে সৃষ্টি হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. চিত্র-২ এর ভূমিরূপটি গঠনে নদীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পার্বত্য অঞ্চলের খাড়া ঢাল বেয়ে নদী সমভূমিতে পতিত হলে নদীবাহিত পলি, বালি, কাঁকর প্রভৃতি পাহাড়ের পাদদেশে সঞ্চিত হয়ে কোণ সদৃশ যে ভূমিরূপের সৃষ্টি করে তাই পলল কোণ। কাশ্মীর, হিমালয়ের জাসকার, দ্রাগ নদীতে সৃষ্ট ভূমিরূপ এর উদাহরণ।

খ পার্বত্য এলাকায় নদীর উচ্চ গতিতে ক্ষয়প্রাপ্ত শিলাচূর্ণ, বালুকণা, পলি প্রভৃতি পাহাড়ের খাড়া ঢালের নিচে সঞ্চিত হয়। এভাবে পাহাড়ের পাদদেশে বিস্তৃত যে ভূমিরূপের সৃষ্টি হয় তাকে পাদদেশীয় পলল সমভূমি (Piedmont alluvial plain) বলে।
বাংলাদেশের রংপুর ও দিনাজপুর জেলার অধিকাংশ স্থানই পাদদেশীয় পলল সমভূমির অন্তর্গত।

গ চিত্র-১ এর ভূমিরূপটি হলো প্লাবন সমভূমি (Flood plain)।
বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে নদীর দুকূল উপচে বন্যার সৃষ্টি করে। বন্যা শেষে বন্যাকবলিত এলাকায় পলির স্তর সঞ্চিত হয়। এভাবে বহুকাল অতীত হলে এক বিস্তৃত সমভূমির সৃষ্টি হয়। একে প্লাবন সমভূমি বলে।
নদীর মধ্য ও নিম্নগতিতে নদীখাত কিছুটা অগভীর থাকে। তাছাড়া নুড়ি, কাঁকর, বালু, কর্দম, পলি প্রভৃতি সঞ্চিত হয়ে নদীখাত আরও অগভীর হয়। ফলে নদীর পানিপ্রবাহ বৃদ্ধি পেলে (যেমন: বন্যার সময়) উহা নদীর দু'কূল প্লাবিত করে। ফলে উভয় কূলে প্রচুর পলি সঞ্চিত হয়। এভাবে কালক্রমে এক বিস্তীর্ণ সমভূমির সৃষ্টি হয়। এটিই প্লাবন সমভূমি। যেমন: গঙ্গা, পদ্মা, নীল, ইয়াংসিকিয়াং প্রভৃতি নদীর মোহনায় এই ধরনের ভূমিরূপ দেখা যায়।

ঘ চিত্র-২ এর ভূমিরূপটি হলো একটি বদ্বীপ (Delta)।
বদ্বীপ নদীবাহিত পলি দ্বারা সৃষ্ট একটি বিশেষ ভূমিরূপ। নদীর বার্ধক্য অবস্থায় (old stage) পলি সঞ্চিত হয়ে বদ্বীপ সমভূমির সৃষ্টি হয়।
নদী যখন মোহনার কাছাকাছি আসে তখন স্রোতের বেগ কমে যায়। ফলে নদী পলি বহনের ক্ষমতা একেবারেই হারিয়ে ফেলে। এসময় নদীবাহিত বালুকণা, পলি, শিলাচূর্ণ প্রভৃতি হালকা পদার্থগুলো নদীর মোহনায় সঞ্চিত হতে থাকে। বহু বছরের ব্যবধানে এসব তলানি নদীর মুখে সঞ্চিত হয়ে উঁচু হয়ে ওঠে। ফলে নদীর মুখে পানির উচ্চতা বেড়ে যায়। এসময় নদী বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়। পুনরায় তাদের মুখে পলি সঞ্চয়ের ফলে নতুন ভূখণ্ডের সৃষ্টি হয়। এরূপে গঠিত ভূখণ্ডের দুই পাশে নদীস্রোত বেশি হওয়ায় দুই পাশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। স্বাভাবিকভাবে এটি ত্রিকোণাকার আকৃতি ধারণ করে। এজন্য একে বদ্বীপ বা Delta বলে। এটি দেখতে মাত্রাহীন বাংলা 'ব'-এর মতো এবং গ্রিক শব্দ ডেল্টার 'Δ'-মতো।
হুগলি থেকে পূর্ব দিকে মেঘনা নদীর সীমানা পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সমগ্র দক্ষিণাংশ গঙ্গা ও পদ্মা নদীর বিখ্যাত বদ্বীপ অঞ্চল।

প্রশ্ন ▶ ১১

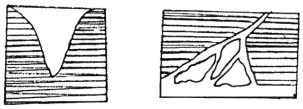

◀ *শিখনফল: ৮ [নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী]*

ক. একটি আগ্নেয় পর্বতের নাম লিখ। ১

খ. প্রশান্ত মহাসাগরকে আগ্নেয় মেখলা বলা হয় কেন? ২

গ. চিত্র 'ক' তে প্রদর্শিত ভূমিরূপটি নদীর যে ধরনের কাজের ফলে সৃষ্ট, তা সংঘটনের প্রক্রিয়াসমূহ বর্ণনা কর। ৩

ঘ. চিত্র 'ক' ও চিত্র 'খ' তে প্রদর্শিত ভূমিরূপদ্বয়ের মধ্যে উৎপত্তি ও গঠনগত পার্থক্য নিরূপণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি আগ্নেয় পর্বতের নাম হলো জাপানের ফুজিয়ামা।

খ পৃথিবীতে অধিকাংশ আগ্নেয়গিরি মহাদেশের উপকূলে অবস্থিত। যেখানে আগ্নেয়গিরিগুলো সজ্জিত আছে তাকে আগ্নেয়গিরি বলয় বলে। পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় বলয়ে ৩০৪টি প্রধান আগ্নেয়গিরি রয়েছে। এসব আগ্নেয়গিরি প্রশান্ত মহাসাগরকে ঘিরে রেখেছে বলে এই আগ্নেয় বলয়কে প্রশান্ত মহাসাগরীয় আগ্নেয় মেখলা বলা হয়।

গ চিত্র 'ক' তে প্রদর্শিত ভূমিরূপটি নদীর 'V' আকৃতির উপত্যকা। এটি নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্ট।

পার্বত্য অবস্থায় নদীর সঞ্চয়ক্রিয়া অপেক্ষা ক্ষয়ক্রিয়াই অধিক, ফলে এ সময় নদীর উপত্যকা গঠিত হতে থাকে। পর্বত হতে প্রবলবেগে নেমে আসার সময় নদীর প্রবল স্রোত বড় বড় শিলাখণ্ড বহন করে নিম্নদিকে অগ্রসর হয়। সাধারণত পর্বতসমূহ কঠিন শিলা দ্বারা গঠিত, কিন্তু মাঝে মাঝে নরম শিলাও থাকে। নদীখাতের পার্শ্ব অপেক্ষা নিম্নদিকের শিলা বেশি কোমল হলে পার্শ্বক্ষয় অপেক্ষা উল্লম্ব ক্ষয় বেশি হয়। এরূপে ক্ষয় পেতে পেতে নদী উপত্যকা অনেকটা ইংরেজি 'ভি' (V) অক্ষরের ন্যায় হয়। যেমন– সাংগু নদীর উপত্যকা।

ঘ চিত্র 'ক' ও 'খ' তে যথাক্রমে 'V' আকৃতির উপত্যকা ও বদ্বীপ ভূমিরূপ দেখানো হয়েছে।

এ ভূমিরূপ দুটির উৎপত্তি ও গঠনগত পার্থক্য ব্যাখ্যা করা হলো–

i. পর্বত থেকে দ্রুত গতিতে নামার সময় নদীর প্রবল স্রোত বড় বড় শিলাখণ্ড বহন করে নিম্নদিকে অগ্রসর হয়। ফলে নদীর পার্শ্বক্ষয় অপেক্ষা উল্লম্ব ক্ষয় বেশি হয়। এভাবে ক্রমশ ক্ষয়ের ফলে নদী উপত্যকা অনেকটা ইংরেজি 'V' আকৃতির হয়। একে 'ভি' আকৃতির উপত্যকা বলা হয়। যেমন– কর্ণফুলি নদীর উপত্যকা।

নদীর নিম্নগতিতে স্রোতের বেগ খুব কমে যায় এবং নদীর পানির সাথে মিশ্রিত শিলাচূর্ণ, বালি, কাদা প্রভৃতি তলানিরূপে সঞ্চিত হতে থাকে। নদীর মোহনায় সমুদ্রের লবণ মিশ্রিত পানি এ তলানি পড়তে বিশেষভাবে সাহায্য করে। নদী যদি কোনো কম স্রোতবিশিষ্ট বা স্রোতহীন সমুদ্রে পড়ে, তাহলে ঐ সমস্ত তলানি নদীর মুখে জমতে জমতে নদীর মুখ প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এবং কালক্রমে ঐ চরাভূমি সমুদ্রে পানির ওপর উঁচু হয়ে উঠে। তখন নদী বিভিন্ন শাখায় ঐ চরাভূমিকে বেষ্টন করে সমুদ্রে পতিত হয়। নদী মোহনাস্থিত ত্রিকোণাকার এ নতুন ভূমিকে ব-দ্বীপ বলা হয়। যেমন– নীল নদের মোহনায় গঠিত বদ্বীপ।

ii. 'v' আকৃতির উপত্যকা পার্বত্য অবস্থায় নদীর ক্ষয়ক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট হয়। আবার বদ্বীপ নিম্নগতিতে নদীর সঞ্চয়কার্যের ফলে সৃষ্টি হয়।

iii. নদীখাতে পার্শ্ব অপেক্ষা নিম্নদিকের শিলা বেশি কোমল হলে পার্শ্বক্ষয় অপেক্ষা উল্লম্ব ক্ষয় বেশি হয়। এরূপ ক্রমশ ক্ষয় পেতে পেতে 'V' আকৃতির নদী উপত্যকা গঠিত হয়। আবার, নদীর মোহনার কাছাকাছি স্রোতের বেগ কম থাকায় কালি, কাদা, নুড়ি তলানিরূপে সঞ্চিত হয়ে বদ্বীপ সমভূমি গঠিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ১২ কেরামত একজন কৃষক। সে যমুনা পাড়ে বসবাস করত। এ বছর বর্ষার সময় নদীভাঙনের জন্য সে ফসল, ঘরবাড়ি সব হারিয়ে আশ্রয় নিয়েছে সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে। তার গ্রামের আরও অনেকের অবস্থা তার মতো।

◀ *শিখনফল: ৮ [অবনীন্দ্রনাথ বৈদ্য; অনু-২]*

ক. নদীভাঙন কী? ১

খ. নদীভাঙনের কয়েকটি কারণ উল্লেখ করো। ২

গ. যমুনা নদীভাঙনের কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নদীভাঙনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তুমি কী কী সুপারিশ করতে পারো? ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পানিতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় (নদীর তীব্র স্রোতের আঘাতে) নদীপাড় নদীগর্ভে বিলীন হওয়াই নদীভাঙন।

খ নদীভাঙন বহুবিধ কারণে সংঘটিত হতে পারে।

বন্যা, যথেচ্ছ ভূমি ব্যবহার, নদী ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি, অববাহিকাতে (নদী তীরবর্তী ভূমি) অতিরিক্ত বৃক্ষ কর্তন, নদী-খাত থেকে অপরিকল্পিত বালু ও পাথর উত্তোলন প্রভৃতি নদীভাঙনের অন্যতম কারণ।

গ নদী ভাঙন একটি মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। আমাদের দেশে প্রতিবছর বর্ষাকালে যমুনাসহ বিভিন্ন নদীতে ভাঙন দেখা যায়।

যমুনার উৎপত্তি তিব্বতের মানস সরোবরে। বর্ষা মৌসুমে ঐ সরোবর থেকে প্রচুর পানির সরবরাহ ঘটে। ফলে এ নদীতে অধিক পানি প্রবাহিত হয় এবং অতিরিক্ত পানির চাপ তীরবর্তী অঞ্চলে ভাঙনের সৃষ্টি করে। এছাড়া যমুনা বিনুনি সদৃশ (braided

pattern) নদী। তাই এর নাব্যতা কম এবং অনেক স্থানে চর জেগে উঠেছে, যা নদীর প্রবাহে বিঘ্ন ঘটায়। উপরন্তু এ নদীর তীরবর্তী অঞ্চল কিছুটা খাড়া ঢালবিশিষ্ট (steepe slope) হওয়ায় ভাঙন প্রবণ।

ঘ নদী ভাঙনের ফলে অনেক ঘর বাড়ি ও ফসলের জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। মূলত এটি বাংলাদেশের জন্য এক ভয়ানক প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যা প্রতিরোধে সবারই কর্তব্য রয়েছে।

নদীভাঙনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমার সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ–

নদীভাঙন প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ–

i. নদীর উৎস স্থলে পানি সরবরাহে বিঘ্ন ঘটানো যাবে না;
ii. নদীর পানির প্রবাহ যাতে স্বাভাবিক থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে;
iii. নদীর নাব্যতা রক্ষা করতে হবে;
iv. নদী শাসনের জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা ও গবেষণা;
v. পানির সুষ্ঠু নিষ্কাশন ব্যবস্থা করতে হবে;
vi. নদী উপকূলবর্তী এলাকাগুলোতে প্রচুর বৃক্ষরোপণ; এবং
vii. নদী উপত্যকা থেকে অপরিকল্পিত এবং অতিমাত্রায় বালু ও পাথর উত্তোলন বন্ধ করতে হবে।

উল্লিখিত পদক্ষেপগুলো যথাযথভাবে গ্রহণের মাধ্যমে নদীভাঙন রোধ অনেকাংশেই সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ১৩ সবুজের গ্রামের বাড়ির মাটি খুব উর্বর। গ্রামের পাশে বয়ে গেছে আঁকাবাঁকা নদী। ক্ষেতে প্রচুর ফসল ফলে। গরমের ছুটিতে চাচার বাড়ি বেড়াতে গিয়ে দেখতে পেল মাটি লাল ও কংকরময়। সেখানে আনারস, কাঁঠাল ও নানা রকম সবজি চাষ হয়। *◀ শিখনফল: ৮ [অধ্যাপক মো. আবদুল কুদ্দুস; অনু-১]*

ক. পর্বত কী? ১
খ. নদীর কোন পর্যায়ে ক্ষয়কার্য বেশি হয় বর্ণনা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সবুজের চাচার বাড়ির মাটি যে যুগে গঠিত তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত স্থান দুটির ভূমিরূপের ভিন্নতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৃথিবীর উপরিভাগে অবস্থিত বহু উঁচু (> ১০০ মিটার) এবং বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত শিলাস্তূপকে পর্বত বলে। যেমন– উত্তর আমেরিকার রকি পর্বতমালা।

খ পার্বত্য বা ঊর্ধ্বগতি পর্যায়ে নদীর ক্ষয়কার্য বেশি হয়। একে নদীর প্রাথমিক অবস্থা হিসেবে অভিহিত করা হয়।

পার্বত্য অঞ্চলের ভূভাগ ঢালু ও বন্ধুর। সুতরাং নদী উঁচু স্থান থেকে পর্বতের ঢাল বেয়ে প্রবল গতিতে নিচে নেমে আসে। এ কারণে পার্বত্য অঞ্চলে ক্ষয়সাধনই নদীর প্রধান কাজ।

গ সবুজের চাচার বাড়ির এলাকার মাটি লাল ও কংকরময়। সেখানে আনারস, কাঁঠাল ও নানারকম সবজি চাষ হয়। সুতরাং স্থানটি মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

প্লাইস্টোসিন যুগের প্রায় অর্ধ মিলিয়ন (৫ লক্ষ) বছর পূর্বে। অন্তঃবরফগলা পানিতে প্লাবনের সৃষ্টি হয়ে এসব উচ্চভূমি গঠিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। ফলে অন্যান্য অঞ্চলের মাটি থেকে একে সহজেই পৃথক করা যায়। মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় সে যুগে গঠিত দ্বিতীয় বৃহত্তম উচ্চভূমি। বরেন্দ্র ভূমি আরও উঁচু। উল্লেখ্য, বরেন্দ্রভূমির মতো এখানকার মাটি লাল ও কংকরময় বলে কৃষিকাজের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নয়।

ঘ সবুজের গ্রামের বাড়ির এলাকার মাটি খুব উর্বর। গ্রামের পাশে বয়ে গেছে আঁকাবাঁকা নদী। ক্ষেতে প্রচুর ফসল জন্মে। এ থেকে বোঝা যায়, অঞ্চলটি সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমির অন্তর্গত। আর সবুজের চাচার বাড়ি মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা ও উত্তরে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়ে বেষ্টিত। এলাকাটি ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও গাজীপুর জেলায় বিস্তৃত। এ এলাকার আয়তন ৪,১০৮ বর্গকিলোমিটার। প্লাবন সমভূমি হতে এর গড় উচ্চতা প্রায় ৬ হতে ৩০ মিটার। এ এলাকার মাটি লাল ও কংকরময়। এ চত্বর এলাকার মধ্য দিয়ে বংশী, লক্ষ্যা, বানার, বালু, মুহুরী, সুতিয়া, তুরাগ, লৌহজং প্রভৃতি নদী প্রবাহিত।

টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ এবং প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ বাদে সমগ্র বাংলাদেশ সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমির অন্তর্গত। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা এবং এদের শাখা ও উপনদীর বাহিত পলল দ্বারা এ অঞ্চল গঠিত হয়েছে। প্রতিবছর বন্যা পরবর্তী সময়ে পলল দ্বারা এখানে নতুন ভূমিরূপ গঠিত হচ্ছে। এ অঞ্চলের আয়তন ১,২৪,২৬৬ বর্গকিলোমিটার। এ এলাকাতে বিল, ঝিল, হাওর লক্ষ করা যায়। এ অঞ্চলের মাটি উর্বর। তাই এ অঞ্চল কৃষিসমৃদ্ধ। এ অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় সমুদ্র সমতলে অবস্থিত সুন্দরবন। এখানকার মাটির স্তর খুবই গভীর এবং ভূমি খুব উর্বর।

প্রশ্ন ▶ ১৪

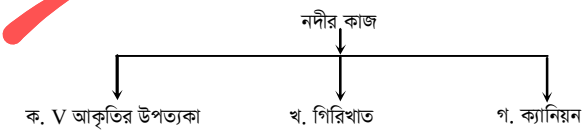

◀ শিখনফল: ৮ [অধ্যাপক মো: আবদুল কুদ্দুস; অনু-২]

ক. নদীর গতিপথ কত প্রকার? সেগুলোর নাম লিখো। ১
খ. 'U' আকৃতির উপত্যকা বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'ক' চিহ্নিত উপত্যকা চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. নদীর কোন কাজের ফলে 'খ' ও 'গ' সৃষ্টি হয় বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নদীর গতিপথ তিন প্রকার। যথা: ঊর্ধ্ব, মধ্য এবং নিম্নগতি।

খ নদীর মধ্যগতিতে অর্থাৎ সমভূমি অবস্থায় উপত্যকা 'U' আকৃতির হয়।

মধ্য গতিতে নদীর স্রোত ও বাহিত শিলারাশি দ্বারা উল্লম্ব ক্ষয় অপেক্ষা পার্শ্বক্ষয় বেশি হয়। ফলে নদী উপত্যকা ক্রমশ প্রশস্ত হয়ে কোনো কোনো স্থানে ইংরেজি 'U' বা চ্যাপ্টা প্রশস্ত থালার ন্যায় আকৃতি ধারণ করে। তখন একে 'U' আকৃতির উপত্যকা বলে। যেমন– মেঘনা নদী উপত্যকা।

গ 'ক' চিহ্নিত উপত্যকা হলো 'V' আকৃতির উপত্যকা। যেমন– সিন্ধুনদের উপত্যকা।

নদী প্রাথমিক অবস্থায় প্রবল স্রোতে বড় বড় শিলাখণ্ড বহন করে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিচের দিকে প্রবাহিত হয়। এ সময় নদীর স্রোত ও বাহিত শিলার ঘর্ষণে নদীগর্ভের শিলার দ্রুত ক্ষয়সাধন ঘটে।

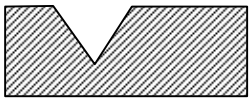

চিত্র : V আকৃতির উপত্যকা

পার্বত্য অবস্থায় নদীর পার্শ্বক্ষয় অপেক্ষা উল্লম্ব ক্ষয় অধিক হয় বলে নদীগর্ভ ইংরেজি 'V' অক্ষরের ন্যায় আকৃতি লাভ করে। এ জাতীয় ভূমিরূপকে 'V' আকৃতির উপত্যকা বলে। পার্বত্য চট্টগ্রামের কর্ণফুলি নদীতে এরূপ উপত্যকা দেখা যায়।

ঘ 'খ' ও 'গ' ভূমিরূপ দুইটি হলো গিরিখাত ও ক্যানিয়ন। নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে ভূমিরূপ দুইটি সৃষ্টি হয়।

গিরিখাত: নদী সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থায় পাহাড়ি ঢালে প্রবল স্রোত এবং বাহিত শিলারাশির আঘাতে নদী উপত্যকা যথেষ্ট গভীর এবং উভয় পার্শ্ব খুব খাড়া হলে তাকে গিরিখাত বলে। নদীর নিম্নক্ষয়ের তুলনায় পার্শ্বক্ষয় কম হলে গিরিখাতের সৃষ্টি হয়। যেমন– সিন্ধু নদের গিরিখাত ৫১৮ মিটার গভীর।

ক্যানিয়ন: পার্বত্য অঞ্চলের হিমবাহ বা বরফগলা পানিতে পরিপূর্ণ কোনো নদী যখন শুষ্ক অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন ঐ অঞ্চলে কোমল শিলাস্তর থাকলে যে গভীর ও সংকীর্ণ গিরিখাতের সৃষ্টি হয় তাকে ক্যানিয়ন বলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো নদীর গিরিখাত গ্রান্ড ক্যানিয়ন সৌন্দর্য ও গভীরতার জন্য বিখ্যাত। এটি ১৩৭-১৫৭ মিটার প্রশস্ত, প্রায় ২.৪ কিলোমিটার গভীর ও ৪৮২ কিলোমিটার দীর্ঘ।

প্রশ্ন ▶ ১৫

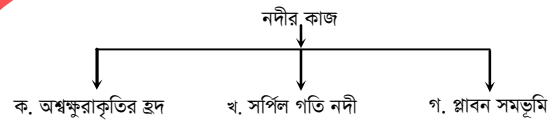

ক. পৃথিবীর গভীরতম গিরিখাতটির নাম কী? ১

খ. জলপ্রপাত কাকে বলে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ক ও গ চিহ্নিত ভূমিরূপ গঠনের কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের অধিকাংশ নদীকে খ চিহ্নিত গতি নদী বলা হয় কেন? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৃথিবীর গভীরতম গিরিখাতটির নাম হলো গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন।

খ ঊর্ধ্বগতি অবস্থায় নদীর পানি যদি পর্যায়ক্রমে কঠিন ও নরম শিলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তাহলে কোমল শিলাস্তরটিকে বেশি পরিমাণে ক্ষয় করে ফেলে। এর ফলে নরম শিলাস্তরের তুলনায় কঠিন শিলাস্তর অনেক উপরে অবস্থান করে এবং পানি খাড়াভাবে নিচের দিকে পড়তে থাকে। এরূপ পানির পতনকে জলপ্রপাত বলে। উত্তর আমেরিকার সেন্ট লরেন্স নদীর বিখ্যাত নায়াগ্রা জলপ্রপাত এরূপে গঠিত হয়েছে।

গ 'ক' চিহ্নিত ভূমিরূপটি হলো অশ্বক্ষুরাকৃতির হ্রদ এবং 'গ' চিহ্নিত ভূমিরূপটি হলো প্লাবন সমভূমি। নিম্নে ভূমিরূপ দুটি গঠনের কারণ ব্যাখ্যা করা হলো:

প্লাবন সমভূমি: বর্ষাকালে পানি বৃদ্ধির কারণে নদীর উভয়কুল প্লাবিত হলে তখন তাকে প্লাবন বা বন্যা বলে। বন্যা শেষে নদীর দুপাশের ভূমিতে খুব পুরু স্তর কাদা, পলি দেখতে পাওয়া যায়। এভাবে অনেকদিন পলি জমতে জমতে যে বিস্তৃত সমভূমির সৃষ্টি হয় তাকে প্লাবন সমভূমি বলে। নদীর সঞ্চয় কাজের ফলে প্লাবন সমভূমিতে অনেক প্রকার ভূমিরূপ গঠিত হয়। বাংলাদেশ প্লাবন সমভূমির একটি আদর্শ উদাহরণ।

অশ্বক্ষুরাকৃতির হ্রদ: অনেক সময় নদীর বাঁক ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হতে হতে মূল নদী থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং নদী বাঁকের পথ মধ্যগতিতে পরিহার করে সোজা পথে প্রবাহিত হতে থাকে। বালি ও পলি সঞ্চিত হয়ে বাঁকের উভয় মুখ নদী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। তখন উহা একটি বন্ধ জলাশয়ে বা হ্রদে পরিণত হয়। এরূপ হ্রদের আকৃতি ঘোড়ার ক্ষুরের মতো দেখা যায় বলে একে অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ বলে। বাংলাদেশের পদ্মা নদীতে অসংখ্য অশ্বক্ষুরাকৃতির হ্রদ দেখা যায়। তাছাড়া রাইন ও মিসিসিপি নদীতে এরূপ হ্রদ দেখা যায়।

ঘ 'খ' চিহ্নিত নদী হলো সর্পিল গতি নদী।

সমভূমি অঞ্চলে নদীর স্রোতের বেগ কম হয়ে যায়। তখন গতিপথে কঠিন শিলাযুক্ত ভূমি ভাগে বাধাগ্রস্ত হলে নদী তার গতিময় পথ পরিবর্তন করে। এরূপ প্রবাহে পুনঃপুনঃ গতিপথ পরিবর্তন করার ফলে নদীর গতিপথ আঁকাবাঁকা বা সর্পিল আকার ধারণ করে।

বাংলাদেশের অধিকাংশ নদী সমতল ভূমিতে প্রবাহিত। প্লাবন সমভূমির ভূ-প্রকৃতির কারণে এ দেশে আঁকাবাঁকা নদীর সৃষ্টি হয়েছে। নদীতে অধিক বাঁক সৃষ্টির কারণে নদীর দৈর্ঘ্যও বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশের বেশিরভাগ নদীর গতিপথ এভাবে সর্পিলাকারে সৃষ্টি হয়েছে। এ জন্যে বাংলাদেশের অধিকাংশ নদীকে সর্পিল গতির নদী বলা হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৬ রহিম মিয়া একজন জেলে। গত বছর তিনি নদী ভাঙনের শিকার হন। বসতভিটা হারিয়ে তিনি কাজের সন্ধানে ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে ঢাকা চলে আসেন।

◀ শিখনফল: ৭ ও ৮ [মোহাম্মদ আরিফুর রহমান, জনু-২]

ক. সুনামি কী? ১

খ. বিচূর্ণীভবন কী কী প্রক্রিয়ায় কাজ করে? ২

গ. রহিম মিয়ার ঢাকা চলে আসার যে কারণটি উল্লেখ করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাটির প্রভাব সম্পর্কে তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমুদ্রতলে ভূআলোড়নের ফলে সমুদ্রের পানিতে যে তীব্র ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়, যা উপকূলে আঘাত হানে তাই সুনামি।

খ বিচূর্ণীভবন অর্থ শিলার চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া। এটি নগ্নীভবনের (denudation) একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে (যেমন– বায়ুপ্রবাহ, নদীর স্রোত) শিলারাশি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে মূল শিলার উপর থেকে সরে যাওয়াকে বিচূর্ণীভবন বলা হয়। বিচূর্ণীভবন তিন প্রক্রিয়ায় কাজ করে যথা: যান্ত্রিক (মরু অঞ্চলে শিলার ভাঙন), রাসায়নিক (আর্দ্র অঞ্চলে শিলার দ্রবণ) ও জৈবিক (মাটিতে উদ্ভিদের শিকড়ের প্রবেশ)।

গ রহিম মিয়ার ঢাকায় চলে আসার মূল কারণটি হলো নদীভাঙন।

প্রতিবছর বাংলাদেশে প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে (উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম) নদী ভাঙন দেখা যায়। সাধারণত ভূমির স্থিতিস্থাপকতা (নদীর পাড়ের মাটির সংবদ্ধতা বা দৃঢ়তা) কমে গেলে নদী ভাঙন হয়। দৃশ্যত দুর্যোগটি প্রাকৃতিক হলেও বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট নিয়ামক (factors) এর জন্য দায়ী। যেমন: ভূমিক্ষয়, বন্যা, অতিবৃষ্টি, নগরায়ণ, বৃক্ষ কর্তন, বসতভিটা স্থাপন, ভূমিতে মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার, নদীর আঁকাবাঁকা গতি, জলবায়ুর পরিবর্তন, নদীর তীব্র স্রোত, তলদেশে পলি সঞ্চয়ন, নদীর তীরবর্তী এলাকায় মৃত্তিকার কোমলতা, গাছপালাহীন নদীকূল এবং বৃক্ষনিধন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাটি হলো নদী ভাঙন।

নদী ভাঙন আমাদের দেশে একটি পরিচিত দুর্যোগ। বাংলাদেশ একটি নদীবিধৌত অঞ্চল। এদেশে প্রায় প্রতিবছরই বন্যা দেখা যায়। ফলে নদীকূল প্লাবিত হয়ে ভূমির সংবদ্ধতা (দৃঢ়তা) কমিয়ে দেয়। এছাড়াও আরও বিভিন্ন কারণে (তীব্র স্রোত, তীরভূমি বৃক্ষশূন্য থাকা) নদী ভাঙন হয়ে থাকে।

নদী ভাঙনের ফলে মানুষজন তাদের জায়গা জমি, সহায় সম্বল সবকিছু হারিয়ে ফেলে। নদী তীরবর্তী অঞ্চলে মূলত শ্রমজীবী (কৃষক, জেলে) এবং নিম্নবিত্ত লোকজন বসবাস করে। সবকিছু হারিয়ে তারা নিঃস্ব হয়ে যায়। এছাড়া কৃষিজমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া এবং নদী তীরবর্তী অবকাঠামো (বিদ্যালয়, হাট-বাজার) ভেঙে পড়ার কারণে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় নদীভাঙন।

কাজেই আমরা দেখতে পাই, নদী ভাঙন ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। এ জন্য আমাদের সবাইকে এ দুর্যোগ মোকাবিলায় সচেতন হতে হবে। সরকারকেও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ১৭

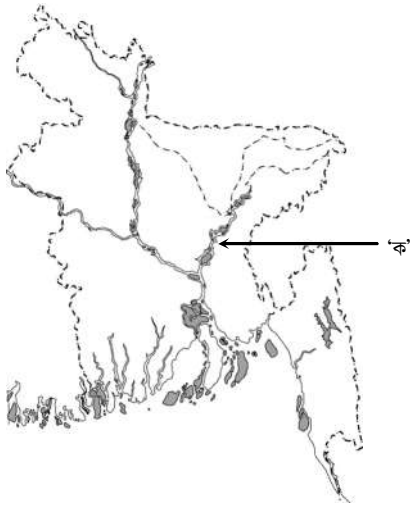

◀ শিখনফল: ৯

ক. যমুনার দীর্ঘতম উপনদী কোনটি? ১

খ. নদীর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখো। ২

গ. 'ক' নদীটির গতিপথ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'ক' নদী ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক করতোয়া যমুনার দীর্ঘতম উপনদী।

খ একটি সুনির্দিষ্ট খাতে (Trench) নিম্ন ঢাল অভিমুখী পানি প্রবাহকে নদী বলে। এর বৈশিষ্ট্য হলো–

নদী প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট। এটি নিয়মিত পানি প্রবাহের উৎস হিসেবে পরিচিত যা ভূপৃষ্ঠের উপর নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত হয়।

সূক্ষ্ম বালুকণাসমৃদ্ধ তলদেশ, পরিমিত ঢাল, সর্পিলাকৃতির গতিপথ, ভাঙন প্রবণ তীর এবং পরিবর্তনশীল নদীখাত প্রভৃতি নদীর বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত।

গ 'ক' নদীটি মেঘনা নদী। নদীটির উৎপত্তি ভারতের শিলং ও মেঘালয় পাহাড়ে। এর প্রধান উৎস বরাক নদী।

আসামের 'বরাক' নদী যা নাগ-মণিপুর পাহাড়ের দক্ষিণাংশ হতে উৎপন্ন হয়ে বাংলাদেশের সিলেট জেলায় প্রবেশ করেছে। এই স্থানে এটি সুরমা ও কুশিয়ারা নামক দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে।

উত্তরে সুরমা নামক শাখাটি খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ের নিকট দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ছাতক ও সুনামগঞ্জে পৌঁছে। এটি আরো অগ্রসর হয়ে দক্ষিণে হবিগঞ্জ জেলার উত্তর সীমানায় কুশিয়ারার সাথে মিলিত হয়। এর মিলিত স্রোতধারা নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ এর সোনারগাঁও এর মধ্য দিয়ে মুন্সিগঞ্জ হয়ে চাঁদপুরে পদ্মার সাথে মিলিত হয়েছে। সবশেষে এটি লক্ষ্মীপুর ও ভোলা দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

ঘ 'ক' নদীটি মেঘনা নদী। মেঘনা নদী ব্যবস্থা হলো—

১. বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী মেঘনার দৈর্ঘ্য ২৯,৭৮৫ বর্গ কি.মি.। পৃথিবীর সর্বাধিক বৃষ্টিপাত সম্পন্ন অঞ্চলের (ভারতের চেরাপুঞ্জি, মৌসিনরাম) একটি ধারা মেঘনা নদীর মাধ্যমে নিষ্কাশিত হয়। নদীটির উৎপত্তি ভারতের শিলং ও মেঘালয় পাহাড়ে। এর প্রধান উৎস বরাক নদী। বরাক-মেঘনার মিলিত দৈর্ঘ্য ৯৫০ কি.মি., যার ৩৪০ কি.মি. বাংলাদেশে অবস্থিত।

২. সিলেট জেলার অমলশিদে সীমান্তে বরাক নদী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে সুরমা ও কুশিয়ারা নদী গঠন করেছে। সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর মধ্যবর্তী এলাকাটি হাওর এলাকা (সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ) যা বর্ষা মৌসুমে গভীরভাবে প্লাবিত হয়। সুরমা ও কুশিয়ারা মারকুলির কাছে পুনরায় মিলিত হয়। পরে এটি মেঘনা নামে ভৈরব হয়ে চাঁদপুরে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। অতঃপর এটি মেঘনা নাম ধারণ করে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

৩. মেঘালয় ও আসাম থেকে উৎপন্ন আরও কতগুলো পাহাড়ি স্রোতধারা মেঘনার সঙ্গে মিশেছে। উৎস স্থান হতে ভৈরব বাজার পর্যন্ত সুরমা-মেঘনা নদী প্রণালির নিষ্কাশন এলাকার (Catchment area) মোট আয়তন প্রায় ৮,০২,০০০ বর্গ কি.মি. যার মধ্যে ৩৬,২০০ বর্গ কি.মি. বাংলাদেশে অবস্থিত।

প্রশ্ন ▶ ১৮ রাব্বি উচ্চ শিক্ষার্থে আমেরিকায় গমন করে। সে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাংশে সেন্টলরেন্স নদীর দ্বারা সৃষ্ট একটি বিখ্যাত ভূমিরূপ দেখে অভিভূত হয়, যেখানে বিশাল পানিরাশি অনেক উঁচু থেকে নিচে পতিত হচ্ছে। অথচ বাংলাদেশে নদীর কার্যক্রম ভিন্ন। এখানে বর্ষাকালে নদী পার্শ্ববর্তী অঞ্চল প্লাবিত করে এবং পরবর্তীতে নদী বাহিত পদার্থ দ্বারা বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি গঠন করে।

◀ *শিখনফল: ৯ [প্রফেসর মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী; অনু-৩/*

ক. পলল কোণ ও পলল পাখা কী? ১

খ. বিচূর্ণীভবন ও নগ্নীভবনের পার্থক্য লেখো। ১

গ. উদ্দীপকের আলোকে উত্তর আমেরিকার নদী দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের নদীগুলো কী ধরনের ভূমিরূপ সৃষ্টি করছে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এ ধরনের ভূমিরূপের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পার্বত্য কোনো অঞ্চল থেকে হঠাৎ করে কোনো নদী যখন সমভূমিতে পতিত হয়, তখন শিলাচূর্ণ, পলিমাটি প্রভৃতি পাহাড়ের পাদদেশে সঞ্চিত হয়ে ত্রিকোণ ও হাতপাখার ন্যায় ভূখণ্ডের সৃষ্টি করে। এরূপ পললভূমিকে পলল কোণ বা পলল পাখা বলে।

খ নগ্নীভবন প্রক্রিয়ার একটি অংশ হিসেবে বিচূর্ণীভবন ও নগ্নীভবনে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

শিলারাশির চূর্ণবিচূর্ণ ও বিশ্লিষ্ট হওয়ার প্রক্রিয়াকে বিচূর্ণীভবন বলে। বিচূর্ণীভবনের ফলে ভূত্বকের উপরিস্তরের শিলা ভেঙেচুরে শিথিল হয়ে পড়ে, কিন্তু অপসারিত হয় না। অন্যদিকে, বিচূর্ণীভবনের সময় শিলা চূর্ণবিচূর্ণ ও বিশ্লিষ্ট হয় এবং পরে ক্ষয়ীভবনের দ্বারা এ শিলা অপসারিত হলে নিচের শিলারাশি নগ্ন হয়ে পড়ে। এরূপ কার্যকে বলা হয় নগ্নীভবন। বিচূর্ণীভবন ও ক্ষয়ীভবনের মিলিত কাজই নগ্নীভবন।

গ উদ্দীপকে উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট লরেন্স নদী দ্বারা সৃষ্ট বিখ্যাত নায়াগ্রা জলপ্রপাতের কথা বলা হয়েছে।

উর্ধ্বগতি অবস্থায় নদীর পানি যদি পর্যায়ক্রমে কঠিন ও নরম শিলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তাহলে কোমল শিলাস্তরটিকে বেশি পরিমাণে ক্ষয় করে ফেলে। এর ফলে নরম শিলাস্তরের তুলনায় কঠিন শিলাস্তর অনেক উপরে অবস্থান করে এবং পানি খাড়াভাবে নিচের দিকে পড়তে থাকে। এরূপ পানির পতনকে জলপ্রপাত বলে। উত্তর আমেরিকার সেন্ট লরেন্স নদীর বিখ্যাত নায়াগ্রা জলপ্রপাত এরূপে গঠিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে বাংলাদেশের নদীগুলো প্লাবন সমভূমি গঠন করেছে।

বর্ষাকালে পানি বৃদ্ধির কারণে নদীর উভয়কূল প্লাবিত হলে তখন তাকে প্লাবন বা বন্যা বলে। বন্যা শেষে নদীর দুপাশের ভূমিতে খুব পুরু স্তরের কাদা, পলি দেখতে পাওয়া যায়। এভাবে অনেকদিন পলি জমতে জমতে যে বিস্তৃত সমভূমির সৃষ্টি হয় তাকে প্লাবন সমভূমি বলে।

বাংলাদেশের প্লাবন সমভূমি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এদেশের মানুষের জীবন ও জীবিকা এর উপর নির্ভরশীল। বিস্তৃত প্লাবন সমভূমিতে নিবিড় কৃষিকার্য সংঘটিত হয়। আর এদেশ কৃষি নির্ভর। কৃষিনির্ভর অর্থনীতি দেশটির মূল

বৈশিষ্ট্য। এদেশের শিল্পগুলো অধিকাংশই কৃষি নির্ভর। যেমন– পাট, চা, চিনি, বস্ত্রশিল্প। এদেশের পরিবহন ব্যবস্থা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত যাতে কৃষি ও শিল্প পণ্য সহজেই সর্বত্র সরবরাহ করা যায়। এক্ষেত্রে সমভূমির আনুকূল্যে সহজেই সড়ক এবং সমভূমিতে বিস্তৃত নদ-নদীর সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে নৌপথ গড়ে উঠেছে। নদীকেন্দ্রিক মৎস্য আহরণ ও বন্দরভিত্তিক অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও প্লাবন সমভূমি অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। এদেশে বাজার ব্যবস্থাও সমভূমির সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে নদীতীরে, সড়কের ধারে গড়ে উঠেছে। ফলে প্লাবন সমভূমি ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণ।

প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ১৯

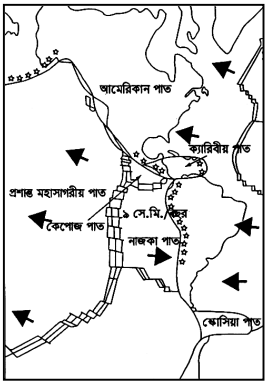

◀ *শিখনফল: ১*

ক. অভিসারী পাত সীমান্ত কী? ১

খ. ভূঅভ্যন্তরে পরিচলন স্রোতের সৃষ্টি হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে → দ্বারা কীসের গতি বোঝানো হচ্ছে? ৩

ঘ. উক্ত গতির কারণগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুটি পাত যখন পরস্পর অভিমুখে অগ্রসর হয়; পাতদ্বয়ের মধ্যবর্তী সংযোগস্থল হলো অভিসারী পাত সীমান্ত।

খ ভূঅভ্যন্তর প্রতিনিয়ত আলোড়িত ও পরিবর্তিত হচ্ছে।

ভূবিজ্ঞানীদের ধারণা, ভূত্বকের নিম্ন অংশে অর্থাৎ অন্তঃস্তরে তেজস্ক্রিয় পদার্থ হতে তাপশক্তি প্রতিনিয়ত বিচ্ছুরিত হয়ে প্রচণ্ড উত্তাপের সৃষ্টি করে। এ উত্তাপের ফলে ভূঅভ্যন্তরে পরিচলন স্রোতের সৃষ্টি হয়।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ প্লেটের গতি ব্যাখ্যা করো।

ঘ প্লেটগুলোর গতির কারণ বিশ্লেষণ করো।

প্রশ্ন ▶ ২০ পুরোনো পত্রিকা গোছাতে গিয়ে মৌসুমির ২০১০ সালে হাইতির একটি ভূমিকম্পের প্রতিবেদন চোখে পড়ল। তাতে লেখা ছিল ভূমিকম্পে প্রায় ১ লাখ লোক প্রাণ হারায়, হাজারেরও অধিক লোক আহত হয় এবং কোটি কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট হয়। রিকটার স্কেলে এ ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৭.৯। প্রতিবেদনটি পড়ে মৌসুমির ধারণা হলো ভূমিকম্পের রূপ কতটা ভয়াবহ হতে পারে। ◀ *শিখনফল: ২*

ক. ভূমিকম্পমাপক যন্ত্রের নাম কী? ১

খ. প্রাকৃতিক বাঁধ সৃষ্টি হয় কীভাবে? ২

গ. উদ্দীপকে আলোচ্য ঘটনাটি যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল প্রমাণ করো। ৩

ঘ. মৌসুমির পড়া প্রতিবেদনের আলোচ্য বিষয়টির ভয়াবহতা সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভূমিকম্পমাপক যন্ত্রের নাম সীসমোগ্রাফ।

খ বন্যার সময় নদীর উভয়কূল প্লাবিত হলে নদী বাহিত ভারি পদার্থসমূহ নদীতীরে সঞ্চিত হয়। এতে নদীর তীরে উঁচু বাঁধের ন্যায় ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়। এরূপ ভূমিরূপকে প্রাকৃতিক বাঁধ বলে।

বাংলাদেশের অধিকাংশ নদীর তীরে নদীর দৈর্ঘ্য বরাবর সুদীর্ঘ প্রাকৃতিক বাঁধ দেখা যায়।

সুপার টিপস্ : প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ ভূকম্পন শক্তি ব্যাখ্যা করো।

ঘ ভূমিকম্পের ফলাফল বিশ্লেষণ করো।

চতুর্থ অধ্যায়

বায়ুমণ্ডল ও বায়ুদূষণ

পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶১

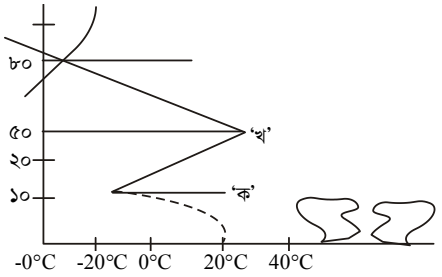

◀ *শিখনফল: ১*

ক. থার্মোস্ফিয়ারের প্রধান উপাদান কী? ১

খ. থার্মোস্ফিয়ার বলতে কী বোঝ? ২

গ. চিত্রের ক ও খ স্তর দুটির প্রধান পার্থক্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উল্লিখিত 'খ' স্তরটির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক থার্মোস্ফিয়ারের প্রধান উপাদান হলো আণবিক নাইট্রোজেন ও পারমাণবিক অক্সিজেন।

খ থার্মোস্ফিয়ার ওজোন স্তরের পরবর্তী স্তর যার ব্যাপ্তি ৮০ থেকে ৫০০ কি.মি. উচ্চতা পর্যন্ত।

মেসোপজ এর সীমানা থেকেই আয়ন সৃষ্টির সীমানা শুরু হয় এবং বায়ুর উষ্ণতা দ্রুত বৃদ্ধি পায় বলে একে থার্মোস্ফিয়ার বলে।

গ চিত্রের বায়ুমণ্ডলের 'ক' স্তরটি হলো ট্রপোস্ফিয়ার ও 'খ' স্তরটি হলো স্ট্রাটোস্ফিয়ার।

বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন স্তর ট্রপোস্ফিয়ার এবং তার পরবর্তী স্তর স্ট্রাটোস্ফিয়ার। ট্রপোমণ্ডলে আবহাওয়ার প্রায় সকল প্রকার উপাদান বিদ্যমান থাকে। ট্রপোস্ফিয়ারে প্রতি ১০০০ মিটারে ৬.৪° সে. তাপমাত্রা কমতে থাকে। ট্রপোসীমায় বায়ু প্রায় স্থির থাকে।

স্ট্রাটোস্ফিয়ারে বাতাস অত্যন্ত হালকা থাকে এবং বাতাসের সমান্তরাল গতি দেখা যায়। এ স্তরে আবহাওয়ার উপাদান সমূহের উপস্থিতি নেই বললেই চলে। স্তরটি প্রায় মেঘশূন্য থাকে। এই স্তরের উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে দ্রুত হারে উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়।

ঘ বায়ুমণ্ডলের 'খ' স্তরটি স্ট্রাটোস্ফিয়ার।

ট্রপোপজ অঞ্চলের শেষ সীমা থেকে মেসোস্ফিয়ারের পূর্ব পর্যন্ত স্তরই হলো স্ট্রাটোস্ফিয়ার। এটি ট্রপোমণ্ডলের উপরের এবং বায়ুমণ্ডলের দ্বিতীয় স্তর। ট্রপোপজ থেকে এই স্তরের বিস্তার প্রায় ৩০ কি.মি.। ট্রপোপজ থেকে উপরের দিকে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা প্রথমত স্থির থাকে। কিন্তু পরে ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে (২০ কি.মি. পর থেকে)। এ স্তরের ঘনত্ব ও চাপ উভয়ই কম।

এই স্তরে ধূলিকণা ও জলীয়বাষ্প নগণ্য পরিমাণে থাকায় স্তরটি প্রায় মেঘশূন্য । বাতাস অত্যন্ত হালকা থাকে। ঊর্ধ্ব ও নিম্নগতি নেই কিন্তু সমান্তরালগতি দেখা যায়। এই স্তরের ঊর্ধ্বসীমাকে স্ট্রাটোপজ বা স্ট্রাটোসীমা বলে। এর উপর থেকে উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে দ্রুতহারে উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়।

এই স্তরেই বায়ুমণ্ডলীয় O_3 গ্যাসের পরিমাণ বেশি। এ ওজোন স্তর সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে নিয়ে পৃথিবীকে জীবজগতের বাস উপযোগী করে তুলেছে।

প্রশ্ন ▶২ রোদে কাপড় শুকাতে দিয়েছেন মিসেস জাহানারা। তার পাঁচ বছরের ছোট ছেলে জায়েদের কৌতুহল নিবৃত্ত করতে তিনি বলেন, তাপে বায়ুমণ্ডলে কাপড়ের পানি মিশে যাবে। এ পানি বায়ুতে ধূলিকণা, ধোঁয়া, ভস্ম ইত্যাদির সাথে ভেসে বেড়াবে।

◀ *শিখনফল: ১*

ক. কোন স্তর সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে? ১

খ. ওজোন গ্যাস কীভাবে পৃথিবীর জীবজগতকে রক্ষা করে? ২

গ. উদ্দীপকে আলোচিত উপাদানগুলো বৃষ্টিপাত সংঘটনে কীভাবে ভূমিকা রাখে? ৩

ঘ. কাপড় থেকে বায়ুতে মিশে যাওয়া উপাদান আবহাওয়া ও জলবায়ুর জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ওজোন স্তর সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে ।

খ ওজোন গ্যাস (O_3) একটি অস্থায়ী গ্যাস যা অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে। এ রশ্মি জীবজগতের জন্য ক্ষতিকর। ওজোন স্তর সূর্য থেকে বিকিরিত এ রশ্মি শোষণ করে নিয়ে পৃথিবীর জীবজগতকে রক্ষা করে।

গ উদ্দীপকে আলোচিত উপাদানগুলো হলো ধূলিকণা, ধোঁয়া, ভস্ম, ইত্যাদি। এগুলো বায়ুমণ্ডলে ভাসমান অজৈব কণিকা ।

বায়ুমণ্ডলে আরও কিছু অজৈব কণিকা রয়েছে। যেমন: কয়লার গুঁড়া, আগ্নেয়গিরির ছাই, উল্কা ভস্ম ইত্যাদি। বায়ুমণ্ডলের এসব কণিকা সূর্যরশ্মি থেকে তাপ শোষণ করে বায়ুকে উত্তপ্ত করে থাকে। এই কণিকাগুলোকে আশ্রয় করেই জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে মেঘের সৃষ্টি করে এবং বৃষ্টিপাত ঘটায়। তাই বৃষ্টিপাত সংঘটনে উক্ত কণিকাগুলো ভূমিকা রাখে।

ঘ উদ্দীপকে বায়ুতে ভাসমান বিভিন্ন কণিকার উল্লেখ রয়েছে।

উদ্দীপকে কাপড় থেকে বায়ুতে মিশে যাওয়া উপদ্যানটি হচ্ছে জলীয়বাষ্প। জলীয়বাষ্প আবহাওয়া ও জলবায়ুর জন্য অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ উপাদান। বায়ুমণ্ডলে ভাসমান বিভিন্ন জৈব ও অজৈব কণিকাকে আশ্রয় করে জলীয়বাষ্প মেঘরূপে ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়।

জলীয়বাষ্প বায়ুমণ্ডলের নিম্ন স্তর ট্রপোস্ফিয়ারে অবস্থান করে। ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন জলাধার থেকে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে জলীয়বাষ্প বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়। সাধারণত তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে বাতাসে জলীয়বাষ্পের ধারণ ক্ষমতা বাড়ে। আবার তাপমাত্রা কমে গেলে এর ধারণ ক্ষমতা কমে যায়।

জলীয়বাষ্প একদিকে সৌরতাপ শোষণ করে, অপরদিকে ভূপৃষ্ঠ থেকে তাপ বিকিরণে বাধা দেয়। বায়ুমণ্ডলে জলীয়বাষ্পের উপস্থিতিতে ঘনীভবন প্রক্রিয়ায়, মেঘ ও কুয়াশা সৃষ্টি হয় এবং বৃষ্টি, তুষার, শিশির, শিলাবৃষ্টি সংঘটিত হয়ে থাকে। যার ফলে ভূপৃষ্ঠ ও বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় থাকে।

সুতরাং আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, আবহাওয়া ও জলবায়ুর জন্য বায়ুমণ্ডলের জলীয়বাষ্প একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

প্রশ্ন ▶ ৩

ক	হাইড্রোজেন
খ	হিলিয়াম
গ	অক্সিজেন
ঘ	নাইট্রোজেন

◀ *শিখনফল: ১ [তাপস কুমার মজুমদার; অনু-১]*

ক. বায়ুমণ্ডল কী? ১

খ. জীবের প্রোটিন জাতীয় খাদ্য প্রস্তুতে সাহায্য করে কোন গ্যাস? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকটি বায়ুমণ্ডলের কোন শ্রেণিবিভাগের ইঙ্গিত করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বায়ুমণ্ডলের আলোকে উদ্দীপকটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে অদৃশ্য বায়ুরাশি পৃথিবীকে বেষ্টন করে রয়েছে তাই বায়ুমণ্ডল (Atmosphere)।

খ জীবের প্রোটিন জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করতে সহায়তা করে নাইট্রোজেন গ্যাস।

নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডলের একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস। বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন গ্যাসের পরিমান সবচেয়ে বেশি (প্রায় ৭৮.০৮%)। এ গ্যাস বায়ুর আয়তন বৃদ্ধি ও অক্সিজেনকে পাতলা করতে সাহায্য করে।

গ উদ্দীপকটি বিষমমণ্ডলকে (Heterosphere) ইঙ্গিত করেছে।

বায়ুমণ্ডলকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ১। সমমণ্ডল এবং ২। বিষমমণ্ডল। রাসায়নিক গঠন অনুসারে বিষমমণ্ডলকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

নাইট্রোজেন পারমাণবিক স্তর: ভূপৃষ্ঠের ৯০ থেকে ২০০ কিলোমিটার ঊর্ধ্ব পর্যন্ত এ স্তরটি বিস্তৃত। এ স্তরে নাইট্রোজেন গ্যাসের আধিক্য দেখা যায়।

অক্সিজেন পারমাণবিক স্তর: নাইট্রোজেন পারমাণবিক স্তরের ওপরে অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের ঊর্ধ্বে ২০০ থেকে ১১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত এ স্তরটি বিস্তৃত। এ স্তরে অক্সিজেন পারমাণবিক অণুর আধিক্য দেখা যায়।

হিলিয়াম স্তর: অক্সিজেন পারমাণবিক স্তরের ঊর্ধ্বে ১১০০ থেকে ৩৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত স্তরটি প্রধানত হিলিয়াম গ্যাস দ্বারা গঠিত। একে হিলিয়াম স্তর বলা হয়।

হাইড্রোজেন স্তর: হিলিয়াম স্তরের ওপরে বায়ুমণ্ডলের সর্বোচ্চ স্তরটি হাইড্রোজেন পরমাণু দ্বারা গঠিত বলে একে হাইড্রোজেন স্তর বলা হয়। এ স্তরটি ৩৫০০ থেকে ১০,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত বলে অনুমান করা হয়।

ঘ উদ্দীপকটিতে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন গ্যাসীয় উপাদানের মধ্যে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের কথা বলা হয়েছে।

নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডলের একটি স্থির বা নিষ্ক্রিয় গ্যাস। বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন গ্যাসের পরিমান ৭৮.০৮%। জীবের প্রোটিন জাতীয় খাদ্য প্রস্তুতে সাহায্য করে এ গ্যাস। শুধু তাই নয় এ গ্যাস বায়ুর আয়তন বৃদ্ধি ও অক্সিজেনকে পাতলা করতে সাহায্য করে। বায়ুমণ্ডলের গ্যাসগুলোর মধ্যে অক্সিজেন সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় একটি গ্যাস। বায়ুমণ্ডলে এ গ্যাসের পরিমাণ ২০.৯৪%। অক্সিজেন প্রাণীর শ্বাস গ্রহণ ও প্রাণীদেহে শক্তি ও উত্তাপ বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

বায়ুমণ্ডলের হিলিয়াম গ্যাসের পরিমাণ ০.০০০৫%। এরা কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না। এছাড়া বায়ুমণ্ডলে হাইড্রোজেন, মিথেন এবং নাইট্রাস অক্সাইড প্রভৃতি গ্যাসের পরিমাণ অতি নগন্য।

বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত উক্ত গ্যাসসমূহ মানুষ ও জীবজগতের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

প্রশ্ন ▶ ৪

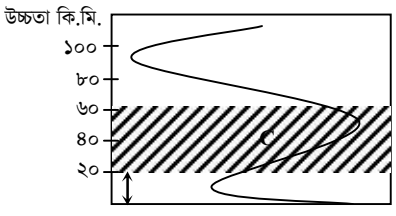

চিত্র: বায়ুমণ্ডলের স্তর বিন্যাস

◀ *শিখনফল: ১ [মোহাম্মদ আরিফুর রহমান; অনু-১]*

ক. স্বাভাবিক তাপ হ্রাসহার কী? ১
খ. সৌরতাপের সাথে বায়ুপ্রবাহের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ২
গ. চিত্রে উল্লিখিত সর্বনিম্ন স্তরের বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. চিত্রের 'C' চিহ্নিত স্তরটি কেন গুরুত্বপূর্ণ? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ট্রপোস্ফিয়ারের উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে তাপমাত্রা কমার হারকে স্বাভাবিক তাপ হ্রাসহার বলে।

খ সৌরতাপ বায়ুর ঘনত্বকে সরাসরি প্রভাবিত করে বায়ুপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে।

সৌরতাপের কারণে বায়ু উত্তপ্ত হয়ে প্রসারিত হয়। তাপ বেশি হলে বায়ুর চাপ কমে এবং উপরের দিকে প্রসারিত হয়। আবার তাপ কম হলে বায়ুর চাপ বেড়ে যায়। তখন বায়ু নিচের দিকে কমতে থাকে। তাই দেখা যায়, সৌরতাপের উপর বায়ুপ্রবাহ নির্ভরশীল।

গ চিত্রে সর্বনিম্ন স্তরটি ট্রপোস্ফিয়ার নামে পরিচিত।

ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুস্তর যেখানে বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদ বসবাস করে তাকে ট্রপোস্ফিয়ার বলে। ট্রপোস্ফিয়ার স্তরের গভীরতা সর্বত্র সমান নয়। এ অঞ্চলের গড় গভীরতা ১২ কি.মি.। ট্রপোস্ফিয়ার এ প্রতি কিলোমিটারে উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে তাপমাত্রা হ্রাস পায় গড়ে ৬.৪ ডিগ্রি সে.। মেঘ, কুয়াশা, বৃষ্টি, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপসর্গগুলো এ স্তরে বিদ্যমান।

ট্রপোস্ফিয়ারের শেষ সীমাকে ট্রপোপজ বলে। এ স্তরের গড় গভীরতা প্রায় ১.৬ কি.মি.। ট্রপোপজ স্তরে উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে তাপমাত্রা কমে না। ঝড়-বৃষ্টির প্রাদুর্ভাব থাকে না বিধায় এ স্তরে বিমান বিনা বাধায় চলাচল করতে পারে।

ঘ চিত্রে C চিহ্নিত স্তরটি স্ট্রাটোস্ফিয়ার নামে পরিচিত। বায়ুমণ্ডলে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তর হচ্ছে স্ট্রাটোস্ফিয়ার।
ট্রপোস্ফিয়ারের উর্ধ্বসীমা থেকে ৫০ কি.মি. বিস্তৃত স্তরটি হলো স্ট্রাটোস্ফিয়ার। এ স্তরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তাপমাত্রা প্রথমে স্থির থাকলেও পরে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ স্তরে অতি সামান্য পরিমাণে ধূলি ও জলীয়বাষ্প থাকে।
ট্রপোপজ থেকে স্ট্রাটোস্ফিয়ারের মাঝামাঝি উচ্চতায় ওজোন স্তরের একটি আস্তরণ তৈরি হয়। সূর্য থেকে প্রতিদিন অজস্র রশ্মি বের হয়। এর মধ্যে অতি বেগুনী রশ্মি সর্বাধিক ক্ষতিকর। এটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু ওজোন গ্যাসের আস্তরণটি সূর্যরশ্মির অতি বেগুনি রশ্মি শোষণ করে পৃথিবীর জীবকুলকে অতি বেগুনি রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করছে।
উপরিউক্ত কারণগুলো বিবেচনা করলে স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, চিত্রে 'C' চিহ্নিত স্তরটি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶৫ বায়ুমণ্ডলে এমন দুটি স্তর রয়েছে, যার একটিতে দ্রুতগামী জেট বিমানগুলো বিনা বাধায় চলাচল করে। অন্যটির দরুন আমরা নির্বিঘ্নে রেডিও শুনতে পাই।

◀ শিখনফল-১ [ড. সৈয়দ শাহজাহান আহমেদ; অনু-৬]

ক. বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ শতকরা কত ভাগ? ১
খ. বায়ু দূষক কী? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকে যেসব বায়ুস্তরের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তাদের বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. 'উদ্দীপকের ইঙ্গিতকৃত স্তর দুটি ছাড়া বায়ুমণ্ডলে আরও বহুবিধ স্তর রয়েছে।'- উক্তিটির পক্ষে অবস্থান নিয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ শতকরা ২০.৭১ ভাগ।

খ বায়ুর উপাদানগুলোর মধ্যকার ভারসাম্যহীনতাই বায়ুদূষণ। আর যেসব পদার্থ দ্বারা বায়ুর উপাদান দূষিত হয় তাদেরকে বায়ুর দূষক বলা হয়।
দূষক প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক উভয় ধরনের হতে পারে। কলকারখানার দূষিত গ্যাস, তেল শোধনের ফলে নিঃসৃত সালফার ডাইঅক্সাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড, পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্রের তেজস্ক্রিয় পদার্থ, গৃহস্থালির আবর্জনা, যানবাহনের কালো ধোঁয়া ইত্যাদি অপ্রাকৃতিক বায়ু দূষকের উদাহরণ। আবার দাবানলের ফলে সৃষ্ট ধোঁয়া, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে নির্গত আগ্নেয় ভস্ম, ছাই প্রভৃতি প্রাকৃতিক দূষকের উদাহরণ।

গ উদ্দীপকে 'ট্রপোস্ফিয়ার' এবং 'থার্মোস্ফিয়ার'-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।
ট্রপোস্ফিয়ার : ভূপৃষ্ঠসংলগ্ন বায়ু স্তর হলো ট্রপোস্ফিয়ার। এটি বায়ুমণ্ডলের প্রথম স্তর। ট্রপোস্ফিয়ারের উর্ধ্বসীমায় অবস্থিত পুরু স্তর হলো ট্রপোপজ। এ স্তরে বায়ু স্থির এবং তাপমাত্রা প্রায় ৫৫° সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়ে থাকে। ঝড়-বৃষ্টির প্রাদুর্ভাব নেই বলে দ্রুতগামী জেট বিমানগুলো এ স্তর দিয়ে বিনা বাধায় চলাচল করে।
থার্মোস্ফিয়ার : এটি বায়ুমণ্ডলের তৃতীয় স্তর। ভূপৃষ্ঠের উর্ধ্বে ৮০ থেকে ৬৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত এর বিস্তার। এখানে সূর্যের তাপ খুবই বেশি। ৮০ কি.মি. উচ্চতায় তাপমাত্রা ৯৩° থেকে বাড়তে বাড়তে ৫০০ কি.মি. উচ্চতায় প্রায় ১২০০° সেলসিয়াস হয়। অতিরিক্ত তাপে এ অঞ্চলটি অসংখ্য বিদ্যুৎযুক্ত কণা বা আয়ন ও ইলেকট্রনে পরিপূর্ণ হয়। এখানে পজিটিভ ও নেগেটিভ দুই ধরনের আয়নের প্রাচুর্য ঘটে। বেতার তরঙ্গ (Radio wave) এ স্তরে প্রতিফলিত হয়ে পুনরায় ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে। ফলে আমরা নির্বিঘ্নে রেডিও শুনতে পাই।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত স্তর দুটি হলো ট্রপোস্ফিয়ার ও থার্মোস্ফিয়ার। এ দুটি স্তর ছাড়া বায়ুমণ্ডলে আরও বহুবিধ স্তর রয়েছে। নিচে এসব স্তর সম্পর্কে আলোচনা করা হলো—

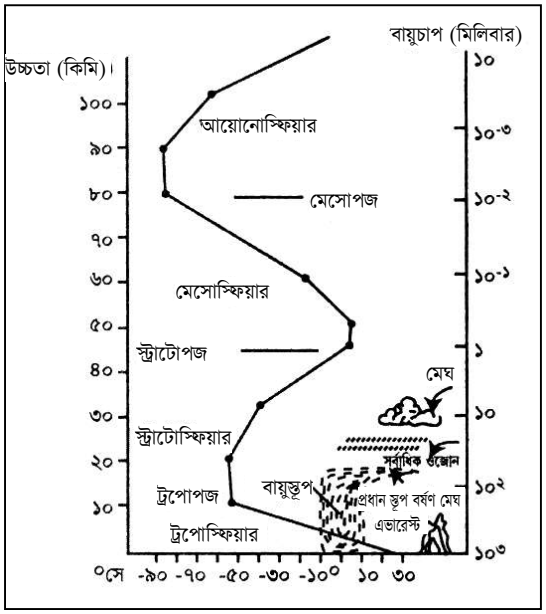

চিত্র: তাপমাত্রার তারতম্য অনুসারে বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাস

স্ট্রাটোস্ফিয়ার : এই স্তর ট্রপোস্ফিয়ারের উর্ধ্বসীমা থেকে প্রায় ৫০ কি.মি. পর্যন্ত বিস্তৃত। এ স্তরে তাপমাত্রা প্রথমে স্থির থাকে (– ৮০° সেলসিয়াস)। পরে উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ স্তরের উচ্চতর অংশের তাপমাত্রা ০° সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়। এ স্তরে ধূলাবালি, জলীয়বাষ্প প্রভৃতি পদার্থ অতি সামান্য পরিমাণে থাকে, মেঘ প্রায় দেখাই যায় না। ট্রপোপজ থেকে স্ট্রাটোস্ফিয়ারের মাঝামাঝি উচ্চতায় ওজোন (O_3) গ্যাসের একটি আস্তরণ দেখা যায়, যা ওজোনোস্ফিয়ার নামে পরিচিত। এ স্তরের উর্ধ্বসীমাকে স্ট্রাটোপজ বলে। এ স্তরের অবস্থান হলো ৪৭ থেকে ৪৮ কি.মি., যার উচ্চতর অংশের তাপমাত্রা ০° সেলসিয়াস।

মেসোস্ফিয়ার : স্ট্রাটোস্ফিয়ারের উর্ধ্বসীমা থেকে ৮০ কি.মি. উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত স্তরকে মেসোস্ফিয়ার বলে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে মেসোস্ফিয়ার স্তরে প্রায় ৮০ কি.মি. উচ্চতায় তাপমাত্রা ৮০° সেলসিয়াস। কখনো কখনো এটি ১২০° সে. পর্যন্ত হয়ে থাকে। মেসোস্ফিয়ারের উর্ধ্বসীমাকে মেসোপজ বলে, যেখানে বায়ুর তাপমাত্রা ৯০° সে.। এ মেসোপজই বায়ুমণ্ডলের সর্বশেষ সীমা।

প্রশ্ন ▶ ৬ ঢাকার সৌমিত্র, চট্টগ্রামের পলি, ময়মনসিংহের সুইটি ও ভোলার রোখসানা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলো। রোখসানা ও সুইটি ঢাকার নগরায়ণ, কলকারখানা, মোটরযানের ধোঁয়া ও ধূলাবালিতে প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়ে। *◀ শিখনফল: ২*

ক. জ্বালানি দহনের ফলে কী সৃষ্টি হয়? ১

খ. অ্যারোসল কীভাবে বায়ুদূষণ ঘটায়? ২

গ. রোখসানা ও সুইটির অসুখ হওয়ার পিছনে কী কারণ দায়ী ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত কারণের পেছনে বিভিন্ন গ্যাস নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা রাখে। বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্বালানি দহনের ফলে CO_2, CO এবং SO_2 সৃষ্টি হয়।

খ রেফ্রিজারেটর, সেভিং ফোমে অ্যারোসল থাকায় তা ব্যবহারের ফলে অ্যারোসল বায়ুতে নির্গত হয়ে যায়, যা পরবর্তীতে অন্যান্য যৌগের সংস্পর্শে এসে নতুন যৌগ তৈরি করে বায়ুকে দূষিত করে তোলে।

অ্যারোসলজনিত বায়ু দূষণ মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরূপ।

গ রোখসানা ও সুইটি অসুস্থ হবার মূল কারণ হলো বায়ুদূষণ। বায়ুতে বিভিন্ন প্রকার দূষিত পদার্থ মিশে বায়ুকে দূষিত করে ফেলে।

বায়ুতে বিভিন্ন পদার্থগুলোর একটি সাম্যাবস্থা বজায় থাকে। CO_2 গ্যাসের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে গাছপালা কেটে ফেলার দরুন। এছাড়াও যানবাহন ও কলকারখানার ধোঁয়া থেকেও CO_2 নির্গত হচ্ছে। বিভিন্ন ইগজস্ট গ্যাস, ওজোন, সালফার-ডাই-অক্সাইড ও সূর্যালোকের উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করে বায়ু দূষিত করে। প্রচুর ধূলাবালিযুক্ত বায়ুও বায়ু দূষিত করে থাকে।

দূষিত বায়ু শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে মানুষের দেহে প্রবেশ করে মানুষকে অসুস্থ করে। মূলত এ সব কারণের দরুন রোখসানা ও সুইটি অসুস্থ হয়েছিল।

ঘ উক্ত কারণ তথা বায়ুদূষণের পেছনে বিভিন্ন গ্যাস নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

বায়ুদূষণের জন্য নিয়ামক গ্যাসগুলো হচ্ছে–CO_2 গ্যাস, ধোঁয়া, স্মগ, ইগজস্ট গ্যাস, সালফার-ডাইঅক্সাইড, ক্লোরোফ্লুরো কার্বন, মিথেন, পরাগরেণু ইত্যাদি।

CO_2 গ্রিন হাউস গ্যাস, এটি উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কিন্তু গাছপালা কমে যাবার ফলে CO_2 এর ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। ফলে বায়ুতে CO_2 এর পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। ধোঁয়া বা এর থেকে নির্গত বস্তু কণাগুলো বায়ুতে ভাসমান অবস্থায় থাকে। এছাড়া যানবাহন ও কলকারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া সূর্যালোকের উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করে বায়ুমণ্ডলে ভাসমান থাকে। ইগজস্ট গ্যাসসমূহ বায়ুতে মিশে এর ঘনত্ব বাড়িয়ে দিচ্ছে। বিভিন্ন জ্বালানি দহনের ফলে সৃষ্ট এসিড ওজোন স্তরকে ধ্বংস করে বায়ু দূষণ করছে।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় বায়ু দূষণে নিয়ামক গ্যাসগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ৭ মানিক গ্রাম থেকে ঢাকা শহরে এসে উপলব্ধি করল গ্রামের তুলনায় শহরের বাতাস বেশ গরম। বাইরে বের হলে গাড়ির কালো ধোঁয়াতে চোখ, মুখ যেন বন্ধ হয়ে আসে। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। দুই দিন থাকার পর সে বেশ অসুস্থ হয়ে পড়ল।

◀ শিখনফল: ২ ও ৩ /তাপস কুমার মজুমদার; অনু-২/

ক. বায়ু কী? ১
খ. সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি শোষণকারী স্তরটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে মানিকের ভ্রমণকৃত স্থানের বাতাস গরম হওয়ার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মানিকের অসুস্থতার কারণ নিজের ভাষায় বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং স্বল্প পরিমাণে নিষ্ক্রিয় গ্যাস যেমন– আর্গন, হিলিয়াম, জেনন, ক্রিপ্টন ইত্যাদির মিশ্রণই সাধারণত বায়ু বলে অভিহিত।

খ সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি শোষণকারী স্তরটি হলো ওজোনোস্ফিয়ার।

জীবজগতের জন্য এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তর। কারণ বায়ুমণ্ডলে যদি এ স্তরটি না থাকত তাহলে সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি সরাসরি ভূপৃষ্ঠে এসে পড়ত। ফলে মানুষসহ প্রাণীকুলের দেহ পুড়ে যেত।

গ উদ্দীপকে মানিকের ভ্রমণকৃত স্থান হলো ঢাকা। আর গ্রাম থেকে ঢাকা শহরের বাতাস গরম হওয়ার কারণ হলো শহরের বায়ুতে বিভিন্ন ধরনের বায়ু দূষণকারী দূষকের উপস্থিতি।

ঢাকায় অপরিকল্পিত নগর গড়ে ওঠায়, বিশেষ করে যত্রতত্র শিল্পকারখানা গড়ে ওঠায় এগুলোর দূষিত ধোঁয়া এই এলাকার বায়ুর সাথে মিশে যাচ্ছে। আবার জনসংখ্যার তুলনায় ঢাকায় গাছপালার সংখ্যা খুবই কম। যার ফলে জীবকুলের ত্যাগ করা সবটুকু CO_2 গ্যাস সবুজ উদ্ভিদ গ্রহণ করতে পারে না। তাই এই অঞ্চলের বাতাসে CO_2 গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। যা এই অঞ্চলের তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। আবার দ্রুত ও অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে যানবাহনের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এগুলোর ধোঁয়া বায়ুর গুণগত মানকে নিচে নামিয়ে দিচ্ছে। তাছাড়া ঢাকার আশপাশে ইটের ভাটার কারণে সাভার এলাকাসহ রাজধানী ঢাকা বায়ু দূষণের শিকার।

উল্লিখিত কারণগুলোই মানিকের ভ্রমণকৃত স্থান ঢাকা শহরের বাতাস গরম হওয়ার জন্য দায়ী।

ঘ মানিকের অসুস্থ হওয়ার মূল কারণ হলো বায়ু দূষণ। বায়ুতে বিভিন্ন দূষিত পদার্থ মিশে বায়ুকে দূষিত করে ফেলে।

বায়ুতে বিভিন্ন পদার্থগুলোর একটি সাম্যবস্থা বিরাজ করে। গাছপালা কেটে ফেলার দরুন CO_2 গ্যাসের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও যানবাহন ও কলকারখানার ধোঁয়া থেকেও CO_2 নির্গত হচ্ছে। বিভিন্ন ইগজস্ট গ্যাস, ওজোন গ্যাস, সালফার ডাইঅক্সাইড ও সূর্যালোকের উপাস্থিতিতে বিক্রিয়া করে বায়ু দূষিত করে থাকে।

বায়ুদূষণের দরুন জীবজগৎ তথা মানব স্বাস্থ্যের উপর ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলে। বায়ু দূষণের ফলে মানবস্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর ক্ষণস্থায়ী ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়ে। তার মধ্যে রয়েছে শ্বাসজনিত আক্রমণ, এ্যাজমা, ব্রঙ্কাইটিস, ফুসফুসের ক্ষতি, মাথাব্যাথা, চোখের সমস্যা, হৃদরোগের ঝুঁকি ইত্যাদি।

মূলত উল্লিখিত কারণেই মানিক অসুস্থ হয়ে পড়েছিল।

প্রশ্ন ▶৮ ঢাকার অদূরে ইপিজেড এলাকার পুরোটাই শিল্প নগরী। ফলে শিল্প উৎপাদিত মালামাল পরিবহনে বিভিন্ন মোটরযান ব্যাবহৃত হয়। শিল্প কারখানাগুলোর চিমনি দিয়ে বিষাক্ত ধোয়া নির্গত হয়। শিল্পাঞ্চল বিধায় সেখানে অপরিকল্পিতভাবে নগর গড়ে ওঠেছে। *◀ শিখনফল: ২ ও ৩*

ক. বিষমণ্ডল কী? ১
খ. ইটভাটা কীভাবে বায়ুদূষণ ঘটায়? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত অবস্থা বায়ুদূষণে কীভাবে ভূমিকা রাখে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত অবস্থা জীবজগতের ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমুদ্রপৃষ্ঠের ৮৫ কি.মি. থেকে ১০,০০০ কি.মি. পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুমণ্ডলীয় স্তরই বিষমমণ্ডল।

খ ইটভাটায় জ্বালানি দহনের ফলে বায়ুদূষণ ঘটে।

ইটের ভাটায় ইট তৈরির জন্য প্রচুর পরিমাণে জ্বালানি প্রয়োজন হয়। এজন্য জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় কাঠ এবং কয়লা। এতে প্রচুর ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়। এছাড়া পুরোনো চিমনির কারণেও বায়ুদূষণ হয়।

গ উদ্দীপকে বায়ু দূষণের কথা বলা হয়েছে।

শিল্পাঞ্চলে যে জ্বালানি ব্যবহৃত হয় তা প্রচুর ধোঁয়ার সৃষ্টি করে। এছাড়া নতুন ও পুরোনো চিমনিগুলোতে যে সব জ্বালানি ব্যবহৃত হয় তা বায়ুকে দূষিত করে। এছাড়া শিল্পদ্রব্য একস্থান হতে অন্যস্থানে পরিবহণে ব্যবহৃত মোটরযান হতে নির্গত ধোঁয়াও বায়ু দূষণ ঘটায়।

মোটরযান থেকে নির্গত সালফার অক্সাইড, কার্বন উপাদান, কিছু জৈব উপাদান যেগুলো বায়ুর সাথে মিশে গিয়ে বায়ুকে দূষিত করে। এগুলো বায়ুর সাথে মিশে বায়ুর গুণ নষ্ট করে ফেলে। বর্তমানে অপরিকল্পিতভাবে প্রচুর শিল্পাঞ্চল যত্রতত্র গড়ে উঠছে। ফলে যেখানে এগুলো গড়ে উঠছে সেখানকার বায়ু দ্রুত দূষিত হচ্ছে। মূলত এসব বিষয়ই অপরিকল্পিত শিল্পায়নের ফলে বায়ুদূষণে ভূমিকা রাখে।

ঘ জীবনধারণ ও বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান বায়ু। বর্তমানে এই দূষিত বায়ু আমাদের জীবনের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বায়ুর উপাদানগুলো যখন নিজেদের মাঝে সমতা আনতে ব্যর্থ হয় তখনই বায়ুদূষণ ঘটে। বায়ুদূষণের ফলে শুধু মানব স্বাস্থ্যের ওপরই ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে না, বরং উদ্ভিদ, বাস্তুসংস্থান এবং পশুপাখির ওপরও প্রভাব পড়ে । যথা–

i. যানবাহন থেকে নির্গত নানা ধরনের গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) উল্লেখযোগ্য। এ গ্যাস মানুষের শরীরে প্রবেশ করলে রক্তের অক্সিজেন সঞ্চালন ক্ষমতা হ্রাস পায়।
ii. জ্বালানি তেল ও কয়লা দহনের দরুন সালফার ডাই অক্সাইড (SO_2) উৎপন্ন হয়। এতে শ্বাসকষ্ট, মাথা ধরা, বমি বমি ভাব হয়।
iii. রাসায়নিক ও পেট্রোক্যামিকেল কারখানায় যেমন: ইনসুলেটর কারখানা থেকে উৎপন্ন হাইড্রোজেন সালফাইড (HS) গ্যাস চোখ ও গলার ক্ষতি করে।
iv. তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্গত সূক্ষ্ম ধূলিকণা ক্যান্সার রোগ সৃষ্টি করে।
v. বিস্ফোরক দ্রব্য, রঙ, সার প্রভৃতি উৎপাদনের সময় যে অ্যামোনিয়া (NH_3) নির্গত হয়, তা মানুষের শ্বাসনালীর ক্ষতি করে।

সুতরাং বলা যায় যে, বায়ু দূষণ জীবজগতের উপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে থাকে। এজন্য বায়ুদূষণ রোধে আমাদের সচেতন হতে হবে।

প্রশ্ন ▶৯ ডেভিড বাংলাদেশ ভ্রমণে এসে এয়ারপোর্ট থেকে হোটেলের উদ্দেশ্যে ট্র্যাক্সি নিল। কিছুদুর যেতেই গাড়ির হর্নের শব্দে তার মাথাব্যাথা শুরু হলো। গাড়ির জানালা সামান্য খুলে দিতেই পাশ দিয়ে যাওয়া পিকআপের কালো ধোঁয়া আর রাস্তায় পাশের আবর্জনার দুর্গন্ধ তার নাকে আসল। ◀ *শিখনফল: ২ ৩ ৩*

ক. ট্রপোস্ফিয়ার কী? ১
খ. বায়ু ছাড়া প্রাণীর বেঁচে থাকা সম্ভব কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ডেভিড যে দূষণের শিকার হলো তার দূষক উৎসগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত দূষণের ফলে মানবস্বাস্থ্যের উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন যে স্তরে আবহাওয়ার সব উপাদান বিদ্যমান তাই ট্রপোস্ফিয়ার।

খ পৃথিবীর সকল প্রাণীর জীবন ধারণ ও বেঁচে থাকার জন্য বায়ু সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান।

বায়ুর অক্সিজেনের সাহায্যে প্রাণী শ্বসনকার্য চালায়। এ ক্রিয়া থেমে গেলে সাথে সাথে প্রাণীর মৃত্যু ঘটে। তাই কোনো প্রাণীর পক্ষে বায়ু ছাড়া কয়েক মিনিটও বাঁচা সম্ভব নয়।

গ উদ্দীপকে ডেভিড পিকআপের কালো ধোঁয়া ও রাস্তায় ফেলে রাখা আবর্জনা দ্বারা বায়ু দূষণের শিকার হলেন।

বায়ু দূষকের উৎসসমূহ নিম্নরূপ:

কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) : শিল্প-কারখানা, বিভিন্ন ধরনের চুল্লি (যেমন– ইট ভাটার চিমনি) ও মোটরযান হতে কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত হয়। গাছপালা হ্রাস পাওয়ায় বাতাসে এ গ্যাসের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে।

নাইট্রোজেন অক্সাইডসমূহ (NO_x) : মোটরযান, শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র, প্লাস্টিক, এসিড ও বিস্ফোরক নির্মাণকারী কারখানায় নাইট্রোজেন জারিত হয়ে বিভিন্ন প্রকার অক্সাইড তৈরি করে।

সালফার ডাইঅক্সাইড (SO_2) : শিল্প-কারখানা ও শক্তি উৎপাদক কেন্দ্র থেকে এ গ্যাস নির্গত হয় ও বাতাসে মিশে যায়।

ক্লোরোফ্লোরো কার্বন : CFC হল কার্বন ফ্লোরিন ও ক্লোরিনের একটি যৌগ। এটি রিফ্রিজারেটর, এয়ারকন্ডিশনার,প্লাস্টিক ও রং তৈরির কারখানা হতে নির্গত হয়।

ভারি ধাতু : পারদ, সীসা, ক্যাডমিয়াম, দস্তা, ক্রোমিয়াম, নিকেল প্রভৃতি ভারি ধাতুগুলো শিল্প কারখানা, মোটরযান ও আবাসস্থলের বর্জ্য হতে বায়ুতে ছড়ায়।

ধূলিকণা : পাটকল, বস্ত্রকল ইত্যাদি থেকে প্রচুর ধূলিকণা নির্গত হয়। এসব ধূলিকণা ধোঁয়ার সাথে মিশে ধোঁয়াশা (smog) তৈরি করে।

রেডিও অ্যাকটিভ পদার্থ : তেজস্ক্রিয় পদার্থ, পারমাণবিক বিস্ফোরণ ও অস্ত্রের পরীক্ষা ইত্যাদি থেকে উপজাত হিসেবে এসব নির্গত হয়।

উপরিউক্ত বিষয়গুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দূষক উপাদানগুলো মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে বায়ু দূষিত হচ্ছে।

ঘ উক্ত দূষণ হলো বায়ু দূষণ।

বায়ু দূষণের ফলে মানব স্বাস্থ্যের উপর মারাত্মক প্রভাব পড়ে। এ কারণে বিভিন্ন দীর্ঘস্থায়ী রোগ এবং জন্মগত ত্রুটি দেখা দিতে পারে। যেমন–

ব্রঙ্কাইটিস: বায়ু দূষক যথা- সালফার ডাই অক্সাইড (SO_2), নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড (NO_2) এবং ওজোন (O_3) গ্যাস ব্রঙ্কাইটিস সৃষ্টি করে। এ রোগের প্রধান উপসর্গ-দীর্ঘস্থায়ী কাশি, অত্যধিক মিউকাস ক্ষরণ ও সঞ্চয় এবং বিঘ্নিত শ্বসন।

এমফাইসিমা : এমফাইসিমা হচ্ছে বায়ুদূষণজনিত একটি অনারোগ্য ব্যাধি। সিগারেট, ধূমপানই এমফাইসিমার প্রধান কারণ।

ফুসফুসের ক্যানসার: বায়ু দূষণ এবং ধূমপান ফুসফুস ক্যানসারের প্রধান কারণ। শহরের বায়ু দূষণ তীব্র হওয়ায় গ্রামের তুলনায় শহরে ফুসফুস ক্যানসারে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি।

অ্যাজবেস্টোসিস : উৎপাদন স্থলে বা অট্টালিকা নির্মাণের সময় অ্যাজবেস্টারের প্রভাবে ফুসফুসীয় কলা অসমৃণ হয় এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবে ফুসফুসে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। ফুসফুসের এরূপ অস্বাভাবিক অবস্থাকে অ্যাজবেস্টোসিস বা ফুসফুসীয় ফাইব্রোসিস বলে।

বন্ধ্যাত্ব এবং জন্মগত ত্রুটি: বায়ুতে বিভিন্ন ধরনের তেজস্ক্রিয় পদার্থের উপস্থিতির কারণে অ্যানিমিয়া, লিউকোমিয়া এবং ক্যানসার সৃষ্টি হতে পারে। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের প্রভাবে DNA এর মিউটেশান, বন্ধ্যাত্ব, ভ্রূণের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং জন্মগত ত্রুটি ঘটতে পারে।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, বায়ু দূষণের কারণে সৃষ্ট রোগ মানব জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ।

প্রশ্ন ▶ ১০ হাবিব নারায়ণগঞ্জে বাস করে। সেখানে অনেক শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছে। এসব কারখানার মালামাল পরিবহনে বিভিন্ন যানবাহন ব্যবহৃত হয়। এসব কারখানা ও যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া উক্ত এলাকার পরিবেশের একটি বিশেষ উপাদানকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। ◀ *শিখনফল: ২ ও ৩*

ক. ধোঁয়া কী? ১

খ. ইটের ভাটা কীভাবে বায়ুদূষণ করে? ২

গ. হাবিবের এলাকায় পরিবেশের যে উপাদানটি দূষিত হচ্ছে তার প্রধান দূষক এবং ক্ষণস্থায়ী উপসর্গগুলো সারণিতে উল্লেখ করো। ৩

ঘ. উক্ত দূষণ মানবস্বাস্থ্যের উপর কী ধরনের প্রভাব ফেলবে– বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ধোঁয়া এক ধরনের এরোসল যা কোনো বস্তুর দহনক্রিয়ার ফলে বাতাসে কলয়ডাল কণা হিসেবে ভাসে।

খ বিষাক্ত ধোঁয়া উৎপাদনের মাধ্যমে ইটের ভাটা বায়ু দূষণ ঘটায়।

ইটভাটায় জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় কাঠ এবং কয়লা। এতে প্রচুর ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়। এছাড়া পুরোনো চিমনি ও রুদ্ধ তাপীয় অবস্থার কারণে বায়ু দূষণ হয়।

গ হাবিবের এলাকায় শিল্পকারখানা এবং যানবাহন থেকে সৃষ্ট ধোঁয়ায় বায়ুদূষণ সংঘটিত হচ্ছে।

নিচে বায়ু দূষণের প্রধান দূষক এবং ক্ষণস্থায়ী উপসর্গগুলো সারণিতে উল্লেখ করা হলো।

সারণি: প্রধান বায়ু দূষক এবং ক্ষণস্থায়ী উপসর্গ

দূষক	ক্ষণস্থায়ী উপসর্গ
কার্বন মনোক্সাইড (CO)	মাথাধরা, ঝিমুনি, শারীরিক শক্তি হ্রাস
সালফার ডাইঅক্সাইড (SO_2)	শ্বাসনালীর স্ফীতি ও জ্বালা, অ্যাজমা, কাশি, নাসিকার জ্বালা (irritation)
ক্ষুদ্র ভাসমান কণা (Particulate)	শ্বসনতন্ত্রের জ্বালা
আলোক-রাসায়নিক জারক (photo chemical agent)	শ্বসনতন্ত্র এবং চোখের জ্বালা

ঘ হাবিবের এলাকায় বায়ু দূষণ সংঘটিত হচ্ছে।

মানুষের স্বাস্থ্যের উপর বায়ু দূষণের প্রভাব খুবই ক্ষতিকর। এর প্রভাবে নানা ধরনের রোগ-ব্যাধি হয়। এমন কী মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

মানবস্বাস্থ্যের ওপর বায়ুদূষণ দু'ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। যথা: i) ক্ষণস্থায়ী প্রভাব ও ii) দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব।

ক্ষণস্থায়ী প্রভাব বাতাসে দূষকের স্বল্পকালীন উপস্থিতির ফলে সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ দূষক যতক্ষণ বাতাসে থাকে ততক্ষণই বায়ু দূষিত হয়। এ কারণে অনেক সময় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস দেহের প্রত্যন্ত কোষে অক্সিজেন সরবরাহকারী লোহিত রক্তকণিকায় হিমোগ্লোবিনের সাথে এবং লোহিত অস্থিপেশী কোষে অক্সিজেন সরবরাহকারী কণিকার সাথে যুক্ত হয়ে কোষে অক্সিজেন পরিবহন বিঘ্নিত করে। ফলে মাথাধরা, ঝিমুনি, শারীরিক শক্তি হ্রাস প্রভৃতি দেখা যায়। এ ছাড়া বাতাসে সালফার ও নাইট্রোজেন অক্সাইডের কারণে অ্যাজমা, কাশি, নাসিকায় জ্বালা, চোখের জ্বালা প্রভৃতির সৃষ্টি হয়।

দীর্ঘস্থায়ী বায়ুদূষণের প্রভাবে বায়ু দূষণজনিত দীর্ঘস্থায়ী রোগ অঙ্গ সংস্থানিক বিকৃতি ও জন্মগত ত্রুটি দেখা যায়। ধূমপানের কারণে উৎপন্ন সালফার অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড ও ওজোন গ্যাস ব্রঙ্কাইটিস সৃষ্টি করে। বায়ুদূষণ ফুসফুস ক্যান্সারের অন্যতম প্রধান কারণ। এ ছাড়াও উৎপাদন স্থানে অ্যাজবেস্টারের প্রভাবে অ্যাজবেস্টোসিস রোগ দেখা দেয়। বায়ুতে বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থের উপস্থিতিতে অ্যানিমিয়া, লিউকোমিয়া, ক্যান্সার, মিউটেশান, বন্ধ্যাত্ব, ভ্রূণের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ও জন্মত্রুটি ঘটতে পারে।

সর্বশেষ উল্লেখ না করলেই নয়, বায়ু দূষণের ফলে উপরিউক্ত প্রভাবগুলো ছাড়াও মানুষের মৃত্যুও হতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ১১ ইরাক যুদ্ধে গাড়ি বোমা হামলায় তেজস্ক্রিয় পদার্থের কারণে হাজার হাজার নারী-পুরুষ ও শিশু হতাহত হয়। পরবর্তীতে ঐ এলাকায় যেসব শিশুর জন্ম হয় তারা অধিকাংশ বিকলাঙ্গ ও প্রতিবন্ধী। ◀ *শিখনফল: ২ ও ৩*

ক. কার্বন ডাইঅক্সাইডের ১টি প্রয়োগ ক্ষেত্র লেখো। ১

খ. বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে জন্য মানুষ রেডিও শুনতে পায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত গাড়ি বোমা হামলায় কী ধরনের দূষণ হয়েছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত শিশু জন্মের কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ শোষণ করে।

খ বায়ুমণ্ডলের থার্মোস্ফিয়ার স্তরের জন্য মানুষ রেডিও শুনতে পায়।

এ স্তরে অক্সিজেন অণুগুলো ভেঙে বিদ্যুৎযুক্ত কণায় পরিণত হয়। এ বিদ্যুৎকণাকে আয়ন বলে। এ স্তরে আয়নের পরিমাণ বেশি হওয়ায় বেতার তরঙ্গগুলো প্রতিফলিত হয়ে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসে ফলে এই স্তরের জন্য মানুষ রেডিও শুনতে পায়।

গ উদ্দীপকে গাড়ি বোমা হামলায় তেজস্ক্রিয় পদার্থের কারণে হাজার হাজার নারী-পুরুষ ও শিশু হতাহত হয়। এই হামলায় কারণে বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছড়িয়ে পড়ার ফলে তেজস্ক্রিয় দূষণ সংঘটিত হয়েছিল।

বিভিন্ন পারমাণবিক চুল্লি থেকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ নির্গত হয়। কখনো কখনো পারমাণবিক চুল্লি বিস্ফোরণের ফলে অথবা বোমা হামলার ফলে বিস্তৃত অঞ্চলব্যাপী বিষাক্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থ নির্গত হয়। বায়ুমণ্ডলে এসব তেজস্ক্রিয় পদার্থ ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম, সিজিয়াম প্রভৃতির অত্যধিক নির্গমন বায়ুমণ্ডলকে দূষিত করে ফেলে।

সুতরাং উদ্দীপকে গাড়ি বোমা হামলার কারণে তেজস্ক্রিয় বায়ুদূষণ সংঘটিত হয়েছিল।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত বিকলাঙ্গ শিশু জন্মের কারণ বায়ুতে তেজস্ক্রিয় দূষণ।

উদ্দীপকে গাড়ি বোমা হামলায় তেজস্ক্রিয় পদার্থের কারণে ঐ এলাকায় যেসব শিশুর জন্ম হয় তারা অধিকাংশ বিকলাঙ্গ ও প্রতিবন্ধী।

তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিষক্রিয়ার ফলে খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে জীবদেহে এসে অঙ্গসংস্থানিক ও শরীরবৃত্তীয় বৈকল্যের সৃষ্টি করে। মানুষের শরীরে তেজস্ক্রিয় দূষক প্রবেশ করার ফলে যে অন্তস্থ সংক্রমন ঘটে তা কোনো কারণেই হ্রাস করা যায় না। কারণ কোষীয় নির্বিষকরণ প্রক্রিয়ায় দূষক দূরীভূত হয় না বা অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকারক পদার্থে রূপান্তরিত হয় না।
এ জন্য যে এলাকায় তেজস্ক্রিয় দূষণ সংঘটিত হয় ঐ এলাকায় বিকলাঙ্গ ও প্রতিবন্ধী শিশুর জন্ম হয়।

প্রশ্ন ▶ ১২

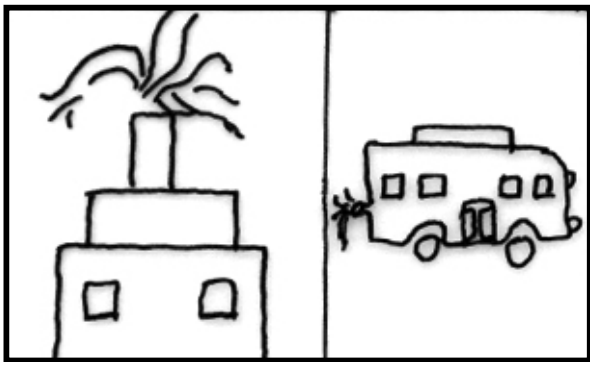

◀ *শিখনফল: ২ ও ৪*

ক. বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয় বায়ুমণ্ডলের কোন স্তর থেকে? ১

খ. বাতাসে CO_2 গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে কেন? ২

গ. চিত্র দুটি দ্বারা কী ধরনের দূষণ হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত দূষণ প্রতিরোধ করার পদক্ষেপগুলো আলোচনা করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয় আয়নোস্ফিয়ার থেকে।

খ CO_2 একটি গ্রিনহাউস গ্যাস। সকল জীব শ্বসন কার্যে এ গ্যাস বাতাসে ত্যাগ করে এবং সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় তা গ্রহণ করে।

বনভূমি ধ্বংস ও গাছপালা নির্বিচারে কাটার ফলে জীবকূলের ত্যাগ করা সবটুকু CO_2 গ্যাস সবুজ উদ্ভিদ গ্রহণ করতে পারে না। তাই বাতাসে CO_2 গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে।

গ চিত্র দুটি দ্বারা শিল্পকারখানা ও যানবাহনের ধোঁয়া বোঝানো হয়েছে যা বায়ু দূষিত করে।

শিল্পকারখানার ধোঁয়া: শিল্পকারখানা থেকে উৎপন্ন ধোঁয়ার সাথে কার্বন-মনোক্সাইড, অ্যামোনিয়া, সালফার ডাই অক্সাইড ইত্যাদি গ্যাস নির্গত হয়। প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের জ্বালানিসমূহের দহনক্রিয়ার (combustion of fuels) ফলে এসব উৎস (source of pollution) হতে দহনকৃত বস্তুর নির্গত গ্যাস বাতাসের সাথে মিশে বায়ুকে দূষিত করছে।

যানবাহনের ধোঁয়া: যানবাহনের কারণে বায়ু দূষণের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যানবাহনের ধোঁয়ার সঙ্গে অবাধে পলিনিউক্লিয়ার হাইড্রোকার্বন, সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড প্রভৃতি বিষাক্ত পদার্থ বাতাসে ভেসে বেড়ায়। ফলে বায়ু দূষিত হয়।

ঘ বায়ু দূষণ প্রতিরোধ করার পদক্ষেপসমূহ–

i. কলকারখানার নির্গত দূষিত গ্যাস নিয়ন্ত্রণে উন্নত প্রযুক্তি কাজে লাগাতে হবে। প্রতিটি কারখানায় বায়ু দূষণ নিরোধক প্লান্ট নির্মাণ করতে হবে।

ii. কারখানা ও যানবাহনে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার হ্রাস করতে হবে।

iii. জীবাশ্ম জ্বালানির (fossil fuels) পরিবর্তে সৌর শক্তি, জৈব গ্যাস ব্যবহার করতে হবে।

iv. কলকারখানার চিমনি যথেষ্ট উঁচু (>১৫০ ফুট) করতে হবে।

v. লোকালয় থেকে কারখানা দূরে স্থাপন করে আশেপাশে প্রচুর বৃক্ষরোপণ করতে হবে।

উপরোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণের মাধ্যমে বায়ু দূষণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ ফিরোজদের বাড়ি শহরের কাছাকাছি। তাদের বাড়ির আশেপাশে অনেকগুলো কলকারখানা ও ইটভাটা গড়ে উঠেছে। ফলে এ এলাকার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ হলেও অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ছে। এমনকি অনেক গাছপালাও মরে যাচ্ছে। এলাকাবাসী এ সকল সমস্যা দূরীকরণে কারখানা ও ইটভাটার মালিকদের পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করতে বলেন।

◀ *শিখনফল: ২ ও ৪*

ক. CFC কী? ১
খ. বাতাসে CO_2 এর পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে কেন? ২
গ. ফিরোজদের এলাকার পরিবেশ দূষিত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত সমস্যা দূরীকরণে ইটভাটা ও কারখানার মালিকদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক CFC হলো ক্লোরিন, ফ্লোরিন ও কার্বনের একটি উদ্বায়ী (volatile) যৌগ, যা বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য দায়ী।

খ CO_2 একটি গ্রিন হাউস গ্যাস।
সকল জীব শ্বসন ক্রিয়াকালে CO_2 বাতাসে ত্যাগ করে। আবার সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় এ গ্যাস গ্রহণ করে। বনভূমি ধ্বংস ও গাছপালা নির্বিচারে কাটার ফলে জীবকুলের ত্যাগ করা সবটুকু CO_2 সবুজ উদ্ভিদ গ্রহণ করতে পারে না। এজন্য বাতাসে CO_2 গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে।

গ ফিরোজদের এলাকার পরিবেশ দূষিত হওয়ার কারণ বায়ু দূষণ। উক্ত এলাকায় বিভিন্ন কারণে বায়ু দূষিত হচ্ছে। যেমন–
যানবাহন: ফিরোজদের বাসা শহরের কাছাকাছি হওয়ায় যান চলাচলের মাধ্যমে তাদের এলাকার পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। কারণ যানবাহন থেকে প্রচুর দূষণকারী পদার্থ নির্গত হয়। মোটরযান থেকে হাইড্রোকার্বন, নাইট্রোজেন অক্সাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি গ্যাস নির্গত হয়ে বায়ু দূষিত হচ্ছে।
শিল্প কারখানা: শিল্পকারখানার বিভিন্ন দূষক পদার্থ বায়ুর সাথে মিশে বায়ুকে দূষিত করে। বিভিন্ন শিল্প কারখানা থেকে কার্বন মনোক্সাইড, অ্যামোনিয়া, সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড ইত্যাদি গ্যাস নির্গত হয়ে বায়ুকে দূষিত করে। এছাড়াও শহর এলাকার বর্জ্য, শিল্পকারখানার বর্জ্য পুড়িয়ে বায়ুকে দূষিত করা হচ্ছে।
ইটের ভাটার ধোঁয়া: ইটভাটায় যে কয়লা ও কাঠ পোড়ানো হয় তা থেকে প্রচুর ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়, যা বায়ুকে দূষিত করে।
উপরিউক্ত কারণে ফিরোজদের এলাকার বায়ু দূষিত হচ্ছে যার প্রভাব পরিবেশ এবং মানুষের উপর পড়ছে।

ঘ ফিরোজদের এলাকার সমস্যাটি হলো বায়ু দূষণ। বায়ু হলো কতিপয় গ্যাসীয় উপাদান, যা সর্বদা পৃথিবীকে আবৃত করে রেখেছে। বায়ুমণ্ডলের মধ্যে যখন দূষিত গ্যাস, ধোঁয়া, বাষ্প ইত্যাদি উপাদানের সমাবেশ ঘটে তখন বায়ু দূষিত হয়।
বায়ু দূষণ প্রতিরোধে ইটভাটা ও কারখানার মালিকগণ যেসব পদক্ষেপ নিতে পারেন সেগুলো হলো—
i. কলকারখানা থেকে নির্গত দূষিত গ্যাস নিয়ন্ত্রণে উন্নত প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বায়ু দূষণ বন্ধ করা। এক্ষেত্রে প্রতিটি কারখানায় বায়ু দূষণ নিরোধক প্লান্ট নির্মাণ করা যেতে পারে।
ii. জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার হ্রাস করতে হবে।
iii. কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতির পরিবর্তে সৌর শক্তি, জৈব গ্যাস ব্যবহার করা।
iv. ইটের ভাটা ও কলকারখানার চিমনি উঁচু রাখা।
v. শহর বা লোকালয় হতে দূরে নির্দিষ্ট স্থানে ইটের ভাটা ও কলকারখানা স্থাপন করা।
vi. ইটের ভাটা ও কারখানার চারদিকে প্রচুর বৃক্ষরোপণ করা।

উপরিউক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ইটভাটা ও কারখানার মালিকগণ বায়ু দূষণ প্রতিরোধ করতে পারেন।

প্রশ্ন ▶ ১৪

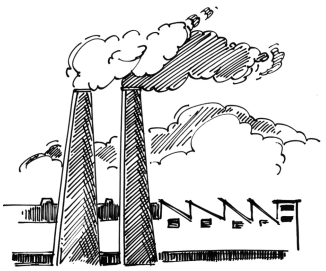

◀ *শিখনফল: ৩ ও ৪*

ক. বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয় কোন স্তর থেকে? ১
খ. বাতাসে CO_2 গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে কেন? ২
গ. চিত্রের দূষণ উক্ত এলাকার উদ্ভিদের উপর কী ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করবে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বৃক্ষরোপন কীভাবে উক্ত দূষণ প্রতিরোধে ভূমিকা পালন করে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয় আয়োনোস্ফিয়ার স্তর থেকে।

খ কারখানা ও যানবাহনে জ্বালানির দহনে বাতাসে প্রচুর পরিমাণ CO_2 নির্গত হয়। আবার ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকল জীব শ্বসন কার্যে CO_2 ত্যাগ করে। অন্যদিকে সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় CO_2 ব্যবহার করে।

বনভূমি ধ্বংস ও গাছপালা নির্বিচারে কাটার ফলে জীব সম্প্রদায়ের ত্যাগ করা CO_2 গ্যাসের সবটুকু সবুজ উদ্ভিদ গ্রহণ করতে পারছে না। তাই বাতাসে CO_2 গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে।

গ উক্ত দূষণ হলো বায়ুদূষণ। এ দূষণ বিভিন্ন মাত্রায় উদ্ভিদের ক্ষতি করতে পারে। যেমন–
উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডলের সাথে সরাসরি গ্যাস বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে বায়ুদূষক (CO, CO_2) গ্রহণ করবে অথবা মাটিতে পতিত হলে তা পানিতে দ্রবীভূত হয়ে উদ্ভিদ কর্তৃক শোষিত হতে পারে। এসিডিক বায়ু দূষক (SO_2) বৃষ্টির সাথে অথবা উপরিভাগে সঞ্চিত জলীয়বাষ্পের (কুয়াশা, শিশির) সাথে দ্রবীভূত হয়ে মাটিতে পতিত হয়ে দূষণ ঘটায়।
বায়ু দূষণের মাত্রা কম হলেও ধীরে ধীরে তা উদ্ভিদ প্রজাতির গঠনে পরিবর্তন আনে। এছাড়া বায়ুদূষক উদ্ভিদ প্রজাতির উপর

সঞ্চিত হয়ে খাদ্য শৃঙ্খলে প্রবেশ করে থাকে। বায়ুদূষক উদ্ভিদের পাতা, কচি ডগা, ফলে আক্রমণ চালিয়ে সৌন্দর্য বিনষ্ট করে থাকে। সুতরাং বলা যায় যে, বায়ু দূষণের ফলে উদ্দীপকের অঞ্চলটির উদ্ভিদের উপর মারাত্মক প্রভাব পড়ছে।

ঘ অপরিকল্পিতভাবে শিল্পকারখানা এবং ইটের ভাটা নির্মিত হওয়ায় সেগুলো থেকে নির্গত ধোঁয়া বায়ু দূষণের সৃষ্টি করে।
বৃক্ষরোপণ বায়ুদূষণ রোধ করার অন্যতম উপায়। মূলত ক্ষতিকর উপাদান (যেমন: CO_2) গ্রহণ করে বায়ুকে নির্মল রাখার ক্ষেত্রে বৃক্ষরোপণের বিকল্প নেই।

বৃক্ষ বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে। বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের ঘাটতি গাছপালাই পূরণ করে থাকে। নাইট্রোজেন ও সালফারের অক্সাইডসমূহ (NOx ও SO_x) পরিশোধনেও কিছু উদ্ভিদরাজি (যেমন– শিম জাতীয় উদ্ভিদ) কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এভাবে গাছ প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে; সেই সাথে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। এর মাধ্যমে বায়ু দূষণ রোধ করা অনেকাংশেই সম্ভব।

সুতরাং বৃক্ষরোপণ বায়ুদূষণ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ১৫

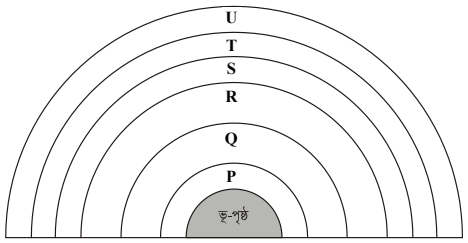

◀ *শিখনফল: ১*

ক. বায়ুমণ্ডল কী? ১

খ. পৃথিবীর প্রাকৃতিক সৌরপর্দা বলা হয় কোন স্তরকে এবং কেন? ২

গ. 'Q' স্তরটির প্রধান বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'R' এবং 'S' স্তরের মধ্যে কোনটি আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভূপৃষ্ঠের চারদিকে জীবজগতের প্রাণ ধারণের প্রয়োজনীয় যে গ্যাসীয় আবরণ পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে তাই বায়ুমণ্ডল।

খ ওজোন স্তরকে 'পৃথিবীর প্রাকৃতিক সৌরপর্দা' হিসেবে অভিহিত করা হয়।

ওজোন স্তর সূর্য হতে আগত অতিবেগুনি রশ্মিকে অতি সহজে শোষণ করে। এ কারণে এখানে তাপমাত্রা অনেক বেশি। এই স্তর না থাকলে ঐ রশ্মির দহনে প্রাণীর দেহ পুড়ে যেত এবং সমস্ত প্রাণিকুল অন্ধ হয়ে যেত। এজন্য বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরকে পৃথিবীর প্রাকৃতিক সৌরপর্দা বলা হয়।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ বায়ুমণ্ডলের স্ট্রাটোস্ফিয়ার বস্তুটি বর্ণনা করো।

ঘ মেসোমণ্ডল ও তাপমণ্ডলের মধ্যে তাপমণ্ডল আমাদের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ– বিশ্লেষণ করো।

প্রশ্ন ▶ ১৬

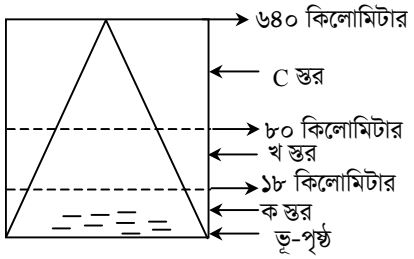

◀ *শিখনফল: ১*

ক. প্রতি ১০০০ মিটার উচ্চতায় কত তাপমাত্রা হ্রাস পায়?

খ. বায়ুমণ্ডলকে খালি চোখে দেখা যায় না কেন?

গ. 'ক' স্তরটির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'খ' স্তরটির ক্ষতি হলে প্রাণীজগত ধ্বংস হবে– উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো।

পঞ্চম অধ্যায়
জলবায়ুর উপাদান ও নিয়ামক

পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶১ আবহাওয়া ও জলবায়ুর গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের জন্যই পৃথিবীতে জীবজগতের সৃষ্টি হয়েছে। যেসব উপাদানের গড় অবস্থা বিবেচনা করে আবহাওয়া ও জলবায়ু নির্ধারণ করা হয় তাদের মধ্যে তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও বায়ুপ্রবাহ অন্যতম। আবার কিছু জলবায়ু নিয়ন্ত্রণকারী নিয়ামক রয়েছে যাদের প্রভাবে বিভিন্ন স্থানে জলবায়ুর পার্থক্য সৃষ্টি হয়। এদের মধ্যে অক্ষাংশের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। ◀ *শিখনফল: ১ [প্রফেসর মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী; অনু-১]*

ক. বায়ুচাপ কাকে বলে? ১

খ. আবহাওয়া ও জলবায়ুর পার্থক্য লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত জলবায়ুর উপাদানগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে কোন নিয়ামকটি জলবায়ুকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে বিশ্লেষণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৃথিবীর মাধ্যকর্ষণ শক্তির প্রভাবে বায়ুমণ্ডল ভূপৃষ্ঠের প্রতি বর্গকিলোমিটার স্থানের উপর যে বল প্রয়োগ করে তাকে বায়ুচাপ বলে।

খ আবহাওয়া হলো কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানের নির্দিষ্ট সময়ের বায়ুণ্ডলের তাপমাত্রা, বায়ুর চাপ, বায়ুর প্রবাহ, আর্দ্রতা বৃষ্টিপাত ইত্যাদি অবস্থা।

অপরদিকে, জলবায়ু বলতে একটি বৃহৎ অঞ্চল জুড়ে আবহাওয়ার উপাদানগুলো যেমন-বায়ুর তাপ, চাপ, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত ইত্যাদির অন্তত ৩০-৩৫ বছরের যে গড় অবস্থা দেখা যায় তাকে বোঝায়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত তাপমাত্রা, বায়ুর চাপ, বায়ুর গতি, বায়ুর আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি জলবায়ুর উপাদান। নিম্নে উপাদানসমূহের বর্ণনা দেওয়া হলো:

তাপমাত্রা: তাপমাত্রার পরিমাপের উপর কোনো স্থানের জলবায়ু বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাপমাত্রা বেশি হলে দেশটিতে উষ্ণতম জলবায়ু উপভোগ করে, আবার তাপমাত্রা খুব কম বা মধ্যম হলে দেশটিতে যথাক্রমে মেরুদেশীয় অথবা নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর সৃষ্টি হয়।

বায়ুর চাপ : বায়ুর চাপ জলবায়ুর একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান। বিভিন্ন স্থানে চাপের মধ্যে পার্থক্য থাকে বলে আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যেও পার্থক্য হয়ে থাকে।

বায়ুর গতি: বায়ুর গতিও আবহাওয়া এবং জলবায়ুর উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সমুদ্র হতে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু কোনো অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হলে সে অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় এবং তাপ হ্রাস পায়। কিন্তু স্থলভাগ হতে আগত বায়ুর প্রভাবে তাপ হ্রাস পায় না। এ বায়ু শুষ্ক হলে এর দ্বারা বৃষ্টিপাত হয় না।

বায়ুর আদ্রতা: আর্দ্রতাও আবহাওয়া ও জলবায়ুর একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান। বায়ুতে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিকে আর্দ্রতা বলে। আর্দ্রতার প্রভাবে বৃষ্টিপাত ঘটে। বায়ু আর্দ্র হলে জলবায়ু শীতল হয় এবং বায়ুর শুষ্কতা জলবায়ুকে উষ্ণ করে তোলে।

বৃষ্টিপাত: বৃষ্টিপাত আবহাওয়া ও জলবায়ুর একটি প্রধান উপাদান। কোনো স্থানে বৃষ্টিপাত বেশি হলে সেখানকার জলবায়ু আর্দ্র থাকে এবং বৃষ্টিপাত কম হলে জলবায়ু শুষ্ক হয়।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে অক্ষাংশ নিয়ামকটি জলবায়ুকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে।

অক্ষাংশ অনুযায়ী সূর্যরশ্মি কোথাও লম্বভাবে আবার কোথাও হেলে পড়ে। নিরক্ষরেখায় সূর্যরশ্মি সারা বছর প্রায় লম্বভাবে পড়ে সে জন্য নিরীক্ষীয় অঞ্চল সর্বাপেক্ষা উষ্ণ হয়। নিরক্ষরেখা হতে যতই উত্তরে বা দক্ষিণে যাওয়া যায় ততই সূর্যরশ্মি অধিককর তির্যকভাবে পড়ে এবং দিন ছোট ও বড় হতে থাকে। ফলে নিরক্ষরেখা হতে উত্তর ও দক্ষিণে তাপমাত্রা ক্রমে কমতে থাকে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, গড়ে প্রতি ১° অক্ষাংশে ১° সেলসিয়াস উষ্ণতা হ্রাস পায়। এ কারণে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে অধিক শীত এবং এ অঞ্চল দুটি সর্বদা বরফে ঢাকা থাকে।

সুতরাং বলা যায়, এভাবেই অক্ষাংশ নিয়ামকটি জলবায়ুর উপর গুরত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

প্রশ্ন ▶২ তিথি তার ভাই এর সাথে ভূগোলকে স্থান ও বিভিন্ন দেশ খোঁজার খেলা খেলছে। ৯০° উত্তর নির্দেশ করে তিথি জিজ্ঞেস করলো এ বিন্দুকে কি বলে? উত্তর দিয়ে তার ভাই জানালো ৯০° দক্ষিণেও একই তাপমাত্রা বিরাজ করে।

◀ *শিখনফল: ২*

ক. কোন কোন এলাকা নিয়ে উষ্ণমণ্ডল গঠিত? ১

খ. নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে নির্দেশিত তাপমণ্ডল সারা বছর বরফাবৃত থাকে কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত তাপমণ্ডলের নিম্ন অক্ষাংশে যে দুটি তাপমণ্ডল রয়েছে, সেগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিরক্ষরেখার উভয় পাশে কর্কট ও মকরক্রান্তি রেখার মধ্যবর্তী ও সন্নিহিত অঞ্চল নিয়ে উষ্ণমণ্ডল গঠিত।

খ উত্তর ও দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণমন্ডল নিয়ে নাতিশীতোষ্ণ মন্ডল গঠিত।

উত্তরে কর্কটক্রান্তি থেকে সুমেরুবৃত্ত এবং দক্ষিণে মকরক্রান্তি থেকে কুমেরুবৃত্ত পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলকে যথাক্রমে উত্তর এবং দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণ মন্ডল বলে। এ দুটি মন্ডল একত্রে নাতিশীতোষ্ণ মন্ডল নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে তিথি ও তার ভাই ভূগোলকে যে দুটি তাপমন্ডল নির্দেশ করেছে সেগুলো হলো উত্তর ও দক্ষিণ হিমমন্ডল।

উত্তর ও দক্ষিণ হিমমন্ডল সারা বছর বরফাচ্ছন্ন থাকে কারণ, এ অঞ্চল দুটিতে তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রির নিচে থাকে।

উত্তর গোলার্ধে সুমেরুবৃত্ত এবং দক্ষিণ গোলার্ধে কুমেরুবৃত্ত থেকে মেরু বিন্দু পর্যন্ত সূর্য রশ্মির তির্যক পতনের কারণে বছরের কোনো সময়েই অঞ্চল দুইটি পর্যাপ্ত তাপ পায় না যা বায়ুমন্ডলীয় তাপমাত্রাকে শূন্য ডিগ্রির বেশি করতে পারে। ফলে এসব এলাকা বরফাচ্ছন্ন থাকে। শীতকালে এ অঞ্চল অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে এবং তাপমাত্রা আরও নিচে নেমে যায়।

সুতরাং বলা যায়, হিমমন্ডলের অঞ্চল দুইটি তথা মেরুবৃত্ত থেকে মেরু বিন্দু পর্যন্ত অঞ্চল সারাবছর বরফে আবৃত থাকে।

ঘ উক্ত তাপমন্ডলের নিম্ন অক্ষাংশে উত্তর ও দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণ মন্ডল রয়েছে। এ অঞ্চল দুটিতে গড় তাপমাত্রা ০°-২৭° সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে।

উত্তর ও দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণ মন্ডলের বিস্তৃতি প্রায় ৪,৮০০ কিলোমিটার। এর সীমানায় মেরুবৃত্ত অবস্থিত। ফলে এখানে তাপমাত্রা দুই ক্রান্তীয় অঞ্চল অপেক্ষা অনেক কম। তাই ক্রান্তীয় অবস্থানের নিকটবর্তী অঞ্চলকে উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ মন্ডল এবং দু মেরুবৃত্তের নিকটবর্তী অঞ্চলকে শীতল নাতিশীতোষ্ণ মন্ডল বলে।

সুতরাং বলা যায়, হিমমন্ডল থেকে নিম্ন অক্ষাংশে নাতিশীতোষ্ণ মন্ডলের অবস্থান যেখানে তাপমাত্রা সহনীয় এবং জীবজগতের বসবাসের অনুকূল।

প্রশ্ন ▶৩ জুলাই মাস। হিমেল যুক্তরাষ্ট্র যাচ্ছে। যাওয়ার আগে বন্ধুর সাথে দেখা করতে গেলে সে বলল শরীরের দিকে লক্ষ রেখো। এ সময় সেখানে আবহাওয়া খুব সুবিধাজনক নয়।

◀ শিখনফল: ২

ক. উত্তর হিমমন্ডল কাকে বলে? ১

খ. উষ্ণমন্ডল বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সময়ে হিমেলের ভ্রমণকৃত দেশের তাপমাত্রা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের তাপের বিন্যাস বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক উত্তর গোলার্ধে সুমেরুবৃত্ত থেকে মেরু বিন্দু অর্থাৎ ৯০° উত্তর পর্যন্ত অঞ্চলকে উত্তর হিমমন্ডল বলে।

খ নিরক্ষরেখার উভয় পাশে কর্কট ও মকরক্রান্তি রেখার মধ্যবর্তী ও সন্নিহিত অঞ্চল নিয়ে উষ্ণমন্ডল গঠিত।

সাধারণত ২৭° সে. বা ৮০° F সমোষ্ণরেখা বিশিষ্ট অঞ্চলই উষ্ণমন্ডল। এ অঞ্চলের যেকোনো স্থানে বার্ষিক গড় উষ্ণতা সাধারণত ২৭° সে. হয়। তবে স্থান বিশেষে যেমন- বালুকাময় মরুভূমিতে বেশিও হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে জুলাই মাসের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এ সময়টিতে হিমেল যুক্তরাষ্ট্র যাচ্ছে। এ মাসে মেরু প্রদেশের কাছাকাছি অঞ্চলে তাপমাত্রা চরম থাকে।

যুক্তরাষ্ট্র উত্তর মেরু প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। জুলাই মাসে এখানকার তাপমাত্রা প্রায় চরমে থাকে। দেশটির ব্যাপক বিস্তৃতির কারণে সর্বত্র একই তাপমাত্রা না থাকলেও ২৫° সে. এর উপরে থাকে। ৩০° সে. সমোষ্ণরেখা দ্বারা সৃষ্ট নিম্নচাপ বৃত্তগুলো যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে স্থান করে নেয়।

ঘ উদ্দীপকে জুলাই মাসের উল্লেখ করা হয়েছে।

জুলাই মাসের উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের তাপের বিন্যাস বিপরীতমুখী।

উত্তর গোলার্ধে তাপের বিন্যাস : জুলাই মাসে ৪৫° সে. সমোষ্ণরেখা সাহারা মরুভূমিতে ক্ষুদ্র এলাকা বেষ্টন করে থাকে। এ এলাকাকে ঘিরে বাইরের দিকে ক্রমান্বয়ে তাপমাত্রা কমতে থাকে। ৩০° সে. সমোষ্ণরেখা দ্বারা সৃষ্ট নিম্নচাপ বৃত্তগুলো আফ্রিকার উত্তর দিকে এবং এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে স্থান করে নেয়। এ সময় এসব অঞ্চলে রীতিমতো উত্তপ্ত (>২৫° সে.) অবস্থা বিরাজ করে। ২০° উত্তর অক্ষাংশের অঞ্চলগুলোতে বেশি তাপ অনুভূত হয়। এভাবে ধীরে ধীরে সমতাপ রেখাগুলোর মান দক্ষিণ থেকে উত্তরে কমতে থাকে।

দক্ষিণ গোলার্ধে তাপের বিন্যাস : উত্তর গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল, দক্ষিণ গোলার্ধে তখন শীতকাল। দক্ষিণ গোলার্ধে স্থলভাগ খুব কম থাকায় সমোষ্ণরেখাগুলো প্রায় সোজাভাবে পূর্ব-পশ্চিমে প্রলম্বিত হয়। ২০° সে. সমোষ্ণরেখা দক্ষিণ গোলার্ধে প্রায় ২০° অক্ষাংশের ওপর অবস্থান করে। নিরক্ষরেখা থেকে যত দক্ষিণে যাওয়া যায় তত এ রেখাগুলোর মান কমতে থাকে।

প্রশ্ন ▶৪

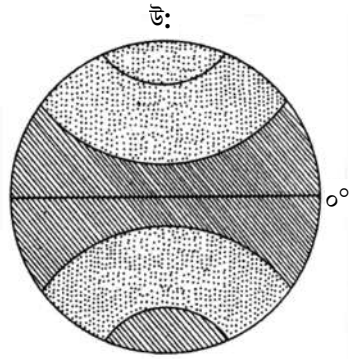

◀ শিখনফল-২ [ড. সৈয়দ শাহজাহান আহমেদ; অনু-৪]

ক. বায়ুতে জলীয়বাষ্পের উপস্থিতিকে কী বলে? ১

খ. টর্নেডো বলতে কী বোঝায়? ২

গ. চিত্রে প্রদর্শিত রেখা এবং অঞ্চলগুলোর নামকরণপূর্বক পাঠ্যবইয়ের আলোকে চিত্রটি বুঝিয়ে দাও। ৩

ঘ. চিত্রের বিভাজনকৃত অঞ্চলগুলোর বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বায়ুতে জলীয়বাষ্পের উপস্থিতিতে আর্দ্রতা বলে।

খ টর্নেডো এক প্রকারের আবর্তনশীল অতি ক্ষুদ্র আকারের বজ্রঝড়।

আয়তনে এটি ক্ষুদ্র হলেও তান্ডবতায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। দেখে মনে হবে, হাতির শুঁড়ের মতো কালো মেঘ আকাশ থেকে নেমে আসছে মাটিতে। বাতাসের বেগ ঘণ্টায় ৪০০-৮০০ কি. মি.।

গ উদ্দীপকের চিত্রটি পৃথিবীর তাপ বলয়ের চিত্র।

পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ অক্ষাংশগুলোর অবস্থান অনুযায়ী পৃথিবীকে উভয় গোলার্ধে তিনটি করে মোট পাঁচটি উষ্ণতা বলয়ে ভাগ করা হয় (উভয় গোলার্ধের উষ্ণমণ্ডলকে একত্রে একটি বলয় হিসেবে ধরা হয়েছে)। নিচে প্রদর্শিত রেখা এবং অঞ্চলগুলোর নামকরণ করা হলো-

গোলাকৃতি পৃথিবীর উষ্ণতার তাপ অঞ্চলসমূহ সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে বলয়ের মতো আবৃত করে অবস্থান করছে বলে এদের উষ্ণতা বলয় বলে। তাপ বলয় মূলত সূর্যরশ্মির হ্রাস-বৃদ্ধির উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর তাপ বলয়গুলো হলো উষ্ণমণ্ডল, উত্তর নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল, উত্তর হিমমণ্ডল ও দক্ষিণ হিমমণ্ডল।

নিরক্ষরেখার দুদিকে অর্থাৎ ২৩ $\frac{১^\circ}{২}$ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৩ $\frac{১^\circ}{২}$ দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত স্থান দ্বারা উষ্ণমণ্ডল বোঝানো হচ্ছে। এ অঞ্চলে সারা বছর সূর্য খাড়াভাবে কিরণ দেয় এবং দিন ও রাত্রির দৈর্ঘ্যে খুব বেশি পার্থক্য হয় না। উত্তরে কর্কটক্রান্তি রেখা থেকে সুমেরুবৃত্ত (২৩ $\frac{১^\circ}{২}$ থেকে ৬৬ $\frac{১^\circ}{২}$ উত্তর অক্ষাংশ) পর্যন্ত প্রসারিত স্থান হলো উত্তর নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল।

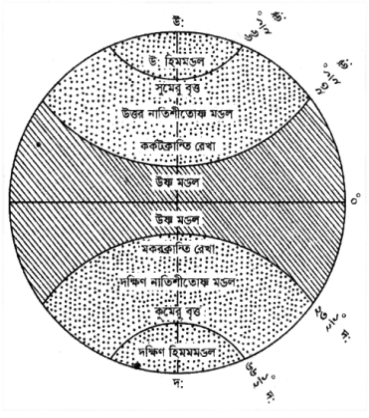

চিত্র : তাপ বলয়

দক্ষিণে মকরক্রান্তি রেখা থেকে কুমেরুবৃত্ত পর্যন্ত প্রসারিত স্থান হলো দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল। উত্তর ও দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল সারা বছরই মধ্যম উষ্ণ থাকে। চিত্রে প্রদর্শিত উত্তর প্রান্তের সুমেরুবৃত্ত থেকে সুমেরু বিন্দু (অর্থাৎ ৬৬ $\frac{১^\circ}{২}$ – ৯০° উঃ) এবং দক্ষিণ প্রান্তের কুমেরুবৃত্ত থেকে কুমেরু বিন্দু (৬৬ $\frac{১^\circ}{২}$ উঃ – ৯০° দঃ) পর্যন্ত অংশে সারা বছরই সূর্যরশ্মি তির্যকভাবে পড়ায় উষ্ণতা বেশ কমই পাওয়া যায়। এজন্য এ অঞ্চল দুটিকে যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ হিমমণ্ডল নামে অভিহিত করা হয়।

ঘ উদ্দীপকে প্রদর্শিত চিত্রটি হলো পৃথিবীর তাপ বলয়ের চিত্র। এতে বিভাজনকৃত অঞ্চলগুলো হলো- উষ্ণমণ্ডল, উত্তর ও দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল, উত্তর ও দক্ষিণ হিমমণ্ডল।

উষ্ণমণ্ডল : নিরক্ষরেখার দুদিকে অর্থাৎ ২৩ $\frac{১^\circ}{২}$ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৩ $\frac{১^\circ}{২}$ দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত স্থান এ মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। এ অঞ্চলে বছরের অধিকাংশ সময় সূর্যরশ্মি প্রায় খাড়াভাবে পড়ে এবং কোনো সময়ই দিন ও রাত্রির দৈর্ঘ্যের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য হয় না। অঞ্চলটির উত্তর সীমায় কর্কটক্রান্তি এবং দক্ষিণ সীমায় মকরক্রান্তি রেখা অবস্থিত। এ অঞ্চলে বার্ষিক গড় উষ্ণতার পরিমাণ ২৭° সে.।

উত্তর ও দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল :

উত্তরে কর্কটক্রান্তি রেখা থেকে সুমেরুবৃত্ত (২৩ $\frac{১^\circ}{২}$ থেকে ৬৬ $\frac{১^\circ}{২}$ উত্তর অক্ষাংশ) এবং দক্ষিণে মকরক্রান্তি রেখা থেকে কুমেরুবৃত্ত ২৩ $\frac{১^\circ}{২}$ থেকে ৬৬ $\frac{১^\circ}{২}$ দক্ষিণ অক্ষাংশ) পর্যন্ত প্রসারিত স্থানই যথাক্রমে উত্তর নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল এবং দক্ষিণ অন্তর্ভুক্ত।

এ অঞ্চল দুটি সারা বছরই মধ্যম উষ্ণ থাকে, যেখানকার গড় উষ্ণতা মোটামুটি ০°-২৭° সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে।

উত্তর ও দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের একত্রে সর্বাধিক বিস্তৃতি ৮০০ কিলোমিটার হওয়ায় এদের যে সীমানা মেরুবৃত্তে অবস্থিত সেখানকার উষ্ণতা দুই ক্রান্তীয় অঞ্চলের উষ্ণতা অপেক্ষা অনেক কম।

দুই ক্রান্তীয় অঞ্চলের নিকটবর্তী অঞ্চলকে উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল এবং দুই মেরুবৃত্তের নিকটবর্তী অঞ্চলকে শীতল নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল নামে অভিহিত করা হয়।

উত্তর ও দক্ষিণ হিমমণ্ডল —

পৃথিবীর উত্তর প্রান্তের সুমেরুবৃত্ত থেকে সুমেরু বিন্দু (অর্থাৎ ৬৬ $\frac{১^\circ}{২}$ থেকে ৯০° উত্তর) এবং দক্ষিণ প্রান্তের কুমেরুবৃত্ত থেকে কুমেরু বিন্দু ৬৬ $\frac{১^\circ}{২}$ উত্তর থেকে ৯০° দক্ষিণ) পর্যন্ত অংশে সারা বছরই সূর্যরশ্মি তির্যকভাবে পড়ায় উষ্ণতা বেশ কমই পাওয়া যায়। সারা বছর বরফে আবৃত থাকায় এ অঞ্চল দুটি যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ হিমমণ্ডল নামে পরিচিত।

প্রশ্ন ▶৫ রওনক মনে রাখার সুবিধার জন্য চাপবলয়গুলোর বৈশিষ্ট্যের একটি ছক তৈরি করল।

চাপবলয়	প্রধান বৈশিষ্ট্য
নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়	.....
উপক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয়	.....
উপ মেরু নিম্নচাপ বলয়	.....
মেরুদেশীয় উচ্চচাপ বলয়	.....

◀ শিখনফল: ৩

ক. জলবায়ু কাকে বলে? ১

খ. জল ও স্থলভাগের অবস্থান কীভাবে জলবায়ুর নিয়ামক হিসেবে কাজ করে? ২

গ. উক্ত চাপবলয়গুলো চিত্রে দেখাও। ৩

ঘ. ছকে উল্লিখিত চাপবলয়গুলোর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি বৃহৎ অঞ্চল জুড়ে আবহাওয়ার উপাদানগুলোর অন্তত ৩০-৩৫ বছরের গড় অবস্থাকে জলবায়ু বলে। যেমন-দক্ষিণ এশিয়ার মৌসুমি জলবায়ু।

খ স্থলভাগ অপেক্ষাকৃত দ্রুত সৌরতাপ গ্রহণ ও বিকিরণ করতে পারে। ফলে দিনের বেলা স্থলভাগ দ্রুত উত্তপ্ত এবং রাতে শীতল হয়। স্থল ও জলভাগের পাশাপাশি অবস্থান তাই কোনো স্থানের জলবায়ুকে প্রভাবিত করে। যেমন– উক্ত বৈশিষ্ট্যের কারণে স্থল ও সমুদ্র বায়ু প্রবাহিত হয়।

সমুদ্র থেকে দূরবর্তী অবস্থানে বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ কম থাকে এবং শীত ও গ্রীষ্মে তাপমাত্রার পার্থক্য বেশি হয়। অন্যদিকে উপকূলবর্তী এলাকার জলবায়ু সমভাবাপন্ন হয়। যেমন- বাংলাদেশের উপকূলবর্তী জেলা কক্সবাজারের জলবায়ু উত্তরের রংপুর থেকে অধিক আরামদায়ক।

গ উদ্দীপকের চাপবলয়গুলো পৃথিবীব্যপী বিন্যস্ত বায়ু চাপবলয় নির্দেশ করে। ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুমণ্ডলে চাপবলয়গুলো সুবিন্যস্ত। এ বায়ুচাপবলয়গুলো দুটি গোলার্ধে বিস্তৃত।

উক্ত চাপবলয়গুলো চিত্রে দেখানো হলো:

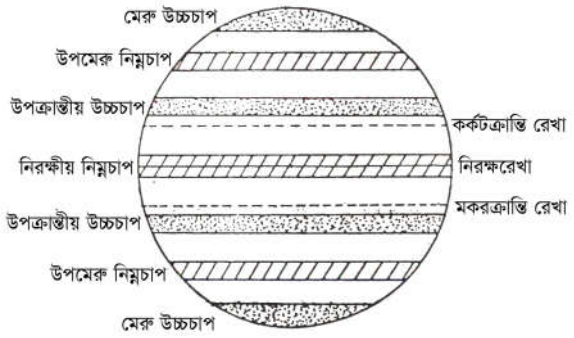

চিত্র : পৃথিবীর বায়ুচাপ বলয়

ঘ উভয় গোলার্ধে বিস্তৃত পৃথিবীতে সর্বমোট ৭টি চাপবলয় রয়েছে। এ চাপবলয়গুলো বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে চার ধরনের। যেমন-

i. **নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় :** নিরক্ষরেখা ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সূর্য সারাবছরই লম্বভাবে কিরণ দেয়। ফলে এখানে জলভাগ থেকে প্রচুর জলীয়বাষ্পের সৃষ্টি হয় এবং বায়ুর চাপ কমে যায়। এখানে বায়ুর আনুভূমিক প্রবাহ বোঝা যায় না। এজন্যে একে নিরক্ষীয় শান্ত বলয় বলে।

ii. **উপক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয় :** এ অঞ্চলের বায়ু শীতল ও ভারী হয়। উচ্চচাপ বিশিষ্ট কর্কটক্রান্তীয় শান্ত বলয়কে অশ্ব অক্ষাংশ বলে।

iii. **উপমেরু নিম্নচাপ বলয় :** ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে এ চাপ বলয়ের স্থান পরিবর্তন হয়। মূলত পশ্চিমা বায়ু ও মেরু বায়ুর মিলিত অঞ্চলকে উপমেরু নিম্নচাপ (মেরু প্রদেশীয় শান্ত) বলয় বলে।

iv. **মেরুদেশীয় উচ্চচাপ বলয় :** এখানে বাতাস খুব ঠান্ডা ও ভারী। সূর্যকিরণের অভাবে জলীয়বাষ্পও খুব কম থাকে। উল্লেখ্য পৃথিবীর আবর্তনে মেরুবৃত্তীয় নিম্নচাপ এলাকা থেকে ছিটকে যাওয়া ঊর্ধ্বগামী বাতাস শীতল ও ভারী হয়ে এখানে নেমে আসে। ফলে এখানে চাপ বৃদ্ধি পায়। এভাবে মেরুদেশীয় উচ্চচাপ বলয়ের সৃষ্টি হয়েছে।

পৃথিবীর বায়ুচাপবলয়গুলো মূলত নিয়ত বায়ুপ্রবাহের নিয়ন্ত্রক এবং তাপবলয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

প্রশ্ন ▶৬ মি. যোসেফ নিলস ভ্রমণপিয়াসু পর্যটক। পৃথিবীর অনেক দেশ তিনি ভ্রমণ করেছেন। এবার তিনি চাচ্ছেন সাইবেরিয়া ভ্রমণ করতে যেখানে জনবসতি বিরল। তার ইচ্ছে আছে একদিন দুই মেরুও জয় করার। *◀ শিখনফল: ৩*

ক. নিম্নচাপ বলয় কাকে বলে? ১

খ. কর্কটীয় শান্ত বলয়কে অশ্ব অক্ষাংশ বলা হয় কেন? ২

গ. মি. যোসেফের ভ্রমণকৃত স্থানে বায়ুমণ্ডলীয় উচ্চচাপ বলয় সৃষ্টি হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মেরু অঞ্চল জয় করতে মি. যোসেফের অতিক্রম করা নিম্নচাপ বলয়টির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো চাপবলয়ের বাইরের দিকে বায়ুচাপ তুলনামূলকভাবে বাড়তে থাকলে তাকে নিম্নচাপ বলয় বলে। যেমন- নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়।

খ আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর বিস্তৃত কর্কটীয় শান্তবলয় অশ্ব অক্ষাংশ নামে পরিচিত।

প্রাচীনকালে সমুদ্র বক্ষে পালতোলা জাহাজ বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রস্রোতের অনুকূলে চলাচল করতো। বায়ুর পার্শ্বপ্রবাহ না থাকায় পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে উত্তর আমেরিকামুখী ঘোড়া

বোঝাই জাহাজ কর্কটীয় শান্ত বলয় অঞ্চলে এসে আটকা পড়তো। দীর্ঘদিন আটকে থাকলে খাদ্য ও পানীয় জলের অভাবে ঘোড়াগুলোকে সাগর বক্ষে নিক্ষেপ করা হতো। তাই এ অঞ্চলের নাম হয়েছে অশ্ব অক্ষাংশ।

গ উদ্দীপকে মি. যোসেফ সাইবেরিয়া ভ্রমণকালে বায়ুমন্ডলীয় মেরুদেশীয় উচ্চচাপ বলয়ে অবস্থান করবেন।

মেরুদেশীয় উচ্চচাপ বলয়ে উচ্চচাপ সৃষ্টি হওয়ার বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। যেমন– i. উভয় মেরু এলাকা বরফাচ্ছন্ন; ii. এখানে প্রচন্ড শীতল অবস্থা বিরাজ করে (০°সে. এর নিচে তাপমাত্রা) iii. বাতাস খুব ঠাণ্ডা ও ভারি এবং iv. সূর্য কিরণের অভাবে জলীয়বাষ্প খুব কম থাকে।

উল্লেখ্য পৃথিবীর আবর্তনে মেরুবৃত্তীয় নিম্নচাপ এলাকা থেকে ছিটকে যাওয়া উর্ধ্বগামী বাতাস শীতল ও ভারি হয়ে এখানে নেমে আসে। ফলে এখানে চাপ বৃদ্ধি পায়। এভাবে মেরুদেশীয় উচ্চচাপ বলয়ের সৃষ্টি হয়েছে।

ঘ মেরু অঞ্চল জয় করতে মি. যোসেফ মেরুবৃত্ত প্রদেশীয় বা উপমেরুবৃত্তের নিম্নচাপ বলয় অতিক্রম করবেন।

উপমেরুবৃত্তের নিম্নচাপ বলয়টি অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। পৃথিবীর আবর্তনের বেগ মেরুদ্বয় অপেক্ষা দুই মেরুবৃত্তপ্রদেশে অধিক এবং এখানে বহির্মুখী শক্তি কার্যকরী হয়। এ কারণে এই দুই অঞ্চলের বায়ু ক্রান্তীয় অঞ্চলের দিকে বিক্ষিপ্ত হয়।

পৃথিবীর আবর্তনে এখানে বায়ুপ্রবাহ বিরাট ঘূর্ণিতে পরিণত হয় এবং উর্ধ্বগামী হয়। ঘূর্ণিগুলোর কেন্দ্রস্থলে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এই অঞ্চলে উষ্ণ পশ্চিমা ও শীতল মেরু বায়ু উপরে উঠে গিয়ে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়।

পশ্চিমা ও মেরু বায়ুপ্রবাহ যেখানে মিলিত হয়েছে তাকে মেরুপ্রদেশীয় শান্ত বলয় বলে। এ অঞ্চলে বায়ুর পরিমাণ কমে যায়। ফলে বায়ুর চাপ নিম্ন হয়। উত্তর গোলার্ধে স্থলভাগের প্রাধান্য থাকায় শীতকালে ঝড়ের সম্ভাবনা বেশি কিন্তু গ্রীষ্মকাল তাপমাত্রার বেশ মৃদু-শান্ত থাকে। দক্ষিণ গোলার্ধে জলভাগ বেশি থাকায় শীত-গ্রীষ্মের তাপমাত্রার পার্থক্য কম থাকে। এই চাপবলয়ে যেখানে জলভাগ আছে সেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। যেমন- চীনের উত্তরাঞ্চল।

প্রশ্ন ▶ ৭ পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলে নিরক্ষীয় অঞ্চলের বায়ুচাপ বলয় বছরের বিভিন্ন সময়ে ৫° থেকে ১০° উত্তর ও দক্ষিণে সরে যায়। আবার উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের ২৫°-৩৫° অক্ষাংশের মধ্যে উপক্রান্তীয় উচ্চচাপবলয় দুটি অবস্থিত। *◀ শিখনফল: ৩*

ক. উচ্চচাপ বলয় কাকে বলে? ১

খ. সামগ্রিকভাবে চাপবলয়কে কী কী ভাগে ভাগ করা হয় উল্লেখ করো। ২

গ. উদ্দীপকের নিম্নচাপ বলয়টি কী কী কারণে সৃষ্টি হয়, ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের উচ্চচাপ বলয় দুটির বায়ুপ্রবাহের অবস্থা বিশ্লেষণ করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো চাপ বলয়ের বাইরের দিকে বায়ুচাপ তুলনামূলকভাবে কমতে থাকলে তাকে উচ্চচাপ বলয় বলে। যেমন- উপক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয়।

খ পৃথিবীতে সর্বমোট সাতটি চাপবলয় রয়েছে। এ চাপবলয়গুলো বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে চার ধরনের। যেমন–

১. নিরক্ষীয় নিম্নচাপবলয় বা শান্ত বলয়; ২. উপক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয়: (i) কর্কটীয় ও (ii) মকরীয় উচ্চচাপ বলয়; ৩. মেরুবৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয় : (i) সুমেরুবৃত্ত প্রদেশীয় ও (ii) কুমেরুবৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয়; ৪. মেরুদেশীয় উচ্চচাপ বলয়: (i) উত্তর ও (ii) দক্ষিণ মেরুদেশীয় উচ্চচাপ বলয়।

গ নিরক্ষরেখার উভয় পাশে ৫°-১০° অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত চাপবলয়কে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় বলে। উদ্দীপকে এ বলয়টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

পৃথিবীর বার্ষিক গতির জন্য বছরের বিভিন্ন সময়ে এই চাপবলয় ৫°-১০° অক্ষাংশ পর্যন্ত অবস্থান পরিবর্তন করে। আফ্রিকার নাইজেরিয়া, কেনিয়া; দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়া, গায়ানা; এশিয়ার মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ এ বলয়ে অবস্থিত।

নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়টি বিভিন্ন কারণে সৃষ্টি হয়। যেমন—

১. নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্য প্রায় সারাবছর লম্বভাবে কিরণ দেওয়ায় বায়ু উত্তপ্ত ও হালকা হয়ে প্রসারিত হয় এবং উপরে উঠে যায়।
২. এই অঞ্চলে স্থল অপেক্ষা জলভাগ বেশি হওয়ায় প্রখর সূর্য তাপে অধিকতর জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু হালকা হয়ে উপরে উঠে যায়।
৩. এছাড়া এই অঞ্চলের উঁচু বায়ুস্তরে উষ্ণ, আর্দ্র ও লঘু বায়ু পৃথিবীর আবর্তন গতির জন্য উত্তর ও দক্ষিণ, উভয় দিকে ছিটকে যায়।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত উপক্রান্তীয় বলয় দুটি হলো কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয়। মেক্সিকো, লিবিয়া, মিশর, আলজেরিয়া, বাংলাদেশ কর্কটীয় এবং আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়ার মধ্যভাগ প্রভৃতি মকরীয় উচ্চচাপ বলয়ে অবস্থিত।

নিরক্ষরেখার উভয়পাশে ২৫°-৩৫° অক্ষাংশের মধ্যে উচ্চচাপ বলয় দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে।

নিচে উপক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয় দুটির বায়ুপ্রবাহের অবস্থা বিশ্লেষণ করা হলো :

১. নিরক্ষীয় অঞ্চলে উর্ধ্বে প্রবাহিত উষ্ণ, আর্দ্র ও হালকা বায়ু পৃথিবীর আবর্তনের ফলে উত্তরে ও দক্ষিণে ছিটকে যায়। এ বায়ু শীতল ও ভারি হয়ে ক্রান্তীয় অঞ্চলে নেমে আসে।
২. সুমেরু ও কুমেরু উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে শীতল ও ভারি বাতাস নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে ধাবিত হয়। এই দু'দিকের বায়ুপ্রবাহ যথাক্রমে কর্কট ও মকরক্রান্তির নিকট নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে আগত বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে পরস্পর মিলিত হয় এবং চাপ বৃদ্ধি পায়।

৩. উভয় ক্রান্তীয় অঞ্চলে বায়ুর প্রবাহ নিম্নমুখী হওয়ায় বায়ুর পার্শ্বপ্রবাহ লক্ষ করা যায় না। তাই নিরক্ষীয় অঞ্চলের মতো ক্রান্তীয় অঞ্চলেও বায়ুপ্রবাহে সর্বদা শান্ত অবস্থা বিরাজ করে। তাই এদের ক্রান্তীয় শান্তবলয় বলে অভিহিত করা হয়।

উল্লেখ্য উপক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয়ের সর্বত্র বায়ুপ্রবাহের গতি-প্রকৃতি একই রকম নয়। অক্ষাংশভেদে এর ভিন্নতা দেখা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৮ নিরক্ষীয় অঞ্চলের বায়ুচাপ বলয়টি নিরক্ষরেখার উভয় দিকে ৫°-১০° অক্ষাংশের মধ্যে বায়ুমন্ডলের নিম্নস্তরে অবস্থিত। উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে ৬০°-৬৫° অক্ষাংশ জুড়ে সুমেরুবৃত্ত ও কুমেরুবৃত্ত অঞ্চলে অনুরূপ বায়ুচাপ বলয় অবস্থিত। ◀ *শিখনফল: ৩*

ক. স্থলবায়ু কাকে বলে? ১

খ. উচ্চচাপ ও নিম্নচাপ বলয় কীভাবে সৃষ্টি হয়? ২

গ. উদ্দীপকের নিরক্ষীয় বলয়টির আবহাওয়া কিরূপ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের উপমেরুবৃত্তের বলয়টির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাতের বেলা স্থল থেকে জলভাগের দিকে যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাকে স্থলবায়ু বলে। যেমন: কক্সবাজার থেকে বঙ্গোপসাগরের দিকে প্রবাহিত রাত্রিকালীন বায়ু।

খ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অক্ষাংশভেদে সূর্যরশ্মির পতন কোণের পার্থক্য হয়। যেমন: নিরক্ষরেখায় সূর্য সারাবছর লম্বভাবে এবং মেরুপ্রদেশে তির্যকভাবে কিরণ দেয়। ফলে বায়ুর তাপমাত্রা ও চাপের পার্থক্য হয়। আবার পৃথিবীর গতির কারণেও বিভিন্ন স্থানে বায়ুচাপের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। যেমন- নিরক্ষীয় অঞ্চলে পৃথিবীর আহ্নিক গতি সর্বাধিক। ফলে বায়ুর চাপ কম। এভাবে এক বা একাধিক কারণের প্রভাবে কোনো চাপবলয়ের বাইরের দিকে বায়ুচাপ তুলনামূলকভাবে বাড়তে থাকলে তাকে নিম্নচাপ বলয় বলে। যেমন- নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়। কোনো চাপ বলয়ের বাইরের দিকে বায়ুচাপ তুলনামূলকভাবে কমতে থাকলে তাকে উচ্চচাপ বলয় বলে। যেমন- উপক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয়।

গ উদ্দীপকের নিম্নচাপ বলয়টি নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়।

নিরক্ষরেখার উভয় পাশে ৫°-১০° অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত চাপ বলয়টি নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় নামে পরিচিত।

নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়ে জলভাগের পরিমাণ বেশি। আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলবর্তী বিভিন্ন দেশ যেমন- আফ্রিকার নাইজেরিয়া, কেনিয়া; দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়া, গায়ানা; এশিয়ার মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ এ বলয়ে অবস্থিত।

এ অঞ্চলে বায়ুর পরিচলন স্রোতে (Convectional flow) কিউমুলাস মেঘের সৃষ্টি হয়; যা বজ্র-বিদ্যুৎসহ প্রবল পরিচলন বৃষ্টিপাত (Convectional rain) ঘটায়। এ অঞ্চলে সারা বছরই বৃষ্টিপাত হয়। বিশেষ করে বিকেলের দিকে। বাতাসে প্রচুর জলীয়বাষ্প থাকায় আবহাওয়া গুমোট হয় ও ভ্যাপসা গরম পড়ে। এ ধরনের আবহাওয়ায় শরীর ঘেমে যায়, অবসন্নতা আসে ও মানুষের কাজের ক্ষমতা হ্রাস পায়।

ঘ উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে ৬০°-৬৫° অক্ষাংশ জুড়ে উদ্দীপকের উপমেরুবৃত্তের নিম্নচাপ বলয় অবস্থিত।

এই বলয়টি সুমেরুবৃত্ত ও কুমেরুবৃত্তীয় নিম্নচাপ বলয় নামে দুটি ভাগে বিভক্ত।

মেরুবৃত্ত প্রদেশীয় বা উপমেরুবৃত্তের নিম্নচাপ বলয়ের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো—

i. পৃথিবীর আবর্তনের বেগ মেরুদ্বয় অপেক্ষা দুই মেরুবৃত্ত প্রদেশে অধিক। এ কারণে এই দুই অঞ্চলে বায়ু ক্রান্তীয় অঞ্চলের দিকে বিক্ষিপ্ত হয়। যেমন: মঙ্গোলিয়া থেকে চীনের উত্তর দিকে অথবা কানাডার দক্ষিণ থেকে আমেরিকার দিকে।

ii. পৃথিবীর আবর্তনের ফলে এখানে বায়ু প্রবাহ ঘূর্ণিতে পরিণত হয়ে ঊর্ধ্বগামী হয়। ঘূর্ণিগুলোর কেন্দ্রস্থলে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। ফলে এই অঞ্চলে উষ্ণ পশ্চিমা বায়ু প্রবাহ শীতল মেরু বায়ুর ওপর উঠে গিয়ে নিম্ন চাপের সৃষ্টি করে। যেমন: জাপানে।

iii. পশ্চিমা ও মেরু বায়ুপ্রবাহ যেখানে মিলিত হয়েছে তাকে মেরু প্রদেশীয় শান্ত বলয় বলে।

iv. এ অঞ্চলে উত্তর গোলার্ধে স্থলভাগের প্রাধান্য থাকায় শীতকালে ঝড়ের সম্ভাবনা বেশি থাকে কিন্তু গ্রীষ্মকাল বেশ শান্ত থাকে। এই চাপবলয়ে যেখানে জলভাগ আছে সেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। যেমন: দক্ষিণ গোলার্ধে অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণে সমুদ্রভাগে দেখা যায়।

সুতরাং মেরুবৃত্ত দেশীয় চাপ বলয়টি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

প্রশ্ন ▶ ৯

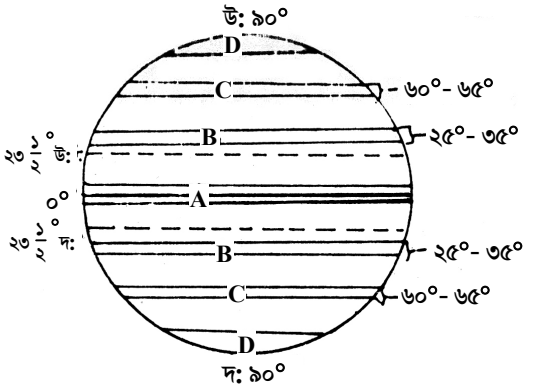

◀ *শিখনফল: ৩ [গুরুদয়াল সরকারি কলেজ, কিশোরগঞ্জ; কেশবপুর কলেজ, যশোর]*

ক. আপেক্ষিক আর্দ্রতা নির্ণয়ের সূত্রটি লিখো। ১

খ. NORWESTER নামে পরিচিত ঝড়টির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে চিত্রটি বায়ুর কোন বিষয়টি প্রকাশ করছে? চিহ্নিত স্থানগুলোর নাম ও কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের চিত্রটির সাথে বায়ুপ্রবাহের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক আপেক্ষিক আর্দ্রতা নির্ণয়ের সূত্রটি হলো—

$$\text{আপেক্ষিক আর্দ্রতা (Relative Humidity)} = \frac{\text{বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ}}{\text{একই উষ্ণতায় বায়ুর জলীয়বাষ্প ধারণ করার ক্ষমতা}} \times ১০০$$

খ NORWESTER নামে পরিচিত ঝড়টি হলো কালবৈশাখী ঝড়।

কালবৈশাখী ঝড়ের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

i. কালবৈশাখীর আগমনে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় ৫°—১০° সেলসিয়াস কমে যায়।
ii. এটি যেকোনো স্থানে সৃষ্টি ও আঘাত হানতে পারে।
iii. কালবৈশাখী ঝড়ে বাতাস প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণির আকারে প্রবাহিত হয়।
iv. মার্চ-এপ্রিল মাসে এ ঝড় আঘাত হানে।

গ উদ্দীপকের চিত্রটি বিভিন্ন বায়ুচাপ বলয় নির্দেশ করে।

চিত্রে চিহ্নিত স্থানগুলোর নাম হলো, A = নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়; B = ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয়; C = মেরুবৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয় এবং D = মেরুদেশীয় উচ্চচাপ বলয়।

বিভিন্ন নিয়ামকের কার্যকারিতায় বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে বায়ুচাপ রেখাগুলো গোলাকার পৃথিবীকে ঘিরে বায়ুচাপ অঞ্চল সৃষ্টি করে। এই গোলাকার বায়ুচাপ অঞ্চলগুলোকে চাপ বলয় (Pressure Belt) হিসেবে অভিহিত করা হয়। নিচের বিভিন্ন প্রকার চাপ বলয়ের কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করা হলো—

নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় (Equatorial low pressure belt):
i. সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয় বলে প্রচুর জলীয়বাষ্পের উদ্ভব হয়; ii. বায়ুর আনুভূমিক প্রবাহ বোঝা যায় না।

উপক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয় (Sub-tropical high pressure belt):
i. এ অঞ্চলের বায়ু শীতল ও ভারি হয়। ii. কর্কটক্রান্তীয় শান্ত বলয়কে অশ্ব অক্ষাংশ বলে।

মেরুবৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয় (Sub-polar low Pressure belt):
i. ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে স্থান পরিবর্তন হয়; ii. পশ্চিমা ও মেরু বায়ুর মিলিত অঞ্চলকে মেরুপ্রদেশীয় শান্ত বলয় বলে।

মেরুদেশীয় উচ্চচাপ বলয় (Polar high pressure belt): i. বাতাস খুব ঠান্ডা ও ভারি হয়। ii. সূর্যকিরণের অভাবে জলীয়বাষ্প খুব কম থাকে।

ঘ বায়ুচাপ বলয়ের সাথে বায়ুপ্রবাহের ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান।

নিয়ত বায়ু পৃথিবীর চাপ বলয়গুলো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে বছরের সকল সময় একই দিকে প্রবাহিত হয়। এই বায়ু তিন প্রকারের। যথা– অয়ন বায়ু, পশ্চিমা বায়ু ও মেরু বায়ু। নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় থেকে উষ্ণ ও হালকা বায়ু উপরে উঠে গেলে কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে শীতল ও ভারী অয়ন বায়ু নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। উত্তর গোলার্ধে এটি উত্তর-পূর্ব অয়ন বায়ু এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু নামে পরিচিত। কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে পশ্চিমা বায়ুপ্রবাহ মেরুবৃত্ত নিম্নচাপ বলয়ের দিক প্রবাহিত হয়। উত্তর গোলার্ধে এটি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে থেকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়। মেরু অঞ্চলের উচ্চচাপ বলয় থেকে অতি শীতল ও ভারী বায়ু উত্তর গোলার্ধে নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয়। এ বায়ু উত্তর গোলার্ধে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বায়ু চাপ বলয়গুলোর উপর ভিত্তি করেই মূলত নিয়ত বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং, বায়ুপ্রবাহ ও বায়ু চাপবলয়ের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶ ১০ ভূপৃষ্ঠের উচ্চচাপ বলয় হতে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে বায়ু সর্বদা নিয়মিতভাবে প্রবাহিত হয়। এ জাতীয় বায়ু আবার কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। যেমন- আয়ন বায়ু। ◀ *শিখনফল: ৪*

ক. নিয়ত বায়ু কয় প্রকার ও কী কী? ১
খ. গর্জনশীল চল্লিশ বর্ণনা করো। ২
গ. চিত্র অঙ্কন করে উদ্দীপকে উল্লিখিত নিয়ত বায়ু দেখাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে নিয়ত বায়ুর শ্রেণিবিভাগ বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিয়ত বায়ু তিন প্রকার। যথা : ১. অয়ন বা বাণিজ্য, ২. পশ্চিমা ও ৩. মেরুদেশীয়।

খ উত্তর গোলার্ধে স্থলভাগ বেশি হওয়ায় পশ্চিমা বায়ুর গতি ও বেগ বেশি পরিবর্তিত হয়। দক্ষিণ গোলার্ধে স্থলভাগ কম থাকায় উত্তর-পশ্চিম পশ্চিমা বায়ু অবাধে জলভাগের উপর দিয়ে প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়।

ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরে এ বায়ু ৪০° থেকে ৪৭° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে বেশ জোরে গর্জন করতে করতে প্রবাহিত হয় বলে একে গর্জনশীল চল্লিশ বলে।

গ যে বায়ু কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয় হতে সারা বছর নিয়মিতভাবে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয় তাকে অয়ন বায়ু বলে। উদ্দীপকে অয়ন বায়ু উল্লিখিত হয়েছে। পৃথিবীতে উত্তর পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু বিরাজমান।

চিত্র অঙ্কন করে উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু দেখানো হলো:

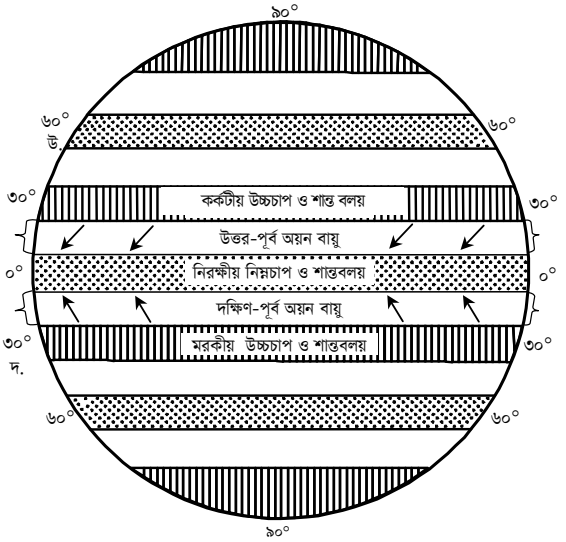

চিত্র : অয়ন বায়ুপ্রবাহ

ঘ ভূপৃষ্ঠের উচ্চচাপ বলয় থেকে নিম্নচাপ বলয়ের দিকে যে বায়ু সারাবছর নিয়মিতভাবে প্রবাহিত হয় তাকে নিয়ত বায়ু বলে।

বায়ুপ্রবাহের অবস্থান, দিক এবং উৎপত্তির ওপর ভিত্তি করে নিয়ত বায়ুকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— অয়ন, পশ্চিমা এবং মেরুদেশীয় বায়ু।

বিভিন্ন প্রকার নিয়ত বায়ু নিচে বিশ্লেষণ করা হলো:

অয়ন বায়ু : কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয় হতে সারা বছর নিয়মিতভাবে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে অয়ন বায়ু প্রবাহিত হয়। এ বায়ুর অনুকূলে পূর্বকালে বাণিজ্যের জন্য পালতোলা জাহাজ অধিক যাতায়াত করত বলে একে বাণিজ্য বায়ু বলা হয়। উত্তর-পূর্ব অয়ন বায়ু ঘণ্টায় ১৬ কি.মি. এবং দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু বাধাহীনভাবে সমুদ্র পথে প্রায় ২২.৪ কি.মি. বেগে প্রবাহিত হয়।

পশ্চিমা বায়ু: ককটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয় হতে আরও দুটি বায়ু প্রবাহ সুমেরু ও কুমেরুবৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয়। একে পশ্চিমা বায়ু বলে। দক্ষিণ গোলার্ধে পশ্চিমা বায়ুকে গর্জনশীল চল্লিশও বলা হয়। এ বায়ুর প্রবাহে মহাদেশগুলোর পশ্চিম উপকূলে বৃষ্টিপাত হয়।

মেরুদেশীয় বায়ু: সুমেরু ও কুমেরু উচ্চচাপ থেকে নিয়মিতভাবে দুটি বায়ুপ্রবাহ মেরুবৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয় দুটির দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। একে মেরুদেশীয় বায়ু বলে। এরা ফেরেলের সূত্রানুসারে উত্তর গোলার্ধে উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ-পূর্ব দিক হতে প্রবাহিত হয়।

উপরের আলোচনা হতে বলা যায় যে, নিয়ত বায়ুপ্রবাহ বায়ুচাপ বলয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

প্রশ্ন ▶ ১১ ভূপৃষ্ঠের উচ্চচাপ বলয় হতে নিম্নচাপ বলয়ের দিকে একটি বায়ু সারাবছর নিয়মিতভাবে প্রবাহিত হয়। এ বায়ুর অনুসরণ করে প্রাচীনকালে পালতোলা জাহাজ তাদের বাণিজ্য পরিচালনা করতো। *◀ শিখনফল: ৪*

ক. মেরুবায়ু কাকে বলে? ১

খ. মেরু বায়ুর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে আলোচিত বায়ু প্রবাহটি চক্রাকারে দেখাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কিত বায়ুটির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করো। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুমেরু ও কুমেরু উচ্চচাপ বলয় থেকে নিয়মিতভাবে দুটি বায়ু প্রবাহ মেরুবৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয়। এই বায়ুদুটিকে মেরু বায়ু বা মেরুদেশীয় বায়ু বলে।

খ মেরু এলাকা থেকে আগত মেরু বায়ু শুষ্ক ও শীতল।

ক্রান্তীয় এলাকার নিকট থেকে আগত পশ্চিমা বায়ুর সঙ্গে মেরুবায়ুর সংযোগ হলে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়। এ বায়ুপ্রবাহ মেরুবৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয়কে নিচের দিকে ঠেলে দেয়। মেরু বায়ুর গতিবেগ ঘণ্টায় ২ কি.মি. এর কাছাকাছি।

গ উদ্দীপকে নিয়ত বায়ুপ্রবাহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ভূপৃষ্ঠের উচ্চচাপ বলয় হতে নিম্নচাপ বলয়ের দিক যে বায়ু সারা বছর নিয়মিতভাবে প্রবাহিত হয় তাকে নিয়ত বায়ু বলে। নিয়ত বায়ুকে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা- (i) অয়ন বায়ু বা বাণিজ্য বায়ু, (ii) পশ্চিমা বায়ু এবং (iii) মেরুদেশীয় বায়ু।

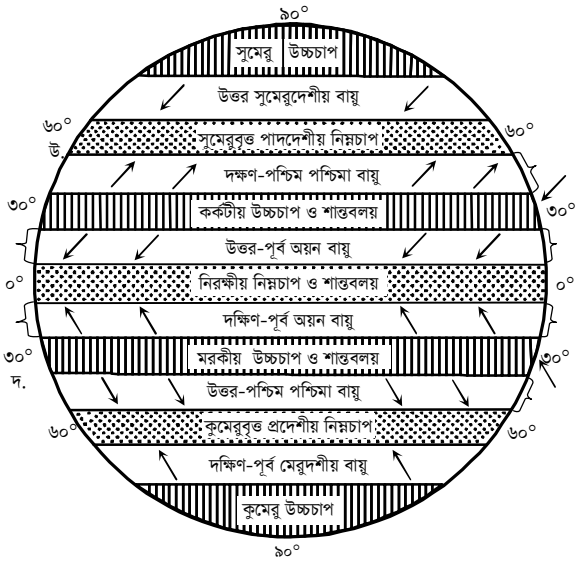

চিত্র : নিয়ত বায়ুপ্রবাহ

ঘ উদ্দীপকের বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কিত বায়ুপ্রবাহ হচ্ছে অয়ন বায়ু।

নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় থেকে উষ্ণ ও হালকা বায়ু উপরে উঠে গেলে কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে শীতল ও ভারী বায়ু নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। ফেরেলের সূত্র অনুসারে এ বায়ু উত্তর গোলার্ধে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয়। এদেরকে যথাক্রমে উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু বলে।

প্রশ্ন ▶ ১২ ভৌগোলিক কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। এমনিভাবে উত্তর আমেরিকার রকি পর্বতের পূর্বপাশে এক ধরনের উষ্ণ ও শুষ্ক বায়ু প্রবাহিত হয়। স্থানীয় অধিবাসীরা এই বায়ুপ্রবাহকে তুষারখাদক নামে অভিহিত করেন। *◀ শিখনফল: ৪*

ক. পশ্চিমা বায়ু কাকে বলে? ১

খ. পশ্চিমা বায়ুকে গর্জনশীল চল্লিশ বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের বায়ুপ্রবাহটির গতি প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বায়ুটি ছাড়া অন্যান্য স্থানীয় বায়ু বিশ্লেষণ করো। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে মেরুবৃত্ত প্রদেশীয় অঞ্চলের দিকে দুটি বায়ু সারাবছর নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হয়। এদেরকে পশ্চিমা বায়ু বলে।

খ উত্তর গোলার্ধে স্থলভাগ বেশি বলে পশ্চিমা বায়ুর গতিবেগ বেশ পরিবর্তিত হয়। কিন্তু দক্ষিণ গোলার্ধে স্থলভাগ কম থাকায় উত্তর-পশ্চিম পশ্চিমা বায়ু অবাধে জলভাগের উপর দিয়ে প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়।

ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরে এ বায়ু ৪০° দক্ষিণ থেকে ৪৭° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে বেশ জোরে গর্জন করতে করতে প্রবাহিত হয় বলে পশ্চিমা বায়ুকে গর্জনশীল চল্লিশ বলে।

গ উদ্দীপকের তুষারখাদক নামে পরিচিত বায়ুপ্রবাহটি হলো চিনুক বায়ুপ্রবাহ। এটি একটি স্থানীয় বায়ু।

উত্তর আমেরিকার রকি পর্বতের পূর্বপাশে প্রবাহিত উষ্ণ ও শুষ্ক বায়ুকে চিনুক বলে। চিনুক শব্দের অর্থ তুষারখাদক। শীত ও বসন্তকালে পাহাড়ের পাদদেশে এ বায়ুর তাপমাত্রা ২০° থেকে ৩০° সে. পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এ বায়ুর প্রভাবে বরফমুক্ত থাকে বিধায় ফলে অল্প সময়ের মধ্যে এ অঞ্চলে বরফ গলতে শুরু করে। এ কারণে স্থানীয় রেড ইন্ডিয়ানগণ এ বায়ুকে তুষারখাদক বলে। এ বায়ুর প্রভাবে বরফমুক্ত থাকে বিধায় স্থানীয় তৃণভূমি অঞ্চলে শীতকালে পশুচারণের পক্ষে সুবিধাজনক হয়।

ঘ যেসব বায়ু স্থানীয়ভাবে বায়ুর তাপ ও চাপের পার্থক্যের ফলে সৃষ্টি হয় তাকে স্থানীয় বায়ু বলে।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন স্থানীয় বায়ু দেখা যায়। যেমন- চিনুক, ফন, খামসিন, লু, সিরক্কো, বোরা, পাম্পেরো, সাইমুম, মিস্ট্রাল প্রভৃতি। নিচে কয়েকটি স্থানীয় বায়ুর বর্ণনা দেয়া হলো—

ফন (Fohn): পার্বত্য অঞ্চলের যে শীতল বায়ু পাহাড়ের উপত্যকার মধ্যে দিয়ে সমভূমির দিকে প্রবাহিত হয়, তাকে ফন বলে। ইউরোপের আল্পস পর্বতের উপত্যকাগুলোর মধ্য দিয়ে এরূপ বায়ু প্রবাহিত হয়।

মিস্ট্রাল (Mistral): ফ্রান্সের রোন নদীর উপত্যকা দিয়ে শীতকালে যে বায়ু দক্ষিণে সমভূমি ও দ্বীপ এলাকার দিকে প্রবাহিত হয়, তাকে মিস্ট্রাল বলে।

সিরক্কো (Sirocco): ভূমধ্যসাগরের উপর দিয়ে একটি নিম্নচাপ পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়। এর পুরোভাগে যে বায়ু থাকে তাকে সিরস্কো বলে। সকল ঋতুতে এ বায়ু প্রবাহিত হতে পারে।

খামসিন (Khamsin): মিসরের দক্ষিণ দিক হতে এ উষ্ণ বায়ু মিসরে প্রবেশ করে। এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ দিন এ বায়ু মিশরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় বলে একে খামসিন বলা হয়। ভূমধ্যসাগরীয় নিম্নচাপের ফলে এ বায়ুর উৎপত্তি হয়।
সুতরাং বলা যায় যে, স্থানীয় আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৩

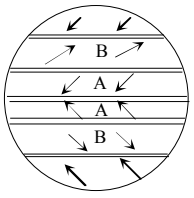

◀ *শিখনফল: ৪ [মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা]*

ক. বায়ুমণ্ডল কাকে বলে? ১

খ. ওজোনস্তরের গুরুত্ব লিখো। ২

গ. উদ্দীপকে 'A' বায়ু প্রবাহের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'B' বায়ু প্রবাহ 'A' বায়ু প্রবাহ থেকে ভিন্নতর–বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভূপৃষ্ঠের চারদিকে জীবজগতের প্রাণধারণের প্রয়োজনীয় যে গ্যাসীয় আবরণ পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে তাকে বায়ুমণ্ডল বলে।

খ ওজোনস্তর সূর্যরশ্মির অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে। ফলে পৃথিবীর জীবকূল অতিবেগুনি রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পায়। ওজোনস্তর না থাকলে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি প্রাণিকূল বিনষ্ট করত। সুতরাং বলা যায়, ওজোনস্তরের গুরুত্ব অপরিসীম।

গ চিত্রে 'A' চিহ্নিত অঞ্চলে প্রবাহিত বায়ু হলো দক্ষিণ-পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব অয়ন বায়ু।

নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় থেকে উষ্ণ ও হালকা বায়ু উপরে উঠে গেলে কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে শীতল ও ভারী বায়ু নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। ফেরেলের সূত্র অনুসারে, এ বায়ু উত্তর গোলার্ধে উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয়। এদেরকে যথাক্রমে উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু বলে।

উক্ত বায়ুপ্রবাহের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

i. উত্তর-পূর্ব অয়ন বায়ু ঘণ্টায় প্রায় ১৬ কিলোমিটার এবং দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু ঘণ্টায় প্রায় ২২.৫৪ কিলোমিটার বেগে প্রবাহিত হয়।

ii. উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী হলে অত্যধিক তাপে উষ্ণ ও হালকা হয়ে ঊর্ধ্বে উঠে যায়।

iii. উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বায়ুর প্রভাবে নিরক্ষরেখার উভয়দিকে শান্তবলয় সৃষ্টি হয়।

iv. শীতকালে এ বায়ুপ্রবাহের গতিবেগ বেশি থাকে।

ঘ চিত্রে 'A' চিহ্নিত বায়ুপ্রবাহ হলো উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু এবং 'B' চিহ্নিত বায়ুপ্রবাহ হলো উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম পশ্চিমা বায়ু।

নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় থেকে উষ্ণ ও হালকা বায়ু উপরে উঠে গেলে কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে শীতল ও ভারী বায়ু নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। ফেরেলের সূত্র অনুসারে এ বায়ু উত্তর গোলার্ধে উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয়। এদেরকে যথাক্রমে উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু বলে।

অপরদিকে, কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে 'B' চিহ্নিত বায়ুপ্রবাহ মেরুবৃত্ত নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম পশ্চিমা বায়ু উত্তর গোলার্ধে দক্ষিণ-পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম পশ্চিমা বায়ু দক্ষিণ গোলার্ধে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, 'B' বায়ু প্রবাহ 'A' বায়ুপ্রবাহ থেকে ভিন্নতর।

প্রশ্ন ▶ ১৪

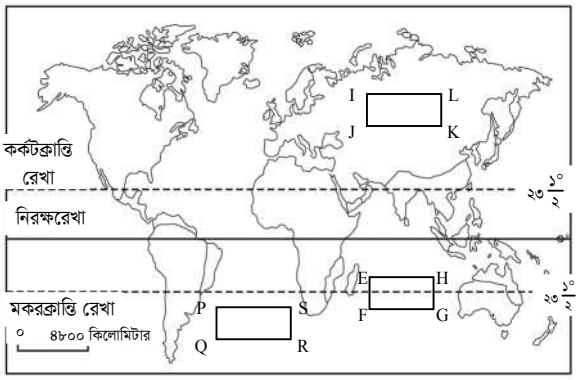

◀ *শিখনফল: ৪*

ক. সমুদ্রবায়ু কাকে বলে? ১

খ. ফেরেলের সূত্রটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'EFGH' স্থানে বিরাজমান বায়ুপ্রবাহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'IJKL' এবং 'PQRS' স্থানের বায়ুর বেগ কি একই রকম? তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দিনের বেলা জল থেকে স্থলভাগের দিকে যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাকে সমুদ্রবায়ু বলে।

খ ফেরেলের সূত্র পৃথিবীব্যাপী নিয়ত বায়ুপ্রবাহের দিক নির্দেশ করে।

আমেরিকান আবহাওয়াবিদ উইলিয়াম ফেরেল (Ferrel) সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন যে, পৃথিবীর আবর্তনজনিত শক্তির প্রভাবে বায়ুপ্রবাহের দিক পরিবর্তন হয়। এ কারণে তার নামানুসারে বায়ুপ্রবাহের এ নিয়মকে 'ফেরেলের সূত্র' বলা হয়। সূত্রটি হলো— "বায়ুপ্রবাহ উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হওয়ার সময় উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বামদিকে বেঁকে যায়।"

গ চিত্রে 'EFGH' স্থানটি ২৩ ১/২° দক্ষিণ অক্ষরেখার চারপাশে অবস্থিত। সেখানে দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ুপ্রবাহ বিরাজমান।

নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় থেকে উষ্ণ ও হালকা বায়ু উপরে ওঠে গেলে কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে শীতল ও ভারি বায়ু নিরক্ষীয় বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয়। ফেরেলের সূত্রানুযায়ী অয়ন বায়ু উত্তর গোলার্ধে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয়। দক্ষিণ গোলার্ধে অয়ন বায়ু দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু নামে পরিচিত।

সুতরাং, মানচিত্রে প্রদর্শিত স্থানটি 'EFGH' দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ুপ্রবাহের অন্তর্গত, যার বেগ ঘণ্টায় প্রায় ২২.৫৪ কিলোমিটার।

ঘ চিত্রে প্রদর্শিত 'IJKL' এবং 'PQRS' স্থানটি দুটি পশ্চিমা বায়ুর অন্তর্গত হলেও 'PQRS' স্থানে বায়ুর বেগ বেশি।

পশ্চিমা বায়ু কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে উৎপন্ন হয়ে মেরুবৃত্ত নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয়। উত্তর গোলার্ধে এটি দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়।

চিত্রে প্রদর্শিত 'IJKL' স্থান উত্তর গোলার্ধে দক্ষিণ-পশ্চিম পশ্চিমা বায়ুর অন্তর্গত। উত্তর গোলার্ধে স্থলভাগের পরিমাণ বেশি হওয়ায় স্থানীয় কারণে পশ্চিমা বায়ুর সাময়িক বিরতি ঘটে। সুতরাং, দেখা যায় 'IJKL' স্থানে বায়ুর বেগ কম।

অপরপক্ষে, 'PQRS' স্থানটি দক্ষিণ গোলার্ধে উত্তর-পশ্চিম পশ্চিমা বায়ুর অন্তর্গত। দক্ষিণ গোলার্ধে জলভাগের পরিমাণ বেশি বলে এ অঞ্চলে পশ্চিমা বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়। এই বায়ুপ্রবাহকে প্রবল পশ্চিমা বায়ু বলে। ৪০°-৪৭° দক্ষিণ অক্ষাংশে পশ্চিমা বায়ুর বেগ সর্বাধিক। এজন্য এ অঞ্চলকে 'গর্জনশীল চল্লিশ' বা 'Roaring Forties' বলে। সুতরাং, বোঝা যায় 'PQRS' স্থানে বায়ুর বেগ বেশি।

প্রশ্ন ▶ ১৫

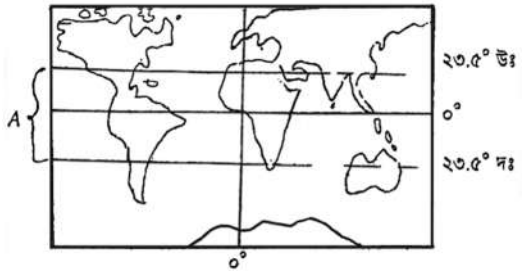

◀ *শিখনফল: ৪ [ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ]*

ক. আর্দ্রতা পরিমাপক যন্ত্রের নাম কী? ১

খ. মেঘ সৃষ্টির প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'A' চিহ্নিত অঞ্চলে প্রবাহিত বায়ুর গতি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'A' চিহ্নিত অঞ্চলে কোন ধরনের জলবায়ু পরিলক্ষিত হবে? যুক্তি দাও। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আর্দ্রতা পরিমাপক যন্ত্রের নাম হাইগ্রোমিটার (Hygrometer).

খ বায়ুতে ভাসমান অসংখ্য পানিকণা বা বরফকণার সমষ্টিকে মেঘ বলে।

বায়ুতে ভাসমান জলীয়বাষ্প কোনো কারণে শীতল হলে অতিক্ষুদ্র পানিকণা ও তুষার কণায় পরিণত হয়। এ কণিকাগুলো বায়ুমণ্ডলের সূক্ষ্ম ধূলিকণায় আশ্রয় নিয়ে ভেসে বেড়ায়। বাতাসে ভাসমান এ ছোট ছোট পানিকণা বা তুষারকণাই মেঘ।

গ চিত্রের 'A' চিহ্নিত অঞ্চলে অয়ন বায়ু প্রবাহিত হয়।

যে বায়ু সর্বদা কর্কটীয় উত্তর-পূর্ব ও মকরীয় দক্ষিণ-পূর্ব উচ্চচাপ বলয় হতে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয় তাকে অয়ন বায়ু বলে। নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় থেকে উষ্ণ ও হালকা বায়ু উপরে উঠে গেলে কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে শীতল ও ভারী বায়ু নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। ফেরেলের সূত্র অনুসারে এ বায়ু উত্তর গোলার্ধে উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে থাকে। অয়ন বায়ু উত্তর গোলার্ধে উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু নামে পরিচিত। উত্তর-পূর্ব অয়ন বায়ু ঘণ্টায় ১৬ কিলোমিটার এবং দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু প্রায় ২২.৫৪ কিলোমিটার বেগে প্রবাহিত হয়।

ঘ চিত্রের 'A' চিহ্নিত অঞ্চলে নিরক্ষীয় জলবায়ু পরিলক্ষিত হবে।

নিরক্ষরেখার (০°) উভয় পাশে ৫°–১০° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চল অবস্থিত। এই অঞ্চলের জলবায়ু প্রধানত নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সূর্য সারা বছর লম্বভাবে কিরণ দেয়ায় দিন-রাত্রির দৈর্ঘ্য প্রায় সমান। জানুয়ারি ও জুলাই মাসের তাপমাত্রা ২২°–৩৪° সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়। এ অঞ্চলটি পর্যাপ্ত জলীয়বাষ্প বহন করায় প্রতিদিন পরিচলন প্রক্রিয়ায় বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৭০–২৫০ সেন্টিমিটার। সারা বছর অধিক তাপ ও প্রচুর বৃষ্টিপাত নিরক্ষীয় জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ অঞ্চলে বায়ুর চাপের পরিবর্তনের হার কম এবং অয়ন বায়ুর প্রবেশ থাকায় বায়ুপ্রবাহের বেগ অধিক হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৬ সোহান ঢাকা থেকে মামা বাড়ি ফরিদপুর যেতে পদ্মার ফেরিঘাটে দাঁড়িয়ে দেখল একটি লঞ্চ উত্তর দিকে যাচ্ছে। ছাদে একটি লাল পতাকা দক্ষিণ দিকে উড়ছে। ◀ *শিখনফল: ৪*

ক. পরম আর্দ্রতা কাকে বলে? ১

খ. স্থানীয় বায়ুর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে সোহান বায়ুর যে অবস্থা দেখলো তার উপর ভূমিরূপের কোনো প্রভাব আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বায়ুর যে অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে তার বিভিন্ন কারণগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে জলীয়বাষ্পের প্রকৃত পরিমাণকে পরম আর্দ্রতা বলে।

খ ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, ভৌগোলিক অবস্থান প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে স্থানীয় বায়ুর সৃষ্টি হয়।

এই বায়ুপ্রবাহের স্থায়িত্ব কম এবং সীমিত এলাকা জুড়ে সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বায়ু দু' প্রকারের হয়ে থাকে। যথা– (i) উষ্ণ প্রকৃতির (যেমন– লু) ও (ii) শীতল (যেমন– বোরা) প্রকৃতির স্থানীয় বায়ু।

গ উদ্দীপকে সোহান পতাকা উড়তে দেখলো। এ বিষয়টি বায়ুপ্রবাহ নির্দেশ করে।

পৃথিবীর কোথাও পাহাড়-পর্বত, কোথাও মালভূমি বা মরুভূমি, কোথাও সমভূমি ইত্যাদি নানারূপ ভূপ্রকৃতি দেখা যায়। সমভূমির উপর দিয়ে অবাধে বায়ু প্রবাহিত হয়। আবার উচ্চভূমির অনুবাত পার্শ্বে বায়ুপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়। যেমন- শীতকালে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে অত্যন্ত শীতল বাতাস হিমালয় পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পশ্চিমে ঘুরে যায় আর কিছু অংশ বাংলাদেশে আসে, এতে শীতের প্রকোপ অনেক কম হয়।

মরুভূমি এলাকায় প্রখর সূর্যতাপে দিনের বেলায় বায়ু উত্তপ্ত ও হালকা হয়। রাতে শীতল বাতাস প্রবাহিত হয়। যেমন– সাহারা। জল-স্থলভাগের সংযোগ এলাকায় স্থলবায়ু ও সমুদ্রবায়ু প্রবাহিত হয়। যেমন– বাংলাদেশের কক্সবাজার।

ঘ উদ্দীপকে বায়ুপ্রবাহ বর্ণনা করা হয়েছে। বায়ুপ্রবাহের কারণগুলো নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো:

উষ্ণতার পার্থক্য: বায়ু উষ্ণ হলে হালকা ও প্রসারিত হয় এবং ঘনত্ব ও আপেক্ষিক গুরুত্ব কমে যায়। উষ্ণ বায়ু ওপরে উঠে যায়। যেমন– জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু উষ্ণ ও হালকা বিধায় ঊর্ধ্বে গমন করে। তখন সমতা রক্ষার্থে উচ্চচাপ অঞ্চলের শীতল ও ভারি বায়ু ঐ নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে ধাবিত হয়।

বায়ু চাপের পার্থক্য: বায়ুর উচ্চচাপযুক্ত অঞ্চলের ভারী বাতাস নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। যেমন নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে বায়ু প্রবাহিত হয়।

পৃথিবীর আবর্তন গতি ও অন্যান্য: পৃথিবীর আবর্তন গতির জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে কার্যকরী শক্তি যেমন– কেন্দ্রাতিগ ও ঘর্ষণজনিত শক্তি এবং কোরিওলিস বা জিয়োট্রোফিক বল এর প্রভাবে বায়ু প্রবাহের নির্দিষ্ট গতিপথ পরিবর্তিত হয়।

বায়ুমণ্ডলীয় উপাদান: বায়ুমণ্ডলীয় বিভিন্ন উপাদানের কারণে বায়ু প্রবাহের পার্থক্য ঘটে। যেমন বায়ুমণ্ডল জলীয়বাষ্পপূর্ণ হলে বায়ু হালকা হয়ে ওপরে উঠে যায়। তখন চারপাশ থেকে শীতল বায়ু শূন্যস্থান পূরণ করে।

এভাবে কোনো স্থানে বায়ুপ্রবাহ সৃষ্টি হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ১৭

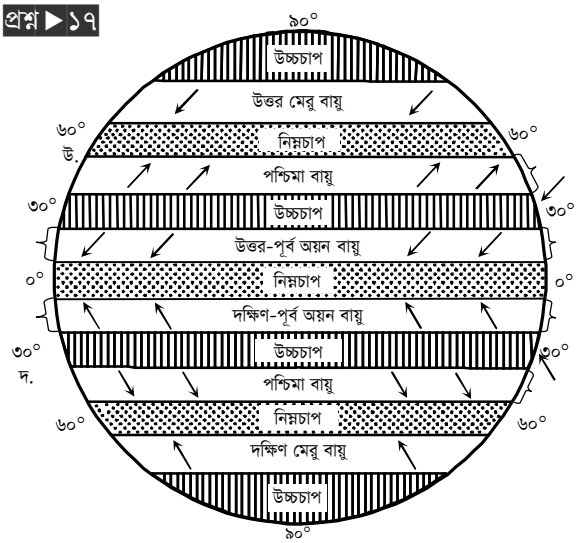

◀ ***শিখনফল: ৪*** *[জবনীন্দ্রনাথ বৈদ্য; অনু-৩]*

ক. বায়ুপ্রবাহ কী? ১

খ. নিয়তবায়ু প্রবাহ কত প্রকার ও কী কী? ২

গ. নিয়ত বায়ুপ্রবাহের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'নিয়ত বায়ু চাপবলয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত'— ব্যাখ্যা করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভূপৃষ্ঠের উচ্চচাপ অঞ্চল হতে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে বায়ুর চলাচলই বায়ুপ্রবাহ।

খ ভূপৃষ্ঠের উচ্চচাপ বলয় থেকে নিম্নচাপ বলয়ের দিকে যে বায়ু সারা বছর নিয়মিতভাবে প্রবাহিত হয় তাকে নিয়ত বায়ু বলে।

নিয়ত বায়ুকে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা: অয়ন বা বাণিজ্য বায়ু, পশ্চিমা বায়ু এবং মেরুদেশীয় বায়ু।

গ ভূপৃষ্ঠের উচ্চচাপ বলয় হতে নিম্নচাপ বলয়ের দিকে যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাকে নিয়ত বায়ুপ্রবাহ বলে।

নিয়ত বায়ুপ্রবাহের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

i. ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয়।
ii. সারা বছর নিয়মিতভাবে একই দিক থেকে প্রবাহিত হয়।
iii. এ বায়ু উত্তর গোলার্ধে দক্ষিণ-পশ্চিম এবং দক্ষিণ গোলার্ধে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়।
iv. নিম্ন অক্ষাংশের বায়ু নিরক্ষীয় নিম্নচাপ অঞ্চলে মিলিত হয়।
v. মধ্য অক্ষাংশ পশ্চিম দিক হতে মেরু অঞ্চলে প্রধানত পূর্ব দিক হতে এ বায়ু প্রবাহিত হয়।
vi. নিয়ত বায়ুপ্রবাহ দ্বারা জাহাজ চলাচলের গতিবেগ, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকাজ ও নানান অর্থনৈতিক ক্রিয়াদি হয়ে থাকে।

ঘ ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অক্ষাংশে উষ্ণতা ও জলীয়কণার পরিমাণের জন্য বায়ুচাপের তারতম্য হয়।

পৃথিবীর ঘূর্ণনজনিত কারণে এ তারতম্য আরও প্রবল হয় বিধায় বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে কয়েকটি চাপবলয়ের সৃষ্টি হয়।

সাধারণত ভূপৃষ্ঠে সাতটি সুনির্দিষ্ট চাপ বলয় রয়েছে। এ চাপ বলয়গুলোর অবস্থান লক্ষ করলে বায়ুপ্রবাহের দিক সহজেই জানা যায়। বায়ুপ্রবাহ উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলের ডানদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে যায়। ভূপৃষ্ঠের উচ্চচাপ বলয় থেকে নিম্নচাপ বলয়ের দিক নিয়ত বায়ু সারা বছর নিয়মিতভাবে প্রবাহিত হয়। বায়ুচাপ বিভিন্ন নিয়ামক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ নিয়ামকসমূহের তারতম্যের সাথে সাথে বায়ুচাপের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।

সুতরাং, এ থেকে বোঝা যায়, নিয়ত বায়ু চাপবলয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৮ বায়ুর চাপের তারতম্যের ওপর ভিত্তি করে পৃথিবীতে বিভিন্ন শ্রেণির চাপ বলয়ের সৃষ্টি হয়েছে। বায়ুচাপের পরিবর্তনের সাথে সাথে বায়ুপ্রবাহেরও পরিবর্তন হয়। এ কারণে পৃথিবীতে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের বায়ু প্রবাহিত হয়। ফেরেলের সূত্র অনুযায়ী বায়ুপ্রবাহ উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বামদিকে বেঁকে যায়।

◀ শিখনফল: ৪ [অধ্যাপক নো: আবদুল কুদ্দুস; অনু-২]

ক. নিয়ত বায়ু কী? ১
খ. সমুদ্রবায়ু ও স্থলবায়ু কাকে বলে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ফেরেলের সূত্র অনুসারে অয়ন বায়ুর গতিপথ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক অনুসারে পশ্চিমা বায়ুর বৈশিষ্ট্য অয়ন বায়ুর মতো নয়। তোমার মতামত দাও। ৪

১৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভূপৃষ্ঠের উচ্চচাপ বলয় হতে নিম্নচাপ বলয়ের দিকে যে বায়ু সারাবছর নিয়মিতভাবে প্রবাহিত হয় তাকে নিয়ত বায়ু বলে।

খ দিনের বেলায় স্থলভাগ বেশি উত্তপ্ত হয় বলে সেখানে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। কিন্তু জলভাগ বেশি উত্তপ্ত হয় না। তাই সেখানে উচ্চচাপ অবস্থা বিরাজ করে। এই উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে বায়ু নিম্নচাপ অঞ্চল তথা স্থলভাগে যেতে থাকে তাকে সমুদ্রবায়ু বলে।

পক্ষান্তরে রাত্রিবেলায় স্থলভাগ দ্রুত শীতল হয় কিন্তু সমুদ্রের পানি দ্রুত শীতল না হওয়ায় স্থলভাগের উচ্চচাপ এবং জলভাগে নিম্নচাপ বিরাজ করে। এ কারণে স্থলভাগ থেকে উচ্চচাপযুক্ত বায়ু জলভাগের দিকে যেতে থাকে একে স্থলবায়ু বলে।

গ যে বায়ু মকরীয় ও কর্কটীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে সব সময় প্রবাহিত হতে থাকে তাকে অয়ন বায়ু বলে। ফেরেলের সূত্র অনুসারে অয়ন বায়ুর গতিপথ নিচে ব্যাখ্যা করা হলো:

নিরক্ষীয় শান্ত বলয়ের উভয় দিকে ১০° থেকে ৩০° অক্ষাংশের ভেতরে এই বায়ু প্রবাহিত হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিক হতে প্রবাহিত হয়ে পৃথিবীর আবর্তনের ফলে এই বায়ু ফেরেলের সূত্র অনুযায়ী উত্তর গোলার্ধের ডানদিকে বেঁকে সব সময় উত্তর-পূর্ব দিক হতে এবং দক্ষিণ গোলার্ধের বামদিক থেকে বেঁকে সব সময় দক্ষিণ-পূর্ব দিক হতে প্রবাহিত হয়।

ফলে কর্কটীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে যে বায়ু নিরক্ষীয় নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয় তাকে উত্তর পূর্ব অয়ন বায়ু এবং মকরীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে যে বায়ু নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয় তাকে দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু বলে। উত্তর-পূর্ব অয়ন বায়ু ঘণ্টায় ১৬ কি.মি. এবং দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু ঘণ্টায় ২২.৫০ কি.মি. গতিবেগে প্রবাহিত হয়।

ঘ উদ্দীপক অনুসারে পশ্চিমা বায়ুর বৈশিষ্ট্য অয়ন বায়ুর মতো নয়– উক্তিটি ভৌগোলিক বিবেচনায় সত্য।

অয়ন বায়ু ও পশ্চিমা বায়ু নিয়ত বায়ুপ্রবাহের দুটি ধরন। অয়ন বায়ু ক্রান্তীয় অঞ্চলে এবং পশ্চিমাবায়ু মেরুবৃত্তীয় অঞ্চলে প্রবাহিত হয়। ভৌগোলিক অবস্থানগত এই পার্থক্যের কারণে বায়ুপ্রবাহ দুটি বৈশিষ্ট্যগতভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

উদ্দীপক অনুসারে অয়ন বায়ুর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে:

i. অয়ন বায়ু বা বাণিজ্য বায়ু যখন নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী হয় তখন অত্যধিক তাপে উষ্ণ ও হালকা হয়ে ঊর্ধ্বে ওঠে।
ii. উত্তর অয়ন বায়ু ঘণ্টায় ১৬ কি.মি. এবং দক্ষিণ অয়ন বায়ু ঘণ্টায় ২২.৫০ কি.মি. গতিবেগে প্রবাহিত হয়।
iii. নিরক্ষীয় অঞ্চলে অয়ন বায়ুর কোনো প্রকার আনুভূমিক প্রবাহ থাকে না।
iv. অয়ন বায়ুতে সাধারণত জলীয়বাষ্প কম থাকে বলে এ বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে।
v. অয়ন বায়ুর যে অংশ সমুদ্রের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তার প্রভাবে উপকূলবর্তীতে সামান্য বৃষ্টিপাত হয়।

পক্ষান্তরে পশ্চিমা বায়ুর বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

i. দক্ষিণ পশ্চিম প্রত্যয়ন বায়ুতে জলীয়বাষ্প থাকে বলে প্রবাহিত অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয়।
ii. প্রত্যয়ন বায়ু বা পশ্চিমা বায়ু প্রবাহিত অঞ্চলে স্থলভাগ বেশি থাকায় তথায় এর গতিবেগ দুর্বল থাকে। উত্তর পশ্চিম প্রত্যয়ন বায়ু জলভাগের উপর দিকে প্রবাহিত হওয়ায় এর গতিবেগ প্রবল থাকে।

iii. ৩০° থেকে ৩৫° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের এ বায়ুর আনুভূমিক প্রবাহ অনুভব হয় না বলে এ অঞ্চলকে অশ্ব অক্ষাংশ বলে।

সুতরাং উপরিউক্ত পশ্চিমা বায়ু ও অয়ন বায়ুর বৈশিষ্ট্যগুলোর আলোকে আমরা বলতে পারি পশ্চিমা বায়ুর বৈশিষ্ট্য অয়ন বায়ুর মতো নয়।

প্রশ্ন ▶ ১৯

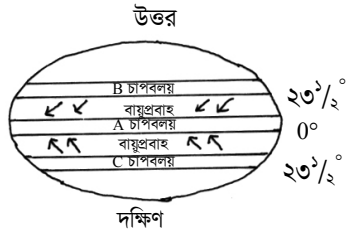

◀ *শিখনফল-৩ ও ৪ [মুমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ]*

ক. স্থানীয় বায়ু কী? ১

খ. অশ্ব-অক্ষাংশ নামের কারণ সংক্ষেপে লিখো। ২

গ. উদ্দীপকে যে বায়ুপ্রবাহের দিক দেখানো হয়েছে তার বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. A, B ও C চাপবলয় আলাদা হওয়ার কারণসহ এসব স্থানের বায়ুচাপের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু ও ভৌগোলিক অবস্থার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে যে বায়ুর সৃষ্টি হয় তাই স্থানীয় বায়ু। যেমন– ফ্রান্সের রোন নদীর উপত্যকায় প্রবাহিত 'মিস্ট্রাল'।

খ প্রাচীনকালে আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে জাহাজযোগে ইউরোপ থেকে আমেরিকায় অশ্ব (ঘোড়া) ও অন্যান্য পশু রপ্তানি করা হতো। জাহাজটি মহাসাগরের ২৫-৩৫° অক্ষাংশে পৌঁছলে বায়ুপ্রবাহের অভাবে এর গতি কমে যায়। এ অবস্থায় খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে অশ্বগুলোকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হতো। এ জন্য আটলান্টিক মহাসাগরের ক্রান্তীয় শান্ত বলয়ের (Tropical calms) নাম করা হয় অশ্ব অক্ষাংশ (Horse latitude)।

গ চিত্রে যে বায়ুপ্রবাহের দিক দেখানো হয়েছে তা হলো উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম পশ্চিমা বায়ু।

দক্ষিণ-পশ্চিম পশ্চিমা বায়ু উত্তর গোলার্ধে দক্ষিণ-পশ্চিম হতে এবং উত্তর-পশ্চিম পশ্চিমা বায়ু দক্ষিণ গোলার্ধে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়।

উক্ত বায়ুপ্রবাহের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ–

i. কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে এ দুটি বায়ুপ্রবাহ মেরুবৃত্ত নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয়।

ii. উত্তর গোলার্ধে অধিক স্থলভাগ ও ভূপ্রকৃতি থাকায় দক্ষিণ-পশ্চিম পশ্চিমা বায়ুর দিক ও গতি অধিক পরিবর্তিত হয়।

iii. দক্ষিণ গোলার্ধে জলভাগ বেশি থাকার কারণে উত্তর-পশ্চিম পশ্চিমা বায়ু ৪০°-৬০° অক্ষাংশের মধ্যে সারা বছর বাধাহীনভাবে প্রবলগতিতে প্রবাহিত হয়।

ঘ চিত্রে A, B ও C চিহ্নিত বায়ুচাপ বলয় হলো যথাক্রমে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়, কর্কটীয় উচ্চচাপ বলয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয়।

পৃথিবীর সর্বত্র বায়ুর চাপ সমান নয়। অঞ্চলভেদে বায়ুর চাপের তারতম্য রয়েছে। বায়ুর তাপমাত্রা ও বায়ুতে জলীয়বাষ্পের তারতম্যের কারণে বায়ু চাপবলয়গুলো আলাদা হয়েছে। যে অঞ্চলে বায়ুর চাপ উচ্চ তাকে উচ্চচাপ বলয় এবং যে অঞ্চলে বায়ুর চাপ নিম্ন তাকে নিম্নচাপ বলয় বলে।

A, B ও C চাপ বলয়ের বায়ুচাপের তুলনামূলক আলোচনা করা হলো–

i. নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্য প্রায় সারাবছর লম্বভাবে কিরণ দেয়। উত্তর গোলার্ধে কর্কটক্রান্তি রেখার ২৩.৫° উত্তরে কর্কটীয় উচ্চচাপ বলয় অবস্থিত। দক্ষিণ গোলার্ধে মকরক্রান্তি রেখার ২৩.৫° দক্ষিণে মকরীয় উচ্চচাপ বলয় অবস্থিত।

ii. নিরক্ষীয় অঞ্চলে স্থলভাগ অপেক্ষা জলভাগ বেশি হওয়ায় প্রখর সূর্যতাপে অধিকতর জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু হালকা হয়ে উপরে ওঠে যায়। অন্যদিকে, B চাপবলয়ে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ কম থাকে। ফলে বায়ুপ্রবাহও কম হয়। এছাড়া C অঞ্চলেও জলীয়বাষ্পের পরিমাণ কম থাকায় বায়ুপ্রবাহ কম পরিলক্ষিত হয়।

iii. A অঞ্চলের উঁচু স্তরে উষ্ণ, আর্দ্র লঘু বায়ু পৃথিবীর আবর্তন গতির জন্য উত্তর ও দক্ষিণে ছিটকে যায়। অন্যদিকে B ও C অঞ্চলের বায়ু শীতল ও ভারী হয়।

প্রশ্ন ▶ ২০ শীতের সকালে শান্তা ঘুম থেকে উঠে বাইরে বের হলো। কিন্তু সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। তার মনে হলো সবকিছু যেন ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে। ◀ *শিখনফল: ৫*

ক. মানুষের বসবাস কষ্টসাধ্য কোন এলাকায়? ১

খ. ঘনীভবন বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে শান্তার দেখা আবহাওয়ার উপাদানটির বিকিরণজাত ধরন সৃষ্টির প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উল্লিখিত উপাদানটির বিভিন্ন ধরন সৃষ্টির অনুকূল নিয়ামকগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

২০নং প্রশ্নের উত্তর

ক খুবই উষ্ণ বা খুবই শীতল এলাকায় মানুষের বসবাস করা কষ্টসাধ্য।

খ পরিপৃক্ত বায়ু উষ্ণতর হলে আর পরিপৃক্ত থাকে না, আরো বেশি জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে।

তেমনি বায়ু শীতল হতে থাকলে পূর্বের মতো বেশি জলীয়বাষ্প ধারণ করে রাখতে পারে না। তখন জলীয়বাষ্পের কিছু অংশ পানিতে পরিণত হয়। একে ঘনীভবন বলে।

গ উদ্দীপকে শান্তা ঘুম থেকে ওঠে বিকিরণজাত কুয়াশা দেখতে পেলো।

সাধারণত যে সকল কুয়াশা আমরা দেখতে পাই তা বিকিরণজাত কুয়াশা। যেসব অনুকূল অবস্থায় বিকিরণজাত কুয়াশার সৃষ্টি হয় সেগুলো হলো: (১) ভূমি সংলগ্ন আর্দ্র বায়ুস্তর (২) বায়ুতে প্রচুর

পরিমাণে জলীয় কণার উপস্থিতি (৩) মেঘমুক্ত রাতের আকাশ (৪) দীর্ঘ শীতের রাত এবং (৫) বাতাসের শান্ত অবস্থা।

উপরে উল্লিখিত নিয়ামকগুলোর প্রভাবে বায়ুর তাপমাত্রা কমে যখন শিশিরাংকের নিচে নেমে যায় তখন জলীয় কণাগুলোকে আশ্রয় করে ভাসমান ঘনীভবন হয়ে বিকিরণজাত কুয়াশার সৃষ্টি করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত উপাদানটি হলো কুয়াশা। কুয়াশার কয়েকটি রূপ দেখা যায়, শিশির ও তুষার, তুহিন, কুজ্ঝটিকা প্রভৃতি।

কুয়াশা সৃষ্টির অনুকূল নিয়ামকগুলো হলো—

i. ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি বায়ুস্তরে অধিক আপেক্ষিক আর্দ্রতা থাকলে সামান্য শীতল হলেই বায়ু সম্পৃক্ত অবস্থায় পৌঁছাবে।
ii. রাতের মেঘমুক্ত আকাশ যাতে পৃথিবী অবাধে উত্তাপ বিকিরণ করে তাড়াতাড়ি শীতল হতে পারে।
iii. দীর্ঘ শীতের রাত, যেমন পৃথিবী দিনের বেলা যে সৌরশক্তি লাভ করে দীর্ঘ রাতে তার চেয়ে বেশি উত্তাপ বিকিরণ করে বেশ শীতল হতে পারে।
iv. বাতাসের শান্ত অবস্থা, যেন উষ্ণ ও শীতল বায়ুর মিশ্রণ না হয়। এতে শীতল ও ভারি বায়ুর স্তরটি পৃথিবীর কাছাকাছি অবস্থান করে আরও শীতল হওয়ার সুযোগ পায়।

উপরে উল্লিখিত নিয়ামকগুলির সমন্বিত প্রভাবে পৃথিবী তাপ বিকিরণ করে বেশ শীতল হয়ে পড়ে। শীতল ভূমির সংস্পর্শে এসে পৃথিবীর সংলগ্ন বায়ুস্তরটি শীতল হয়ে এর তাপমাত্রা শিশিরাংকের নিচে নেমে যায় এবং ঘনীভবন ঘটে। ফলে শিশির, তুষার, কুয়াশা সৃষ্টি হয়।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন প্রকার কুয়াশা সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ প্রায় একই রূপ।

প্রশ্ন ▶ ২১ সীমা তার মাকে চুলায় ভাত রাঁধতে দেখে। পাতিল থেকে সাদা ধোঁয়ার মতো কিছু জিনিস বায়ুতে মিশে যাচ্ছিল। সীমা ধোঁয়ার ওপর কিছুক্ষণ হাত রাখতেই হাত ভেজা অনুভব করলো। *◀ শিখনফল: ৫*

ক. সাইমুম কাকে বলে? ১
খ. বাষ্পীভবন বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকের ধোঁয়ার মতো অবস্থাটি বাতাসের কোন অবস্থা নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে সীমা বায়ুর যে অবস্থা অনুভব করলো তার প্রকারভেদ বিশ্লেষণ করো। ৪

২১নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্থানীয়ভাবে সাহারা ও আরব মরুভূমিতে প্রবাহিত বায়ুকে সাইমুম বলে।

খ যে প্রক্রিয়ায় তরল পদার্থ গ্যাসীয় পদার্থে বা বাষ্পে রূপান্তরিত হয় তাকে বাষ্পীভবন বলে।

পানি সূর্যতাপে বাষ্পীভূত হয়ে জলীয়বাষ্পে পরিণত হয়। উন্মুক্ত জলরাশি থেকে প্রতিনিয়ত কম বেশি বাষ্পীভবন প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এছাড়া আর্দ্র মৃত্তিকা, উদ্ভিদপত্র, বৃষ্টি বিন্দু থেকে বাষ্পীভবন হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকের ধোঁয়ার মতো অবস্থাটি বায়ুর আর্দ্রতা নির্দেশ করে।

বায়ুতে জলীয়বাষ্পের উপস্থিতিকে বায়ুর আর্দ্রতা বলে। আর্দ্রতা পরম, আপেক্ষিক, বিশেষ হতে পারে। বাতাসে জলীয়বাষ্পের উপস্থিতি বিভিন্ন ধরনের আর্দ্রতা নির্দেশক।

উদ্দীপকে সীমা তার মাকে ভাত রাঁধতে দেখে। ভাতের পাতিল থেকে সাদা ধোঁয়ার মতো কিছু জিনিস বাতাসে মিশে যাচ্ছিল। সীমা ধোঁয়ার উপর কিছুক্ষণ হাত রাখায় তার হাত ভিজে গেল। মূলত আগুনের তাপে ভাতের পাতিল থেকে অধিক পরিমাণে জলীয়বাষ্প নির্গত হওয়ায় তা সাদা ধোঁয়ার মতো দেখা যাচ্ছিল। সীমা হাত রাখাতে এই জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে তার হাত ভিজিয়ে দেয়। অর্থাৎ উদ্দীপকে সাদা ধোঁয়ার মতো অবস্থাটি বাতাসে জলীয়বাষ্পের উপস্থিতি নির্দেশ করে আর বায়ুতে এই জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিই হলো বায়ুর আর্দ্রতা।

ঘ উদ্দীপকে সীমা বায়ুর যে অবস্থা অনুভব করলো তা মূলত বায়ুর আর্দ্রতা।

বায়ুর আর্দ্রতা বাতাসে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি নির্দেশ করে। বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণের উপর নির্ভর করে আর্দ্রতাকে তিনভাবে প্রকাশ করা হয়। যথা- (i) চরম বা নিরপেক্ষ, (ii) আপেক্ষিক আর্দ্রতা ও (iii) বিশেষ আর্দ্রতা।

চরম বা নিরপেক্ষ আর্দ্রতা: একটি নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে জলীয়বাষ্পের প্রকৃত পরিমাণকে চরম আর্দ্রতা বলে। বায়ুর প্রতি ঘনমিটার আয়তনে যে জলীয়বাষ্প থাকে তার ভরকে গ্রাম হিসেবে এর পরিমাপ করা হয়।

আপেক্ষিক আর্দ্রতা : যেকোনো উষ্ণতায় নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে প্রকৃত জলীয়বাষ্পের ভরের সঙ্গে সেই উষ্ণতায় উক্ত বায়ুকে পরিপৃক্ত করতে প্রয়োজনীয় জলীয়বাষ্পের ভরের যে অনুপাত তাকে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বলে। এই আর্দ্রতা সবসময় শতকরা (%) হিসাবে প্রকাশ করা হয়।

বিশেষ আর্দ্রতা: কোনো বিশেষ বায়ুতে মোট আর্দ্র বায়ুর ভরের সঙ্গে জলীয়বাষ্পের ভরের অনুপাতকে বিশেষ আর্দ্রতা বলা হয়। এক্ষেত্রে প্রতি কিলোগ্রাম বায়ুতে যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প থাকে তার ভর যত গ্রাম হয় সেই পরিমাণকে বিশেষ আর্দ্রতা দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

প্রশ্ন ▶ ২২ উদ্দীপক-১ : ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুস্তরে জলীয় কণাকে আশ্রয় করে মেঘের মতো ঘনীভবন হয়ে কুয়াশার সৃষ্টি হয়। কখনো কখনো কুয়াশা অনেক ঘন হয়।

উদ্দীপক-২ : ঊর্ধ্বমুখী সম্পৃক্ত বায়ু ঘনীভবন সমতলের উপরে ওঠে নানা প্রকার মেঘের সৃষ্টি করে। বায়ু যদি দ্রুত বেগে উপরের দিকে উঠে ঘনীভবন ঘটায় তাহলে মেঘের উল্লম্ব বিস্তৃতি খুব বেশি হয়। *◀ শিখনফল: ৫*

ক. ঘনীভবন কাকে বলে? ১
খ. ঊর্ধ্বস্তর মেঘে আবেষ্টনী সৃষ্টি হয় কেন? ২
ঘ. উদ্দীপক-২ এর ঘনীভবন প্রক্রিয়াটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩
গ. উদ্দীপক-১ এর ঘনীভবনের উপাদানটির প্রকারভেদ বিশ্লেষণ করো। ৪

২২নং প্রশ্নের উত্তর

ক বায়ু উষ্ণ হলে অধিক জলীয়বাষ্প ধারণ করে কিন্তু শীতল হলে জলীয়বাষ্প ধরে রাখতে পারে না তখন জলীয়বাষ্পের কিছু অংশ পানিতে পরিণত হলে তাকে ঘনীভবন বলে।

খ পালকপুঞ্জ মেঘের নিচে ঊর্ধ্বস্তর মেঘ অবস্থান করে। এ ধরনের মেঘ সাদা এবং বেশ হালকা ও স্বচ্ছ হয়ে থাকে।

এসব মেঘের মধ্যে অবস্থিত বরফ কণায় সূর্য ও চাঁদের আলোর প্রতিসরণ ঘটে বলে এক রকম আবেষ্টনীর সৃষ্টি হয়। ঘূর্ণিঝড়ের আগে আকাশে এ ধরনের মেঘ দেখা যায়।

গ উদ্দীপক-২ এর ঘনীভবন প্রক্রিয়াটি মেঘ যা ঊর্ধ্ব বায়ুস্থ ঘনীভবন। ঊর্ধ্ব বায়ুতে ঘনীভবন হয়ে মেঘের সৃষ্টি হয়।

বায়ুর উপরের স্তরের ঘনীভবন হওয়ার জন্য বায়ুকে উপরে উঠতে হয়। বায়ু যখন উপরের দিকে উঠে তখন সম্প্রসারিত হবার ফলে তা শীতল হয়। বায়ু যদি অসম্পৃক্ত থাকে তাহলে উপরের দিকে উঠার সময় তাপমাত্রা একটি নির্দিষ্ট হারে কমতে থাকে, যার পরিমাণ হলো ১০° সে. / কি.মি.। এভাবে কমতে কমতে বায়ুর তাপমাত্রা শিশিরাংকে (যে তাপমাত্রায় ঘনীভবন শুরু হয়) পৌঁছালে বায়ুর ঘনীভবন ঘটে। এ ধরনের ঘনীভবন ঊর্ধ্ববায়ুস্থ ঘনীভবন।

ঘ উদ্দীপক-১ এর ঘনীভবনের উপাদানটি হচ্ছে কুয়াশা।

ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুস্তরে জলাকর্ষী কণাকে আশ্রয় করে মেঘের মতো যে ঘনীভবন হয় তাকে কুয়াশা বলে। সাধারণত তিন ধরনের কুয়াশা দেখা যায়। যেমন– ১. বিকিরণজাত, ২. আনুভূমিক প্রবাহজনিত ও ৩. কুয়াশা বায়ু প্রাচীরজনিত কুয়াশা।

বিকিরণজাত কুয়াশা : যেসব অনুকূল অবস্থায় বিকিরণজাত কুয়াশার সৃষ্টি হয় সেগুলো হলো: ভূমি সংলগ্ন আর্দ্র বায়ুস্তর, বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে জলীয় কণার উপস্থিতি, মেঘমুক্ত রাতের আকাশ, দীর্ঘ শীতের রাত, বাতাসে শান্ত অবস্থা।

আনুভূমিক বায়ুপ্রবাহজনিত কুয়াশা : উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু শীতল স্থানের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হলে এ ধরনের কুয়াশার সৃষ্টি হয়। আলাস্কার পশ্চিমে এবং পেরু উপকূলে এ ধরনের কুয়াশার সৃষ্টি হয়।

বায়ু প্রাচীরজনিত কুয়াশা : মধ্য ও উচ্চ অক্ষাংশ অঞ্চলে ভিন্ন তাপ ও আর্দ্রতা বিশিষ্ট দুটি বায়ুপুঞ্জ মিলিত হয়ে একটি অদৃশ্য প্রাচীর হয়ে অবস্থান করে। এই বায়ুপুঞ্জ দুটির মধ্যে শীতল বায়ুপ্রাচীরের পিছনের অঞ্চলে ব্যাপকভাবে এ ধরনের কুয়াশার সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন ▶ ২৩ ল্যাবরেটরিতে গতদিন মিতু ও শিলা একটি যন্ত্র নিয়ে কাজ করছিল; যেটি দিয়ে বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। *◀ শিখনফল-৫ [ড. সৈয়দ শাহজাহান আহমেদ; জুন-৬]*

ক. কত বছরের গড় আবহাওয়ার অবস্থাকে জলবায়ু বলে? ১

খ. ঘূর্ণিবৃষ্টি হয় কেন? ২

গ. মিতু ও শিলার কাজ করা যন্ত্রটির বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. যে বিষয়টি নির্ণয়ের জন্য যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয় তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাধারণত ৩০ থেকে ৪০ বছরের গড় আবহাওয়ার অবস্থাকে জলবায়ু বলে।

খ নিম্নচাপকে সাধারণভাবে ডিপ্রেশন (Depression) বলে। ডিপ্রেশনের জন্য ঘূর্ণিবৃষ্টি হয়।

বায়ু সব সময় উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হয়। চারদিক থেকে বায়ুপ্রবাহ নিম্নচাপ অঞ্চলে ছুটে গেলে ঘূর্ণিবাত (Cyclone) সৃষ্টি হয়। ঘূর্ণিবাতের ফলে নিম্নচাপ কেন্দ্রের বায়ু ঘুরতে ঘুরতে উপরে ওঠে এবং ক্রমহারে হ্রাস পেয়ে শীতল হলে অতিরিক্ত জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। একে ঘূর্ণিবৃষ্টি বলে।

গ মিতু ও শিলার কাজ করা যন্ত্রটি হলো হাইগ্রোমিটার।

বায়ুতে জলীয়বাষ্পের উপস্থিতিকে বায়ুর আর্দ্রতা বলে। বায়ুর এই আর্দ্রতা মাপা হয় শুষ্ক ও আর্দ্র কুণ্ডযুক্ত হাইগ্রোমিটারের সাহায্যে। এ যন্ত্রে এক শ্রেণির দুটি থার্মোমিটার একটি ফ্রেমে পাশাপাশি আটকানো থাকে। এক প্রান্তের কুন্ড খোলা থাকে এবং অন্য প্রান্তের কুন্ডটি একখন্ড মসলিন কাপড়ে আবৃত থাকে। মসলিনে আবৃত এ কুন্ডটি একটি পাত্রে রাখা পানিতে ভেজানো পলতের সাথে সংযুক্ত থাকে। আর্দ্রতা পরীক্ষা করার সময় মসলিন কাপড় এবং পানির পাত্রে রাখা পলতেটাকে পানিতে ভেজানো হয়। পানিসিক্ত বাতাস যতই বাষ্পে পরিণত হতে থাকে ততই বাতাসের আর্দ্রতা অনুযায়ী থার্মোমিটারের পারদ সূত্রটি নিচে নামতে থাকে এবং পরিশেষে স্থির হয়।

যদি বায়ুতে জলীয়বাষ্প (আর্দ্রতা) অধিক থাকে তবে থার্মোমিটার দুটির তাপমাত্রার পার্থক্য সামান্য হয়। পক্ষান্তরে বায়ুতে জলীয়বাষ্প (আর্দ্রতা) যদি কম থাকে তবে থার্মোমিটারদ্বয়ের তাপমাত্রার পার্থক্য বেশি হয়।

ঘ যন্ত্রটি বায়ুর আর্দ্রতা নির্ণয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়। বায়ুতে জলীয়বাষ্পের উপস্থিতিকে আর্দ্রতা বলে।

পরম আর্দ্রতা : কোনো নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে অবস্থিত জলীয়বাষ্পের প্রকৃত পরিমাণকে উক্ত বায়ুর পরম আর্দ্রতা বলে। ১০ ঘন সেন্টিমিটারের আয়তনে যদি ৫ গ্রাম জলীয়বাষ্প থাকে তবে তার পরম আর্দ্রতা হয় $\frac{৫}{১০} = ০.৫$ গ্রাম ঘন সে. মি.।

সাধারণভাবে পরম আর্দ্রতা নিম্ন অক্ষাংশে বেশি ও উচ্চ অক্ষাংশে কম হয়। মেরু অঞ্চলে তা সবচেয়ে কম হয়। সমুদ্র সান্নিধ্যে তা বাড়ে এবং সমুদ্র থেকে দূরত্বের তারতম্যে তার পরিবর্তন হয়। শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে তা বাড়ে। আবার দিনের পরম আর্দ্রতা রাত্রির পরম আর্দ্রতা অপেক্ষা সাধারণভাবে বেশি হয়।

আপেক্ষিক আর্দ্রতা : কোনো নির্দিষ্ট তাপ ও চাপে বায়ুতে যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প থাকে তার সাথে এই তাপ ও চাপে বায়ু কী পরিমাণ জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে তার অনুপাতকে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বলে। অর্থাৎ বায়ুর তুলনামূলক সিক্ততাকে বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা বলে। এটি সর্বদা শতকরা হিসাবে

পরিমাপ করা হয়; যেমন- আপেক্ষিক আর্দ্রতা = $\frac{\text{বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ}}{\text{একই উষ্ণতায় বায়ুর জলীয়বাষ্প ধারণ করার ক্ষমতা}} \times ১০০$

মনে করি, নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে ২৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রার ১৫ গ্রাম জলীয়বাষ্প বর্তমান আছে এবং এ বায়ুতে একইরূপে তাপমাত্রায় ২২.৯ গ্রাম (যদি পরিপৃক্ত হয়) পর্যন্ত জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে। তখন আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে, $\frac{১৫}{২২.৯} =$ ০.৬৫; শতকরা হিসাবে হবে ৬৫ × ১০০ = ৬৫%।

প্রশ্ন ▶ ২৪

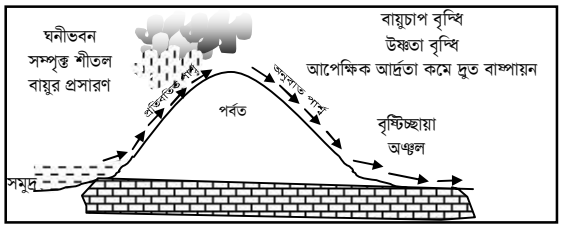

◀ *শিখনফল: ৬ [অবনীন্দ্রনাথ বৈদ্য; অনু-৪]*

ক. সম্পৃক্ত বায়ু কী? ১

খ. বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল কী? ২

গ. পর্বতের অনুবাত পার্শ্বে বৃষ্টিপাত হয় না কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. প্রতিবাত পার্শ্ব ও অনুবাত পার্শ্বের আবহাওয়াগত পার্থক্য বিশ্লেষণ করো। ৪

২৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো অসম্পৃক্ত বায়ুর জলীয়বাষ্পের পরিমাণ স্থির রেখে বায়ুকে শীতল করতে থাকলে এক পর্যায়ে বায়ুর জলীয়বাষ্প ধারণ করার ক্ষমতা এবং বায়ুর প্রকৃত জলীয়বাষ্পের পরিমাণ সমান হয়ে যায়। এ অবস্থায় বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা ১০০ শতাংশে পৌঁছে এবং এই বায়ুকে সম্পৃক্ত বায়ু বলে।

খ জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় গতিপথ পর্বতে বাধা পেলে তা পর্বতের ঢাল বেয়ে ওপরে উঠতে থাকে এবং প্রসারিত ও শীতল হয়।

ফলে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে পর্বতের প্রতিবাত পার্শ্বে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং অনুবাত পার্শ্বে কম বৃষ্টিপাত হয়। এ কম বৃষ্টিপাত অঞ্চলকে বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল বলে।

গ পর্বতের অনুবাত পার্শ্বে বৃষ্টিপাত না হওয়ার কারণ হলো জলীয়বাষ্পের অভাব।

সমুদ্র উপকূলের নিকটবর্তী অঞ্চলে পাহাড়, পর্বত, মালভূমি থাকলে নিকটবর্তী উষ্ণ সমুদ্র থেকে আগত জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু এই উঁচু ভূমিতে ধাক্কা খায় এবং ওপরে উঠতে থাকলে শীতল ও প্রসারিত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। এই অংশকে প্রতিবাত পার্শ্ব বলে।

অপরদিকে, উচ্চভূমি অতিক্রম করে বায়ু অপর পার্শ্বে অর্থাৎ অনুবাত পার্শ্বে পৌঁছালে এতে জলীয়বাষ্প আর থাকে না ফলে পর্বতের অনুবাত পার্শ্বের বৃষ্টিচ্ছায় সাধারণভাবে শুষ্ক বা প্রায় শুষ্ক বায়ু অনুভূত হয় বলে বৃষ্টি খুব কম হয়।

এজন্য পর্বতের অনুবাত পার্শ্বে বৃষ্টিপাত সামান্য পরিমাণে হয় আবার কখনোও বৃষ্টি হয় না।

ঘ শৈলোৎক্ষেপ প্রক্রিয়ায় পর্বতের যে পার্শ্বে বৃষ্টিপাত হয় তাকে প্রতিবাত পার্শ্ব এবং বৃষ্টিপাতহীন পার্শ্বকে অনুবাত পার্শ্ব বলে।

প্রতিবাত পার্শ্ব ও অনুবাত পার্শ্বের আবহাওয়াগত পার্থক্য নিচে বিশ্লেষণ করা হলো:

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় যেখানে পর্বতশ্রেণি রয়েছে সেখানে প্রতিবাত পার্শ্বে শৈলোৎক্ষেপ প্রক্রিয়ায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। কারণ— সমুদ্র উপকূলের নিকটবর্তী অঞ্চলে পাহাড় পর্বত, মালভূমি থাকলে নিকটবর্তী উষ্ণ সমুদ্র থেকে আগত জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু এই উচ্চ ভূমিতে ধাক্কা খায় এবং ওপরে উঠতে থাকলে শীতল এবং ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। এই অংশকে প্রতিবাত পার্শ্ব বলে।

উচ্চভূমি অতিক্রম করে বায়ু অপর পার্শ্বে পৌঁছলে এতে জলীয়বাষ্প আর থাকে না বলে বৃষ্টি খুব কম হয়। এ অঞ্চলকে বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল বলে। পর্বতের অনুবাত পার্শ্বের বৃষ্টিচ্ছায় সাধারণতভাবে শুষ্ক বা প্রায় শুষ্ক অঞ্চল।

প্রশ্ন ▶ ২৫ কিলাত মাহমুদ মালয়েশিয়ার এক টগবগে তরুণ। বিকালে বন্ধুদের সাথে সে মাঠে ফুটবল খেলছিল। বৃষ্টি শুরু হলে সবাই খেলা চালিয়ে যেতে চায়। কিন্তু মাহমুদ আর না খেলেই বাড়ি ফিরে যায়।

◀ *শিখনফল: ৬*

ক. আপেক্ষিক আর্দ্রতা কী? ১

খ. কীভাবে মেঘের সৃষ্টি হয়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বৃষ্টিপাতের ধরনটির চিত্র অঙ্কন করো। ৩

ঘ. কিলাত মাহমুদের দেশে এ ধরনের বৃষ্টিপাত প্রতিদিন ঘটার কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট তাপ ও চাপে বায়ুতে যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প থাকে, তার সাথে ঐ তাপ ও চাপে বায়ু কি পরিমাণ জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে তার অনুপাতই আপেক্ষিক আর্দ্রতা।

খ বায়ুতে ভাসমান অসংখ্য পানিকণা বা বরফকণার সমষ্টিকে মেঘ বলে।

বায়ুতে ভাসমান জলীয়বাষ্প কোনো কারণে শীতল হলে অতিক্ষুদ্র পাণিকণা ও তুষার কণায় পরিণত হয়। এ কণিকা বা তুষারকণা বায়ুমণ্ডলের সূক্ষ্ম ধূলিকণায় আশ্রয় নিয়ে ভেসে বেড়ায়। বাতাসে ভাসমান এ ছোট ছোট পানিকণা বা তুষারকণাই মেঘ।

গ উদ্দীপকে পরিচলন বৃষ্টিপাতের কথা উল্লিখিত হয়েছে, যা মালয়েশিয়ায় প্রতিদিন বিকেলেই সংঘটিত হয়।

চিত্র অঙ্কন করে পরিচলন বৃষ্টিপাত প্রক্রিয়া দেখানো হলো:

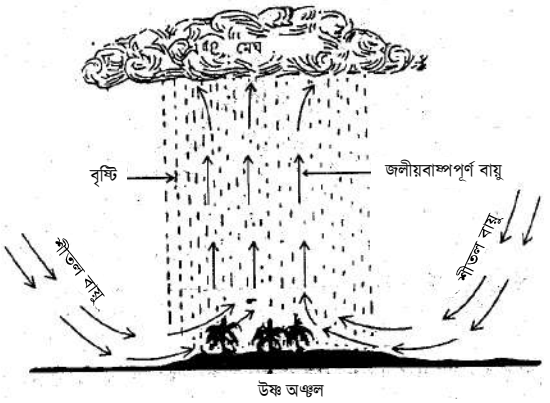

চিত্র : পরিচলন বৃষ্টিপাত

ঘ কিলাত মাহমুদের দেশ মালয়েশিয়া নিরক্ষীয় অঞ্চলের একটি দেশ। নিরক্ষীয় অঞ্চলে (৫° উ.-৫° দ.) জলভাগ অধিক এবং তাপমাত্রাও বেশি। কাজেই এখানকার বায়ুতে সর্বদা অধিক জলীয়বাষ্প থাকে। সূর্য সারাবছর এখানে লম্বভাবে কিরণ দেয়। এ অঞ্চলে সারাদিনের উত্তপ্ত উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু সোজা ওপরে উঠে যায়। ওপরের শীতল বায়ুস্তরের সংস্পর্শে আর্দ্র বায়ু শীতল হয় ও ঘনীভূত হয় এবং বিকেলের দিকে বজ্র-বিদ্যুৎসহ ঝড়-বৃষ্টি হয়। মূলত পরিচলন প্রক্রিয়ায় সমুদ্রের পানি বাষ্পীভূত হওয়া এবং দিনের শেষভাগে তাপ কমে গেলে তা ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটে। এ কারণে নিরক্ষীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে দিনের শেষ ভাগে প্রতিদিনই বৃষ্টিপাত হয়।

প্রশ্ন ▶ ২৬

চিত্র-১

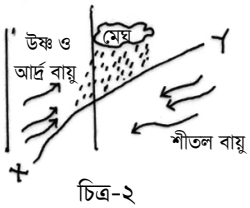

চিত্র-২

◀ শিখনফল: ৬

ক. আপেক্ষিক আর্দ্রতা কী? ১

খ. উল্লম্ব বিস্তার সম্পন্ন মেঘ কখন গঠিত হয়? ২

গ. চিত্র-২ এর XY অঞ্চলে কোন ধরনের বৃষ্টিপাত ঘটে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রদ্বয়ে সংঘটিত বৃষ্টিপাত অঞ্চলের কৃষিকাজের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

২৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেকোনো উষ্ণতায় নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে প্রকৃত জলীয়বাষ্পের ভরের সঙ্গে উষ্ণতায় উক্ত বায়ুকে পরিপৃক্ত করতে প্রয়োজনীয় জলীয়বাষ্পের ভরের যে অনুপাত, তাই আপেক্ষিক আর্দ্রতা।

খ উলম্ব বিস্তার সম্পন্ন মেঘের গোত্রে পুঞ্জ মেঘ ও ঝড়োপুঞ্জ মেঘ দেখা যায়।

বাংলাদেশে প্রাক-মৌসুমি গ্রীষ্ম ঋতুর প্রথম দিকে এবং শরৎকালে পুঞ্জ মেঘ দেখা যায়। প্রাক মৌসুমি গ্রীষ্ম ঋতুর মাঝামাঝি সময় থেকে মৌসুমি বর্ষা ঋতুর আগ পর্যন্ত সময়ে অতি গভীর পুঞ্জ মেঘ ঝড়োপুঞ্জ মেঘে রূপান্তরিত হয়।

গ চিত্র-২ এর XY অঞ্চলে বায়ু প্রাচীরজনিত বৃষ্টিপাত ঘটে।

শীতল ও উষ্ণ বায়ু মুখোমুখি উপস্থিত হলে উষ্ণ বায়ু ও শীতল বায়ু একে অপরের সঙ্গে মিশে না গিয়ে তাদের মধ্যবর্তী এলাকায় অদৃশ্য বায়ু প্রাচীরের সৃষ্টি করে। বায়ু প্রাচীর সংলগ্ন এলাকায় শীতল বায়ুর সংস্পর্শে উষ্ণ বায়ুর তাপমাত্রা হ্রাস পায় ফলে শিশিরাঙ্কের সৃষ্টি হয়। এতে উভয় বায়ুর সংযোগস্থলে বৃষ্টিপাত ঘটে। এই বৃষ্টিপাতকে বায়ুপ্রাচীর জনিত বৃষ্টিপাত বলে।

শীতল বায়ুপ্রাচীরের ঢাল অপেক্ষাকৃত খাড়া হয়। ফলে বায়ু প্রাচীর সংলগ্ন এলাকায় মেঘ ও বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্র সংকীর্ণ হয়ে যায়। আবার উষ্ণ বায়ু প্রাচীরের ক্ষেত্রে বিপরীত অবস্থা ঘটে।

ঘ চিত্র-১ এর বৃষ্টিপাত হচ্ছে ঘূর্ণিবৃষ্টি এবং চিত্র-২ এর বৃষ্টিপাত হচ্ছে বায়ুপ্রাচীর জনিত বৃষ্টি।

বৃষ্টিপাতের উপর কৃষিকার্যের সাফল্য এবং উন্নতি অনেকাংশে নির্ভরশীল। বৃষ্টিপাতের অভাবে ফসল উৎপাদন যেমন অসম্ভব তেমনি অতিবৃষ্টি চাষাবাদের জন্য মোটেই উপযোগী নয়। প্রকৃতপক্ষে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত ফসল উৎপাদনের জন্য অধিক উপযোগী।

চিত্র-১ এর ঘূর্ণিবৃষ্টি সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী হয় যা কৃষিকাজের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। কারণ অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের সাথে ঝড়ো হাওয়া ও শিলাবৃষ্টি হয় যা ফসলের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে।

অপরদিকে, চিত্র-২ এর বায়ুপ্রাচীর জনিত বৃষ্টিপাত কৃষিকাজের উপর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ধরনের বৃষ্টিপাত মাঝারি আকারে হয়ে থাকে। ফলে যে অঞ্চলে এ ধরনের বৃষ্টিপাত হয় সেখানে কৃষিকাজ করা সম্ভব হয় এবং বিভিন্ন ফসল উৎপাদিত হয়।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, তীব্র গতি বা মাত্রাতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে ঘূর্ণিবৃষ্টি অঞ্চলে কৃষিকাজের ক্ষতি সাধিত হয় এবং কৃষি উপযোগী বৃষ্টিপাতের কারণে বায়ু প্রাচীরজনিত বৃষ্টিপাত অঞ্চলে কৃষিকাজ করা সহজ হয়।

প্রশ্ন ▶ ২৭ আসিফ ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণে গেল। কিন্তু সারাদিন প্রচুর বৃষ্টির কারণে সে হোটেলের বাইরে তেমন বের হতে পারেনি। তবে যেটুকু সময় সে ভ্রমণ করেছে, দেশটির প্রশস্ত পত্রযুক্ত চিরহরিৎ বন দেখে মুগ্ধ হয়েছে।

◀ শিখনফল: ৬ [তেজগাঁও কলেজ, ঢাকা]

ক. জলবায়ু কাকে বলে? ১

খ. জলবায়ু পরিবর্তনে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের কীরূপ পরিবর্তন হবে তা লিখো? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অঞ্চলে কোন ধরনের বৃষ্টিপাত হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আসিফের দেখা বৃষ্টিপাত ছাড়া আর কী কী ধরনের বৃষ্টিপাত হয় তা বর্ণনা করো? ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো অঞ্চলের বায়ুর তাপ, চাপ, বায়ুপ্রবাহ, আর্দ্রতা, বারিপাত ইত্যাদির ৩০-৪০ বছরের গড় অবস্থাকে জলবায়ু বলে।

খ জলবায়ু পরিবর্তনে পরবর্তী ৫০ বছরে সমুদ্র পৃষ্ঠের উষ্ণতা ৩ ফুট বাড়লে বাংলাদেশের ১৭ ভাগ ভূমি পানির নিচে ডুবে যাবে (জাতিসংঘের সতর্কীকরণ)। এছাড়া বন্যা ও সাইক্লোনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি পাবে, রোগ-ব্যাধির সংক্রমণ ঘটবে। সমুদ্র উপকূলবর্তী সুন্দরবনের মতো প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। ফলে বাস্তুতন্ত্র (ecosystem) ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যা দেশের সামগ্রিক পরিবেশকে জীব বসবাসের অনুপযোগী করে তুলবে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত অঞ্চল হলো ইন্দোনেশিয়া। এ অঞ্চলে পরিচলন বৃষ্টিপাত হয়।

ভূপৃষ্ঠের বায়ু উষ্ণ হলে প্রচুর জলীয়বাষ্পসহ তা সোজা উপরে উঠে যায়। এ অবস্থায় চারপাশের শীতল ভারি বায়ু উক্ত অঞ্চলে এসে বায়ুচাপের সমতা রক্ষা করে। বায়ু উপরে উঠে প্রসারিত ও শীতল হলে জলীয় অংশ ঘনীভূত হয়ে ছোট ছোট পানি ও বরফ কণায় পরিণত হয়। পরে এ পানিকণাগুলো মিলিত হয়ে বৃষ্টি বিন্দুরূপে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে। পরিচলন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ জাতীয় বৃষ্টিপাত হয় বলে একে পরিচলন বৃষ্টি বলা হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলে (মালয়েশিয়া) সারাবছর এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে (বাংলাদেশ) গ্রীষ্মকালের শুরুতে পরিচলন বৃষ্টিপাত হতে দেখা যায়।

ঘ উদ্দীপকে আসিফের দেখা বৃষ্টিপাত পরিচলন প্রক্রিয়ায় হয়ে থাকে। এ বৃষ্টিপাত ছাড়া আরো তিন ধরনের বৃষ্টিপাত রয়েছে। এগুলো হলো– শৈলোৎক্ষেপ, ঘূর্ণিবাত ও সংঘর্ষ। নিচে এসব বৃষ্টিপাতের বর্ণনা দেওয়া হলো–

শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিঃ জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু স্থলভাগের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় যদি গমনপথে কোনো উঁচু পর্বতশ্রেণিতে বাধা পায় তাহলে তা উপরে উঠে যায়; এরপর ক্রমশ প্রসারিত হয় এবং শেষে পর্বতের উঁচু অংশে শীতল ও ঘনীভূত হয়ে পর্বতের প্রতিবাত ঢালে (Windward side) বৃষ্টিপাত ঘটায়। এরূপ বৃষ্টিপাতকে শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি বলে।

পর্বত অতিক্রম করে ঐ বায়ু যখন পর্বতের অপর পার্শ্বে অর্থাৎ অনুবাত ঢালে (Leeward side) এসে পৌঁছায় তখন জলীয়বাষ্প কমে যায়। এছাড়া নিচে নামার ফলে ঐ বায়ু উষ্ণ ও শুষ্ক হয়। ফলে এখানে বৃষ্টি হয় না। এরূপ প্রায় বৃষ্টিহীন স্থানকে বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল (Rain-shadow region) বলে।

সংঘর্ষ বৃষ্টি: শীতল ও উষ্ণ বায়ু মুখোমুখি উপস্থিত হলে উভয় বায়ু একে অপরের সাথে মিশে না গিয়ে তাদের মধ্যবর্তী এলাকায় অদৃশ্য বায়ুপ্রাচীরের (Front) সৃষ্টি করে। বায়ুপ্রাচীর সংলগ্ন এলাকায় শীতল বায়ুর সংস্পর্শে উষ্ণ বায়ুর তাপমাত্রা হ্রাস পায় এবং শিশিরাঙ্কের সৃষ্টি হয়। ফলে উভয় বায়ুর সংযোগস্থলে বৃষ্টিপাত ঘটে, একে সংঘর্ষ বৃষ্টি বলে। এ প্রকার বৃষ্টিপাত সাধারণত নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে (স্পেন) দেখা যায়।

ঘূর্ণিবাত বৃষ্টি: কোনো অঞ্চলে বায়ুমণ্ডলে নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হলে জলভাগের উপর থেকে জলীয়বাষ্পপূর্ণ উষ্ণ এবং স্থলভাগের উপর থেকে শুষ্ক শীতল বায়ু ঐ নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। শীতল বায়ু ভারি বলে উষ্ণ বায়ু ধীরে ধীরে তার উপরে উঠতে থাকে। জলভাগের উপর থেকে আসা উষ্ণ বায়ুতে প্রচুর জলীয়বাষ্প থাকে। ঐ বায়ু শীতল বায়ুর উপরে উঠলে তার ভিতরে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। এরূপ বৃষ্টিপাতকে ঘূর্ণিবাত বৃষ্টি বলে।

প্রশ্ন ▶ ২৮ নাসির ও শরিফ দুই বন্ধু। শরিফের বাড়ি কুষ্টিয়া জেলায়। নাসিরের বাড়ি হবিগঞ্জে। বর্ষাকালে নাসির শরিফের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে প্রচুর বৃষ্টি হতে দেখে এবং দুই অঞ্চলে উক্ত সময়ে বৃষ্টিপাতের ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ করে।

◀ *শিখনফল: ৬ [সরকারি ইয়াছিন কলেজ, ফরিদপুর]*

ক. বৃষ্টিপাত কী? ১

খ. বৃষ্টিপাতের প্রকারভেদ লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে যে বৃষ্টিপাতের ইঙ্গিত রয়েছে তা চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দুই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের বৈষম্যের কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভাসমান মেঘ ঘনীভূত হয়ে পানির ফোঁটা আকারে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে ভূপৃষ্ঠে পতিত হওয়াই বৃষ্টিপাত।

খ বৃষ্টিপাতকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা–

i. শৈলোৎক্ষেপ;
ii. পরিচলন;
iii. সংঘর্ষ; এবং
iv. ঘূর্ণিবাত।

গ উদ্দীপকে শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাতের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নিচে চিত্রসহ এ বৃষ্টিপাত ব্যাখ্যা করা হলো–

জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু স্থলভাগের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় যদি গমনপথে কোনো উঁচু পর্বতশ্রেণিতে বাধা পায় তাহলে তা উপরে উঠে যায়; ক্রমশ প্রসারিত হয় এবং পর্বতের উঁচু অংশে শীতল ও ঘনীভূত হয়ে পর্বতের প্রতিবাত ঢালে (Windward side) বৃষ্টিপাত ঘটায়। এরূপ বৃষ্টিপাতকে শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি বলে।

পর্বত অতিক্রম করে ঐ বায়ু যখন পর্বতের অপর পার্শ্বে অর্থাৎ অনুবাত ঢালে (Leeward side) এসে পৌঁছায় তখন জলীয়বাষ্প কমে যায়। এছাড়া নিচে নামার ফলে ঐ বায়ু উষ্ণ ও শুষ্ক হয়। ফলে এখানে বৃষ্টি হয় না। এরূপ প্রায় বৃষ্টিহীন স্থানকে বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল (Rain-shadow region) বলে।

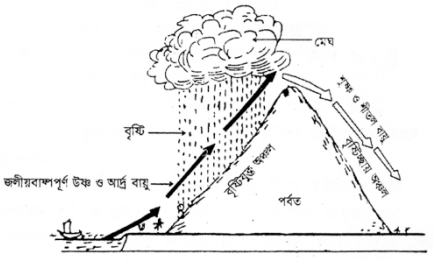

চিত্র: শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু মেঘালয় পাহাড়ের পাদদেশে (বাংলাদেশের সিলেট) প্রচুর শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত ঘটায়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বাংলাদেশের দুটি অঞ্চল কুষ্টিয়া ও হবিগঞ্জ। উক্ত অঞ্চল দুটি ভূপ্রকৃতিগত দিক থেকে ভিন্ন বলে বৃষ্টিপাতের ধরনে পার্থক্য হয়।

হবিগঞ্জ বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত এবং এখানে উঁচু পার্বত্য ভূমি রয়েছে। এছাড়া হিমালয় পর্বত উত্তর দিকে অবস্থিত। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ দিক থেকে বঙ্গোপসাগরে জলীয়বাষ্পপূর্ণ উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু উত্তর দিকে প্রবাহিত হওয়ার সময় হবিগঞ্জের পাহাড়ে বাধা পেয়ে উপরে উঠতে থাকে এবং প্রসারিত ও শীতল হয়। পর্বতের উচ্চ অংশের শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এ জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু ঘনীভূত হয়ে পর্বতের প্রতিবাত পাশে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়।

অন্যদিকে, শরিফের বাড়ি কুষ্টিয়া জেলায়, যা সমভূমি অঞ্চল। এখানকার বায়ু উষ্ণ। বায়ুর উষ্ণতা অত্যধিক হলে বাষ্পীভবনের ক্ষমতা বাড়ে। আর জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বাড়লে বায়ু হালকা হয়ে উপরে উঠে যায়। এর ফলে বায়ুর তাপ হ্রাস পায় এবং অতিরিক্ত জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। অর্থাৎ, এখানে পরিচলন বৃষ্টিপাত ঘটে।

প্রশ্ন ▶ ২৯

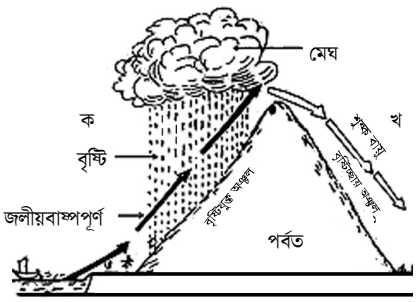

◀ *শিখনফল: ৬ [তাপস কুমার মজুমদার; অনু-২]*

ক. নিয়ত বায়ু কী? ১

খ. বৃষ্টিপাত কীভাবে সংঘটিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের বৃষ্টিপাত সংঘটিত হচ্ছে বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে 'ক' অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হলেও 'খ' অঞ্চল বৃষ্টিহীন কেন বিশ্লেষণ করো। ৪

২৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভূপৃষ্ঠের উচ্চচাপ বলয় হতে নিম্নচাপ বলয়ের দিকে যে বায়ু সারাবছর নিয়মিতভাবে প্রবাহিত হয় তাকে নিয়ত বায়ু বলে।

খ জলীয়বাষ্প মিশ্রিত বায়ু কোনো কারণে শীতল হলে তা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণায় পরিণত হয়।

এ জলকণাগুলো বায়ুতে ভাসমান ধূলিকণার সাথে মিশে আকারে বড় ও ভারী হয়। এ কণাগুলো তখন আর আকাশে ভেসে বেড়াতে পারে না। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে এ পানির কণাগুলো ভূপৃষ্ঠে বৃষ্টিরূপে পতিত হয়। আর এভাবেই বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়।

গ উদ্দীপকে শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত সংঘটিত হচ্ছে।

ভূমির বন্ধুরতার জন্য এরূপ বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়।

জলীয়বাষ্পপূর্ণ উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু ভূপৃষ্ঠের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় গতিপথে পর্বতাদিতে বাধা পেলে তা পর্বতের ঢাল বেয়ে ওপরে উঠতে থাকে এবং প্রসারিত ও শীতল হয়। পর্বতের উচ্চ অংশের শীতল বায়ু তুষারের সংস্পর্শে এবং ঊর্ধ্বে ওঠার ফলে এ জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু ঘনীভূত হয়ে পর্বতের প্রতিবাত পার্শ্বে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। ভূমির বন্ধুরতার (Relief) জন্য এরূপ বৃষ্টিপাত হয় বলে একে শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি বলে। পাহাড়ে বাধা পেয়ে এ জাতীয় বৃষ্টিপাত হয় বলে একে আবার পাহাড়িয়া বৃষ্টিও বলা হয়।

ঘ উদ্দীপকে 'ক' অঞ্চল হলো বৃষ্টিযুক্ত অঞ্চল এবং 'খ' অঞ্চল হলো বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল।

সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে পাহাড় ও মালভূমি থাকলে জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু উচ্চভূমিতে ধাক্কা খেয়ে শীতল ও ঘনীভূত হয়ে পর্বতের প্রতিবাতে পার্শ্বে বৃষ্টিপাত ঘটায়। এটি বৃষ্টিযুক্ত অঞ্চল নামে পরিচিত। উচ্চভূমি অতিক্রম করে বায়ু অনুবাত পার্শ্বে পৌঁছালে জলীয়বাষ্প কম থাকে। বায়ু তখন পর্বতের গাত্র বেয়ে নিচে নামতে থাকে।

এ পর্যায়ে বায়ু উত্তপ্ত ও প্রায় শুষ্ক হয়ে পড়ে। এ কারণে পর্বতের অনুবাত পার্শ্বে বৃষ্টিপাত হয় না বা কম হয়। এজন্য পর্বত বা পাহাড়ের বৃষ্টিপাতহীন অনুবাত অঞ্চলকে বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল বলে।

উপরিউক্ত কারণেই 'ক' অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হলেও 'খ' অঞ্চল বৃষ্টিহীন।

প্রশ্ন ▶ ৩০

স্তর	মেঘের উচ্চতা
ক	৬০০০-১০০০০ মিটার
খ	২০০০-৬০০০ মিটার
গ	২০০০ মিটার উচ্চতার মধ্যে

◀ *শিখনফল: ৬ [তাপস কুমার মজুমদার; অনু-১]*

ক. আবহাওয়া কী? ১

খ. আর্দ্র বায়ুর উষ্ণতা শিশিরাঙ্কে নেমে গেলে কোন অবস্থার সৃষ্টি হয় ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে 'ক' ও 'খ' স্তরের মেঘের বৈসাদৃশ্য বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে 'গ' স্তরের মেঘ বিমান চলাচলের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ- কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানের নির্দিষ্ট সময়ের বায়ুমন্ডলের উষ্ণতা, বায়ুর চাপ, বায়ুপ্রবাহ, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি অবস্থাই আবহাওয়া।

খ আর্দ্র বায়ুর উষ্ণতা শিশিরাঙ্ক নেমে গেলে ঘনীভবন সৃষ্টি হয়।

আর্দ্র বায়ুর উষ্ণতা যখন শিশিরাঙ্কের নিচে নেমে যায় তখন অতিরিক্ত জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে জলকণায় পরিণত হয়। এভাবে বাষ্প থেকে জলকণায় রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে ঘনীভবন বলে।

গ উদ্দীপকে 'ক' হলো উচ্চ আকাশের মেঘ এবং 'খ' হলো মধ্যম আকাশের মেঘ। নিম্নে ক ও 'খ' স্তরের মেঘের বৈসাদৃশ্য বর্ণনা করা হলো:

সাধারণত ৬,০০০ মিটার থেকে ১০,০০০ মিটার পর্যন্ত উচ্চতার মেঘকে ঊর্ধ্ব আকাশের মেঘ বলে। অন্যদিকে মধ্যম স্তরের মেঘের অবস্থান হলো ঊর্ধ্ব স্তরের মেঘের নীচে অর্থাৎ ২,০০০ মিটার থেকে ৬,০০০ মিটারের মধ্যে। ঊর্ধ্ব আকাশের মেঘগুলো দেখতে পাখির পালক বা আঁশের মতো। অন্যদিকে মধ্যম আকাশের মেঘগুলো জলকণা বা বরফকণা আকারে অবস্থান করে। ঊর্ধ্ব স্তরের মেঘ হতে বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে। অন্যদিকে মধ্যম উচ্চতার মেঘ থেকে কদাচিৎ বৃষ্টিপাত হলেও সেই বৃষ্টি পৃথিবীতে এসে পৌঁছায় না। ঊর্ধ্ব স্তরের মেঘের মধ্যে পালক মেঘ, পালকপুঞ্জ মেঘ উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে মধ্যম উচ্চতার মেঘের মধ্যে পুঞ্জ মেঘ ও উন্নেঘ স্তর মেঘ উল্লেখযোগ্য।

উপরের আলোচনা হতে বলা যায় যে, 'ক' ও 'খ' স্তরের মেঘের মধ্যে যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘ 'গ' স্তরের মেঘ হলো নিম্ন আকাশের মেঘ।

যেসব মেঘ ভূপৃষ্ঠের উপর থেকে ২,০০০ মি. উচ্চতার মধ্যে ভেসে বেড়ায় তাদের নিম্ন আকাশের মেঘ বলে।

নিম্ন আকাশের মেঘ তিন ধরনের। যেমন স্ট্র্যাটোকিউমুলাস, স্ট্যাটাস, এবং নিম্বস্ট্রাটাস। এর মধ্যে স্ট্যাটাস ভূপৃষ্ঠের নিকটতম মেঘ। এ মেঘ স্তরে স্তরে বিন্যস্ত থাকে। এ মেঘ থেকে হালকা ধরনের বৃষ্টিপাত হয়। এ স্তরের মেঘগুলো সম্পূর্ণরূপে জলকণা দ্বারা গঠিত। এছাড়াও মধ্য ও উচ্চ অক্ষাংশ অঞ্চলে শীতকালে এ স্তরের মেঘে বরফকণা ও তুষার অবস্থান করে। আনুভূমিকভাবে বিস্তৃত ছাই রঙের এ মেঘগুলো সারা আকাশকে ছেয়ে রাখে। ফলে বিমান চালকগণ এ মেঘের ভিতর দিয়ে বিমান চালালে যেকোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে।
উপরিউক্ত কারণেই 'গ' স্তরের মেঘ বিমান চলাচলের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶৩১ ঈদের ছুটিতে রেবেকা বাবার সাথে মালয়েশিয়ায় বেড়াতে যায়। তারা বৃষ্টির কারণে একদিনও বিকালে হোটেল থেকে বের হতে পারেনি। অথচ গত বছর শীতকালে ইতালিতে ভ্রমণকালে সংঘটিত বৃষ্টিতেও ঝলমলে রৌদ্রকরোজ্জ্বল আবহাওয়া দেখে তার অভিভূত হয়ে ছিল। ◀ *শিখনফল: ৪ ও ৬ /বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা; রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, গাজীপুর]*

ক. পরম আর্দ্রতা কী? ১
খ. বৃষ্টিপাত সংঘটনের কারণ ব্যাখ্যা করো। ২
গ. রেবেকার ভ্রমণকৃত প্রথম স্থানটির সাথে বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের তুলনামূলক চিত্র অঙ্কন করে উপস্থাপন করো। ৩
ঘ. রেবেকার ভ্রমণকৃত স্থান দুটির কোনটি কোন ধরনের জলবায়ুর ইঙ্গিত প্রদান করে? এদের যে কোন একটির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো। ৪

৩১নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে উপস্থিত জলীয়বাষ্পের প্রকৃত পরিমাণই উক্ত বায়ুর পরম আর্দ্রতা।

খ জলীয়বাষ্প মিশ্রিত বায়ু কোনো কারণে শীতল হলে তা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণায় পরিণত হয়।

এ জলকণাগুলো বায়ুতে ভাসমান ধূলিকণার সাথে মিশে আকারে বড় ও ভারী হয়। এ কণাগুলো তখন আর আকাশে ভেসে বেড়াতে পারে না। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে এ পানির কণাগুলো ভূপৃষ্ঠে বৃষ্টিরূপে পতিত হয়। আর এভাবেই বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়।

গ রেবেকার প্রথম ভ্রমণকৃত স্থান হলো মালয়েশিয়া। দেশটিতে প্রায় প্রতিদিন পরিচলন প্রক্রিয়ায় বৃষ্টিপাত হয়। আর বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলে সারা বছর ধরে শৈলোৎক্ষেপ প্রক্রিয়ায় বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়। নিচে বৃষ্টিপাত দুইটির তুলনামূলক আলোচনা চিত্র অঙ্কন করে উপস্থাপন করা হলো:

পরিচলন বৃষ্টি: ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা অত্যধিক হলে বায়ুর বাষ্পীভবনের ক্ষমতা বাড়ে। বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বাড়লে বায়ু হালকা হয়ে উপরে উঠে যায়। এর ফলে বায়ুর তাপ ক্রমশ হ্রাস পায় এবং অতিরিক্ত জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। সাধারণভাবে বিকালের দিকে পরিচলন প্রক্রিয়ায় বৃষ্টিপাত হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলে সারা বছর ধরে প্রতিদিন বিকালে পরিচলন বৃষ্টিপাত হয়।

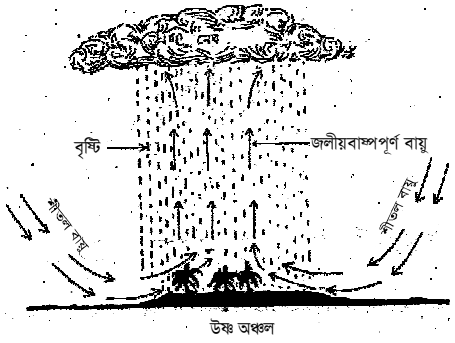

চিত্র : পরিচলন বৃষ্টিপাত

শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি: সমুদ্র থেকে আগত জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু স্থলভাগের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় যদি গমন পথে কোনো উঁচু পর্বতশ্রেণিতে বাঁধা পায় তাহলে ঐ বায়ু উপরের দিকে উঠতে থাকে। তখন তা ক্রমশ প্রসারিত ও ঘনীভূত হয়ে পর্বতের প্রতিবাত ঢালে (Windward side) প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। কিন্তু পর্বতের অপর পার্শ্বে অর্থাৎ অনুবাত ঢালে (Leeward side) জলীয়বাষ্প কম থাকে বলে বৃষ্টিপাত কম হয়। এরূপ বৃষ্টিপাতকে শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি বলে।

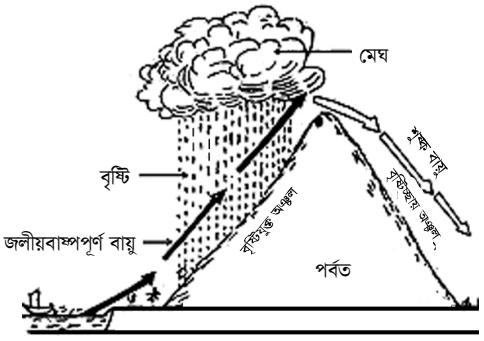

চিত্র : শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত

ঘ রেবেকার ভ্রমণকৃত স্থান দুটি হলো মালয়েশিয়া এবং ইতালি।

মালয়েশিয়া নিরক্ষীয় এবং ইতালি ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত। নিচে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো:

অবস্থান: মহাদেশগুলোর পশ্চিমাংশে ৩০° হতে ৪৫° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে যে জলবায়ু দেখা যায় তাকে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু বলে। ভূমধ্যসাগর এবং এর তীরবর্তী দেশসমূহে (মিশর, স্পেন) এ জলবায়ুর বিস্তৃতি ও প্রভাব সর্বাধিক বলে এ জলবায়ুকে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু বলা হয়।

তাপমাত্রা: ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা ২১° থেকে ২৭° সেলসিয়াস এর মধ্যে এবং শীতকালীন তাপমাত্রা ৪° হতে ১০° সেলসিয়াস এর মধ্যে থাকে। ফলে শীত-গ্রীষ্মের তাপমাত্রার পার্থক্য গড়ে প্রায় ১১° সেলসিয়াস (৩০° ফা.)।

বৃষ্টিপাত: বৃষ্টিবহুল শীতকাল এবং বৃষ্টিহীন গ্রীষ্মকাল ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ অঞ্চলে বার্ষিক ২৫ হতে ৭৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়।

সুতরাং বলা যায় যে, শীত-গ্রীষ্ম ও দিন-রাতের তাপমাত্রার ব্যাপক পার্থক্য, মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশ, বৃষ্টিবহুল শীতকাল ও বৃষ্টিহীন গ্রীষ্মকাল প্রভৃতি ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

প্রশ্ন ▶ ৩২ জলবায়ুর বিভিন্নতা একটি অঞ্চলে মানুষ, উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করে। তাপমাত্রার সাথে সম্পর্ক রেখে কৃষি, মানুষের বসবাস, মানুষের কর্মক্ষমতা ইত্যাদির ভিন্নতা দেখা যায়। *◀ শিখনফল: ৭*

ক. মেঘ কাকে বলে? ১

খ. আপেক্ষিক আর্দ্রতা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের বিষয়টি কৃষিকার্যের ওপর কী ধরনের প্রভাব রাখে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জলবায়ুর ভিন্নতা কৃষিকার্য ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের ওপর যে প্রভাব ফেলে তা তোমার মতামতসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৩২নং প্রশ্নের উত্তর

ক বায়ুতে ভাসমান জলীয়বাষ্প কোনো কারণে শীতল হলে অতি ক্ষুদ্র পানিকণা ও তুষারকণায় পরিণত হয়ে সূক্ষ্ম ধূলিকণা আশ্রয় করে ভাসতে থাকে। বাতাসে ভাসমান এ ছোট ছোট পানিকণা বা তুষারকণাকে মেঘ বলে।

খ যেকোনো উষ্ণতায় নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে প্রকৃত জলীয়বাষ্পের ভরের সঙ্গে সেই উষ্ণতায় উক্ত বায়ুকে পরিপৃক্ত করতে প্রয়োজনীয় জলীয়বাষ্পের ভরের যে অনুপাত, তাকে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বলে।

আপেক্ষিক আর্দ্রতাকে শতকরা (%) হিসাবে প্রকাশ করা হয়।

$$\text{আপেক্ষিক আর্দ্রতা} = \frac{\text{বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ}}{\text{একই উষ্ণতায় বায়ুর জলীয়বাষ্প ধারণ করার ক্ষমতা}} \times ১০০$$

গ উদ্দীপকের বিষয়টি জলবায়ু। জলবায়ুর ভিন্নতা কৃষিকার্যের ওপর ব্যাপকভাবে প্রভাব সৃষ্টি করে। কৃষিকার্য প্রধানত জলবায়ুর ওপর নির্ভরশীল।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে হাজার হাজার বছর ধরে জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রকার ফসল উৎপন্ন হয়। যেমন— উষ্ণমণ্ডলে বৃষ্টিবহুল এলাকায় ধান, পাট, চা, ইক্ষু বিভিন্ন রসাল ফল ইত্যাদি জন্মায়। অপেক্ষাকৃত কম বৃষ্টিপাত হয় এমন নাতিশীতোষ্ণ মন্ডলে গম, যব, ভুট্টা ইত্যাদি খাদ্যশস্য জন্মায়।

কোনো অঞ্চলের জলবায়ুর সঙ্গে অভিযোজিত হয়ে যে ফসল উৎপাদন হয় তার ওপর মানুষের জীবন-জীবিকা বা খাদ্যাভ্যাস নির্ভর করে। বাংলাদেশের কৃষিও জলবায়ুর ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে।

ঘ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ ভেদে জলবায়ুর ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

জলবায়ুর ভিন্নতা কৃষিকার্য ব্যাতীত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। নিম্নে এগুলো বিশ্লেষণ করা হলো—

পশুপালন : পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মহাদেশীয় জলবায়ুর প্রভাবে বিশাল আয়তনের তৃণভূমির সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণে উত্তর আমেরিকার প্রেইরী, দক্ষিণ আমেরিকার পাম্পাস, অস্ট্রেলিয়ার ডাউন্স, ইউরেশিয়ার স্টেপ তৃণভূমি অঞ্চলে পশুপালনের পাশাপাশি পশু শিল্প গড়ে উঠেছে।

মৎস্য শিল্প: পৃথিবীর প্রধান প্রধান মৎস্য শিকার কেন্দ্রগুলো নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অবস্থিত। এই জলবায়ুতে মাছের খাদ্য প্লাঙ্কটন জন্মায়। উষ্ণমণ্ডলে মাছ সংরক্ষণ কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ।

ব্যবসা-বাণিজ্য : অনুকূল আবহাওয়ার জন্য ব্যবসা বাণিজ্যের বিকাশ ঘটে। যন্ত্র, কুটির, হস্তশিল্পের ওপর জলবায়ুর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে। এছাড়া নৌপরিবহন বাণিজ্যে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

বসতি-বাসস্থান : খুবই উষ্ণ বা খুবই শীতল এলাকায় মানুষের বসবাস করা কষ্টসাধ্য। জলবায়ুর বিভিন্নতার জন্য বাসগৃহের আকৃতি বা নির্মাণ কৌশল ভিন্নতর হয়। বনভূমি প্রাধান্য এলাকায় কাঠের ঘরবাড়ি, পলিযুক্ত মৃত্তিকা অঞ্চলে মাটির ঘর না হয়ে টিন ও বেড়ার ঘর তৈরি করা হয়।

সভ্যতার বিকাশ ও অন্যান্য : জলবায়ুর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে নদী উপত্যকায় সভ্যতা বিকাশ লাভ করে।

পরিশেষে বলা যায়, জলবায়ুর বিভিন্ন উপাদানগুলোর বিরূপ প্রক্রিয়ায় জীবজগৎ হুমকির সম্মুখীন। জলবায়ুর ভিন্নতার প্রভাবে মানব সমাজ নানাভাবে প্রতিকূল অবস্থায় পড়ছে। তবে এ ব্যাপারে বিশ্ব সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ শিমুলের মামা একটি দেশের রাষ্ট্রদূত। শিমুল গত বছর ঐ দেশে বেড়াতে গেল। তার মামা তাকে বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখাল। শিমুল লক্ষ করল, সেখানে প্রতিদিন বিকাল বেলায় কিছু সময়ের জন্য বৃষ্টিপাত হয়। তার মামা বলল জলবায়ুগত কারণে এখানে রাবার ভালো জন্মে। ফলে দেশটির রাবার শিল্প যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে।

◀ শিখনফল: ৬ ও ৭ [ড. সৈয়দ শাহজাহান আহমেদ: অনু-১]

ক. আর্দ্রতা কী? ১
খ. বায়ু সর্বদা উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলে প্রবাহিত হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে শিমুল কোন ধরনের বৃষ্টিপাত দেখল তার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে শিমুলের ভ্রমণকৃত দেশটির কৃষির উপর জলবায়ুর প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক বায়ুর জলীয়বাষ্প ধারণ করার ক্ষমতাই বায়ুর আর্দ্রতা।

খ উষ্ণতার তারতম্যের কারণে বায়ু সর্বদা উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়।

উষ্ণতা ও বায়ুর চাপ ব্যাস্তানুপাতে সম্পর্কযুক্ত। কোনো স্থানে বায়ুর উষ্ণতা বাড়লে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয় আর উষ্ণতা কমলে উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়। ফলে বায়ুপ্রবাহ তখন উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়।

গ উদ্দীপকে শিমুল পরিচলন বৃষ্টিপাত দেখেছে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে সারাবছর প্রায় প্রতিদিন বিকালে এ ধরনের বৃষ্টিপাত হয়।

ক্রান্তীয় নীতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে বিকালের দিকে পরিচলন বৃষ্টি হতে দেখা যায়। এই বৃষ্টির বৈশিষ্ট্যসমূহের ব্যাখ্যা নিচে প্রদান করা হলো —

i. নিরক্ষীয় অঞ্চলে অর্থাৎ পৃথিবীর উভয় গোলার্ধে ৫°–১০° অক্ষাংশে সূর্য সারাবছর লম্বভাবে কিরণ দেয়। উপরন্তু এ অঞ্চলে জলভাগ বেশি থাকায় বায়ুমণ্ডলে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ অধিক হয়।
ii. এ অঞ্চলে বার্ষিক পরিচলন বৃষ্টির পরিমাণ গড়ে প্রায় ২০০ সেন্টিমিটার।
iii. এ বৃষ্টিপাত সাধারণত বজ্র-বিদ্যুৎসহ মুষলধারে সংঘটিত হয় এবং অনেক সময় এর সাথে শিলাবৃষ্টিও হয়ে থাকে।
iv. ঝড়োপুঞ্জ মেঘ হতে এ বৃষ্টিপাত হয় বলে এর বিস্তৃতি কম ও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এ কারণে ঝড়বৃষ্টির পর মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ দেখা যায়।

ঘ শিমুলের ভ্রমণকৃত দেশটি হলো মালয়েশিয়া।

মালয়েশিয়া নিরক্ষীয় জলবায়ুর দেশ। এ অঞ্চলে প্রতিদিন বিকেলবেলায় পরিচলন প্রক্রিয়ায় বৃষ্টিপাত হয় এবং জলবায়ুগত কারণে মালয়েশিয়ায় রাবার ভালো জন্মে। নিম্নে মালয়েশিয়ার কৃষির ওপর জলবায়ুর প্রভাব বিশ্লেষণ করা হলো:

জলবায়ুর ভিত্তিতে মালয়েশিয়ার কৃষি পদ্ধতিকে দেশীয় কৃষি এবং আবাদি কৃষি নামক দুই ভাগে ভাগ করা যায়। উপদ্বীপের পশ্চিম উপকূলীয় উপত্যকাগুলোতে এবং পূর্ব উপকূলীয় এলাকায় ধান উৎপাদিত হয়। এছাড়া কৃষকরা তামাক, ইক্ষু, কর্পুর, সাগু, মশলা, কফি, কোকো, চা ও ট্যাপিওকা উৎপাদন করে। উপকূল ও উপত্যকাগুলো থেকে দূরবর্তী এলাকায় খুব কমই কৃষিকাজ করা হয়। এখানে বড় বড় রাবার খামারগুলোতে বাণিজ্যিক হারে রাবার উৎপাদিত হয়। এ জলবায়ুতে অন্যান্য আবাদি উদ্ভিদের মধ্যে নারকেল, পাম গাছ, আনারস ও তামাক উল্লেখযোগ্য। উপকূলীয় এলাকার বালুকাময় মাটিতে নারকেল গাছের চাষ প্রসার লাভ করেছে। এছাড়া ভোজ্য তেল প্রদায়ী আফ্রিকান পাম গাছের চাষ যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে। অপেক্ষাকৃত অনুর্বর মাটিতে আনারস চাষ করা হয়। সাবাহ ও সারাওয়াকে রাবার ও তামাক আবাদি ফসল হিসেবে উৎপাদন হয় এছাড়া দেশের এই অংশে সাগু ও গোলমরিচ উৎপাদিত হয়।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা হতে একথা বলা যায় যে, মালয়েশিয়ার কৃষির উপর জলবায়ুর ব্যাপক প্রভাব বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶৩৪ সাইফুল সুপার কম্পিউটারের মাধ্যমে হাতির শুঁড়ের মতো এক ধরনের মেঘ দেখতে পেল। সে দেখে, মেঘের শুঁড়টা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরে যাচ্ছে আর দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে সবকিছু। *◀শিখনফল-৮ [ড. সৈয়দ শাহজাহান আহমেদ; অনু-৯]*

ক. কালবৈশাখী কী? ১
খ. টর্নেডোর শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করো। ২
গ. সাইফুলের দেখা প্রাকৃতিক দুর্যোগের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত দুর্যোগের প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালের শুরুতে স্বল্প পরিসরে অল্প সময়ব্যাপী বজ্রবিদ্যুৎসহ এক প্রকার প্রবল ঝড়ই কালবৈশাখী।

খ টর্নেডো সাধারণত দুই প্রকার। যথা : এফ-০ এবং এফ-৫। বাতাসের গতিবেগ ৩৫ থেকে ৫৩ নট থাকলে তা এফ-০। এ প্রকৃতির ঝড়ে সামান্য ক্ষতি হয়। অপরদিকে বাতাসের গতিবেগ ২২৭ থেকে ২৭৬ নট হলে এ ঝড়কে এফ-৫ বলে। এ প্রকৃতির টর্নেডোতে প্রচুর ধ্বংসলীলা সাধিত হয়।

গ সাইফুল যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখেছে তা হলো টর্নেডো।

টর্নেডো এক প্রকারের আবর্তনশীল অতিক্ষুদ্র আকারের বজ্রঝড়। আয়তনে এটি ক্ষুদ্র হলেও তান্ডবলীলায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ঝড়ো পুঞ্জ মেঘের তলদেশ থেকে চোঙের মতো মেঘ মাটির দিকে নামতে থাকে। এ চোঙ যেখানে ভূমি স্পর্শ করে সেখানে ঘন কালো মেঘে চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়। যেখানে চোঙ মাটি স্পর্শ করে না সেখানে কোনো ক্ষতি সাধিত হয় না। সমুদ্রের উপর টর্নেডোর সৃষ্টি হলে সমুদ্রের পানি চোঙ বরাবর উপরের দিকে উত্থিত হয়। টর্নেডোর মধ্যভাগে বায়ু আবর্তনের গতিবেগ ঘণ্টায় ২০০-৫০০ কি. মি. পর্যন্ত হতে পারে। উত্তর গোলার্ধে এরা ডানাবর্তে আবর্তিত হয়। একটি টর্নেডো কোনো স্থানে সাধারণত ২০ সেকেন্ডের বেশি স্থির থাকে না। এর পরিভ্রমণ পথের দৈর্ঘ্য ১৫ থেকে ৩০ কি. মি. পর্যন্ত হতে পারে। বাংলাদেশে সাধারণত চৈত্র-বৈশাখ মাসে টর্নেডোর তান্ডব লক্ষ করা যায়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখিত দুর্যোগটি হলো টর্নেডো। নিচে এ টর্নেডোর প্রভাব বিশ্লেষণ করা হলো-

যত ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় রয়েছে তার মধ্যে টর্নেডোর ক্ষতির মাত্রা সবচেয়ে বেশি। এ বিধ্বংসী ঝড়ে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। টর্নেডো বিশেষ করে মানুষের ঘরবাড়ি উপড়ে ফেলে, মানুষ ও প্রাণীর মৃত্যু ঘটায়। টেলিফোন ও বিদ্যুৎ লাইন উপড়ে ফেলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় বিঘ্ন ঘটায়। এটি গাছপালা ভেঙে ফেলে এবং ফসলের ক্ষেতের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। লঞ্চ-স্টিমার ও সড়কপথের যানবাহনও দুর্ঘটনায় পতিত হয়। মানুষের জান-মালের ক্ষতি ঘটায়।

টর্নেডোর কোনো পূর্বপ্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব নয়। তবে এর প্রেক্ষিতে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। বাড়ির চারপাশে বায়ু প্রতিরোধক শক্ত জাতের গাছ যেমন- তাল, নারিকেল, খেজুর প্রভৃতি গাছের চারা লাগানো যেতে পারে। টর্নেডো চলাকালীন অপেক্ষাকৃত নিচু স্থানে শুয়ে পড়তে হবে।

প্রশ্ন ▶ ৩৫

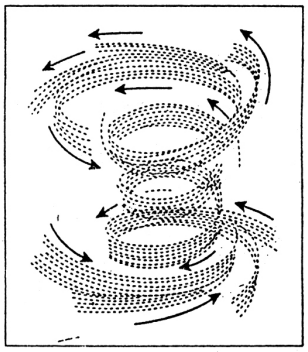

◀ *শিখনফল: ৮ [অবনীন্দ্রনাথ বৈদ্য; অনু-২]*

ক. চিত্রটি কিসের? ১

খ. চিত্রের বিষয়বস্তুর শ্রেণিবিভাগ দাও। ২

গ. টর্নেডো ও চিত্রের মধ্যে পার্থক্য কী? ৩

ঘ. বাংলাদেশের কয়েকটি টর্নেডোর সময়কাল উল্লেখপূর্বক ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বর্ণনা দাও। ৪

৩৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক উদ্দীপকের চিত্রটি ঘূর্ণিঝড়ের।

খ চিত্রের ঘূর্ণিঝড়ের বিষয়বস্তুর ২টি শ্রেণিবিভাগ লক্ষ করা যায়। যথা: ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় এবং নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণিঝড়।

ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় : ক্রান্তীয় অঞ্চলে সংঘটিত নিম্নচাপ বিশিষ্ট ঝড়কে ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় বলে।

নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণিঝড়: নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে উষ্ণ ও শীতল বায়ুপুঞ্জের মিলনস্থলে বা সীমান্তে যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয় তার ফলে হালকা জলীয়বাষ্পপূর্ণ উষ্ণ বায়ু উপরে উঠে যে ঝড়বৃষ্টির সৃষ্টি হয় তাকে নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণিঝড় বলে।

গ টর্নেডো ও চিত্রের অর্থাৎ ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ:

টর্নেডো	ঘূর্ণিঝড়
১. অতি অল্প স্থান জুড়ে অত্যন্ত গভীর নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়।	১. ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রে সর্বনিম্ন চাপ থাকে এবং কেন্দ্রের বাহিরের দিকে চাপ ক্রমশ বাড়তে থাকে।
২. ঘূর্ণিঝড় গভীর সমুদ্রে সৃষ্টি হয়।	২. টর্নেডো যেকোনো স্থানেই সৃষ্টি হতে পারে।
৩. ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের বেগ অনেক বেশি হয়।	৩. টর্নেডোর ক্ষেত্রে বাতাসের গতিবেগ সাইক্লোনের চেয়ে বেশি হয়।
৪. টর্নেডোর সাথে প্রবল বৃষ্টিপাত হয় এবং কখনো কখনো শিলাবৃষ্টি হয়।	৪. ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথে বজ্রসহ ঝড় ও বৃষ্টি হয়।

ঘ আমাদের অতি পরিচিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলো টর্নেডো। বাংলাদেশ ছাড়াও আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়াসহ বিশ্বের অনেক দেশেই টর্নেডো আঘাত আনে। টর্নেডোর সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক হলো এটি হঠাৎ করে অল্প সময়ের মধ্যে প্রচণ্ড ধ্বংসযজ্ঞ সাধন করে।

বাংলাদেশের কয়েকটি টর্নেডোর সময়কাল উল্লেখপূর্বক ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলো:

সময়	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা
৪ মে ১৯৬৭	মুন্সীগঞ্জের কাছে মধ্যপাড়া গ্রাম ও ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়া থানা।
৮ এপ্রিল ১৯৬৮	ঢাকা জেলার ডেমরা ও ঢাকা শহরের রামপুরা।
১৮ এপ্রিল ১৯৬৯	ঢাকা জেলার মহাখালী থেকে ডেমরা পর্যন্ত এবং ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার দরিরামপুর গ্রাম।
১০ মে ১৯৭৩	বরিশাল জেলার হিজলা ও মুলাদী থানা।
৬ এপ্রিল ১৯৭৪	টাঙ্গাইল জেলা সদর।
এপ্রিল ১৯৭৭	গোপালগঞ্জ জেলার সদর ও মাদারীপুর জেলা।
৪ মে ১৯৮৪	যশোর জেলা।
এপ্রিল ১৯৮৬	কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি।
এপ্রিল ১৯৮৭	ঢাকা জেলার সাটুরিয়া গ্রাম।
এপ্রিল ১৯৮৯	ঢাকা জেলার সাটুরিয়া গ্রাম ও মানিকগঞ্জ জেলা।
১২ মে ১৯৯১	গাজীপুর জেলা
২২ মে ২০১৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ ২০১৩ সালের ২৪মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওকলাহোমায় একটি শক্তিশালী প্রাকৃতিক দুর্যোগ হাতির শুঁড়ে মতো আকার নিয়ে আঘাত হানে। এতে প্রায় ৯১ জনের মৃত্যু হয়। দুর্যোগটি ঘণ্টায় ৩২০ কিলোমিটার বেগে ধেয়ে আসে যার ব্যাস ছিল প্রায় ২ কিলোমিটার। ◀ *শিখনফল: ৮*

ক. টর্নেডো কী? ১

খ. কালবৈশাখী সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উক্ত ঘটনার সৃষ্টির কারণ কী হতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ঘটনাটির প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক লঘু বা নিম্নচাপ কেন্দ্র থেকে উষ্ণ বাতাস উপরে উঠে গেলে ঐ শূন্য জায়গা পূরণের জন্য শীতল বাতাস প্রচণ্ড বেগে ধাবিত হয়; এটিই টর্নেডো।

খ বৈশাখ মাসে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে যে ঝড় প্রবাহিত হয় তাকে কালবৈশাখী বলে।

কালবৈশাখী সৃষ্টির প্রধান কারণ হলো নিম্নচাপ। এই নিম্নচাপের কারণে উষ্ণ বাতাস উপরের দিকে উঠতে থাকে। এর ফলে সৃষ্ট ফাঁকা জায়গা পূরণের জন্য ঠাণ্ডা বাতাস প্রচণ্ড বেগে ধাবিত হয়। এভাবে কালবৈশাখীর সৃষ্টি হয়।

গ উদ্দীপকে টর্নেডো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। খুব অল্প স্থানব্যাপী এটি সংঘটিত ঘূর্ণিবাত।

আর্দ্র ও শুষ্ক ঋতুর সন্ধিক্ষণে দিনের বেলায় যখন বায়ু অত্যধিক উত্তপ্ত হয় তখন টনের্ডো পরিলক্ষিত হয়। ঘূর্ণিঝড়ের মতো টর্নেডোর জন্যও নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়াই প্রধান কারণ। এর ফলে উষ্ণ বাতাস উপরে উঠে যায়। চারপাশ থেকে শীতল বাতাস প্রচণ্ড বেগে ঐ শূন্য জায়গার দিকে ধাবিত হয়ে টর্নেডোর সৃষ্টি করে। টর্নেডোতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি।

সার্বিকভাবে বলা যায় যে, বায়ুর অনিয়মিত প্রবাহের ফলশ্রুতিতেই টর্নেডো সংঘটিত হয়ে থাকে।

ঘ উদ্দীপকে হাতির শুঁড়ের ন্যায় আঘাত হানা প্রাকৃতিক দুর্যোগটি হলো টর্নেডো।

টর্নেডোর স্থায়িত্ব মাত্র কয়েক মিনিট হলেও এর গতিবেগ অনেক বেশি হওয়ায় এর ক্ষতির পরিমাণও অনেক বেশি। ফলে এটি জনজীবনে মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে। টর্নেডোর প্রভাবে কখনও কখনও প্রবল বৃষ্টিপাত এবং শিলাবৃষ্টিও হয়ে থাকে। প্রায়ই প্রবল বৃষ্টি ও বজ্রপাত হয়ে থাকে। টর্নেডোর কেন্দ্রে বায়ুর চাপ এত নিম্ন থাকে যে এর মধ্য দিয়ে ঘর-বাড়ি বৃক্ষাদি ঘুরতে ঘুরতে ঊর্ধে উঠে যায়।

১৯৮৯ সালে মানিকগঞ্জের সাটুরিয়াতে প্রলয়ঙ্কারী টর্নেডোর আঘাতের ফলে এলাকার প্রায় সবকিছুই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ১৯৬৯ সালের ১৪ এপ্রিল ঢাকার মহাখালী থেকে ডেমরা পর্যন্ত যে টর্নেডো হয়েছিল তার ফলে হাজার হাজার মানুষ ও জীবজন্তু প্রাণ হারিয়েছিল এবং অসংখ্য ঘরবাড়ি ও শিল্প কারখানা বিধ্বস্ত হয়েছিল।

সুতরাং, টর্নেডো প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোর মধ্যে অন্যতম যার ক্ষতিকর প্রভাব কোনো অঞ্চলের বা স্থানের বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

প্রশ্ন ▶৩৭ অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী সাদমান কখনো বাংলাদেশে আসেনি। তাই গ্রীষ্মের ছুটিতে বাংলাদেশে তার চাচার বাসায় এসে দেখলো এ সময় প্রায় দিনই ঝড় হচ্ছে, মাঝে মাঝে ঝড়ের সাথে বৃষ্টিও হচ্ছে। সাদমান তার চাচার কাছে আবহাওয়ার এই দুর্যোগ সম্পর্কে জানতে চাইল। ◀ *শিখনফল: ৮*

ক. মৌসুমি বায়ুর অগ্রদূত কোনটি? ১

খ. জলোচ্ছ্বাস কীভাবে সৃষ্টি হয়? ২

গ. উদ্দীপকে সাদমান তার চাচার বাসায় এসে যে দুর্যোগ দেখলো তা সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত দুর্যোগের প্রভাব সম্পর্কে তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কালবৈশাখী ঝড়কে মৌসুমি বায়ুর অগ্রদূত বলা হয়।

খ প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় যখন সমুদ্রে থাকে তখন বাতাসের প্রবল টানে সমুদ্রের পানি উঁচু হয়ে তার কেন্দ্রের দিকে যায়।

ঘূর্ণিঝড় যখন উপকূলে গিয়ে পৌঁছে তখন এ পানি উঁচু হয়ে প্রবল বেগে উপকূলবর্তী অঞ্চলে গিয়ে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। এভাবে জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টি হয়।

গ উদ্দীপকে সাদমান গ্রীষ্মকালে তার চাচার বাসায় এসে কালবৈশাখী ঝড় দেখেছিল।

কালবৈশাখী সৃষ্টির প্রধান কারণ নিম্নচাপ। এই নিম্নচাপের কারণে উষ্ণ বাতাস উপরের দিকে উঠতে থাকে। এর ফলে সৃষ্ট ফাঁকা জায়গা পূরণের জন্য ঠাণ্ডা বাতাস প্রচণ্ড বেগে ঐ ফাঁকা স্থানের দিকে ধাবিত হয়ে কালবৈশাখী সংঘটিত হয়।

কালবৈশাখীর আগমনে উষ্ণতা স্বাভাবিকের তুলনায় ৫°-১০° সে. কমে যায়। দক্ষিণ দিক হতে প্রবাহিত উষ্ণ জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু উত্তর-পশ্চিমে পৌঁছিয়ে উপরে ওঠতে থাকে। এ বায়ুর ঠিক উপরের দিকে উত্তর-পশ্চিম বা পশ্চিম দিক হতে শুষ্ক শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়। এই দুই বিপরীতগামী বায়ুপ্রবাহের সন্ধিস্থলে বজ্রবিদ্যুৎসহ কালবৈশাখী ঝড় শুরু হয়।

ঘ বাংলাদেশের চৈত্র-বৈশাখে সংগঠিত ঝড়কে কালবৈশাখী ঝড় বলা হয়।

উক্ত দুর্যোগ তথা কালবৈশাখী ঝড়ের গতি প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৪০ কি.মি. হতে ৮০ কি.মি. হতে পারে। অনেক সময় এ ঝড়ের গতি ঘণ্টায় ১২৮ কি.মি. এরও বেশি হয়ে থাকে। কালবৈশাখী ঝড়ে ঘরবাড়ি, গাছপালা, শস্য প্রভৃতি নষ্ট হয়।

কোনো কোনো বছর কালবৈশাখীর প্রভাবে মানুষ ও পশুপাখির প্রাণহানি ঘটে। অনেক সময় কালবৈশাখী ঝড়ের সাথে শিলা বৃষ্টিও হয়ে থাকে। কোনো কোনো সময় বড় আকারের শিলাও বর্ষিত হয়।

কালবৈশাখী দেশের উত্তর-পূর্বদিকে প্রথমে আঘাত হানে এবং বৃষ্টিপাত ঘটাতে ঘটাতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়। এ ঝড় যখন দেশের পশ্চিমাঞ্চলে পৌঁছে তখন বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ খুবই কম থাকে। এ কারণে কালবৈশাখী ঝড়ের প্রভাবে দেশের পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষা পূর্বাঞ্চলে বেশি বৃষ্টিপাত হয়।

প্রশ্ন ▶৩৮

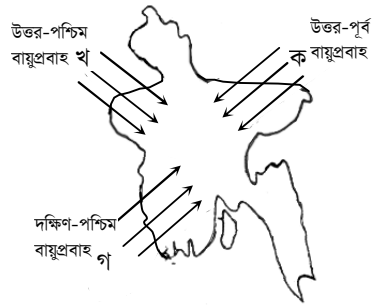

◀ *শিখনফল: ৪ ও ৮ [বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]*

ক. জলবায়ু অঞ্চল কাকে বলে? ১

খ. গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'ক' বায়ুপ্রবাহের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'খ' ও 'গ' বায়ুপ্রবাহের সংঘর্ষে এক ধরনের ঝড়ের সৃষ্টি হয়— কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সকল স্থানের জলবায়ুর উপাদানসমূহ প্রায় একই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন তাকে জলবায়ু অঞ্চল বলে। যেমন— দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়া মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত।

খ মানুষের নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদি গ্রিন হাউস গ্যাসের উপস্থিতি পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি করছে এবং পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে ছেড়ে দেয়া তাপ পুনরায় ফিরে যেতে বাধা সৃষ্টি করছে। তাপ শোষণের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং ক্রমশ উষ্ণতা বৃদ্ধির এ প্রক্রিয়াই গ্রিন হাউস প্রক্রিয়া।

গ চিত্রের 'ক' উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু। এ বায়ু শীতকালে বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়।

নিচে উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু প্রবাহের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা হলো–

i. উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আগত শীতল মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার কারণে শীতকালে বাতাসের আর্দ্রতা কম থাকে।

ii. উত্তরের হিমালয় পর্বত পেরিয়ে আসার সময় এই বায়ুতে জলীয়বাষ্প থাকে যা পাহাড়ি এলাকায় সামান্য বৃষ্টিপাত ঘটায়।

iii. বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের উপর দিয়ে এই শীতল বায়ু প্রবাহিত হওয়ার ফলে তীব্র শীত অনুভূত হয়।

ঘ চিত্রের খ ও গ অঞ্চলে যথাক্রমে উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয়।

গ্রীষ্মকালে সূর্য উত্তর গোলার্ধের কর্কটক্রান্তি রেখার নিকটবর্তী হওয়ায় বায়ুচাপের পরিবর্তন হয় এবং বাংলাদেশের উপর দিয়ে উষ্ণ ও আর্দ্র দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয়। দক্ষিণ দিক হতে প্রবাহিত উষ্ণ জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু উত্তর-পশ্চিমে গিয়ে উপরে উত্থিত হয়ে থাকে। এ বায়ুর ঠিক উপর দিয়ে উত্তর-পশ্চিম বা পশ্চিম দিক হতে শুষ্ক শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়। এর ফলে বিপরীতগামী বায়ু প্রবাহের সংঘর্ষে এ ঋতুতে বাংলাদেশে বজ্র বিদ্যুৎসহ কালবৈশাখী ঝড় হয়।

প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ৩৯

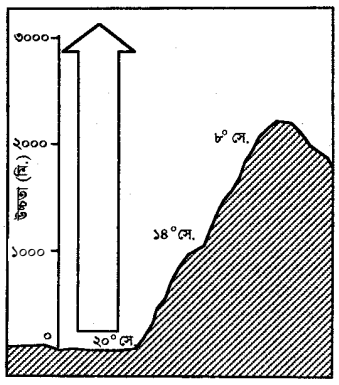

চিত্র-১

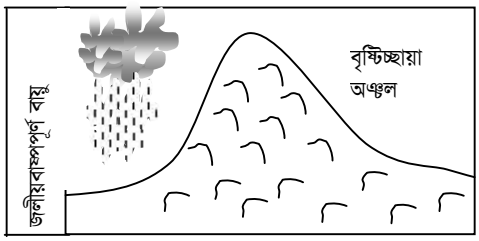

চিত্র-২

◀ শিখনফল: ১

ক. স্বাভাবিক অবস্থায় ১৬৫ মিটার উচ্চতায় কী পরিমাণ তাপ হ্রাস পায়? ১

খ. সমুদ্রস্রোত কীভাবে জলবায়ুকে প্রভাবিত করে? ২

গ. চিত্র দুটি কোনো স্থানের জলবায়ুর উপর কী প্রভাব ফেলে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. চিত্র দুটি ছাড়া জলবায়ুর অন্যান্য নিয়ামকগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বাভাবিক অবস্থায় ১৬৫ মিটার উচ্চতায় ১° সে. তাপ হ্রাস পায়।

খ সমুদ্রস্রোত সমুদ্রের উপরিস্থ বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতার তারতম্য ঘটায়। কোনো অঞ্চলের জলবায়ুর ওপর সমুদ্রস্রোতের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়।

উপকূল অঞ্চলে উষ্ণস্রোত উষ্ণতা ও শীতল স্রোত শৈত্য নিয়ে আসে। যেমন— আটলান্টিক মহাসাগরে উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের প্রভাবে উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের জলবায়ু অপেক্ষাকৃত উষ্ণ এবং উপকূল বরফমুক্ত থাকে।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা ও পর্বতের অবস্থান কোনো স্থানের জলবায়ুর উপর কী প্রভাব ফেলে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ জলবায়ুর নিয়ামকগুলো বিশ্লেষণ করো।

প্রশ্ন ▶ ৪০

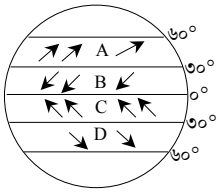

◀ শিখনফল-৪

ক. বারিপাত কাকে বলে? ১

খ. কীভাবে সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে ব্যাখ্যা করো। ২

গ. চিত্রে B চিহ্নিত চাপ বলয়ে প্রবাহিত বায়ুপ্রবাহের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. চিত্রে A ও D চিহ্নিত চাপ বলয়ে প্রবাহিত বায়ুপ্রবাহের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান-উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৬ষ্ঠ অধ্যায়

জলবায়ু অঞ্চল ও জলবায়ু পরিবর্তন

পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶১ উচ্চশিক্ষার্থে মুহিত সিঙ্গাপুর ও নাহিদ ফ্রান্সে গেল। মুহিতের অবস্থানকারী দেশে পরিচলন প্রক্রিয়ায় বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়। নাহিদের অবস্থানকারী দেশে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। ◀ *শিখনফল: ১*

ক. পৃথিবীকে প্রধান কয়টি জলবায়ু অঞ্চলে ভাগ করা যায়? ১

খ. জলবায়ু অঞ্চল বলতে কী বোঝ? ২

গ. মুহিত ও নাহিদের অবস্থানকারী দেশ দুটির জলবায়ুর মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মুহিতের অবস্থানকারী দেশটি কোন জলবায়ুর অন্তর্গত? বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৃথিবীকে প্রধান ৫টি জলবায়ু অঞ্চলে ভাগ করা যায়।

খ ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত কোনো বিস্তৃত অঞ্চলে জলবায়ুর বিভিন্ন উপাদানগুলো যেমন— বায়ুর তাপ, চাপ, প্রবাহ এবং আর্দ্রতা মেঘাচ্ছন্নতা, বারিপাত প্রভৃতি যখন মোটামুটি একই ধরনের হয় তখন ঐ অঞ্চলটিকে একটি জলবায়ু অঞ্চল বলে। যেমন— মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চল সমগ্র দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে বিস্তৃত।

জলবায়ুর উপাদানগুলোর বিভিন্নতার জন্য পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন জলবায়ু অঞ্চল দেখা যায়।

গ মুহিতের অবস্থানকারী দেশ সিঙ্গাপুর নিরক্ষীয় এবং নাহিদের অবস্থানকারী দেশ ফ্রান্স ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর অর্ন্তগত। নিরক্ষীয় ও ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত ব্যাপক।

নিরক্ষীয় অঞ্চলে তাপমাত্রা সারা বছর অধিক থাকে। এখানে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপের পার্থক্য সাধারণত কম। বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ২২°-৩৪° সেলসিয়াস পর্যন্ত। এ অঞ্চলটিতে বিস্তৃত জলভাগ থাকায় প্রচুর জলীয়বাষ্প প্রতিদিন বাতাসে মিশে যায় এবং পরিচলন প্রক্রিয়ায় বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৭০-২৫০ সেন্টিমিটার। এ অঞ্চলে বায়ুর চাপের পরিবর্তনের হার কম এবং অয়ন বায়ুর প্রবেশ থাকায় বায়ুপ্রবাহের বেগ অধিক হয়।

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে গ্রীষ্ম ও শীতকালীন তাপমাত্রা যথাক্রমে ২১°-২৭° সে. এবং ৪°-১০°সে. এর মধ্যে থাকে। বৃষ্টিবহুল শীতকাল ও বৃষ্টিহীন গ্রীষ্মকাল এ অঞ্চলের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এখানে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২৫-৭৫ সে.মি. পর্যন্ত হয়। পাবর্ত্য অঞ্চলে অত্যধিক তুষারপাত হয়। এ অঞ্চলের উপর দিয়ে উত্তর পূর্ব অয়ন বায়ু প্রবাহিত হয় আবার শীতকালে পশ্চিমা বায়ু প্রবাহিত হয়।

ঘ মুহিতের অবস্থানকারী দেশ সিঙ্গাপুর নিরক্ষীয় জলবায়ুর অর্ন্তগত।

নিরক্ষরেখার উভয় পার্শ্বে ৫° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে যে জলবায়ু দেখা যায় তাকে নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চল বলে। এই জলবায়ু অঞ্চলটি মূলত নিরক্ষরেখাকে কেন্দ্র করেই বিস্তৃত।

নিরক্ষরেখায় সূর্যের লম্বভাবে কিরণ দেয়ায় অধিক তাপ ও বৃষ্টিপাত এই অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বিশাল আয়তনের এশিয়া মহাদেশের অন্যতম ছোট একটি দেশ সিঙ্গাপুর উপরে আলোচিত জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যমন্ডিত; যেটি নিরক্ষীয় জলবায়ুর অন্তর্গত।

প্রশ্ন ▶২ তিন বছর যাবৎ পর্বত আরোহণের উপর প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন মরক্কোর পর্বতারোহী আবু সাঈদ। অবশেষে হিমালয় পর্বত জয়ের লক্ষ্যে তিনি নেপাল গেলেন। তিনি অনুভব করলেন হিমালয়ের আবহাওয়া তার দেশ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

◀ *শিখনফল: ১*

ক. কোন বায়ুর প্রভাবে চিলির দক্ষিণাংশে সারা বছর বৃষ্টিপাত হয়? ১

খ. মহাদেশের অভ্যন্তরের জলবায়ু চরমভাবাপন্ন কেন? ২

গ. আবু সাঈদের নিজ দেশের জলবায়ু অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো মানচিত্রে দেখাও। ৩

ঘ. আবু সাঈদের নিজ দেশ ও ভ্রমণকৃত অঞ্চলের আবহাওয়া ভিন্ন কেন? বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে চিলির দক্ষিণাংশে সারা বছর বৃষ্টিপাত হয়।

খ বৃষ্টিপাতের অভাবে সমুদ্র থেকে দূরে মহাদেশের অভ্যন্তরভাগের জলবায়ু চরমভাবাপন্ন হয়ে থাকে।

মহাদেশের অভ্যন্তরে গ্রীষ্মকালে যেমন প্রচণ্ড গরম শীতকালে তেমনি তীব্র শীত পড়ে। এখানে গ্রীষ্ম ও শীতকালে গড় তাপমাত্রা যথাক্রমে ৩৬° এবং ১০° সেলসিয়াস বা তার কম হয়। সমুদ্র থেকে দূরে মহাদেশের অভ্যন্তরভাগ বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল হওয়ায় বৃষ্টিপাত কম। তাই মহাদেশের অভ্যন্তরের জলবায়ু চরমভাবাপন্ন।

গ আবু সাঈদের নিজ দেশ হলো মরক্কো। দেশটি ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর অন্তর্গত।

নিচে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো মানচিত্রে দেখানো হলো—

সাইফুল ইসলামের গমনকৃত জলবায়ু অঞ্চলটি ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল, যেখানে শীতকালে বৃষ্টিপাত ঘটে এবং সারাবছরই মেঘমুক্ত রৌদ্রকরোজ্জ্বল আবহাওয়া থাকে। ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো–

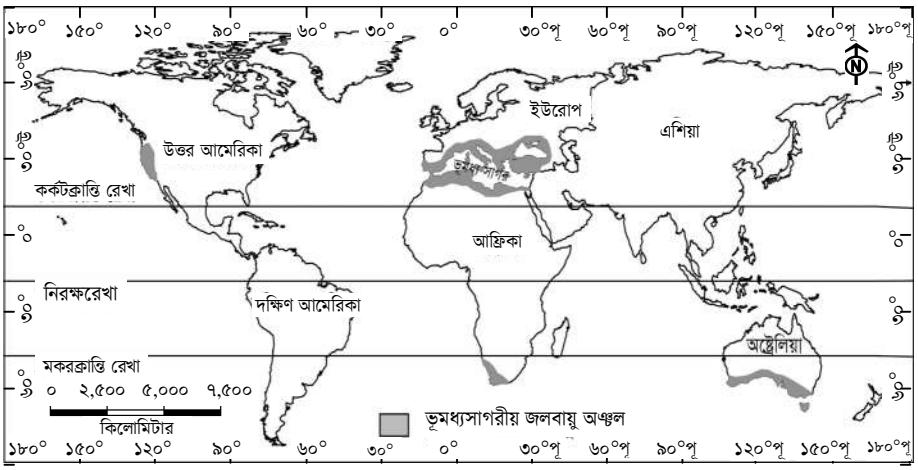

চিত্র : ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর বণ্টন

ঘ আবু সাঈদের নিজ দেশ ও ভ্রমণকৃত দেশের আবহাওয়া ভিন্ন। তার নিজ দেশ মরক্কোতে মৃদু উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অনুভূত হয়। আর তার ভ্রমণকৃত হিমালয় পর্বত অঞ্চলে শীতল জলবায়ু বিরাজমান।

মরক্কো এবং হিমালয় যথাক্রমে মালভূমি ও উঁচু পর্বত নির্দেশ করে। উচ্চতার ব্যাপক পার্থক্যের কারণে এ দুটি অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন জলবায়ু বিরাজ করে। স্বাভাবিকভাবে এ দুই অঞ্চলের আবহাওয়াও ভিন্ন হয়ে থাকে।

মরক্কো মৃদু উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর দেশ। এ অঞ্চলে গ্রীষ্ম ও শীতকালীন তাপমাত্রা যথাক্রমে ২১°-২৭° এবং ৪°-১০°সে. এর মধ্যে থাকে। শীত, গ্রীষ্ম ও দিনরাত্রির তাপমাত্রার ব্যাপক পার্থক্য, মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশ, রৌদ্রকরোজ্জ্বল আবহাওয়া, বৃষ্টিবহুল শীতকাল এবং বৃষ্টিহীন গ্রীষ্মকাল এ জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ অঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৫ থেকে ৭৫ সেন্টিমিটার। অন্যদিকে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে শীতল জলবায়ু বিরাজমান। এ অঞ্চলের জলবায়ু উচ্চতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এ কারণে পর্বতের নিম্নভূমি উষ্ণ থাকে। কিন্তু যতই উপরে ওঠা যায় তাপমাত্রা ততই কমতে থাকে। এ অঞ্চল শীতকালে বরফাবৃত থাকে এবং কখনও কখনও তুষারপাত হয়ে থাকে। এ অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। তবে পর্বতের ঢাল অনুসারে বৃষ্টিপাতের তারতম্য হয়ে থাকে। উন্মুক্ত সূর্যালোকে এবং ছায়াযুক্ত অঞ্চলের মধ্যে উষ্ণতার প্রচণ্ড পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জলবায়ুর ভিন্নতার কারণেই আবু সাইদের নিজ দেশ ও ভ্রমণকৃত অঞ্চলের আবহাওয়া ভিন্ন।

প্রশ্ন ▶৩ আলমাস উচ্চশিক্ষার্থে অস্ট্রেলিয়া ও কানাডার যে কোনো একটি দেশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। সে দেশ দুটির প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ শুরু করল। সে জানতে পারল কানাডায় শীতকালে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে থাকলেও অস্ট্রেলিয়ায় মৃদুভাবাপন্ন জলবায়ু বিরাজমান। ◀ *শিখনফল: ১*

ক. ভাসমান বরফের দেশ বলা হয় কোন জলবায়ু অঞ্চলকে? ১

খ. মৃদু শীতল নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলকে ব্রিটিশ টাইপ জলবায়ু বলা হয় কেন? ২

গ. উল্লিখিত দেশ দুটির জলবায়ুর প্রধান পার্থক্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আলমাসের ক্ষেত্রে কোন দেশের আবহাওয়া বেশি অনুকূল হবে– বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মেরুদেশীয় তুষারাবৃত জলবায়ু অঞ্চলকে ভাসমান বরফের দেশ বলা হয়।

খ ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে মৃদু শীতল নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অত্যন্ত জোরালো বলে একে ব্রিটিশ টাইপ জলবায়ু বলা হয়।

মহাদেশের পশ্চিম প্রান্তের সমুদ্র উপকূলের নিকটবর্তী এলাকার ৪৫°-৬০° অক্ষাংশের মধ্যে মৃদু শীতল নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর অবস্থান। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ মহাদেশীয় ভূভাগের পশ্চিম প্রান্তে ৪৯°

থেকে ৫৯° উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ অবস্থানে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে মৃদু শীতল নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর সকল বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত প্রকট। তাই এ জলবায়ুকে বলা হয় ব্রিটিশ টাইপ জলবায়ু।

গ উল্লিখিত দেশ দুটি হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া ও কানাডা। অস্ট্রেলিয়া উপক্রান্তীয় পূর্ব উপকূলীয় আর্দ্র জলবায়ু এবং কানাডা শীতপ্রধান নাতিশীতোষ্ণ মহাদেশীয় জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত।

অস্ট্রেলিয়া ও কানাডা দেশ দুটির জলবায়ুর প্রধান পার্থক্য হলো জলবায়ুর উপাদানগত তীব্রতা। কানাডায় চরমভাবাপন্ন জলবায়ু বিরাজ করে। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার জলবায়ু সমভাবাপন্ন।

অস্ট্রেলিয়া অঞ্চলে বেশিরভাগ বৃষ্টি হয় গ্রীষ্মকালে। পাহাড় পর্বতের অবস্থান তথা ভূপ্রকৃতিগত কারণে এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের তারতম্য হয়। তবে গ্রীষ্মের শেষ দিকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেক বেশি হয়। এ জলবায়ু অঞ্চলের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১০০-১৫০ সে.মি.। গ্রীষ্মের সর্বোচ্চ এবং শীতকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ২৭° সে. এবং ৯°সে.। অস্ট্রেলিয়ার জলবায়ুকে উপসাগরীয় জলবায়ুও বলা হয়। অন্যদিকে, কানাডায় চরমভাবাপন্ন জলবায়ু বিরাজ করে। গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত গরম এবং শীতকালে তীব্র শীত পড়ে। ফলে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে থাকে। শীতকাল গ্রীষ্মকাল হতে অনেক বেশি দিন স্থায়ী হয়। গ্রীষ্মকালীন গড় তাপমাত্রা ২০° সে.। এ অঞ্চলের বার্ষিক বৃষ্টিপাত প্রায় ৫০ সে.মি.। তবে এ বৃষ্টিপাত কেবল গ্রীষ্মকালেই হয়ে থাকে। শীতকালে কোনো বৃষ্টি হয় না তবে তুষারপাত হয়।

ঘ আলমাসের ক্ষেত্রে কানাডা অপেক্ষা অস্ট্রেলিয়ার আবহাওয়া বেশি অনুকূল হবে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশ দুটো হলো অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডা। এ দুটি দেশের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার জলবায়ু অপেক্ষাকৃত মৃদুভাবাপন্ন। আলমাস বাংলাদেশের অধিবাসী। সে নিজ দেশে সমভাবাপন্ন জলবায়ুতে অভ্যস্ত। তাই চরমভাবাপন্ন জলবায়ুর দেশ কানাডার চেয়ে আলমাস অস্ট্রেলিয়ায় স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করবে।

অস্ট্রেলিয়া অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত হয়। ভূপ্রকৃতির পার্থক্যের দরুন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সর্বত্র সমান নয়। তবে গ্রীষ্মের শেষ দিকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেকটা বেশি। এখানকার গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১০০-১৫০ সেন্টিমিটার। গ্রীষ্ম ও শীতের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রার পরিমাণ যথাক্রমে ২৭° ও ৯° সেলসিয়াস। এ অঞ্চলে বছরের প্রায় ৭ মাস তুষারমুক্ত থাকে। অন্যদিকে কানাডায় গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত গরম এবং শীতকালে তীব্র শীত পড়ে। শীতকাল গ্রীষ্মকাল হতে অনেক বেশি দিন স্থায়ী হয়। গ্রীষ্মকালীন গড় তাপমাত্রা ২০° সেলসিয়াস এবং শীতকালে তাপমাত্রা প্রায়ই হিমাঙ্কের নিচে থাকে। এ অঞ্চলের বার্ষিক বৃষ্টিপাত প্রায় ৫০ সে.মি.। এ বৃষ্টিপাত আবার কেবল গ্রীষ্মকালেই হয়ে থাকে। শীতকালে কোনো বৃষ্টিপাত হয় না। তবে তুষারপাত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, অস্ট্রেলিয়া অঞ্চলে মৃদু উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু বিরাজ করে আর কানাডায় চরমভাবাপন্ন জলবায়ু পরিলক্ষিত হয়। এজন্য আলমাসের ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ার আবহাওয়া কানাডার চেয়ে অনুকূল হবে।

প্রশ্ন ▶ ৪

অবস্থান	বায়ুর তাপ	বায়ুর চাপ	বৃষ্টিপাত
নিরক্ষীয়			
মৌসুমি			

◀ শিখনফল-২

ক. ইতালিতে কী ধরনের খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়? ১

খ. ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলের উদ্ভিদের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী? ২

গ. ছকটি পূরণ করো। ৩

ঘ. ছকে উল্লিখিত জলবায়ু অঞ্চল দুটির বৃষ্টিপাতের প্রধান পার্থক্যগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইতালিতে গন্ধক ও মর্মর পাথর জাতীয় খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়।

খ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জ জলবায়ুর ওপর নির্ভরশীল।

শুষ্ক গ্রীষ্মকাল ও আর্দ্র শীতকাল হওয়ায় এরূপ জলবায়ুর উদ্ভিদসমূহ শুষ্কতার মোকাবেলা করার ক্ষমতাসম্পন্ন। বৃষ্টিবহুল শীতকালে বৃক্ষাদি জন্মে। ছোট ছোট গাছ ও ঝোপঝাড় এ অঞ্চলে বেশি জন্মে। গ্রীষ্মকাল সম্পূর্ণরূপে বৃষ্টিহীন না হলেও শুষ্ক। সে জন্য এ ঋতুতে বৃক্ষলতাদির বৃদ্ধি বিশেষ হয় না।

গ ছকে পৃথিবীর দুই প্রধান জলবায়ু তথা নিরক্ষীয় ও মৌসুমি জলবায়ুর নামের বিপরীতে বায়ুর তাপ, চাপ ও বৃষ্টিপাত; জলবায়ু দুইটির বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে।

নিচে ছকটি পূরণ করা হলো:

অবস্থান	বায়ুর তাপ	বায়ুর চাপ	বৃষ্টিপাত
নিরক্ষীয় জলবায়ু	(১) এ অঞ্চলে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা সাধারণত ২২° থেকে ৩৪° সে. পর্যন্ত। (২) এ অঞ্চলে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপের পার্থক্য সাধারণত কম।	(১) এ অঞ্চলে বায়ুতে সর্বদা পরিচলন প্রক্রিয়া চলতে থাকে। (২) এ অঞ্চলে অনুভূমিকভাবে তাপমাত্রার পরিবর্তনের হার খুব কম বলে বায়ুচাপের পরিবর্তনের হারও কম।	(১) এ অঞ্চলে পরিচলন প্রক্রিয়ায় বৃষ্টিপাত হয় (২) এ অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৭০ সে. মি. থেকে ২৫০ সে. মি.।
মৌসুমি জলবায়ু	(১) এ অঞ্চলে গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা ২৭° সে. অধিক থাকে। (২) এ অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে ও শীতকালে গড় উষ্ণতার পার্থক্য প্রায় ৫° সে. হয়ে থাকে।	(১) ঋতুভেদে বায়ুর চাপের তারতম্যের জন্য মৌসুমি বায়ুর উৎপত্তি হয়। (২) স্থলভাগের ওপর দিয়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে আসে বলে এ বায়ু শুষ্ক থাকে।	(১) মৌসুমি অঞ্চলের অধিকাংশ বৃষ্টিপাত গ্রীষ্মকালেই হয়ে থাকে। (২) এ অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১২৫ সে. মি. থেকে ২০০ সে. মি.।

ঘ ছকে উল্লিখিত জলবায়ু অঞ্চল দুটি হচ্ছে নিরক্ষীয় ও মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চল।

ভৌগোলিক ভিন্ন অবস্থানের দুইটি পৃথক জলবায়ুতে বৃষ্টিপাতের ধরনে, বিস্তৃতিতে, সময়ে ও পরিমাণে পার্থক্য থাকা খুব স্বাভাবিক। নিরক্ষীয় ও মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলের বৃষ্টিপাতেও রয়েছে ব্যাপক পার্থক্য।

নিম্নে নিরক্ষীয় ও মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের প্রধান পার্থক্যগুলো তুলে ধরা হলো :

নিরক্ষীয় অঞ্চলে স্থল অপেক্ষা জলভাগ বেশি হওয়ায় এবং প্রচণ্ড উত্তাপ থাকায় সারাদিনই সূর্যের উত্তাপে জল বাষ্পীভূত হয়ে ঊর্ধ্বে উঠতে থাকে এবং ঊর্ধ্বে প্রসারিত ও শীতল হয়ে অপরাহ্নে পরিচলন প্রক্রিয়ায় ব্যাপকভাবে বৃষ্টিপাত ঘটায়। এ অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৭০ থেকে ২৫০ সে. মি.। স্থানবিশেষে ৫০০ সে. মি. পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হলেও স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০০ সে. মি। অন্যদিকে মৌসুমি অঞ্চলের অধিকাংশ বৃষ্টিপাত গ্রীষ্মকালেই হয়ে থাকে। শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে। এ অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১২৫ থেকে ২০০ সে. মি.। জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, নিরক্ষীয় ও মৌসুমি জলবায়ু উভয়টিই বৃষ্টিবহুল। তবে নিরক্ষীয় জলবায়ুর সারাবছরব্যাপী প্রতিদিন বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ৫

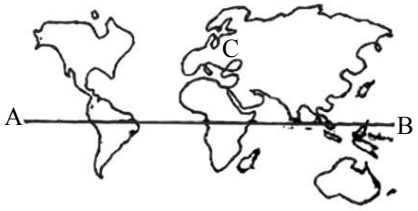

◀ শিখনফল: ২ [বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]

ক. বাংলাদেশের জলবায়ুর নাম কী? ১

খ. বাংলাদেশের জলবায়ুর এরূপ নামকরণের কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. AB রেখার পার্শ্ববর্তী স্থানের জলবায়ুর চিত্র আঁকো। ৩

ঘ. উক্ত জলবায়ু বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের জলবায়ুর নাম ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু।

খ বাংলাদেশের মাঝামাঝি স্থান দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা (২৩.৫° উত্তর) অতিক্রম করায় এখানে ক্রান্তীয় জলবায়ু বিরাজ করে। কিন্তু এদেশের জলবায়ুর উপর মৌসুমি বায়ুর প্রভাব বেশি হওয়ার কারণে বাংলাদেশের জলবায়ু ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু নামে পরিচিত।

গ

চিত্র-৬.২: নিরক্ষীয় জলবায়ুর বন্টন

ঘ AB রেখার পার্শ্ববর্তী স্থানে নিরক্ষীয় জলবায়ু বিরাজ করে।

নিরক্ষরেখার উভয় পার্শ্বে ৫° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে যে জলবায়ু পরিলক্ষিত হয় তাকে নিরক্ষীয় জলবায়ু বলে। কোনো কোনো স্থানে ১০° অক্ষাংশ পর্যন্ত এ জলবায়ু দেখা যায়। এখানে সারা বছর গ্রীষ্মকাল থাকে এবং পরিচলন প্রক্রিয়ায় বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এ অঞ্চলে বার্ষিক সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পার্থক্য খুবই কম।

পৃথিবীর যেসব অঞ্চলে নিরক্ষীয় জলবায়ু পরিলক্ষিত হয় সেগুলো হলো– দক্ষিণ আমেরিকার আমাজান অববাহিকা; আফ্রিকার কঙ্গো অববাহিকা ও গিনি উপকূল; এশিয়ার শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, নিউগিনি, দক্ষিণ ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশ।

প্রশ্ন ▶ ৬ একটি বেসরকারি ট্যুরিজম কোম্পানি প্রতি বছর পর্যটকদের নিয়ে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও ফিলিপাইনে ভ্রমণে যায়। তবে, কোম্পানিটি গ্রীষ্মকালে ফিলিপাইনে ভ্রমণ বন্ধ রাখে।

◀ *শিখনফল: ২*

ক. মৌসুমি জলবায়ু কাকে বলে? ১

খ. ক্রান্তীয় মহাদেশীয় জলবায়ুকে সুদানি জলবায়ুও বলা হয় কেন? ২

গ. ট্যুরিজম কোম্পানিটির গ্রীষ্মকালে ফিলিপাইনে ভ্রমণ বন্ধ রাখার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পর্যটকদের ভ্রমণকৃত অন্য অঞ্চলটির জলবায়ু বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে যে বায়ুর দিক পরিবর্তন হয় তাকে মৌসুমি বায়ু বলে। আর মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত অঞ্চলের জলবায়ুকে মৌসুমি জলবায়ু বলে।

খ মহাদেশসমূহে নিরক্ষীয় এবং উষ্ণ মরু অঞ্চলের মধ্যভাগে যে জলবায়ু দেখতে পাওয়া যায় তাকে ক্রান্তীয় মহাদেশীয় জলবায়ু বলে।

আফ্রিকার সুদান অঞ্চলে এ জলবায়ু স্পষ্টরূপে দেখা যায় বলে একে সুদানি জলবায়ু বলা হয়।

গ ট্যুরিজম কোম্পানিটি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড়-বৃষ্টির কারণে গ্রীষ্মকালে ফিলিপাইনে ভ্রমণ বন্ধ রাখে।

ফিলিপাইন ক্রান্তীয় সমুদ্র উপকূলীয় জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত। মহাদেশসমূহের পূর্ব উপকূলে ৫°-৩০° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে এ জলবায়ু দেখা যায়। নিরক্ষীয় অঞ্চলের মতো এখানেও সারা বছর অধিক উত্তাপ থাকে। এখানে গ্রীষ্মকালীন গড় তাপমাত্রা প্রায় ২৯° সে. এবং বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ১২৭ সেমি হয়ে থাকে। গ্রীষ্মকালে এ জলবায়ু অঞ্চলে প্রবল ঘূর্ণিঝড়, টাইফুন, হারিকেনের সৃষ্টি হয়। যে দুটি কারণ মূলত ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করে তা হলো নিম্নচাপ ও উচ্চ তাপমাত্রা। সাগরে বৃষ্টিপাতের ফলে তা সুপ্ততাপ ছেড়ে দেয়, যা বাষ্পীভবন বাড়িয়ে দেয়। আবার এই সুপ্ততাপের প্রভাবে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রাও বেড়ে যায়। ফলে বায়ুমণ্ডল অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে এবং নিম্নচাপের সৃষ্টি করে। ফলে আশপাশের বাতাস সেখানে ধাবিত হয় যা বাড়তি তাপমাত্রার কারণে ঘুরতে ঘুরতে উপরে ওঠতে থাকে এবং ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি করে।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, তীব্র এবং ঘনঘন ঝড়-বৃষ্টির কারণে ট্যুরিজম কোম্পানিটি গ্রীষ্মকালে ফিলিপাইনে ভ্রমণ বন্ধ রাখে।

ঘ উদ্দীপকে পর্যটকরা ফিলিপাইন ব্যতীত পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ভ্রমণ করে।

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত।

ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে যে বায়ুর দিক পরিবর্তন হয় তাকে মৌসুমি বায়ু বলে। আর এ বায়ু প্রবাহিত অঞ্চলের জলবায়ুকে মৌসুমি জলবায়ু বলে।

ক্রান্তীয় অঞ্চলে মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাব সর্বাধিক বলে এ জলবায়ুকে ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ুও বলা হয়।

নিচে মৌসুমি জলবায়ুর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দেওয়া হলো—

বায়ুর তাপ : গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা ২৭° সেলসিয়াসের অধিক থাকে। আবার শীতকালে তাপমাত্রা গড়ে ১০° থেকে ২২° সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে। তবে গ্রীষ্ম ও শীতকালে গড় উষ্ণতার পার্থক্য প্রায় ৫° সেলসিয়াসের মতো হয়ে থাকে। মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণে তাপমাত্রা কম অনুভূত হয়। আবার গ্রীষ্মকালে মৌসুমি বায়ুর কারণে তাপমাত্রা সমভাবাপন্ন থাকে।

বায়ুর চাপ ও বায়ুপ্রবাহ : ঋতুভেদে বায়ুর চাপের তারতম্যের জন্য মৌসুমি বায়ুর উৎপত্তি হয়। নিরক্ষরেখা অতিক্রম করলে ফেরেলের সূত্র অনুসারে দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ুর গতি বেঁকে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উত্তর- পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়। এজন্য গ্রীষ্মের মৌসুমি বায়ুকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বলে। আবার শীতকালে মৌসুমি বায়ু উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আসে বলে একে উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু বলে।

বৃষ্টিপাত : গ্রীষ্মকালে উত্তর গোলার্ধের স্থলভাগে অধিক তাপের ফলে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। দক্ষিণে সমুদ্র হতে আগত জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু প্রবাহিত হয়ে এ অঞ্চলে ব্যাপক বৃষ্টিপাত ঘটায়। এখানে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১২৫ থেকে ২০০ সে.মি.।

প্রশ্ন ▶ ৭ নিরক্ষীয় অঞ্চল ভ্রমণ করতে এসে জিসান দেখলেন এখানে প্রতিদিন বিকেলে বৃষ্টিপাত হয়। তিনি জানতে পারলেন অঞ্চলটিতে সারা বছর একই ধরনের বৃষ্টিপাত হয়। এই বৃষ্টিপাত একটি বিশেষ নিয়ম অনুসরণ করে।

◀ *শিখনফল: ২*

ক. কোন বলয় দ্বারা নিরক্ষীয় অঞ্চলের জলবায়ু নিয়ন্ত্রিত হয়? ১

খ. নিরক্ষীয় অঞ্চলের বায়ুর তাপমাত্রা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জিসানের ভ্রমণকৃত অঞ্চলের উদ্ভিদ, মাটি ও জীবজন্তু কীরূপ হবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের অঞ্চলটিতে কোন ধরনের বৃষ্টিপাত হয় এবং কেন? বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিরক্ষীয় অঞ্চলের জলবায়ু নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

খ নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্য সারা বছর লম্বভাবে কিরণ দেয়। দিনের দৈর্ঘ্য সারা বছর প্রায় একই ধরনের থাকে বলে এ অঞ্চলে তাপমাত্রা সারা বছরই অধিক থাকে।

নিরক্ষীয় অঞ্চলের বায়ুর তাপের দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যথা:

i. সারা বছর সমানভাবে অধিক তাপ (২৬-২৮ ডিগ্রি সে.)।

ii. সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপের পার্থক্য সাধারণত কম (৫-১০ ডিগ্রি সে.)।

গ নিরক্ষীয় অঞ্চলের উদ্ভিদ, মাটি ও জীবজন্তুর বৈশিষ্ট্য নিরক্ষীয় জলবায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এ অঞ্চলের উদ্ভিদ, মাটি ও জীবজন্তুর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা হলো–

উদ্ভিদ : সারা বছর ধরে প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং অধিক তাপের জন্য এ অঞ্চলে প্রশস্ত পত্রযুক্ত চিরহরিৎ বৃক্ষের গভীর বনের সৃষ্টি হয়েছে। এখানকার গাছগুলো ৪৯ মিটারের মত উঁচু হয়। যেমন– মালয়েশিয়ার বনভূমি।

মাটি : এ অঞ্চলে মাটি খুব বেশি উর্বর নয়। তবে এ অঞ্চলের কোনো কোনো স্থানে লাল মাটি, চুন জাতীয় ও আগ্নেয় মৃত্তিকা দেখা যায়।

জীবজন্তু : এ অঞ্চলের বনভূমিতে বৃক্ষচারী জীবজন্তুর সংখ্যা বেশি। কারণ নিবিড় অরণ্যে কোনো পদচারী পশু চলাফেরা করতে পারে না। পাখি, গেছোসাপ, গরিলা, বানর প্রভৃতি বৃক্ষচারী প্রাণী এ অঞ্চলের বৃক্ষের শাখায় বিচরণ করে।

ঘ জিসান নিরক্ষীয় অঞ্চল ভ্রমণ করেছিল।

নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চল নিরক্ষরেখার উভয় পার্শ্বে ৫° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত। এ অঞ্চলে সারাবছর প্রায় প্রতিদিনই পরিচলন প্রক্রিয়ায় বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়।

নিরক্ষীয় অঞ্চলে স্থলভাগ অপেক্ষা জলভাগ অধিক। তাপমাত্রা অধিক হওয়ায় সারা দিনই সূর্যের তাপে পানি বাষ্পীভূত হয়ে উপরে ওঠতে থাকে। সূর্যের তাপে ধূলিকণার সাথে মিশে এ জলকণাগুলো ঘনীভূত হয়ে বাষ্পে পরিণত হয়। এ ঘনীভূত বাষ্প ঊর্ধ্বে প্রসারিত ও শীতল হয়ে অপরাহ্নে পরিচলন প্রক্রিয়ায় ব্যাপক বৃষ্টিপাত ঘটায়।

এ অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৫০ থেকে ২৫০ সেন্টিমিটার। প্রায় প্রতিদিন বৃষ্টিপাত হয় বলে এ অঞ্চলে শুষ্ক ঋতু বলে কোনো ঋতু দেখা যায় না। অত্যধিক প্রতিকূল অবস্থা সম্পন্ন অঞ্চলেও বার্ষিক ১২৫ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। সুতরাং বলা যায় যে, উক্ত অঞ্চলটিতে প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময় বৃষ্টিপাত হলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়না। ফলে বৃষ্টির পরপরই মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ দেখা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৮ জনাব শাহজাহান বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন চৌকষ সৈনিক। তিনি জাতিসংঘের বিশেষ শান্তি মিশনে বিদেশে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি চিরহরিৎ বনভূমি দেখতে পেলেন। দুপুর বেলা তিনি প্রচণ্ড গরম অনুভব করলেও পরে খুব আরাম বোধ করলেন। আবার মধ্য রাতের পরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা অনুভব করলেন। ◀ *শিখনফল: ২*

ক. বায়ুর চাপ বলয় কী? ১

খ. কীভাবে ঘূর্ণিবাত বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়? ২

গ. উদ্দীপকের অঞ্চলটিতে দিনও রাতের তাপমাত্রার পার্থক্য হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব শাহজাহানের নিজ দেশ ও প্রবাস অঞ্চলের আবহাওয়া ও জলবায়ুর পার্থক্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে বায়ুচাপ রেখাগুলো গোলাকার পৃথিবীকে ঘিরে যে বলয় সৃষ্টি করেছে তাই বায়ুর চাপ বলয়।

খ নিম্নচাপের প্রভাবে ঘূর্ণিবাত বৃষ্টিপাত হয়।

বায়ু সব সময় উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। চারদিক থেকে বায়ুপ্রবাহ নিম্নচাপ অঞ্চলে গেলে ঘূর্ণিবাত সৃষ্টি হয়। ঘূর্ণিবাতের ফলে নিম্নচাপ কেন্দ্রের বায়ু ঘুরতে ঘুরতে উপরে ওঠে। পরবর্তীতে তাপ হ্রাস পেয়ে শীতল হলে অতিরিক্ত জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। একে ঘূর্ণিবৃষ্টি বলে। এভাবে ঘূর্ণিবাত বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়।

গ উদ্দীপকের জনাব শাহজাহানের মিশন স্থল হচ্ছে নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চল।

নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলে চিরহরিৎ বনভূমি দেখতে পাওয়া যায়। এখানে বেলা দ্বি-প্রহরের আগে প্রচণ্ড ভ্যাপসা গরম থাকে। পরে আবহাওয়া ঠাণ্ডা হতে থাকে এবং খুব আরাম বোধ হয়। আর এ বৈশিষ্ট্যগুলো জনাব শাহজাহানের মিশন স্থলে দেখতে পাওয়া যায় বিধায় এটি নিরক্ষীয় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

নিরক্ষরেখার উভয় পার্শ্বে ৫° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে যে জলবায়ু পরিলক্ষিত হয় তাকে নিরক্ষীয় জলবায়ু বলে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্য সারাবছর লম্বভাবে কিরণ দেয়। ফলে দিবাভাগে প্রচণ্ড গরম এবং রাতে ভূপৃষ্ঠ তাপ বিকিরণ করে বলে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা অনুভূত হয়। বনভূমির আধিক্য এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। এ কারণেই এ অঞ্চলে দিন ও রাতের তাপমাত্রার পার্থক্য দেখা যায়। এ অঞ্চলে দিবাভাগের দৈর্ঘ্য সারাবছর প্রায় সমান থাকে বলে তাপমাত্রা সারা বছরই অধিক থাকে। এখানে বিভিন্ন মাসের মধ্যে তাপমাত্রার পার্থক্য খুবই কম হয়ে থাকে। বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ২২°-৩৪° সে.। দৈনিক সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পার্থক্য সাধারণত ৫°-১০° সে. পর্যন্ত হয়ে থাকে।

ঘ জনাব শাহজাহানের নিজ দেশ এবং প্রবাস অঞ্চলটি যথাক্রমে মৌসুমি এবং নিরক্ষীয় জলবায়ুর অন্তর্গত।

ঋতু পরিবর্তনের সাথে যে বায়ুর দিক পরিবর্তন হয় তাকে মৌসুমি বায়ু বলে। যেসব দেশের উপর দিয়ে এ বায়ু প্রবাহিত হয় সেসব দেশ মৌসুমি জলবায়ুর অন্তর্গত। অন্যদিকে নিরক্ষরেখার উভয় পার্শ্বে ৫° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে যে জলবায়ুর পরিলক্ষিত হয়, তাকে নিরক্ষীয় জলবায়ু বলে। এ দুটি অঞ্চলের আবহাওয়া ও জলবায়ুর পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো—

আর্দ্র গ্রীষ্মকাল, শুষ্ক শীতকাল মৌসুমি জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। গ্রীষ্ম ও শীতকালে এর গড় তাপমাত্রা যথাক্রমে ২১°-৩২° এবং ১১°-২২° সে.। অন্যদিকে নিরক্ষীয় অঞ্চলের গড় তাপমাত্রা ২৬-২৮° সে.। নিরক্ষীয় অঞ্চলের গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৫০-২৫০ সে.মি.। কোনো কোনো স্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি হয়। অপরদিকে, মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১২৫-২০০ সে.মি.। এ অঞ্চলের বেশিরভাগ বৃষ্টিপাত গ্রীষ্মকালেই হয়ে থাকে। গ্রীষ্মকালে উত্তর গোলার্ধের অন্তর্গত দক্ষিণ-পূর্ব ও মধ্য এশিয়ার উত্তর-পশ্চিম ভারতের স্থলভাগের উপর সূর্য লম্বভাবে কিরণের ফলে অতিশয় উত্তপ্ত হলে এ স্থানে

নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলের তাপমাত্রা সারাবছর অধিক থাকে বলে এখানে চিরস্থায়ী নিম্নচাপ বলয়ের সৃষ্টি হয়েছে। নিরক্ষীয় অঞ্চলের গড় আর্দ্রতা ৮৫-৯০%। অন্যদিকে মৌসুমী অঞ্চলের গড় আর্দ্রতা ৫০-৮০%।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, দুটি অঞ্চলের আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶ ৯ সাজিদ বাংলাদেশে থেকে শীতের ছুটিতে তার বন্ধুর বাড়ী ফ্রান্সে বেড়াতে গিয়ে দেখলো সেখানে তখন বৃষ্টি হচ্ছে। সে লক্ষ করলো একটু পরেই বৃষ্টি শেষ হয়ে আবহাওয়া রৌদ্রকরোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সাজিদ তার বন্ধুকে বলল আমাদের দেশে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে।

◀ *শিখনফল: ২ [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল]*

ক. ঘনীভবন কাকে বলে? ১

খ. মৌসুমি বায়ুর উৎপত্তি তাপজনীত কারণে— বুঝিয়ে লিখো। ২

গ. সাজিদের ভ্রমণকৃত দেশে উল্লিখিত ঋতুতে বৃষ্টিপাতের কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দেশ দুটির জলবায়ুর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো।

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বায়ুর বাষ্পকণা জলকণায় পরিবর্তন হওয়ার প্রক্রিয়াকে ঘনীভবন বলে।

খ ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে যে বায়ুপ্রবাহের দিক পরিবর্তিত হয় তাকে মৌসুমি বায়ু বলে।

সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের ফলে শীত-গ্রীষ্মে ঋতুভেদে স্থল ও জলভাগের তাপের তারতম্য ঘটে। ফলে মৌসুমি বায়ুর সৃষ্টি হয়। সুতরাং বলা যায়, তাপজনিত কারণেই মৌসুমি বায়ুর উৎপত্তি হয়।

গ সাজিদের ভ্রমণকৃত দেশ ফ্রান্স ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

বৃষ্টিবহুল শীতকাল এবং বৃষ্টিহীন গ্রীষ্মকাল ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে বায়ুপ্রবাহের সাথে বৃষ্টিপাতের সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে।

ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে শীতকালে আর্দ্র পশ্চিমা বা প্রত্যয়ন বায়ু প্রবাহিত হয়। এ সময় বায়ুতে নিম্নচাপ বিরাজ করে। গ্রীষ্মকালে শুষ্ক অয়ন বায়ু প্রবাহিত হয়। তাই এ সময় বৃষ্টিপাত হয় না। উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকালে সূর্যের উত্তরায়ণ হলে সূর্য কর্কটক্রান্তির নিকটবর্তী হয় তখন পৃথিবীর বায়ুচাপ বলয়গুলো উত্তর দিকে সরে যায়। চাপ বলয়ের সাথে সাথে বায়ু বলয়গুলোও উত্তরে সরে অবস্থান করে। ফলে এ সময় উত্তর গোলার্ধের ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলের দেশগুলোর উপর দিয়ে উত্তর-পূর্ব অয়ন বায়ু প্রবাহিত হয়। এ বায়ু স্থলভাগের উপর দিয়ে আসে বলে এতে জলীয়বাষ্প থাকে না। ফলে এ অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি হয় না। এ সময় দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল থাকায় এবং বায়ু চাপ বলয়গুলো কিছুদূর উত্তরে সরে যাওয়ায় সেখানকার ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলগুলোর উপর দিয়ে পশ্চিমা বায়ু প্রবাহিত হয়। এ বায়ু সমুদ্র হতে আসে বলে তাতে প্রচুর জলীয়বাষ্প থাকে এবং ঐ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ঘটায়।

সুতরাং আলোচনা হতে বলা যায় যে, ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুতে বায়ুপ্রবাহের সাথে বৃষ্টিপাতের গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে সাজিদের বসবাসকৃত বাংলাদেশে মৌসুমি এবং তার ভ্রমণকৃত দেশ ফ্রান্সে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু বিদ্যমান।

ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে যে বায়ুর দিক পরিবর্তন হয় তাকে মৌসুমি বায়ু বলে। যেসব দেশের উপর দিয়ে এ বায়ু প্রবাহিত হয় সেসব দেশের জলবায়ুকে সৌমুমি জলবায়ু বলে। আবার, মহাদেশগুলোর পশ্চিমাংশে ৩৩° থেকে ৪৫° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে যে জলবায়ু দেখতে পাওয়া যায় তাকে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু বলে।

মৌসুমি ও ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নিচে তুলে ধরা হলো—

i. মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু এবং শীতকালে উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয়। অন্যদিকে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে শুষ্ক অয়ন বায়ু এবং শীতকালে আর্দ্র পশ্চিমা বায়ু প্রবাহিত হয়।

ii. মৌসুমি জলবায়ুতে গ্রীষ্মকাল বৃষ্টিবহুল এবং শীতকাল বৃষ্টিহীন। অপরদিকে, ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুতে গ্রীষ্মকাল বৃষ্টিহীন এবং শীতকাল বৃষ্টিবহুল।

iii. মৌসুমি জলবায়ুতে মৌসুমি বায়ু গ্রীষ্মকালে জল হতে স্থলভাগের দিকে এবং শীতকালে স্থল হতে জলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়। অপরদিকে, ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুতে গ্রীষ্মকালে অয়ন বায়ু স্থল থেকে জলভাগের দিকে এবং শীতকালে পশ্চিমা বায়ু জলভাগ থেকে স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়।

iv. মৌসুমি জলবায়ুতে গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা ২৭° সেলসিয়াসের অধিক থাকে। অপরদিকে, ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুতে গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়।

v. মৌসুমি জলবায়ুতে শীত ও গ্রীষ্মের গড় তাপমাত্রার পার্থক্য প্রায় ৫° সে. এবং ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুতে শীত ও গ্রীষ্মের গড় তাপমাত্রা প্রায় ১১° সে.।

vi. মৌসুমি অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১২৫-২০০ সেন্টিমিটার এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বার্ষিক ২৫-৭৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, মৌসুমি ও ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর মধ্যে ঋতুগত ভিন্নতায় কোনো সাদৃশ্য নেই। এ দুই জলবায়ুতে ব্যাপক বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ১০ উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে মুহিব ইতালি এবং তার বন্ধু নিরব মালয়েশিয়ায় গেল। স্কাইপিতে আলাপচারিতার মাধ্যমে মুহিব জানালো তার দেশে শীতকালে বৃষ্টি হয়। নিরব বলল, এদেশে সারা বছরই বৃষ্টি হয়।

◀ *শিখনফল: ২ [মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা]*

ক. পরিপৃক্ত বায়ু (saturated air) কী? ১

খ. আপেক্ষিক ও পরম আর্দ্রতা বলতে কী বোঝ? ২

গ. মুহিব যে দেশে পড়তে গিয়েছে, সে দেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। ৩

ঘ. নিরব এখন যে দেশে অবস্থান করছে, সে দেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বায়ু যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে, তা বায়ুতে উপস্থিত থাকলে তাকে পরিপৃক্ত বায়ু বলে।

খ নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে প্রকৃত জলীয়বাষ্পের ভরের সাথে একই তাপমাত্রায় উক্ত বায়ুকে পরিপৃক্ত (Saturated) করতে প্রয়োজনীয় জলীয়বাষ্পের ভরের যে অনুপাত, তাকে আপেক্ষিক আর্দ্রতা (relative humidity) বলে। এটি সব সময়ই শতকরা (%) হিসাবে প্রকাশ করা হয়।

অন্যদিকে, একটি নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে জলীয়বাষ্পের প্রকৃত পরিমাণকে পরম আর্দ্রতা (absolute humidity) বলে। বায়ুর প্রতি ঘনমিটার আয়তনে যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প থাকে তার ভরকে গ্রামে প্রকাশ করে এর পরিমাপ করা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত মুহিব ইতালিতে পড়তে গিয়েছিল, যা ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত। নিচে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো–

i. **বায়ুর তাপমাত্রাঃ** ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুবিশিষ্ট অঞ্চলে (ইতালি) গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা ২১°–২৭° সে.। এ সময় আকাশ মেঘহীন থাকে এবং রাতে তাপমাত্রা কমে যায়। স্থলভাগের অভ্যন্তরে দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে তাপমাত্রা কম থাকে। শীতকালীন তাপমাত্রা ৫°–১০° সে. হয়। তবে উপকূলীয় এলাকায় এসময় গড় তাপমাত্রা কিছুটা বেশি (১°-২° সে.) পরিলক্ষিত হয়। শীতকালে কোনো কোনো রাতে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে নেমে যায়।

ii. **বায়ুর চাপ ও বায়ুপ্রবাহঃ** পৃথিবীর বার্ষিক গতির জন্য জুন-জুলাই মাসে সূর্য কর্কটক্রান্তির নিকটবর্তী হলে চাপবলয়গুলো (pressure belt) উত্তর দিকে সরে যায়। উষ্ণমণ্ডলের নিম্নচাপ বলয় তখন মধ্য এশিয়া, পূর্ব ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও উত্তর আফ্রিকায় অবস্থান করে বলে এ সময় উত্তর গোলার্ধে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে (যেমন– ইতালি, স্পেন) অয়ন বায়ু প্রবাহিত হয় এবং দক্ষিণ গোলার্ধে প্রত্যয়ন বায়ু (Westerlies) প্রবাহিত হয়।

iii. **বৃষ্টিপাতঃ** ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে আর্দ্র পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়। এখানে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৫–৭৫ সে.মি. পর্যন্ত হয়ে থাকে।

iv. **আর্দ্রতাঃ** ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় এবং গ্রীষ্মকাল বৃষ্টিহীন থাকে। অর্থাৎ, এ অঞ্চলে শীতকাল আর্দ্র এবং গ্রীষ্মকাল শুষ্ক।

v. **প্রাকৃতিক উদ্ভিদঃ** ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলের প্রধান বৃক্ষ হলো জলপাই। তাছাড়া কর্ক, ওক, পাইন, সিডার, তুঁত প্রভৃতি বৃক্ষ দেখা যায়।

vi. **জীবজন্তুঃ** এ জলবায়ু অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য প্রাণী হলো খচ্চর, উট, ছাগল ও গর্দভ।

ঘ নিরব মালয়েশিয়ায় অবস্থান করছে। দেশটি নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত। নিচে এ জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো–

i. **বায়ুর তাপমাত্রাঃ** সূর্য সারা বছর লম্বভাবে কিরণ দেয় বলে নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলে তাপমাত্রার পরিমাণ সারাবছর বেশি থাকে। বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ২২° থেকে ৩৪° সেলসিয়াস হয়ে থাকে।

ii. **বায়ুর চাপঃ** নিরক্ষীয় অঞ্চলে সারাবছর তাপমাত্রা অধিক থাকে বলে এখানে নিম্নচাপ বলয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এখানে বায়ুর চাপ সাধারণত ১,০০৯ থেকে ১,০১২ মিলিবারের মধ্যে থাকে।

iii. **বায়ুপ্রবাহঃ** নিরক্ষীয় অঞ্চলে ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু প্রবাহিত হয়।

iv. **বায়ুর আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাতঃ** জলভাগ অধিক বলে নিরক্ষীয় অঞ্চলে বায়ুর আর্দ্রতা সর্বোচ্চ। এ অঞ্চলে দুপুরের পর থেকে আকাশ মেঘে ছেয়ে যায় এবং অপরাহ্নে বজ্রসহ পরিচলন বৃষ্টিপাত ঘটে। এখানে গড়ে বার্ষিক ১৫০–২৩০ সে.মি. পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়।

v. **উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্তুঃ** সারাবছর ধরে অধিক তাপমাত্রা এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ার কারণে নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রশস্ত পত্রবিশিষ্ট চিরহরিৎ (evergreen) বৃক্ষের গভীর বনভূমির সৃষ্টি হয়েছে। এ বনভূমির গভীর অংশে বাঘ, সিংহ, গন্ডার প্রভৃতি বৃহদাকার মাংসাশী পশু বাস করে।

vi. **মাটিঃ** নিরক্ষীয় অঞ্চলে চুনজাতীয় (lime stone) এবং আগ্নেয় মৃত্তিকা দেখা যায়।

প্রশ্ন ▶১১ পৃথিবীর সর্বত্র জলবায়ু একরকম নয়। কোথাও জলবায়ু উষ্ণ কোথাও নাতিশীতোষ্ণ আবার কোথাও শীতল। এই বৈচিত্র্যের মধ্যেও এমন কতকগুলো অঞ্চল আছে যাদের জলবায়ু উদ্ভিজ্জ ভূ-গঠন ও জীবজন্তুর মেধ্য সাদৃশ্য আছে। ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ুর সাদৃশ্য অনুযায়ী জলবায়ু অঞ্চলে ভাগ করা হয়।

◀ *শিখনফল: ২ [সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর]*

ক. জলবায়ু অঞ্চল বলতে কী বোঝ? ১

খ. নিরক্ষীয় জলবায়ু প্রভাবিত ৫টি দেশের নাম লেখ। ২

গ. ডব্লিউ কোপেন পৃথিবীকে কী কী তাপমণ্ডলে বিভক্ত করেছেন? ৩

ঘ. নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্রগুলো লেখ। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত কোনো বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জলবায়ুর বিভিন্ন উপাদানগুলো যেমন– বায়ুর চাপ, বায়ুপ্রবাহ, বায়ুর আর্দ্রতা, মেঘাচ্ছন্নতা, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি একই ধরনের হয় তখন ওই অঞ্চলকে জলবায়ু অঞ্চল বলা হয়।

খ নিরক্ষরের উভয় পাশে ৫° অক্ষাংশের মধ্যে নিরক্ষীয় জলবায়ু বিস্তৃত। দক্ষিণ আমেরিকার আমাজান নদীর অববাহিকায় ব্রাজিলের উত্তরাংশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, গায়না, ভেনেজুয়েলা ও কলম্বিয়ার দক্ষিণাংশ, পেরুর উত্তরাংশ এবং ইকুয়েডর।

গ ড. ডব্লিউ কোপেন পৃথিবীকে চারটি তাপমণ্ডলে বিভক্ত করেছেন। যথা– (১) উষ্ণমণ্ডল (২) উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল (৩) শীতল নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল ও (৪) হিমমণ্ডল। নিচে এসব মণ্ডল সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হলো–

উষ্ণমণ্ডল ঃ নিরক্ষরেখার দুই দিকে অর্থাৎ ২৩ $\frac{১^\circ}{২}$ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৩ $\frac{১^\circ}{২}$ দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত স্থানকে উষ্ণমণ্ডল বলা হয়। এ অঞ্চলে বছরের অধিকাংশ সময় সূর্যরশ্মি প্রায় খাড়াভাবে পড়ে এবং কোনো সময়ই দিন রাত্রির দৈর্ঘ্যের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য হয় না। অঞ্চলটি উত্তর সীমায় কর্কটক্রান্তি রেখা এবং দক্ষিণ সীমায় মকরক্রান্তি রেখা অবস্থিত। অঞ্চলটির বার্ষিক উষ্ণতার পরিমাণ ২৭° সে.।

উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল ঃ উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল দুটি অংশে বিভক্ত; যথা–

(১) উত্তর নাতিশীতোষ্ণ (২) দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণ। উত্তরে কর্কটক্রান্তি রেখা থেকে সুমেরুবৃত্ত পর্যন্ত প্রসারিত স্থানকে উত্তর নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল বলা হয়। আর দক্ষিণে মকরক্রান্তি রেখা থেকে কুমেরুবৃত্ত পর্যন্ত প্রসারিত স্থানকে দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল বলা হয়।

শীতল নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল : উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল সারা বছরই উষ্ণ থাকে। গড় উষ্ণতা মোটামুটি ০°-২৭° সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে। এ মণ্ডলের সর্বাধিক বিস্তৃতি ৪,৮০০ কিলোমিটার হওয়ায় এর যে সীমানায় মেরুবৃত্ত অবস্থিত সেখানকার উষ্ণতা দুই ক্রান্তীয় অঞ্চলের উষ্ণতা অপেক্ষা অনেক কম। দুই মেরুবৃত্তের নিকটবর্তী অঞ্চলকে শীতল নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল বলা হয়।

হিমমণ্ডল ঃ হিমমণ্ডর দুটি অংশে বিভক্ত; যথা– উত্তর হিমমণ্ডল ও দক্ষিণ হিমমণ্ডল। পৃথিবীর উত্তর প্রান্তের সুমেরুবৃত্ত থেকে সুমেরু বিন্দু পর্যন্ত এবং দক্ষিণ প্রান্তের কুমেরুবৃত্ত থেকে কুমেরু বিন্দু পর্যন্ত অংশে সারা বছরই সূর্যরশ্মি তির্যকভাবে পড়ায় উষ্ণতা বেশ কমই পাওয়া যায়। ফলে এ অঞ্চল দুটিকে যথাক্রমে উত্তর হিমমণ্ডল ও দক্ষিণ হিমমণ্ডল বলা হয়। এ অঞ্চল দুটি সারা বছর বরফে আবৃত থাকায় এদের একত্রে হিমমণ্ডল বলা হয়।

ঘ নিরক্ষীয় জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো– বায়ুর তাপ, বায়ুর চাপ, বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাত। নিচে এ জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হলো–

বার্ষিক ও ঋতুগত তাপমাত্রা ঃ নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্য সারা বছর লম্বভাবে কিরণ দেয় এবং দিবাভাগের দৈর্ঘ্য সারা বছর প্রায় একই ধরনের থাকে বলে এ অঞ্চলে তাপমাত্রা সারা বছরই অধিক থাকে এবং বিভিন্ন মাসের মধ্যে তাপমাত্রার ব্যবধান খুবই কম হয়ে থাকে। বার্ষিক গড় তাপমাত্রা সাধারণত ২২° সেলসিয়াস থেকে ৩৪° সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়। এ অঞ্চলে বার্ষিক সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পার্থক্য খুবই কম। স্থলভাগে বার্ষিক সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পার্থক্য প্রায় ২৫° সেলসিয়াস এর কম হয়ে থাকে।

দৈনিক তাপমাত্রার অবস্থাঃ বার্ষিক সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পার্থক্য অপেক্ষা দৈনিক সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় পার্থক্য অনেক বেশি হয়ে থাকে। দৈনিক সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় পার্থক্য সাধারণত ৬.৭° সেলসিয়াস থেকে ১২.২° সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়ে থাকে।

বেলা দুপুরের পরে সর্বোচ্চ এবং শেষ রাতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দেখা যায়। কোনো কোনো সময় রাতের তাপমাত্রা ১৫° সেলসিয়াসে নেমে যায়। এ জন্য রাতকে নিরক্ষীয় অঞ্চলে শীতকাল বলে গণ্য করা হয়। মেঘবিহীন রাতে পৃথিবীর বিকিরণ খুব বেশি হয় বলে ভূপৃষ্ঠের নিকট কুয়াশা ও শিশির সৃষ্টি হয়। অপেক্ষাকৃত শুষ্ক ঋতুর মেঘমুক্ত রাতেই বায়ুর তাপমাত্রা প্রায় ১৫° সেলসিয়াসে নেমে যায়।

বায়ুর চাপ ও বায়ুপ্রবাহঃ অত্যধিক উত্তাপের জন্য এ াঞ্চলে একটি স্থায়ী নিম্নচাপ অঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে উপক্রান্তীয় উষ্ণ চাপবলয়গুলো হতে অয়ন বায়ু এ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয় এবং এ অঞ্চলে এসে অত্যন্ত উত্তপ্ত ও হালকা হয়ে উপরে উঠে যায়। সুতরাং, এ অঞ্চলে সর্বদা শান্তবলায় অবস্থান করে।

নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় সমুদ্রে শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়। ফলে দিনের প্রচণ্ড উত্তাপের সময় সমুদ্রের এ শীতল বায়ু সেখানকার মানুষের জীবনধারণাকে অপেক্ষাকৃত সহজ করে তোলে। সমুদ্রবায়ুর এ প্রভাব উপকূল থেকে দেশের অভ্যন্তরে প্রায় ৪৫ থেকে ৯০ কিলোমিটার পর্যন্ত অনুভূত হয়।

বৃষ্টিপাত ঃ নিরক্ষীয় অঞ্চলে স্থলভাগ অপেক্ষা জলভাগ অধিক হওয়ায় এবং প্রচণ্ড উত্তাপ থাকায় সারা দিনই সূর্যের উত্তাপে জল বাষ্পীভূত হয়ে উর্ধ্বে উঠতে থাকে এবং উর্ধ্বে প্রসারিত ও শীতল হয়ে অপরাহ্নে পরিচলন প্রক্রিয়ায় ব্যাপকভাবে বৃষ্টিপাত ঘটায়।

পরিচলন প্রক্রিয়ার প্রভাবে নিরক্ষীয় অঞ্চলে সর্বদা স্তূপ বা পুঞ্জ মেঘের সঞ্চার হয় ও শেষ রাতে এবং সকালের দিকে মেঘের আবরণ কম থাকে।

প্রশ্ন ▶১২ প্রমিত উচ্চশিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে একটি দেশে বসবাস করে। এ অঞ্চলে সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয় এবং প্রায় প্রতিদিনই বৃষ্টিপাত হয়। অন্যদিকে তার নিজের দেশের জলবায়ুর প্রকৃতি হল আর্দ্র গ্রীষ্মকাল এবং শুষ্ক শীতকাল। ঋতু পরিবর্তনের সাথে বায়ুর দিক পরিবর্তিত হয়।

◀ *শিখনফল: ২ [নটরডেম কলেজ, ময়মনসিংহ]*

ক. নিয়ত বায়ু কত প্রকার ও কী কী? ১

খ. বৃষ্টিপাত সংঘটনের কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে প্রমিতের নিজের দেশটি কোন জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জলবায়ু অঞ্চল দুটির ভিন্নতার কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিয়ত বায়ু তিন প্রকার। যথা: ১. অয়ন বা বাণিজ্য বায়ু, ২. পশ্চিমা বায়ু ও ৩. মেরুদেশীয় বায়ু।

খ বায়ুমণ্ডলে ভাসমান জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটে।

সূর্যের উত্তাপে সৃষ্ট জলীয়বাষ্প উপরের শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এলে সহজেই তা পরিপৃক্ত হয়। পরে ঐ পরিপৃক্ত বায়ু অতি ক্ষুদ্র

জলকণায় পরিণত হয়ে বায়ুমণ্ডলের ধূলিকণাকে আশ্রয় করে জমাট বেঁধে মেঘের আকারে আকাশে ভাসতে থাকে। বায়ুমন্ডলের উষ্ণতা কোনো কারণে আরও হ্রাস পেলে ঐ মেঘ ঘনীভূত হয়ে পানিবিন্দুতে পরিণত হয় এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে তা ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে। এইভাবে পৃথিবীতে বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে প্রমিতের নিজের দেশটি মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত। মৌসুমি জলবায়ুর প্রকৃতি হলো আর্দ্র গ্রীষ্মকাল এবং শুষ্ক শীতকাল এবং ঋতু পরিবর্তনের সাথে বায়ুর দিক পরিবর্তিত হয়; যা উদ্দীপকের উল্লিখিত প্রমিতের নিজ দেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত অঞ্চলের জলবায়ুকে মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চল বলে। ক্রান্তীয় অঞ্চলে এর প্রভাব সর্বাধিক বলে এ জলবায়ু অঞ্চলকে ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলও বলা হয়। সাধারণভাবে ১৫°-৩০° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মহাদেশসমূহের প্রান্তে এ জলবায়ু অঞ্চল পরিলক্ষিত হয়। এ জন্য এ জলবায়ু অঞ্চলে গ্রীষ্মকাল বৃষ্টিবহুল এবং শীতকাল প্রায় বৃষ্টিহীন অবস্থায় থাকে। এ জলবায়ু অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১২৫-২০০ সে.মি। এ জলবায়ুর অঞ্চলগুলো হলো দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পূর্ব চীন, দক্ষিণ জাপান, ক্যারিবিয়ান সাগর, পূর্ব আফ্রিকান ও মাদাগাস্কার দ্বীপ এবং উত্তর পূর্ব অস্ট্রেলিয়া।

সুতরাং উল্লিখিত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় প্রমিতের দেশটি মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত।

ঘ উদ্দীপক অনুসারে প্রমিতের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে বসবাসকৃত অঞ্চলে সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয় এবং প্রায় প্রতিদিনই বৃষ্টিপাত হয়। যা নিরক্ষীয় জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে তার নিজ দেশের জলবায়ুর প্রকৃতি হলো আর্দ্র গ্রীষ্মকাল এবং শুষ্ক শীতকাল যা মৌসুমি জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য। নিম্নে অঞ্চল দুটিতে জলবায়ুর ভিন্নতার কারণ বিশ্লেষণ করা হলো :

পৃথিবীতে সর্বত্র একই ধরনের জলবায়ু, ভূপ্রকৃতি প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয় না। তবে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে বিস্তীর্ণ অঞ্চলব্যাপী অনেক সময় একই ধরনের জলবায়ু বিরাজ করে। ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত কোনো বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জলবায়ুর বিভিন্ন উপাদানগুলো যেমন– বায়ুর তাপ, বায়ুর চাপ, বায়ুর প্রবাহ, বায়ুর আর্দ্রতা, মেঘাচ্ছন্নতা, বারিপাত প্রভৃতি যখন মোটামুটি একই ধরনের হয় তখন ঐ অঞ্চলটিকে জলবায়ু অঞ্চল বলে। জলবায়ুর এসব উপাদানের বিভিন্নতার জন্য পৃথিবীতে অক্ষাংশভেদে ভিন্ন ভিন্ন জলবায়ু অঞ্চল দেখা যায়। সুতরাং বলা যায় উল্লিখিত নিরক্ষীয় (নিরক্ষরেখাকে ঘিরে) এবং মৌসুমি জলবায়ুর অঞ্চলে (ক্রান্তীয় অঞ্চলকে ঘিরে) বায়ুর তাপ, বায়ুর চাপ, বায়ুর আর্দ্রতা, মেঘাচ্ছন্নতা, বারিপাত প্রভৃতি নিয়ামকের কারণে ভিন্ন জলবায়ু পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৩ হাসেম ব্যবসায়িক কাজে প্রায়ই ইতালি, স্পেন, ফ্রান্স যান। তিনি লক্ষ করেন যে সেসব দেশের জলবায়ুতে শীতকালে কিছু বৃষ্টিপাত হয় কিন্তু গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে। তিনি আরও লক্ষ করলেন যে এসব দেশে ফল খুবই ভালো জন্মে। ফল উৎপাদনে খ্যাতির কারণের সাথে জলবায়ুর সম্পর্কও আছে।

◀ শিখনফল: ২ [ঢাকা কমার্স কলেজ]

ক. জলবায়ু অঞ্চল কাকে বলে? ১

খ. আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য আছে কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. হাসেম যে জলবায়ু অঞ্চল ভ্রমণ করেছেন সে জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো। ৩

ঘ. হাসেম যেসব দেশে ব্যবসায়িক কাজে গিয়েছেন সেসব দেশের ফল উৎপাদনের ওপর জলবায়ুর প্রভাব উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সকল স্থানের জলবায়ুর উপাদানসমূহ প্রায় একই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সে সকল স্থানকে একটি জলবায়ু অঞ্চল বলে।

খ আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানের বায়ুর, তাপ, চাপ, আর্দ্রতা, মেঘ, বৃষ্টিপাত ও বায়ুপ্রবাহের দৈনন্দিন সামগ্রিক অবস্থাকে আবহাওয়া বলে আর কোনো অঞ্চলের দীর্ঘদিনের অর্থাৎ ৩০-৪০ বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থাকে জলবায়ু বলে।

গ হাসেম ব্যবসায়িক কাজে ইতালি, স্পেন, ফ্রান্স যান।

হাসেমের ভ্রমণকৃত অঞ্চলগুলো ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত। কারণ, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় কিন্তু গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে। এছাড়াও ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে ফল খুব ভালো জন্মে। এ অঞ্চলের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য–

তাপমাত্রা: ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা ২১-২৭° সে. এর মধ্যে এবং শীতকালীন তাপমাত্রা ৪° থেকে ১০° সে. এর মধ্যে থাকে। ফলে শীত-গ্রীষ্মের উত্তাপের পার্থক্য গড়ে প্রায় ১১° সেন্টিগ্রেড।

বৃষ্টিপাত: বৃষ্টিবহুল শীতকাল এবং বৃষ্টিহীন গ্রীষ্মকাল ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ অঞ্চলে বার্ষিক ২৫ সেন্টিমিটার হতে ৭৫ সে.মি. পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়।

বায়ুপ্রবাহ: সূর্যের উত্তরায়ণের ফলে বায়ুচাপ বলয়গুলোতে তাপ বিষুবকে অনুসরণ করে কিছুটা উত্তরে সরে যাওয়ায় ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে অয়ন বায়ুর আধিপত্য বিরাজ করে। পক্ষান্তরে দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল থাকায় এবং বায়ু বলয়গুলো উত্তরে সরে যাওয়ায় প্রত্যয়ন বায়ু প্রবাহিত হয়। সূর্যের দক্ষিণায়নের সাথে সাথে এ অঞ্চলের বায়ুপ্রবাহে বিপরীত অবস্থা বিরাজ করে।

ঘ হাসেম যেসব দেশে ব্যবসায়িক কাজে গিয়েছেন সে দেশগুলো ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত।

নিম্নে হাসেমের ভ্রমণকৃত দেশগুলোর ফল উৎপাদনের ওপর জলবায়ুর প্রভাব বিশ্লেষণ করা হলো:

এ অঞ্চলের জলবায়ু ফল উৎপাদনের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। আবার প্রচুর সূর্যকিরণও ফল পাকার পক্ষে উপযোগী। সেজন্য ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ফলের রাজ্য। এরূপ সুমিষ্ট ও রসালো ফল পৃথিবীর অন্য কোনো অঞ্চলে উৎপন্ন হয় না। জলপাই ও ডুমুর জাতীয় গাছ ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুবিশিষ্ট দেশগুলোতে সর্বত্রই

জন্মে। কমলালেবু ও লেবু জাতীয় অন্যান্য বৃক্ষও এ অঞ্চলে জন্মে। আঙুর ফল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।
ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বিশেষত ক্যালিফোর্নিয়া উপত্যকায় ফলের বাগান দেখা যায়। আপেল, কমলালেবু, আখরোট ও খুরানী প্রভৃতি ফল প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এসব ফল বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয়। বর্তমানে এ অঞ্চলের ফল সংরক্ষণের জন্য শিল্প কারখানা স্থাপিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৪ মি. হেনরি যে অঞ্চলে বাস করে সেখানকার বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ২৭° সেলসিয়াসের উর্ধ্বে থাকে। অঞ্চলটির বায়ু সারা বছর উষ্ণ ও আর্দ্র থাকে এবং অঞ্চলটিতে প্রতিদিন বিকেলে বৃষ্টিপাত হয়। সেখানে ঘন বনভূমির সৃষ্টি হয়েছে।

◀ *শিখনফল: ২ [বি এ এফ শাহীন কলেজ, মৌলভীবাজার]*

ক. মৌসুমি জলবায়ুর অপর নাম কী? ১
খ. জলবায়ু অঞ্চল বলতে কী বোঝ? ২
গ. মি. হেনরির বসবাসকৃত অঞ্চলটির মানচিত্র অঙ্কন করে দেখাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. হেনরির বসবাসকৃত অঞ্চলটির বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মৌসুমি জলবায়ুর অপর নাম ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু।

খ যে সকল স্থানের জলবায়ুর উপাদানসমূহ প্রায় একই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন তাকে জলবায়ু অঞ্চল বলে।
ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত কোনো বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জলবায়ুর বিভিন্ন উপাদানগুলো যেমন—বায়ুর তাপ, চাপ, বায়ুপ্রবাহ, আর্দ্রতা, মেঘাচ্ছন্নতা, বারিপাত প্রভৃতি যখন মোটামুটি একই ধরনের হয় তখন তাকে একটি নির্দিষ্ট জলবায়ু অঞ্চল বলে। যেমন— দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত।

গ উদ্দীপক অনুসারে হেনরি যে অঞ্চলে বাস করেন সেখানকার বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ২৭° সে.। অঞ্চলটিতে বায়ু সারা বছর উষ্ণ ও আর্দ্র থাকে যা ঘন বনভূমির সৃষ্টি করেছে। এটি নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। নিচে নিরক্ষীয় অঞ্চলের মানচিত্র অঙ্কন করে দেখানো হলো।

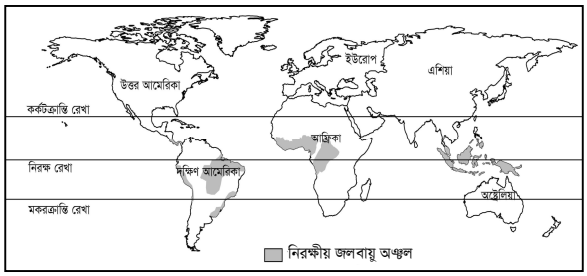

চিত্র: নিরক্ষীয় জলবায়ুর বণ্টন

ঘ উদ্দীপক অনুসারে হেনরি নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলে বসবাস করেন। এ অঞ্চলটির বায়ু সারা বছর উষ্ণ এবং আর্দ্র থাকে এবং অঞ্চলটিতে প্রতিদিন বিকেল বেলায় বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয় যা নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য।
নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ—

i. নিরক্ষরেখার উভয় পার্শ্বে ৫° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে এই জলবায়ু পরিলক্ষিত হয়।
ii. নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় দ্বারা এ জলবায়ু নিয়ন্ত্রিত হয়।
iii. জানুয়ারি ও জুলাই মাসের তাপমাত্রার তেমন কোন পার্থক্য নেই।
iv. ঋতু পরিবর্তন দেখা যায় না।
v. সারা বছর প্রচুর বৃষ্টিপাত ও অধিক তাপমাত্রা থাকে।
vi. বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ২২°-৩৪° সে. পর্যন্ত হয়ে থাকে।
vii. বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ১৭০-২৫০ সে.মি.।
viii. এ অঞ্চলের বায়ু প্রচুর জলীয়বাষ্প ধারণ করে।
ix. এ অঞ্চলে বায়ুপ্রবাহের বেগ কম থাকে।
x. এ অঞ্চলে সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়।
xi. এখানে সারাবছর পরিচলন প্রক্রিয়ায় বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়।
xii. অঞ্চলটির দিনরাত্রির দৈর্ঘ্য প্রায় সমান থাকে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ভূপ্রকৃতিগত ব্যাপক ভিন্নতা না থাকায় এবং সমুদ্রভাগের অবস্থানের কারণে সমগ্র অঞ্চলে নিরক্ষীয় জলবায়ু একই রূপ বৈশিষ্ট্যে আবির্ভূত হয়।এ সমরূপতা নিরক্ষীয় অঞ্চলের জলবায়ু অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

প্রশ্ন ▶ ১৫ সাইফুল ইসলাম রিয়াদ উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ গমন করে। সেখানকার জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য তাকে অবাক করে। সে দেখতে পায় যে সেখানে শীতকালে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে এবং সারা বছরই মেঘমুক্ত রৌদ্রকরোজ্জ্বল আবহাওয়া। অথচ তার নিজ দেশে শীত ও গ্রীষ্মে পরস্পর বিপরীত দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হয়, শীতকাল শুষ্ক ও বৃষ্টিহীন। ৮০% বৃষ্টিপাত হয় বর্ষাকালে।

◀ *শিখনফল: ২ [প্রফেসর মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী; অনু-১]*

ক. জলবায়ু কাকে বলে? ১
খ. তুন্দ্রা অঞ্চল বলতে কি বোঝায়? ২
গ. সাইফুল ইসলামের গমনকৃত জলবায়ু অঞ্চলটির প্রধান এলাকা চিত্রের মাধ্যমে দেখাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত জলবায়ু অঞ্চল দুইটির বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আবহাওয়ার দীর্ঘদিনের গড় অবস্থাকেই জলবায়ু বলে।

খ মেরুদেশীয় জলবায়ু অঞ্চলে সূর্যরশ্মি দেখা যায় না বললেই চলে। ফলে এ অঞ্চলে হিমশীতল বায়ু প্রবাহিত হয়। যে কারণে একে মেরুদেশীয় তুন্দ্রা জলবায়ু বলে। হিমশীতল জলবায়ু তুন্দ্রা অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

গ সাইফুল ইসলামের গমনকৃত জলবায়ু অঞ্চলটি ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল, যেখানে শীতকালে বৃষ্টিপাত ঘটে এবং সারাবছরই মেঘমুক্ত রৌদ্রকরোজ্জ্বল আবহাওয়া থাকে। ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো–

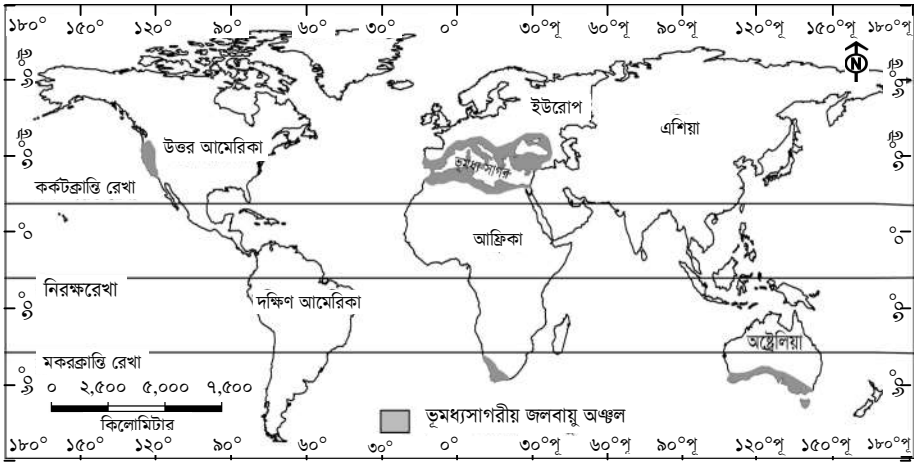

চিত্র : ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর বণ্টন

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত জলবায়ু অঞ্চল দুটি হচ্ছে– ১. ভূমধ্যসাগরীয় ও ২. মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চল।

এ দুটি জলবায়ু অঞ্চলের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। যেমন–

i. মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু এবং শীতকালে উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয়। ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে শুষ্ক অয়ন বায়ু এবং শীতকালে আর্দ্র পশ্চিমা বায়ু প্রবাহিত হয়।

ii. মৌসুমি জলবায়ুতে গ্রীষ্মকাল বৃষ্টিবহুল এবং শীতকাল বৃষ্টিহীন। অপরদিকে, ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুতে গ্রীষ্মকাল বৃষ্টিহীন এবং শীতকাল বৃষ্টিবহুল।

iii. মৌসুমি জলবায়ুতে মৌসুমি বায়ু গ্রীষ্মকালে জল হতে স্থলভাগের দিকে এবং শীতকালে স্থল হতে জলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়। অপরদিকে, ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুতে গ্রীষ্মকালে অয়ন বায়ু স্থল থেকে জলভাগের দিকে এবং শীতকালে পশ্চিমা বায়ু জলভাগ থেকে স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়।

iv. মৌসুমি জলবায়ুতে গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা ২৭° সেলসিয়াসের অধিক থাকে। অপরদিকে, ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুতে গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়।

v. মৌসুমি জলবায়ুতে শীত ও গ্রীষ্মের গড় তাপমাত্রার পার্থক্য প্রায় ৫° সে. এবং ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুতে শীত ও গ্রীষ্মের গড় তাপমাত্রা প্রায় ১.১° সে.।

vi. মৌসুমি অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১২৫-২০০ সেন্টিমিটার এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বার্ষিক ২৫-৭৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৬

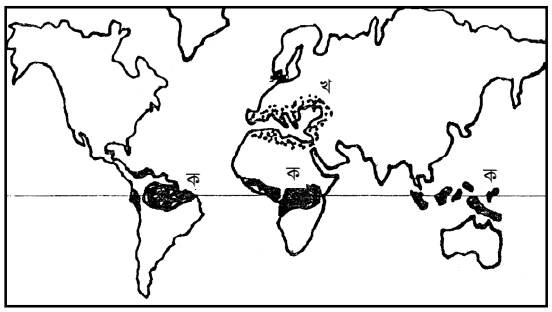

◀ *শিখনফল: ২ [প্রফেসর মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী: অনু-২]*

ক. মৌসুমি জলবায়ু কাকে বলে? ১

খ. সমতাপ ও সমবর্ষণ রেখা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. চিত্রে 'ক' চিহ্নিত জলবায়ু অঞ্চলটির উপাদানগত বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে 'খ' চিহ্নিত জলবায়ু অঞ্চলটি স্থানীয় উদ্ভিদ, জীবজন্তু এবং কৃষিজ দ্রব্যের ওপর কী প্রভাব ফেলে?– বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে যে বায়ুর দিক পরিবর্তন হয় তাকে মৌসুমি বায়ু বলে; আর মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত অঞ্চলের জলবায়ুকে মৌসুমি জলবায়ু বলে।

খ সমতাপ রেখা মানচিত্রে একই তাপমাত্রা সম্পন্ন এবং সমবর্ষণ রেখা একই পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয় এমন অঞ্চলকে যুক্ত করে। এক্ষেত্রে গড় মান ব্যবহার করা হয়।

গ চিত্রে 'ক' চিহ্নিত অঞ্চলটি নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চল।

সাধারণত বায়ুর তাপ, বায়ুর চাপ, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি উপাদানের উপর ভিত্তি করে নিরক্ষীয় জলবায়ু নিরূপণ করা যায়। যথা–

বায়ুর তাপ: নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্য সারাবছর লম্বভাবে কিরণ দেয় এবং দিবাভাগের দৈর্ঘ্য সারাবছর প্রায় সমান থাকে বলে এ অঞ্চলের তাপমাত্রা সারা বছরই অধিক থাকে এবং বিভিন্ন মাসের মধ্যে তাপমাত্রার পার্থক্য খুবই কম হয়ে থাকে। বার্ষিক গড় তাপমাত্রা সাধারণত ২২°– ৩৪° সে. পর্যন্ত।

বায়ুর চাপ ও প্রবাহ: নিরক্ষীয় অঞ্চলে আনুভূমিকভাবে তাপমাত্রা পরিবর্তনের হার খুব কম বলে বায়ু চাপের পরিবর্তনের হারও কম। ফলে আনুভূমিক বায়ুপ্রবাহের বেগও অতি কম। কেবল প্রান্তভাবে অয়ন বায়ুর প্রবেশজনিত কারণে আনুভূমিক বায়ু প্রবাহের বেগ অপেক্ষাকৃত অধিক হয় এবং নিরক্ষীয় শান্তবলয়ের দিকে বায়ুর বেগ ক্রমশ কমে যায়।

বৃষ্টিপাত: নিরক্ষীয় অঞ্চলে জলভাগ অধিক হওয়ায় এবং প্রচণ্ড উত্তাপ থাকায় সারাদিনই সূর্যের তাপ পানি বাষ্পীভূত হয়ে উপরে উঠতে থাকে এবং উর্ধ্বে প্রসারিত ও শীতল হয়ে অপরাহ্নে পরিচলন প্রক্রিয়ায় ব্যাপকভাবে বৃষ্টিপাত ঘটায়। এ অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৫০ সে.মি. মতো।

সুতরাং বলা যায় যে, উপরোক্ত উপাদানগুলোর বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করেই আমরা নিরক্ষীয় জলবায়ু চিহ্নিত করতে পারি।

ঘ উদ্দীপকে 'খ' চিহ্নিত স্থান ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল নির্দেশ করে।

ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে উদ্ভিদ, জীবজন্তু ও কৃষিজ দ্রব্য জলবায়ুর প্রভাবে বৈচিত্র্যময়। যেমন–

কৃষিজাত দ্রব্য: গম চাষের জন্য এ অঞ্চল বিশেষ উপযুক্ত। অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অঞ্চলে পানিসেচের সাহায্যে গম, যব, ভুট্টা, তুলা প্রভৃতি ফসলের চাষ হয়। এছাড়া এ অঞ্চলের জলবায়ু ফল উৎপাদনের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। আবার প্রচুর সূর্যকিরণও ফল পাকার পক্ষে উপযোগী। সে জন্য ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ফলের রাজ্য। এরূপ সুমিষ্ট ও রসালো ফল পৃথিবীর অন্য কোনো অঞ্চলে উৎপন্ন হয় না। জলপাই ও ডুমুর জাতীয় গাছ ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুবিশিষ্ট দেশগুলোতে সর্বত্রই জন্মে। কমলালেবু ও লেবু জাতীয় অন্যান্য বৃক্ষও এ অঞ্চলে জন্মে। আঙুর ফল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বিশেষত ক্যালিফোর্নিয়া উপত্যকায় ফলের বাগান দেখা যায়। আপেল, কমলালেবু, আখরোট ও খুরানী প্রভৃতি ফল প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

উদ্ভিজ্জ: এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জ ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর ওপর নির্ভরশীল। শুষ্ক গ্রীষ্মকাল ও আর্দ্র শীতকাল হওয়ায় এরূপ জলবায়ুর উদ্ভিজ্জসমূহ শুষ্কতার মোকাবেলা করার ক্ষমতাসম্পন্ন। বৃষ্টি বহুল শীতকালে বৃক্ষাদি জন্মে। ছোট ছোট গাছ ও ঝোপঝাড় এ অঞ্চলে বেশি জন্মে। গ্রীষ্মকাল সম্পূর্ণরূপে বৃষ্টিহীন না হলেও শুষ্ক। সেজন্য এ ঋতুতে বৃক্ষলতাদির বৃদ্ধি বিশেষ হয় না। বায়ুমণ্ডলের শুষ্কতার ফলে এ অঞ্চলের উদ্ভিদের দেহে সর্বদা প্রস্বেদন (Transpiration) চলে। এ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য বৃক্ষসকল তাদের মূল, শক্ত আবরণ ও পত্রের মধ্যে গ্রীষ্মকালের জন্য আর্দ্রতা সঞ্চয় করে রাখে। ফলে যেসব বৃক্ষের লম্বা মূল, শক্ত আবরণ এবং পাতাগুলো মোমের মতো তৈলাক্ত কেবল সেসব বৃক্ষই এ অঞ্চলে জন্মে। জলপাই এ অঞ্চলের প্রধান বৃক্ষ। এছাড়া কর্ক, ওক, মিষ্টি বাদাম, সিডার, পাইন, তুঁতগাছ প্রভৃতি বৃক্ষাদিও এ অঞ্চলে জন্মে।

জীবজন্তু: ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে তৃণভূমির পরিমাণ কম। ভেড়া, ছাগল, অশ্ব, উট, খচ্চর, গাধা, শূকর এ অঞ্চলের প্রধান জীবজন্তু। বর্তমানে অনেক স্থানে গোমহিষাদি প্রতিপালিত হয়।

প্রশ্ন ▶১৭

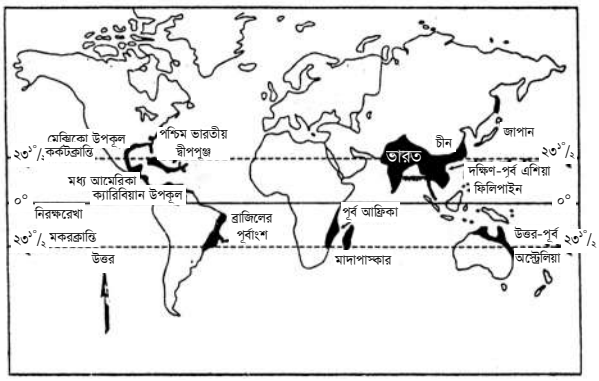

◀ *শিখনফল: ২ /অবনীন্দ্রনাথ বৈদ্য; অনু-১/*

ক. মানচিত্রে কোন জলবায়ু অঞ্চল দেখানো হয়েছে? ১

খ. জলবায়ু অঞ্চলটির অক্ষাংশীয় অবস্থান লিখো। ২

গ. উক্ত জলবায়ুর সাথে বাংলাদেশের জলবায়ুর মিল দেখাও। ৩

ঘ. 'উক্ত জলবায়ুটি বায়ুপ্রবাহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়'- আলোচনা করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানচিত্রে মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চল দেখানো হয়েছে।

খ ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে যে বায়ু দিক পরিবর্তন করে তাকে মৌসুমি জলবায়ু বলে।

ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলটি সাধারণত নিরক্ষরেখার উত্তর ও দক্ষিণে ১৫° হতে ৩০° অক্ষাংশের মধ্যে মহাদেশগুলোর পূর্বাংশে অবস্থিত। তবে বিশেষ করে উত্তর গোলার্ধে স্থানভেদে এ জলবায়ুর বিস্তৃতি ৪০° অক্ষাংশ পর্যন্ত লক্ষ করা যায়।

গ উক্ত জলবায়ুর অর্থাৎ মৌসুমি জলবায়ুর সাথে বাংলাদেশের জলবায়ুর যথেষ্ট মিল রয়েছে।

মৌসুমি জলবায়ু একটি বৈচিত্র্যময় অনিয়মিত ও অনিশ্চিত বৃষ্টিপাতের জলবায়ু। শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে স্থলভাগ ও জলভাগের ওপরে বায়ুর উষ্ণতা ও চাপের পার্থক্য থেকে মূলত এ জলবায়ুর উৎপত্তি। গ্রীষ্মকালে সমুদ্র ভাগ হতে আর্দ্র মৌসুমি বায়ু এবং শীতকালে স্থলভাগ হতে শুষ্ক মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয়। ফলে মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলে সাধারণত শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় না এবং অধিক শুষ্ক থাকে। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এখানে বায়ুপ্রবাহের গতি ও দিকের পরিববর্তন হয়। অপরদিকে, বাংলাদেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যগত দিক হচ্ছে শুষ্ক ও আরামদায়ক শীতকাল, উষ্ণ গ্রীষ্মকাল এবং উষ্ণ ও আর্দ্র বর্ষাকাল।

অতএব, উপরিউক্ত আলোচনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মৌসুমি জলবায়ু ও বাংলাদেশের জলবায়ু ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ঘ উল্লিখিত জলবায়ুটি মৌসুমি জলবায়ু।

মৌসুমি জলবায়ু সাধারণত মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ঋতুভেদে বায়ুর চাপের তারতম্যের জন্য মৌসুমি বায়ুর উৎপত্তি হয়।

উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকালে সূর্য কর্কটক্রান্তির ওপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। এর ফলে কর্কটক্রান্তি অঞ্চলের অন্তর্গত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, উত্তর-পশ্চিম ভারত, মধ্য এশিয়ার প্রভৃতি স্থানের স্থলভাগ অতিশয় উত্তপ্ত হয়। ফলে এ সকল স্থানে বায়ুর চাপ কমে যায় এবং একটি সুবৃহৎ নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। এ পরিস্থিতিতে দক্ষিণ গোলার্ধের ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয় হতে আগত দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু নিরক্ষরেখা অতিক্রম করে এশিয়া মহাদেশের নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে প্রবলবেগে ছুটে যায়। এ বায়ুকে উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মের মৌসুমি বায়ু বলে। আবার শীতকালে সূর্য দক্ষিণ গোলার্ধে মকরক্রান্তি রেখার নিকট অবস্থান করায় তথায় নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। এ সময় উত্তর গোলার্ধের স্থলভাগ অত্যন্ত শীতল হওয়ায় তথায় উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়। ফলে স্থলভাগের উচ্চচাপ অঞ্চল হতে বায়ু দক্ষিণের নিম্নচাপের দিকে মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয়।
এ থেকে বলা যায়, মৌসুমি জলবায়ু মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৮ মি. রফিক সাহেব ফ্রান্সে গিয়ে দেখলেন শীতকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। সেখানে তিনি কয়েকজন মানুষের সাথে আলোচনা করে জানতে পারলেন জলবায়ুগত কারণে এখানে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়। আর এ বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয় মূলত আর্দ্র পশ্চিমা বায়ুপ্রবাহের জন্য।

◀ *শিখনফল: ২ [তাপস কুমার মজুমদার; জনু-১]*

ক. জলবায়ু কাকে বলে? ১
খ. নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের জলবায়ুর ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বায়ুপ্রবাহের সাথে বৃষ্টিপাতের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আবহাওয়ার দীর্ঘদিনের গড় অবস্থাকেই জলবায়ু বলে।

খ নিরক্ষরেখার উভয় পার্শ্বে নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চল অবস্থিত। নিরক্ষরেখার উভয় দিকে ৫°-১০° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে যে জলবায়ু পরিলক্ষিত হয় তাকে নিরক্ষীয় জলবায়ু বলা হয়।

আমাজান অববাহিকা (দঃ আমেরিকা), আফ্রিকার কঙ্গো অববাহিকা, এশিয়ার শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, নিউগিনি, দক্ষিণ ফিলিপাইন প্রভৃতি অঞ্চল নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

গ উদ্দীপকে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় মূলত আর্দ্র পশ্চিমা বায়ু প্রবাহের জন্য। মহাদেশীয় ভূভাগের পশ্চিম প্রান্তে ৩০° হতে ৪০° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যবর্তী স্থানে যে জলবায়ু দেখা যায় তাকে পশ্চিম উপকূলবর্তী উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু বলে। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশসমূহে এ শ্রেণির জলবায়ু দেখা যায়। এ কারণে এ জলবায়ুকে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু বলে।

ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো মৃদুভাবাপন্ন শীত ও রৌদ্রকরোজ্জল আবহাওয়া। এ অঞ্চলের দেশগুলো নাতিশীতোষ্ণমন্ডলে অবস্থিত হওয়ার কারণে তাপের তেমন প্রখরতা অনুভূত হয় না। ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে বৃষ্টিবহুল শীতকাল এবং বৃষ্টিহীন গ্রীষ্মকাল পরিলক্ষিত হয়। এ অঞ্চলে তৃণভূমির পরিমাণ কম হওয়ার কারণে পশুপালন খুব একটা হয় না। ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে পর্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্স, ইতালি, তুরস্ক, সিরিয়া, লেবানন, ইসরাইল, মালটা, গ্রীস, বলকান, অস্ট্রেলিয়ার মারে নদী অববাহিকার দক্ষিণাংশ ইত্যাদি।

ঘ উদ্দীপকে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর কথা বলা হয়েছে।

বৃষ্টিবহুল শীতকাল এবং বৃষ্টিহীন গ্রীষ্মকাল ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে বায়ুপ্রবাহের সাথে বৃষ্টিপাতের সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে।

ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে শীতকালে আর্দ্র পশ্চিমা বা প্রত্যয়ন বায়ু প্রবাহিত হয়। এ সময় বায়ুতে নিম্নচাপ বিরাজ করে। গ্রীষ্মকালে শুষ্ক অয়ন বায়ু প্রবাহিত হয়। তাই এ সময় বৃষ্টিপাত হয় না। উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকালে সূর্যের উত্তরায়ণ হলে সূর্য কর্কটক্রান্তির নিকটবর্তী হয় তখন পৃথিবীর বায়ুচাপ বলয়গুলো উত্তর দিকে সরে যায়। চাপ বলয়ের সাথে সাথে বায়ু বলয়গুলোও উত্তরে সরে অবস্থান করে। ফলে এ সময় উত্তর গোলার্ধের ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলের দেশগুলোর উপর দিয়ে উত্তর-পূর্ব অয়ন বায়ু প্রবাহিত হয়। এ বায়ু স্থলভাগের উপর দিয়ে আসে বলে এতে জলীয়বাষ্প থাকে না। ফলে এ অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি হয় না। এ সময় দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল থাকায় এবং বায়ু চাপ বলয়গুলো কিছুদূর উত্তরে সরে যাওয়ায় সেখানকার ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলগুলোর উপর দিয়ে পশ্চিমা বায়ু প্রবাহিত হয়। এ বায়ু সমুদ্র হতে আসে বলে তাতে প্রচুর জলীয়বাষ্প থাকে এবং ঐ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ঘটায়।
সুতরাং আলোচনা হতে বলা যায় যে, ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুতে বায়ুপ্রবাহের সাথে বৃষ্টিপাতের গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৯ পৃথিবীর সর্বত্র জলবায়ু একরকম নয়। কোথাও জলবায়ু উষ্ণ কোথাও নাতিশীতোষ্ণ আবার কোথাও শীতল। এই বৈচিত্র্যের মধ্যেও এমন কতকগুলো অঞ্চল আছে যাদের জলবায়ু উদ্ভিজ্জ ভূ-গঠন ও জীবজন্তুর মেধ্য সাদৃশ্য আছে। ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ুর সাদৃশ্য অনুযায়ী জলবায়ু অঞ্চলে ভাগ করা হয়।

◀ *শিখনফল-১ ও ২*

ক. জলবায়ু অঞ্চল বলতে কী বোঝ? ১
খ. নিরক্ষীয় জলবায়ু প্রভাবিত ৫টি দেশের নাম লেখ। ২
গ. ডব্লিউ কোপেন পৃথিবীকে কি কি তাপমণ্ডলে বিভক্ত করেছেন? ৩
ঘ. নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো লেখো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত কোনো বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জলবায়ুর বিভিন্ন উপাদানগুলো যেমন– বায়ুর চাপ, বায়ুপ্রবাহ, বায়ুর আর্দ্রতা, মেঘাচ্ছন্নতা, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি একই ধরনের হয় তখন ওই অঞ্চলকে জলবায়ু অঞ্চল বলা হয়।

খ নিরক্ষরের উভয় পাশে ৫° অক্ষাংশের মধ্যে নিরক্ষীয় জলবায়ু বিস্তৃত। দক্ষিণ আমেরিকার আমাজান নদীর অববাহিকায় ব্রাজিলের উত্তরাংশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, গায়না, ভেনেজুয়েলা ও কলম্বিয়ার দক্ষিণাংশ, পেরুর উত্তরাংশ এবং ইকুয়েডর।

গ ড. ডব্লিউ কোপেন পৃথিবীকে চারটি তাপমণ্ডলে বিভক্ত করেছেন। যথা– (১) উষ্ণমণ্ডল (২) উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল (৩) শীতল নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল ও (৪) হিমমণ্ডল। নিচে এসব মণ্ডল সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হলো–

উষ্ণমণ্ডল ঃ নিরক্ষরেখার দুই দিকে অর্থাৎ ২৩ $\frac{১^\circ}{২}$ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৩ $\frac{১^\circ}{২}$ দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত স্থানকে উষ্ণমণ্ডল বলা হয়। এ অঞ্চলে বছরের অধিকাংশ সময় সূর্যরশ্মি প্রায় খাড়াভাবে পড়ে এবং কোনো সময়ই দিন রাত্রির দৈর্ঘ্যের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য হয় না। অঞ্চলটি উত্তর সীমায় কর্কটক্রান্তি রেখা এবং দক্ষিণ সীমায় মকরক্রান্তি রেখা অবস্থিত। অঞ্চলটির বার্ষিক উষ্ণতার পরিমাণ ২৭° সে.।

উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল ঃ উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল দুটি অংশে বিভক্ত; যথা–

(১) উত্তর নাতিশীতোষ্ণ (২) দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণ। উত্তরে কর্কটক্রান্তি রেখা থেকে সুমেরুবৃত্ত পর্যন্ত প্রসারিত স্থানকে উত্তর নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল বলা হয়। আর দক্ষিণে মকরক্রান্তি রেখা থেকে কুমেরুবৃত্ত পর্যন্ত প্রসারিত স্থানকে দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল বলা হয়।

শীতল নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল : উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল সারা বছরই উষ্ণ থাকে। গড় উষ্ণতা মোটামুটি ০°-২৭° সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে। এ মণ্ডলের সর্বাধিক বিস্তৃতি ৪,৮০০ কিলোমিটার হওয়ায় এর যে সীমানায় মেরুবৃত্ত অবস্থিত সেখানকার উষ্ণতা দুই ক্রান্তীয় অঞ্চলের উষ্ণতা অপেক্ষা অনেক কম। দুই মেরুবৃত্তের নিকটবর্তী অঞ্চলকে শীতল নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল বলা হয়।

হিমমণ্ডল ঃ হিমমণ্ডর দুটি অংশে বিভক্ত; যথা– উত্তর হিমমণ্ডল ও দক্ষিণ হিমমণ্ডল। পৃথিবীর উত্তর প্রান্তের সুমেরুবৃত্ত থেকে সুমেরু বিন্দু পর্যন্ত এবং দক্ষিণ প্রান্তের কুমেরুবৃত্ত থেকে কুমেরু বিন্দু পর্যন্ত অংশে সারা বছরই সূর্যরশ্মি তির্যকভাবে পড়ায় উষ্ণতা বেশ কমই পাওয়া যায়। ফলে এ অঞ্চল দুটিকে যথাক্রমে উত্তর হিমমণ্ডল ও দক্ষিণ হিমমণ্ডল বলা হয়। এ অঞ্চল দুটি সারা বছর বরফে আবৃত থাকায় এদের একত্রে হিমমণ্ডল বলা হয়।

ঘ নিরক্ষীয় জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো– বায়ুর তাপ, বায়ুর চাপ, বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাত। নিচে এ জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হলো–

বার্ষিক ও ঋতুগত তাপমাত্রা ঃ নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্য সারা বছর লম্বভাবে কিরণ দেয় এবং দিবাভাগের দৈর্ঘ্য সারা বছর প্রায় একই ধরনের থাকে বলে এ অঞ্চলে তাপমাত্রা সারা বছরই অধিক থাকে এবং বিভিন্ন মাসের মধ্যে তাপমাত্রার ব্যবধান খুবই কম হয়ে থাকে। বার্ষিক গড় তাপমাত্রা সাধারণত ২২° সেলসিয়াস থেকে ৩৪° সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়। এ অঞ্চলে বার্ষিক সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পার্থক্য খুবই কম। স্থলভাগে বার্ষিক সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পার্থক্য প্রায় ২৫° সেলসিয়াস এর কম হয়ে থাকে।

দৈনিক তাপমাত্রার অবস্থাঃ বার্ষিক সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পার্থক্য অপেক্ষা দৈনিক সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় পার্থক্য অনেক বেশি হয়ে থাকে। দৈনিক সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় পার্থক্য সাধারণত ৬.৭° সেলসিয়াস থেকে ১২.২° সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়ে থাকে।

বেলা দুপুরের পরে সর্বোচ্চ এবং শেষ রাতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দেখা যায়। কোনো কোনো সময় রাতের তাপমাত্রা ১৫° সেলসিয়াসে নেমে যায়। এ জন্য রাতকে নিরক্ষীয় অঞ্চলে শীতকাল বলে গণ্য করা হয়। মেঘবিহীন রাতে পৃথিবীর বিকিরণ খুব বেশি হয় বলে ভূপৃষ্ঠের নিকট কুয়াশা ও শিশির সৃষ্টি হয়। অপেক্ষাকৃত শুষ্ক ঋতুর মেঘমুক্ত রাতেই বায়ুর তাপমাত্রা প্রায় ১৫° সেলসিয়াসে নেমে যায়।

বায়ুর চাপ ও বায়ুপ্রবাহঃ অত্যধিক উত্তাপের জন্য এ অঞ্চলে একটি স্থায়ী নিম্নচাপ অঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে উপক্রান্তীয় উষ্ণ চাপবলয়গুলো হতে অয়ন বায়ু এ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয় এবং এ অঞ্চলে এসে অত্যন্ত উত্তপ্ত ও হালকা হয়ে উপরে উঠে যায়। সুতরাং, এ অঞ্চলে সর্বদা শান্তবলায় অবস্থান করে।

নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় সমুদ্রে শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়। ফলে দিনের প্রচণ্ড উত্তাপের সময় সমুদ্রের এ শীতল বায়ু সেখানকার মানুষের জীবনধারণাকে অপেক্ষাকৃত সহজ করে তোলে। সমুদ্রবায়ুর এ প্রভাব উপকূল থেকে দেশের অভ্যন্তরে প্রায় ৪৫ থেকে ৯০ কিলোমিটার পর্যন্ত অনুভূত হয়।

বৃষ্টিপাত ঃ নিরক্ষীয় অঞ্চলে স্থলভাগ অপেক্ষা জলভাগ অধিক হওয়ায় এবং প্রচণ্ড উত্তাপ থাকায় সারা দিনই সূর্যের উত্তাপে জল বাষ্পীভূত হয়ে ঊর্ধ্বে উঠতে থাকে এবং ঊর্ধ্বে প্রসারিত ও শীতল হয়ে অপরাহ্নে পরিচলন প্রক্রিয়ায় ব্যাপকভাবে বৃষ্টিপাত ঘটায়।

পরিচলন প্রক্রিয়ার প্রভাবে নিরক্ষীয় অঞ্চলে সর্বদা স্তূপ বা পুঞ্জ মেঘের সঞ্চার হয় ও শেষ রাতে এবং সকালের দিকে মেঘের আবরণ কম থাকে।

প্রশ্ন ▶ ২০ 'ক' দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি দেশ, যার দক্ষিণে একটি উপসাগর আছে। এই দেশের মাঝখান দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা চলে গেছে। ফলে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে এই দেশে সূর্য রশ্মির সর্বাধিক প্রাপ্তি ঘটে। যা দেশটির বৃষ্টিপাত সংঘটনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। ◀ *শিখনফল: ৩ [হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা]*

ক. জলবায়ু কাকে বলে? ১

খ. গ্রিন হাউস গ্যাস বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের 'ক' দেশের বৃষ্টিপাত সূর্যরশ্মির সর্বাধিক প্রাপ্তির সময় কীভাবে সংঘটিত হয় তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত দেশের জলবায়ুর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো একটি অঞ্চলের ৩০ থেকে ৪০ বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থাকে জলবায়ু বলে।

খ মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ যেমন– কাঠ কয়লা পোড়ানো, গাছ কাটা, কলকারখানার ধোঁয়া ইত্যাদি কারণে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2), মিথেন (CH_4) ইত্যাদির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এ গুলোকে গ্রিন হাউস গ্যাস বলা হয়।

গ উদ্দীপকের 'ক' দেশটি বাংলাদেশ। এদেশে সূর্যরশ্মির সর্বাধিক প্রাপ্তির সময় গ্রীষ্মকাল। এ সময় কর্কটক্রান্তির উপর সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়। ফলে এ ঋতুতে তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। গ্রীষ্মকালে এদেশে কালবৈশাখী ঝড় হয়ে থাকে।
বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালে সমুদ্র উপকূল থেকে দেশের অভ্যন্তরভাগে তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন এদেশের দক্ষিণ দিক থেকে আগত উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু অধিক উত্তাপের প্রভাবে হালকা হয়ে ওপরে উঠে যায়। উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আগত শীতল ও শুষ্ক বায়ুর সাথে এ বায়ুর সংঘর্ষের কারণে বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়। যা কালবৈশাখী ঝড় নামে পরিচিত।

ঘ উদ্দীপকের আলোচিত দেশটি বাংলাদেশ। উষ্ণ ও আর্দ্র গ্রীষ্মকাল এবং শুষ্ক শীতকাল বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য।
বাংলাদেশের জলবায়ুকে মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত ও বার্ষিক তাপমাত্রার ভিত্তিতে তিনটি ঋতুতে ভাগ করা হয়েছে। যেমন– গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত।
গ্রীষ্মকাল: এ সময় সূর্য কর্কটক্রান্তির উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়ায় তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময় সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ৩৮° ও ২১° সেলসিয়াস। কালবৈশাখী ঝড় গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ সময় গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৫১ সেন্টিমিটার।
বর্ষাকাল: এ ঋতুতে সূর্য বাংলাদেশে প্রায় লম্বভাবে কিরণ দেয়। ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। এ সময় গড় তাপমাত্রা ২৭° সেলসিয়াস হয়ে থাকে। এ ঋতুতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বর্ষাকালে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ১১৯° সে.মি.।
শীতকাল: এ ঋতুতে তাপমাত্রা সবচেয়ে কম থাকে। এ সময় সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ২৯° ও ১১° সেলসিয়াস। এ ঋতুতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০ সেন্টিমিটারের অধিক হয় না।

প্রশ্ন ▶ ২১ 'ক' দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি দেশ, যার দক্ষিণে একটি উপসাগর আছে। এই দেশের মাঝখান দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা চলে গেছে। ফলে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে এই দেশে সূর্য রশ্মির সর্বাধিক প্রাপ্তি ঘটে। যা দেশটির বৃষ্টিপাত সংঘটনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। ◀ *শিখনফল: ৩*

ক. জলবায়ু কাকে বলে? ১
খ. গ্রিন হাউস গ্যাস বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের 'ক' দেশের বৃষ্টিপাত সূর্যরশ্মির সর্বাধিক প্রাপ্তির সময় কীভাবে সংঘটিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত দেশের জলবায়ুর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো একটি অঞ্চলের ৩০ থেকে ৪০ বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থাকে জলবায়ু বলে।

খ মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ যেমন– কাঠ কয়লা পোড়ানো, গাছ কাটা, কলকারখানার ধোঁয়া ইত্যাদি কারণে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2), মিথেন (CH_4) ইত্যাদির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এ গুলোকে গ্রিন হাউস গ্যাস বলা হয়।

গ উদ্দীপকের 'ক' দেশটি বাংলাদেশ। এদেশে সূর্যরশ্মির সর্বাধিক প্রাপ্তির সময় গ্রীষ্মকাল। এ সময় কর্কটক্রান্তির উপর সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়। ফলে এ ঋতুতে তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। গ্রীষ্মকালে এদেশে কালবৈশাখী ঝড় হয়ে থাকে।
বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালে সমুদ্র উপকূল থেকে দেশের অভ্যন্তরভাগে তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন এদেশের দক্ষিণ দিক থেকে আগত উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু অধিক উত্তাপের প্রভাবে হালকা হয়ে ওপরে উঠে যায়। উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আগত শীতল ও শুষ্ক বায়ুর সাথে এ বায়ুর সংঘর্ষের কারণে বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়। যা কালবৈশাখী ঝড় নামে পরিচিত।

ঘ উদ্দীপকের আলোচিত দেশটি বাংলাদেশ। উষ্ণ ও আর্দ্র গ্রীষ্মকাল এবং শুষ্ক শীতকাল বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য।
বাংলাদেশের জলবায়ুকে মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত ও বার্ষিক তাপমাত্রার ভিত্তিতে তিনটি ঋতুতে ভাগ করা হয়েছে। যেমন– গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত।
গ্রীষ্মকাল: এ সময় সূর্য কর্কটক্রান্তির উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়ায় তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময় সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ৩৮° ও ২১° সেলসিয়াস। কালবৈশাখী ঝড় গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ সময় গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৫১ সেন্টিমিটার।
বর্ষাকাল: এ ঋতুতে সূর্য বাংলাদেশে প্রায় লম্বভাবে কিরণ দেয়। ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। এ সময় গড় তাপমাত্রা ২৭° সেলসিয়াস হয়ে থাকে। এ ঋতুতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বর্ষাকালে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ১১৯° সে.মি.।
শীতকাল: এ ঋতুতে তাপমাত্রা সবচেয়ে কম থাকে। এ সময় সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ২৯° ও ১১° সেলসিয়াস। এ ঋতুতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০ সেন্টিমিটারের অধিক হয় না।

প্রশ্ন ▶ ২২ বাংলাদেশের জলবায়ুতে মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত ও বার্ষিক তাপমাত্রার ভিত্তিতে তিনটি ঋতু সুস্পষ্ট। যথা- গ্রীষ্মকাল, বর্ষাকাল ও শীতকাল।

◀ *শিখনফল: ৩ [অধ্যাপক মো: আবদুল কুদ্দুস; অনু-২]*

ক. বাংলাদেশের জলবায়ুকে ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু বলা হয় কেন? ১
খ. আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালে কালবৈশাখী ঝড় হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের মতে শীতকাল-বর্ষাকালের মতো নয়— এ বিষয়ে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করো। ৩
ঘ. মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাবে এ দেশের বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়। যুক্তি দেখাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করায় এবং মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাবজনিত কারণে বাংলাদেশের জলবায়ুকে ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু বলা হয়।

খ গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশে কালবৈশাখী ঝড় সংঘটিত হয়। গ্রীষ্মকালের শুরুতে সমুদ্র হতে উষ্ণ ও আর্দ্র দক্ষিণা-পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম দিক হতে উষ্ণ ও শুষ্ক বায়ু বাংলাদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। ফলে উভয় বায়ুর সংঘর্ষে বজ্র বিদ্যুৎসহ ঝড় ও বৃষ্টি হয়ে থাকে যা কালবৈশাখি নামে পরিচিত।

গ বাংলাদেশে জুন থেকে অক্টোবর মাস (জ্যৈষ্ঠ-কার্তিক) পর্যন্ত বর্ষাকাল। অর্থাৎ গ্রীষ্ম ও শীতের মাঝামাঝি বৃষ্টিবহুল সময়কে বর্ষাকাল বা বর্ষা ঋতু বলে। জুন মাসের প্রথমদিকে মৌসুমি বায়ুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ষাকাল শুরু হয়ে যায়।

বর্ষাকালে সূর্য বাংলাদেশে প্রায় লম্বভাবে কিরণ দেয়। ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় (গড় তাপমাত্রা ২৭° সেলসিয়াস)। বর্ষাকালে ওপর দিয়ে প্রবাহিত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ভারত মহাসাগরের ওপর দিয়ে আসে বলে জলীয়বাষ্প সমৃদ্ধ থাকে। এ জলীয়বাষ্প শৈলোৎক্ষেপ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। বছরের মোট বৃষ্টিপাতের প্রায় ৮০ ভাগ এ সময়ে হয়।

সাধারণত এ দেশে নভেম্বরের শেষ থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত সময় শীতকাল। এ সময় তাপমাত্রা সবচেয়ে কম থাকে। এ সময় সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৯° এবং ১১° সেলসিয়াস। জানুয়ারি শীতলতম মাস এবং এ মাসের গড় তাপমাত্রা ১৭.৭° সেলসিয়াস। শীতকালে বাংলাদেশে বৃষ্টিপাত প্রায় হয় না বললেই চলে। শীতকালে সাধারণত উপকূলীয় ও পাহাড়ি এলাকায় সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এ সময়ে ১০ সেন্টিমিটারের অধিক নয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, শীতকাল ও বর্ষাকালের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুতরাং শীতকাল-বর্ষাকালের মতো নয়।

ঘ বাংলাদেশে মৌসুমি অঞ্চলে অবস্থিত বলে ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে বায়ু প্রবাহের গতি পথও পরিবর্তিত হয়।

মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। গ্রীষ্মকালের শুরুতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সমুদ্র হতে উষ্ণ ও আর্দ্র এবং উত্তর-পশ্চিম দিক হতে শীতল ও শুষ্ক বায়ু বাংলাদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। ফলে উভয় বায়ুর সংঘর্ষে প্রায়ই বজ্র বিদ্যুৎসহ ঝড় ও বৃষ্টি হয়ে থাকে।

আবার, বর্ষাকালে দক্ষিণ-পশ্চিমের মৌসুমি বায়ু জলকণা নিয়ে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের এ বৈচিত্র্যময়তার কারণে বাংলাদেশে বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ২৩ নিচে ময়মনসিংহ জেলায় গড় মাসিক ও বার্ষিক বৃষ্টিপাত দেওয়া হলো–

মাস	জানু.	ফেব্রু.	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে.	অক্টো.	নভে.	ডিসে.	বার্ষিক
বৃষ্টিপাত (সে.মি.)	১.৬	৪.০	৮.৬	১৫.২	৩৫.২	৩৫.৯	৩৯.১	৩২.৮	২৫.৭	১৫.৪	১.৯	০.৮	২১৭.৮

◀ *শিখনফল: ৪*

ক. বায়ু সমুদ্রপৃষ্ঠে প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে কত কিলোগ্রাম চাপ প্রয়োগ করে? ১

খ. সমমান রেখা আঁকার সময় স্থানবিন্দুর অবস্থান কীভাবে নির্ণয় করবে? ২

গ. উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে রেখাচিত্র অঙ্কন করো। ৩

ঘ. ছকের তথ্য বিশ্লেষণ করে ময়মনসিংহ জেলার বৃষ্টিপাত সম্পর্কে মতামত দাও। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বায়ু সমুদ্রপৃষ্ঠে প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে ১.০৩ কিলোগ্রাম চাপ প্রয়োগ করে।

খ সমমান রেখায় স্থানবিন্দুগুলোর অবস্থান ও তাদের মান জরিপ করে নির্ণয় করা হয়। এ ছাড়া মানচিত্র থেকেও স্থানবিন্দুর অবস্থান এবং মান হিসাব করে পাওয়া যায়। যেমন– ভূবৈচিত্র্যসূচক মানচিত্র (topographical map) থেকে আপেক্ষিক উচ্চতা হিসাব করতে হয় এবং মধ্যবর্তী অবস্থানে হিসাব করে মান বসাতে হয়।

গ উদ্দীপকে ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন মাসের বৃষ্টিপাতের তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে রেখাচিত্র অঙ্কন করা হলো:

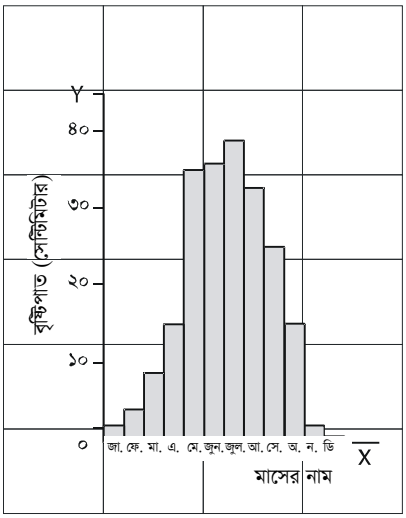

চিত্র : বৃষ্টিপাত সূচক রেখাচিত্র

ঘ উদ্দীপকের ছকে ময়মনসিংহ জেলার মাসিক ও বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দেখানো হয়েছে।

ময়মনসিংহ বাংলাদেশের একটি অঞ্চল। সুতরাং অঞ্চলটি ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাবাধীন। এর বৃষ্টিপাতের ধরন ও বছরের বিভিন্ন সময়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ তাই নির্দেশ করে।

উক্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ময়মনসিংহ জেলার গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২১৭.৮ সে.মি.। মোট বার্ষিক বৃষ্টিপাতের অধিকাংশই গ্রীষ্মকালে অর্থাৎ এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে হয়। বাকি বৃষ্টিপাত অবশিষ্ট ৬ মাস অর্থাৎ অক্টোবর থেকে মার্চ মাসের মধ্যে হয়। এখানকার আর্দ্রতম মাস জুলাই। এ মাসে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩৯.১ সে.মি.। শুষ্কতম মাস ডিসেম্বর। এ মাসে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ০.৮ সে.মি.।

সুতরাং ময়মনসিংহ অঞ্চলে আমরা মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাবান্বিত গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালীন বৃষ্টিপাত দেখতে পাই।

প্রশ্ন ▶ ২৪

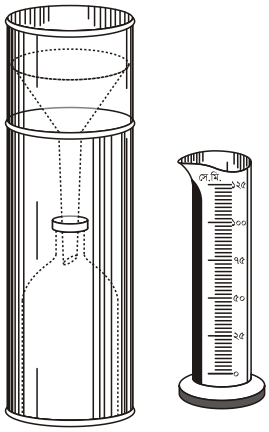

◀ শিখনফল: ৫

ক. বাষ্পীভবন কাকে বলে? ১

খ. কীভাবে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়? ২

গ. বৃষ্টি মাপার জন্য চিত্রের যন্ত্রটি কিভাবে বসাতে হবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. যন্ত্রটি দ্বারা বৃষ্টি মাপার প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে প্রক্রিয়ায় তরল পদার্থ গ্যাসীয় পদার্থে বা বাষ্পে রূপান্তরিত হয় তাকে বাষ্পীভবন বলে।

খ বৃষ্টিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। একটি ১২.৫ সে.মি. ব্যাস যুক্ত ফানেল, ১২.৫ সে.মি. ব্যাস যুক্ত একটি বেলনাকার পাত্রের ভিতরে এমনভাবে বসানো হয় যাতে বৃষ্টির পানি ফানেলের মধ্য দিয়ে এক বিন্দুও নষ্ট না হয়ে বেলনাকার পাত্রের ভিতরে রক্ষিত বোতলের মধ্যে গিয়ে জমা হয়। নির্দিষ্ট সময় পরে বোতলটিতে যে পরিমাণ পানি সঞ্চিত হয় তা একটি দাগ কাটা কাচের পরিমাপক পাত্রে ঢেলে মাপা হয়। এভাবেই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

গ চিত্রের যন্ত্রটি বৃষ্টিমাপক যন্ত্র।

যে যন্ত্রের সাহায্যে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাপা হয় তাকে বৃষ্টিমাপক যন্ত্র বলে। চিত্রে এ ধরনের একটি বৃষ্টিমাপক যন্ত্র বা রেইন গেজ দেখা যাচ্ছে।

বৃষ্টিমাপক যন্ত্রকে সমতল ভূমিতে ফাঁকা জায়গায় বসাতে হয়। যন্ত্রটির নিকটে কোনো বৃক্ষ, ঘর-বাড়ি বা অন্য কোনো কিছু থাকা ঠিক হবে না। বৃক্ষ বা কোনো ঘরবাড়ি বা অন্য যেকোনো কিছু থাকলে পাত্রে স্বাভাবিকভাবে বৃষ্টির পানি জমতে পারে না। ফানেলের মুখে বৃষ্টির পানি ব্যতীত অন্য কোনো পানি যাতে প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে এবং তার জন্য দরকার হলে ভূমি হতে ফানেলের মুখটি বেশ উঁচুতে স্থাপন করতে হবে। সাধারণত ভূমিতে গর্ত করে পাকা গাঁথুনি করে বৃষ্টিমাপক যন্ত্রটি বসানো হয়ে থাকে।

ঘ বৃষ্টিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে বৃষ্টিমাপার প্রক্রিয়াটি একটি সহজ পদ্ধতি।

বৃষ্টিমাপক যন্ত্রে ১২.৫ সেন্টিমিটার ব্যাসযুক্ত একটি বেলনাকার পাত্রের মুখে ১২.৫ সেন্টিমিটার ব্যাসযুক্ত একটি ফানেল বসাতে হবে। ফানেলটি বেলনাকার পাত্রের ভিতরে এমনভাবে বসাতে হবে যেন বৃষ্টির পানি ফানেলের মধ্য দিয়ে এক বিন্দুও নষ্ট না হয়ে বেলনাকার পাত্রের ভিতরে রক্ষিত বোতলের মধ্যে গিয়ে জমা হয়। নির্দিষ্ট সময় পরে দেখা যায় বোতলটিতে কিছু পানি সঞ্চিত হয়েছে।

এরপর অতি সাবধানে ফানেলটি উঠিয়ে ভিতরের বোতলটি বের করতে হবে। তারপর দাগ কাটা পরিমাপক পাত্রটি একটি বেসিনের ভিতর রেখে বোতলের পানি আস্তে আস্তে তার মধ্যে ঢালতে হবে যাতে এক বিন্দু পানিও নষ্ট না হয়। এ ছাড়া পরিমাপক পাত্রটি প্রথমেই পরিষ্কার করে নিতে হবে। কারণ অপরিষ্কার থাকলে তার গায়ে দুই এক বিন্দু পানি লেগে থাকতে পারে এবং মাপে ভুল হতে পারে। পরিমাপক যন্ত্রে পানি ঢালার পর তা বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী দিয়ে খাড়াভাবে ধরে খাঁজ বরাবর রেখে পাঠ নিতে হবে। বৃষ্টি মাপতে যাতে ভুল না হয় সে জন্য একবার বৃষ্টি মাপার পর ঐ পানি ফেলে না দিয়ে যত্ন করে রেখে দিতে হবে এবং প্রয়োজন হলে তা পুনরায় মেপে ভুল সংশোধন করতে হবে।

সুতরাং আলোচনা হতে বলা যায় যে, উপরিউক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে বৃষ্টি মাপক যন্ত্র দ্বারা বৃষ্টি মাপা হয়।

প্রশ্ন ▶ ২৫

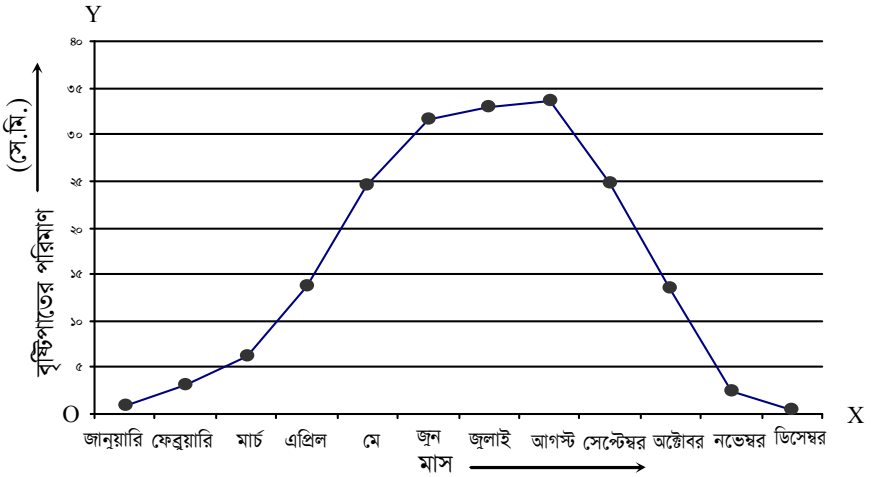

◀ *শিখনফল: ৬*

ক. সমবর্ষণ রেখা কাকে বলে? ১

খ. বর্ষাকালে বাংলাদেশে অধিক বৃষ্টিপাত হয় কেন? ২

গ. রেখাচিত্রটি অনুযায়ী বাংলাদেশের বৃষ্টিপাত ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রেখাচিত্রটির অঙ্কন পদ্ধতিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কাছাকাছি কয়েকটি এলাকায় যখন একই পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয় তখন তা যে রেখা দ্বারা যুক্ত করা হয় তাকে সমবর্ষণ রেখা বলে।

খ বর্ষাকালে বাংলাদেশের উপর দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয়। জলীয়বাষ্পপূর্ণ এ বায়ু বর্ষাকালে বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়।

ভারত মহাসাগরের উপর দিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বলে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুতে প্রচুর জলীয়বাষ্প থাকে। এ সময় বাংলাদেশের অভ্যন্তরভাগের নদীনালায় সর্বত্র পানি থাকে। অধিক তাপে এ পানিও বাষ্পে পরিণত হয়ে জলীয়বাষ্পপূর্ণ মৌসুমি বায়ুর সাথে মিলিত হয়। ফলে প্রায় প্রতিদিন বৃষ্টিপাত হয়। এজন্য বর্ষাকালে বাংলাদেশে অধিক বৃষ্টিপাত হয়।

গ উদ্দীপকের রেখাচিত্রের X ও Y অক্ষে যথাক্রমে মাস এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দেখানো হয়েছে।

X অক্ষে নভেম্বর হতে ফেব্রুয়ারি এই চার মাস শীতকাল থাকায় মান অনুযায়ী চিহ্নিত বিন্দুগুলো নিচের দিকে রয়েছে। কারণ শীতকালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম। মার্চ থেকে মে পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল থাকায় বর্ষাকালের তুলনায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম এবং শীতকালের তুলনায় বেশি। যার ফলে মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসের ওপর চিহ্নিত বিন্দুগুলো মান অনুযায়ী পাশাপাশি উচ্চতায় দেখা যাচ্ছে। জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বর্ষাকাল হওয়ায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অন্য মাসগুলো অপেক্ষা বেশি থাকায় মান অনুযায়ী বিন্দুগুলোও উপরের দিকে। আবার, আগস্ট মাসের উপর চিহ্নিত বিন্দুটি সবার উপরে থাকায় সহজেই বোঝা যাচ্ছে আগস্ট মাসে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি (প্রায় ৩৪ সে.মি.)। পক্ষান্তরে, ডিসেম্বর মাসের ওপর চিহ্নিত বিন্দু সবার নিচে হওয়ায় এ মাসে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সবচেয়ে কম (প্রায় ০.৫ সে.মি.)।

ঘ বৃষ্টিপাতের রেখাচিত্র অঙ্কনে সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হলো সরলরৈখিক পদ্ধতি। উদ্দীপকে এ ধরনের রেখাচিত্রই অঙ্কিত হয়েছে। নিচে রেখাচিত্রটির অঙ্কন পদ্ধতি বিশ্লেষণ করা হলো–

প্রথমে বৃষ্টিপাতের উপাত্ত (Data) ব্যবহার করে রেখাচিত্র অঙ্কন করার জন্য কোন একটি মাসের প্রতিদিনের বৃষ্টিপাত বা বছরের প্রতি মাসের গড় বৃষ্টিপাতের উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয়। এরপর একটি গ্রাফ পেপারে বা সাদা কাগজের উপর স্কেল দিয়ে দাগ টেনে 'X' অক্ষ বরাবর দিন বা মাস এবং 'Y' অক্ষ বরাবর বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দেখাতে হয়।

এরপর 'X' ও 'Y' অক্ষের মূলবিন্দু (o) থেকে শুরু করে বৃষ্টিপাতের উপাত্ত অনুযায়ী মানগুলোকে গ্রাফ বা সাদা কাগজের উপর বিন্দু দিয়ে স্থাপন করতে হয়। তারপর বিন্দুগুলোকে দাগ টেনে একত্রে মিলিত করা হয়। এর ফলে একটি রেখা পাওয়া যায়। এটিই বৃষ্টিপাতের রেখাচিত্র।

এই রেখাচিত্র থেকে সহজে বোঝা যায় যে, কোন দিন বা কোন মাসে কী পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়েছে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম হলে রেখাটি নিচে নামবে এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি হলে রেখাটি উপরে উঠবে। আবার কোনো দিন বা কোনো মাসে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সমান হলে রেখাচিত্রটিও সাম্যবস্থায় থাকবে। এভাবেই বৃষ্টিপাতের রেখাচিত্র অঙ্কন করা হয়।

প্রশ্ন ▶ ২৬

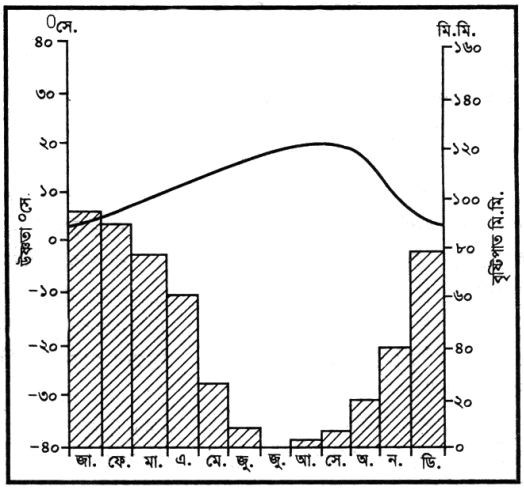

◀ *শিখনফল: ৬ [প্রফেসর মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী; অনু-৩]*

ক. নিরক্ষীয় জলবায়ু কাকে বলে? ১

খ. ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে মনোরম পরিবেশ বিরাজ করে– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. চিত্রটি পর্যবেক্ষণ করে বৃষ্টিপাত ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. চিত্রের আলোকে স্থানটি কোন গোলার্ধে অবস্থিত এবং কোন জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত? ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিরক্ষরেখার উভয় পার্শ্বে ৫° থেকে ১০° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে যে জলবায়ু পরিলক্ষিত হয় তাকে নিরক্ষীয় জলবায়ু বলে।

খ ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে শীতকালে বৃষ্টিপাত হলেও আকাশ একেবারে মেঘাচ্ছন্ন থাকে না এবং বায়ুও আর্দ্র স্যাঁৎসেতে থাকে না। বর্ষণ দিনগুলো দীর্ঘ শুষ্ককাল দ্বারা বিচ্ছিন্ন থাকে। ফলে বছরের অধিকাংশ দিন আকাশ মেঘমুক্ত থাকে এবং উজ্জ্বল সূর্যকিরণ পাওয়া যায়। তাই রৌদ্রকরোজ্জ্বল আবহাওয়া ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ সারা বছরই এখানে মনোরোম পরিবেশ বিরাজ করে।

গ উদ্দীপকে চিত্রটিতে স্তম্ভ রেখা চিত্রের মাধ্যমে বৃষ্টিপাত দেখানো হয়েছে।

মাসভিত্তিক বৃষ্টিপাত দেখানোর একটি সহজ পদ্ধতি হলো স্তম্ভ লেখচিত্র। এভাবে বৃষ্টিপাত দেখানো হলে খুব সহজেই শুষ্ক এবং আর্দ্র মাসগুলোকে চিহ্নিত করে ঋতুভিত্তিক আবহাওয়া ও জলবায়ু ব্যাখ্যা করা যায়।

চিত্রের স্তম্ভ লেখচিত্র হতে দেখা যায় যে, ডিসেম্বর হতে এপ্রিল মাস পর্যন্ত বৃষ্টিবহুল। এ সময়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। চিত্র হতে দেখা যায়, ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল মাসে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যথাক্রমে প্রায় ৮০, ৮৫, ৮২, ৭৮ এবং ৬০ মি.মি.। অর্থাৎ ডিসেম্বর হতে এপ্রিল পর্যন্ত মাসগুলোর গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ৭৫ মি.মি.। অন্যদিকে মে মাস থেকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমতে থাকে এবং জুলাই মাসে বৃষ্টিপাত একেবারেই হয় না অর্থাৎ জুলাই মাস বৃষ্টিহীন। পরবর্তীতে অগাস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বৃষ্টিপাত ১০ মি. মি. এর কম পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং বলা যায় যে, ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল বৃষ্টিবহুল মাস, জুলাই মাস বৃষ্টিহীন এবং মে, জুন, অগাস্ট, সেপ্টেম্বর, আক্টোবরে বৃষ্টিপাত খুবই কম হয়ে থাকে।

ঘ চিত্রের স্থানটি উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত এবং এটি ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত।

উত্তর গোলার্ধে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য হলো বৃষ্টিবহুল শীতকাল এবং বৃষ্টিহীন গ্রীষ্মকাল। শীত-গ্রীষ্ম ও দিন-রাত্রির তাপমাত্রার ব্যাপক পার্থক্য এবং মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশ এ জলবায়ু অঞ্চলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

উত্তর গোলার্ধে ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত শীতকাল এবং অন্যান্য সময় উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল বিরাজ করে। স্তম্ভ লেখচিত্র হতে দেখা যাচ্ছে যে, ডিসেম্বর হতে এপ্রিল পর্যন্ত বৃষ্টিপাত অনেক বেশি এবং গড়ে প্রায় ৭৫ মি.মি. পর্যন্ত হয়ে থাকে। অন্যদিকে ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত এ অঞ্চলের তাপমাত্রা ৪-১০ ডিগ্রি সে.; যা শীতকালকে নির্দেশ করে। আবার মে মাস থেকে তাপমাত্রার পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। এ সময়ে তাপমাত্রা প্রায় গড়ে ২১° থেকে ২৭° সেলসিয়াস হলেও কোন কোন স্থানে তা আরো বৃদ্ধি পায়।

অন্যদিকে এ অঞ্চলে এই সময়গুলোতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই কম, যা উত্তর গোলার্ধের ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু নির্দেশ করে।
সুতরাং আলোচনা হতে বলা যায় যে, উত্তর গোলার্ধের ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে আর্দ্র পশ্চিমা বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় এ অঞ্চল শীতকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত কম থাকলেও গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা বেশি থাকে। এ অঞ্চলে শীত গ্রীষ্মে তাপমাত্রার পার্থক্য বেশি থাকে। উদ্দীপকের লেখচিত্রে তা স্পষ্ট পরিস্ফুট।

প্রশ্ন ▶ ২৭ নরওয়ের ছাত্র স্টিফেন, বাংলাদেশের ছাত্র 'রবি' ও ফ্রান্সের ছাত্র 'ইয়ন' উচ্চশিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছে। তারা বিমানবন্দরে নামার পর এক ভদ্রলোক বললেন, "আপনাদের তিনজনের মধ্যে একজনের বাড়ি নিশ্চয়ই ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলে?" *◀ শিখনফল-৬ [ড. সৈয়দ শাহজাহান আহমেদ; অনু-৯]*

ক. নিরীক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান লেখ। ১
খ. নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চল কাঠশিল্পে অনুন্নত কেন? ২
গ. উদ্দীপকের ভদ্রলোক যাকে ইঙ্গিত করে কথাটি বলেছেন তার দেশের শীতকালীন তাপমাত্রার সচিত্র বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. ভদ্রলোকের ইঙ্গিতকৃত ছাত্রটি যে দেশের নাগরিক সে দেশের গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টিপাতের উপর একটি বিশ্লেষণধর্মী টীকা লেখ। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিরক্ষরেখার উভয় পাশে ৫°-১০° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে এ জলবায়ু পরিলক্ষিত হয়।

খ নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলে সেগুন, মেহগনি, রোজউড, চন্দন প্রভৃতি অতিমূল্যবান বৃক্ষ জন্ম নিলেও বাণিজ্যিক হারে এসব কাঠের ব্যবহার এখন পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়নি। কারণ এসব অঞ্চলে বরফ পড়ে না বলে শীতপ্রধান অঞ্চরের মতো পিচ্ছিল বরফের উপর দিয়ে কাঠ বহন করার সুবিধা নেই। বৃষ্টিবহুল এলাকা বলে মাটি সর্বদা নরম ও ভেজা থাকায় যানবাহন চলাচল তথা পরিবহনেও অসুবিধা হয়। এ অঞ্চলে অনেক নদী আছে কিন্তু অধিংকাশ কাঠ পানি অপেক্ষা ভারী বলে পানিস্রোতে কাঠ বহন করার সুবিধা নেই। এ অঞ্চলের বনে এক জাতীয় বৃক্ষ জন্মে না, আবার বৃক্ষগুলোকে লতাপাতা ও পরগাছা থেকে মুক্ত করায়ও অসুবিধা। এসব কারণে নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চল কাঠশিল্পে অনুন্নত।

গ ভদ্রলোক রবিকে ইঙ্গিত করে কথাটি বলেছেন। রবি বাংলাদেশের নাগরিক। বাংলাদেশ ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এ দেশে শীতকালীন সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পরিমাণ যথাক্রমে ২৯° সেলসিয়াস ও ১১° সেলসিয়াস। জানুয়ারী মাস বাংলাদেশের শীতলতম মাস। এ মাসের গড় তাপমাত্রা প্রায় ১৭.৭°।

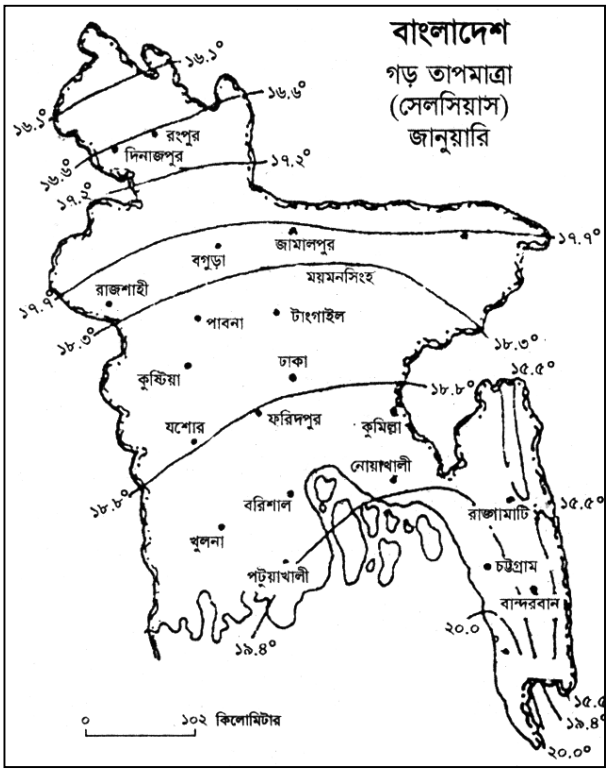

চিত্র: মানচিত্র সমতাপ রেখা (জানুয়ারি মাস)

এ সময় দক্ষিণে সমুদ্র তাপমাত্রা ক্রমশ কম হয়ে থাকে এবং সমতাপ রেখাগুলো অনেকটা সোজা হয়ে পূর্ব-পশ্চিমে অবস্থান করে। জানুয়ারী মাসের গড় তাপমাত্রা চট্টগ্রামে প্রায় ২০°, নোয়াখালীতে ২৯.৪°, ঢাকায় ১৮.৩°, বগুড়ায় ১৭.৭° এবং দিনাজপুরে ১৬.৬° সেলসিয়াস। তবে কোনো কোনো সময় উত্তরাঞ্চলে তাপমাত্রা আরও কম হয়ে থাকে।

ঘ ভদ্রলোকের ইঙ্গিতকৃত ছাত্রটি হলো বাংলাদেশের নাগরিক রবি। বাংলাদেশের গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টিপাত বিশ্লেষণ করে নিচে একটি টীকা লেখা হলো:

বাংলাদেশের গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টিপাত কালবৈশাখী থেকে সংঘটিত হয়। সাধারণত উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে এ ঝড়ের উৎপত্তি হয়। কালবৈশাখী নামে পরিচিত এ ঝড় মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত প্রায়ই সংঘটিত হয়। জুন মাসে মৌসুমি বায়ুর আগমনের সাথে সাথে এ ঝড় অন্তর্হিত হয়। দক্ষিণ দিক থেকে প্রবাহিত উষ্ণ জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু উত্তর-পশ্চিমে পৌঁছে উপরে উঠতে থাকে। এ বায়ুর ঠিক দিয়ে উত্তর-পশ্চিম বা পশ্চিম দিক থেকে শুষ্ক শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়। এর ফলে বিপরীতগামী বায়ুপ্রবাহের সন্ধিস্থলে বজ্রবিদ্যুৎসহ কালবৈশাখী ঝড় শুরু হয়। কালবৈশাখী ঝড় পূর্বাঞ্চলের সর্বাপেক্ষা বেশি সংঘটিত হয় এবং এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণও অধিক। মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত ৩৮ সেন্টিমিটার সমবর্ষণ রেখাটি উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশকে দুটি অঞ্চলে বিভক্ত করে। এ রেখার পূর্বে ৩৮ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। গ্রীষ্মকালীন মাসগুলোর মধ্যে মে মাস সর্বাপেক্ষা বৃষ্টিবহুল। গড়ে প্রতি তিন দিনে এক দিন বৃষ্টি হয়। বাংলাদেশে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের এক-পশ্চমাংশ বৃষ্টিপাত গ্রীষ্মকালেই হয়ে থাকে। গ্রীষ্মকালীন গড়

বৃষ্টিপাত ৫১ সেন্টিমিটার। অবশ্য কোনো কোনো বছর এর তারতম্য হয়ে থাকে। সিলেট জেলাতেই এ সময় সর্বাপেক্ষা বেশি বৃষ্টিপাত হয় এবং সেখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৭৫ সেন্টিমিটারের অধিক। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে এ সময় ৩৮ সেন্টিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। রাজশাহী অঞ্চলে বৃষ্টিপাত সবচেয়ে কম হয়, যা প্রায় ২৫ সেন্টিমিটারের মতো।

প্রশ্ন ▶ ২৮ পৃথিবীর জলবায়ু নিয়ে রাজু ও রাফির খুব আগ্রহ। একদিন রাজু রাফিকে বলল পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকেই এর পরিবেশে নানারূপ পরিবর্তন হয়েছে। কখনও একাধারে বৃষ্টিপাত হয়েছে বহুদিন, বরফে আবৃত হয়েছে পৃথিবীর বিরাট অংশ। আবার কখনও তাপমাত্রার পরিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে আন্তঃবরফ যুগের। রাফি বলল জলবায়ুর এ ধরনের পরিবর্তনে Orbital variation গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। *◀ শিখনফল: ৭*

ক. জলবায়ু কী? ১

খ. জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের ফলে কীভাবে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়? ২

গ. রাজু ও রাফির আলোচনার বিষয়টিতে রাফির বলা বিষয়টি কীভাবে ভূমিকা পালন করে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোচিত বিষয়টি সংঘটনে মনুষ্যসৃষ্ট কারণগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বায়ুর তাপ, চাপ, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত ইত্যাদির ৩০-৩৫ বছরের যে গড় অবস্থা দেখা যায় তাই জলবায়ু।

খ শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

কলকারখানা, যানবাহন, বাসগৃহ, অফিস-আদালত, মার্কেট, বন্দর প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন জীবাশ্ম জ্বালানি; যেমন– পেট্রোল, তেল, গ্যাস প্রভৃতির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এসব উৎস থেকে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়। এ ছাড়াও পারমাণবিক চুল্লি স্থাপনের ফলে বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থ বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয়। এভাবে জীবাশ্ম জ্বালানির অধিক ব্যবহার বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে।

গ রাজু ও রাফির আলোচনার বিষয়টি হলো জলবায়ুর পরিবর্তনশীলতা।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকেই কখনও একাধারে বৃষ্টিপাত হয়েছে আবার কখনও তাপমাত্রা পরিবর্তনে সূচিত হয়েছে আন্তঃবরফ যুগের। আর এ জলবায়ুর পরিবর্তনশীলতায় রাফির বলা বিষয়টি Orbital variation অর্থাৎ কক্ষপথের পরিবর্তনশীলতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পৃথিবীর কক্ষপথের সামান্য পরিবর্তন বিভিন্ন ঋতুতে সূর্যালোকের তারতম্য ঘটায়। স্থানিক গড় সূর্যকিরণ ও বার্ষিক গড় সূর্যকিরণের মধ্যে সামান্য পরিবর্তন থাকলেও ভৌগোলিক ও ঋতুগত বণ্টনে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

পৃথিবীর কক্ষপথের তিন ধরনের পরিবর্তনশীলতা শনাক্ত করা যায়-

১. পৃথিবীর উৎকেন্দ্রিকতার পরিবর্তনশীলতা
২. আবর্তনকালীন পৃথিবীর অক্ষের তির্যক কোণ
৩. পৃথিবীর অক্ষের পূর্বগামীতা

এ নিয়ামকগুলো একত্রে মিলাঙ্কোভিচ চক্র (Milankovitch cycle of Glaciation) সৃষ্টি করে যা জলবায়ুর উপরে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া ফেলে থাকে। বরফ যুগে ও আন্তঃবরফ যুগে এই চক্রের কার্যকর ভূমিকা উল্লেখ করার মতো। সাহারা মরুভূমির অগ্রগমন ও পশ্চাদপসরণের ক্ষেত্রেও এই চক্রের ভূমিকা ছিল।

সুতরাং বলা যায়, orbital variation বা কক্ষপথের পরিবর্তনশীলতা জলবায়ুর পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ঘ রাজু ও রাফির আলোচিত বিষয়টি হলো জলবায়ুর পরিবর্তনশীলতা।

জলবায়ুর পরিবর্তনশীলতায় মানুষের হস্তক্ষেপ বেশিদিনের কথা নয়। বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক যুগে প্রাকৃতিক নিয়মচক্রেই জলবায়ু পরিবর্তন হয়েছে। মানুষ তাতে সাড়া দিয়েছে মাত্র। তবে ঊনিশ শতকের সূচনালগ্ন এবং শিল্প বিপ্লবের পর থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, কলকারখানা, যানবাহন, দৈনন্দিন কাজে ব্যাপকহারে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে পৃথিবী ক্রমাগত উষ্ণতর হচ্ছে। আর বিশ্ব উষ্ণায়নের অবশ্যম্ভাবী প্রভাব জলবায়ু পরিবর্তন।

নির্বিচারে বন উজাড় করা, ভূমি ও জলাভূমি পরিবর্তন, কৃষিকাজে অনিয়ন্ত্রিত সার ব্যবহার, জৈবিক পচনের ফলে মিথেনের নির্গমন, শহরাঞ্চলে বর্জ্য এবং আবর্জনা থেকে নির্গত অনিয়ন্ত্রিত মিথেন গ্যাস, কৃষিকাজের ফলে উৎপন্ন নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদি গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে। বিভিন্ন খনিতে বিশেষ করে কয়লা খনি থেকে উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস, প্রাকৃতিক গ্যাস খনি থেকে নির্গত মিথেন গ্যাস বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়েও গ্রিন হাউস গ্যাস বৃদ্ধি করছে। রেফ্রিজারেটর, ডিপফ্রিজ, বিভিন্ন ধরনের শিল্পকারখানায় ব্যবহৃত সিএফসি, ফ্রেয়ন ইত্যাদি গ্যাসের ব্যবহার গ্রিন হাউস গ্যাসরূপে নির্গত হচ্ছে। বায়ু দূষণজনিত কারণে মিথেন, জলীয়বাষ্প এবং ওজোন প্রভৃতি গ্যাসের ঘনত্ব বায়ুমণ্ডলে বৃদ্ধির ফলে জলবায়ু পরিবর্তন ত্বরান্বিত হয়েছে।

এভাবে দেখা যাচ্ছে, মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলে পৃথিবীতে গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে বিশ্ব উষ্ণায়ন ঘটছে এবং পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবীরূপে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটাচ্ছে।

প্রশ্ন ▶ ২৯ ২৮ আগস্ট, ২০০৫ আমেরিকার পূর্ব উপকূলের কাছে আটলান্টিক মহাসাগরে ঘূর্ণিঝড় ক্যাটরিনা ঘনীভূত ও কেন্দ্রীভূত হওয়ার সময় উপকূলীয় দ্বীপ ও দেশসমূহের সাগরের পানি ফুলে ওঠে এবং ঝড়ো বাতাসের সাথে বৃষ্টি শুরু হয়। ঘূর্ণিঝড়টি উপকূলে আঘাত করলে রাস্তাঘাট, জানমাল, শিল্প কারখানা তথা সমগ্র অঞ্চলের ক্ষয়ক্ষতি করে।

◀ শিখনফল: ৭ [অধ্যাপক মো: আবদুল কুদ্দুস; অনু-১]

ক. সুনামি কী? ১

খ. মেঘ সৃষ্টির প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সময়ে সংঘটিত বৃষ্টিপাত ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে আলোচিত গোলযোগটি মানবজীবনে কী প্রভাব ফেলে তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুনামি হলো বন্দরের ঢেউ।

খ বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বভাগ অপেক্ষাকৃত শীতল এবং সেখানে বায়ুর চাপ কম। এ কারণে বায়ু ঊর্ধ্বে উঠলে শীতল হয় এবং জলীয়বাষ্প, পানিকণা বা বরফকণায় পরিণত হয়। এ পানিকণা বা বরফ কণা হালকা বলে আকাশে ভাসমান ধূলিকণায় আশ্রয় নিয়ে ভেসে বেড়ায় এবং এভাবে মেঘ সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকে উল্লেখ হয়েছে আমেরিকার পূর্ব উপকূলের কাছে আটলান্টিক মহাসাগরে ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হয়। এ ঘূর্ণিঝড় থেকে অধিকাংশ সময় বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে।

আমেরিকার পূর্ব উপকূল ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর অন্তর্গত হওয়ায় এ অঞ্চলের ওপর দিয়ে শুষ্ক ঋতুতে অয়ন বায়ু এবং শীত ঋতুতে আর্দ্র প্রত্যয়ন বায়ু প্রবাহিত হয়। এখানে গ্রীষ্মকাল শুষ্ক এবং শীতকাল আর্দ্র থাকে। অয়ন বায়ু স্থলভাগের ওপর দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়। এটি যখন মহাদেশীয় স্থলভাগের পশ্চিমাংশে পৌঁছায় তখন জলীয়বাষ্পহীন হয়ে পড়ে। ফলে এ অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত হয় না। অপরদিকে শীতকালে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রত্যয়ন বায়ু প্রবাহিত হয়। এ বায়ু আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর দিয়ে আসে বলে প্রচুর জলীয়বাষ্প থাকে। ফলে এ অঞ্চলে শীতকালে ঘূর্ণিঝড় এবং বৃষ্টিপাত সঘটিত হয়।

ঘ উদ্দীপকে আলোচিত গোলযোগটি হলো ঘূর্ণিঝড়। ঘূর্ণিঝড় মানবজীবনের ওপর অনেক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে অনেক ঘরবাড়ি, স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মন্দির-প্যাগোডা, হাটবাজারের স্থায়ী ঘর, গাছপালা প্রভৃতি ভেঙে যায়। এছাড়া উপকূলীয় জলোচ্ছ্বাসের ফলে কাঁচাঘর, রাস্তা, কালভার্ট ভেঙে যায়। অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের অংশবিশেষ ভেঙে পড়ে। এ কারণে শিল্প প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন বন্ধ থাকলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। শিল্প প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের মুখে পড়ে। ব্যাপক ও মারাত্মক আকারের ঘূর্ণিঝড়ের ফলে গৃহ চাপা, গাছ চাপা বা জলোচ্ছ্বাসের প্রভাবে প্রতিবছর অনেক মানুষ ও পশুর প্রাণহানি হয়। উপকূল এলাকায় প্রায় জনশূন্যতার সৃষ্টি হলে অন্য এলাকা থেকে আসা অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়িতে চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়।

পরিবেশগত সমস্যার মধ্যে রয়েছে খাবার পানির অভাব, সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার, খাদ্য সংকট, জ্বালানি সংকট, দারিদ্র্য, অপুষ্টি প্রভৃতি। এছাড়া ঘূর্ণিঝড়ের সময় উপকূলীয় এলাকার সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ৩ থেকে ২০ কি.মি. পর্যাপ্ত এলাকা লবণাক্ত পানিতে প্লাবিত করে। ফলে মাটি লবণাক্ত হয়ে পড়ে এবং উৎপাদন ব্যাহত হয়।

প্রশ্ন ▶ ৩০ বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় প্রতিনিয়ত বিশ্বে উষ্ণায়ন বেড়ে যাচ্ছে। এর ফলে প্রায়ই প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে।

◀ পিখনফল: ৮ [ডা: আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর]

ক. বিশ্ব উষ্ণায়ন (Global warming) কাকে বলে? ১

খ. গ্রিন হাউজ প্রভাব বর্ণনা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়ের প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের কাজকর্মের ফলে পৃথিবীর (বায়ুমণ্ডলের) তাপমাত্রা অসহনীয় পর্যায়ে বেড়ে গেলে তাকে বিশ্ব উষ্ণায়ন বলে।

খ বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরোফ্লুরো কার্বন প্রভৃতি গ্রিন হাউস গ্যাসগুলোর তাপধারণ ক্ষমতা অনেক বেশি। এ গ্যাসগুলো বায়ুর তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। একে গ্রিন হাউস প্রভাব বলে।

গ উদ্দীপকে বলা হয়েছে, বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় উষ্ণায়ন বেড়ে যাচ্ছে। এর ফলে বিশ্বে প্রায়ই প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে। নিচে এর কারণসমূহ ব্যাখ্যা করা হলো–

শিল্পায়ন ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ইউরোপ মহাদেশে এবং পরবর্তীতে বিশ্বব্যাপী হাজার হাজার শিল্পকারখানা স্থাপিত হয়। এর ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এখনও তা অব্যাহত রয়েছে। কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্গত ছাই, সীসা, জিংক, রং ও প্লাস্টিক কারখানার ক্লোরোফ্লুরো কার্বন (CFC) প্রভৃতি বিষাক্ত গ্যাস বায়ুমণ্ডলকে অতিমাত্রায় উত্তপ্ত করে তোলছে।

নগরায়ণ ঃ পৃথিবীতে নগরায়ণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বড় বড় নগরে (বেইজিং, ঢাকা) লক্ষ লক্ষ মানুষের রান্নায় জ্বালানি ব্যবহার, ব্যবহৃত মটরযানের কালো ধোঁয়া, ময়লা, আবর্জনার পচা দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস প্রভৃতি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বিশ্ব উষ্ণায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা ঃ কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রাসায়নিক সার, কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এগুলো বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত গ্যাসের (SO_2) সৃষ্টি করে, যা বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে তোলে।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের লাভা ঃ অগ্ন্যুৎপাতের ফলে নির্গত ছাই, ভস্ম, গ্যাস প্রভৃতি বিশ্ব উষ্ণায়নে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করে থাকে।

জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার ঃ বিশ্বব্যাপী নগরায়ণ ও শিল্পায়নের সাথে সাথে জীবাশ্ম জ্বালানি; যেমন– পেট্রোল, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা প্রভৃতির ব্যবহার আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও পারমাণবিক চুল্লি, কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের মধ্য দিয়ে রাসায়নিক পদার্থ বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয়ে বিশ্ব উষ্ণায়নে ভূমিকা রাখছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি হলো বিশ্ব উষ্ণায়ন। নিচে এর প্রভাব ব্যাখ্যা করা হলো–

জলাবায়ু পরিবর্তন ঃ বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে বিশ্বের জলবায়ুতে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন দেশে ঋতুর সময়সীমায় পরিবর্তন হচ্ছে। যেমন– বাংলাদেশে বর্ষা আগেই শুরু হয়ে যাচ্ছে। ফলে তা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে (যেমন– কৃষিক্ষেত্রে) সরাসরি প্রভাব ফেলছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টি ঃ বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে পৃথিবীতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটনের হার বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড় সিডর বৈশ্বিক উষ্ণায়নের একটি প্রত্যক্ষ ফল।

মেরু অঞ্চলের বরফ গলন ঃ বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে বিংশ শতাব্দীতে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে ০.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এর মধ্যে বিগত ২৫ বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে ০.২ থেকে ০.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলতে শুরু করেছে।

সমুদ্রপৃষ্ঠের পরিবর্তন ঃ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রের উচ্চতা বাড়ছে। তাপমাত্রা বেড়ে সমুদ্র উষ্ণ হওয়ার ফলে পানির প্রসারণ এবং ভূমণ্ডলে সঞ্চিত বরফের ক্রমাগত গলে যাওয়া এর কারণ। ১৯৬১ সাল থেকে সমুদ্রের গড় উচ্চতা প্রতি বছর ১.৮ মিলিমিটার হারে এবং ১৯৯৩ সাল থেকে ৩.১ মিলিমিটার হারে বাড়ছে।

জীববৈচিত্র্য ধ্বংস ঃ বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে পৃথিবীতে বহু প্রজাতির উদ্ভিদ (বাংলাদেশ, ভারতের ভাটিকা) ও প্রাণী (চীনের পান্ডা) বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

রোগ-ব্যাধির বিস্তার ঃ বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে সমগ্র বিশ্বে ম্যালেরিয়া, অ্যাজমা, এলার্জি ও বিভিন্ন সংক্রামক রোগের বিস্তার ঘটছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে, বিশ্বে প্রতিবছর ১০ মিলিয়নের বেশি মানুষ ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে।

খাদ্য উৎপাদন হ্রাস ঃ বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে এবং অনাহার ও অপুষ্টি বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে আফ্রিকার দেশগুলোতে (যেমন– উগান্ডা)।

প্রশ্ন ▶ ৩১ অতিরিক্ত শীত বা বরফ পড়ার কারণে শীতপ্রধান দেশে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের জন্ম ও বিকাশ ব্যাহত হয়। এজন্য এসব দেশে সূর্যের আলো বা তাপ ধরে রেখে উদ্ভিদ ও শাক সবজি উৎপাদনের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা হয়। ◀ *শিখনফল: ৮*

ক. সর্বপ্রথম গ্রিন হাউস শব্দটি ব্যবহার করেন কে? ১

খ. বাংলাদেশে বর্ষাকালে পরিচলন প্রক্রিয়ায় বৃষ্টিপাত হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি তাপ বৃদ্ধিতে কী ভূমিকা রাখে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়ের প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিখ্যাত সুইডিস রসায়নবিদ সোভানটে আরহেনিয়াস সর্বপ্রথম গ্রিনহাউস শব্দটি ব্যবহার করেন।

খ অধিক সূর্যকিরণ ও তাপে পানি বাষ্পীভূত হয়ে বর্ষাকালে পরিচলন বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়।

বর্ষাকালে বাংলাদেশের উপর দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয়। ভারত মহাসাগরের উপর দিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বলে এতে প্রচুর জলীয়বাষ্প থাকে। এ সময় দেশের নদী নালা ও বিভিন্ন জলাশয় থেকে অধিক তাপে পানি বাষ্পে পরিণত হয়ে জলীয়বাষ্পপূর্ণ মৌসুমি বায়ুর সাথে মিলিত হয়। ফলে প্রায় প্রতিদিন পরিচলন প্রক্রিয়ায় বৃষ্টিপাত হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি হলো গ্রিন হাউস প্রভাব।

পৃথিবীতে সমস্ত তাপ ও শক্তির মূল উৎস সূর্যের আলো। সূর্যরশ্মি পৃথিবীতে আসে ক্ষুদ্র তরঙ্গের মাধ্যমে। ইনফ্রারেড রেডিয়েশনের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠ থেকে অতিরিক্ত তাপ মহাশূন্যে চলে যায়। বায়ুমণ্ডলে কিছু গ্যাস আছে ইনফ্রারেড রশ্মি বা অবলোহিত রশ্মি শোষণ করে। ফলে বিকিরিত তাপের সবটুকু মহাশূন্যে চলে যাবার বদলে একাংশ আবহাওয়ামণ্ডলে থেকে যায়। কতটা তাপ এভাবে থেকে যাবে তা নির্ভর করে কী পরিমাণ এই ধরনের গ্যাস বায়ুমণ্ডলে রয়েছে তার উপর। বায়ুমণ্ডলে এ ধরনের গ্যাসের পরিমাণ যত বাড়বে ততই বায়ুমণ্ডল তাপ আটকে রাখার মত একটি ঢাকনির সৃষ্টি হবে এবং তা গ্রিন হাউসের কাঁচের ঢাকনির মতো কাজ করে এবং পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সৃষ্টি করে গ্রিনহাউস প্রভাব।

সুতরাং বলা যায়, চিত্রের ঘরটি তাপ বৃদ্ধিতে এবং ধরে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ মানবজীবনে গ্রিন হাউসের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।

উক্ত ঘরের তথা গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়ার প্রভাব মানবজীবনের জন্য শুধু নেতিবাচকই নয় বরং ভূপৃষ্ঠের প্রাণিকুল এর প্রভাবে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

বিশ্বের আবহাওয়া ও তার ধরন দিন দিন বদলে যাচ্ছে। কোনো ঋতুতেই আমরা প্রকৃতির কাছ থেকে স্বাভাবিক আচরণ পাচ্ছি না। বৃষ্টির সময়ে অনাবৃষ্টি, খরার সময়ে বৃষ্টি, গরমের সময়ে উত্তরে হাওয়া, শীতের সময়ে তপ্ত হওয়া কেমন যেন এলোমেলো আবহাওয়া লক্ষ করা যায়।

বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুযায়ী, গ্রিনহাউস প্রভাব পৃথিবীর কয়েকটি দেশে যথা– কানাডা, রাশিয়া, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড, সুইডেন প্রভৃতি দেশগুলোর জন্য সাফল্য বয়ে আনবে। এ কারণে ঐসব অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ একক জমি বরফমুক্ত হয়ে চাষাবাদ ও বসবাসযোগ্য হয়ে উঠবে। অন্যদিকে দুর্ভোগ বাড়বে পৃথিবীর প্রায় ৪০ শতাংশ এলাকার দরিদ্র অধিবাসীদের। কারণ গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়ার ফলে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উপকূলীয় এলাকার এক বিরাট অংশ পানির নিচে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সমুদ্র উপকূলবর্তী পৃথিবীর বেশ কয়েকটি বিখ্যাত শহর হবে ব্যাপক আকারে ক্ষতিগ্রস্ত। পৃথিবীর উষ্ণায়নের ফলে একবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় বিশ্বের মোট জনসমষ্টির প্রায় ২০ শতাংশ অধিবাসীর সরাসরি ভাগ্য বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠ ফুলে উঠলে আবহাওয়ার প্রকৃতিই বদলে যাবে। সময়ে অসময়ে জলোচ্ছ্বাসের শিকার হয়ে ফসল ডুবে যাবে, দূষিত হবে সুপেয় পানি, লোনা পানি প্রবেশের ঝুঁকি বাড়বে, বনাঞ্চল ধ্বংস হবে, বন্য জীবজন্তুর সংখ্যা হ্রাস পাবে এবং একই দেশের মানুষ অন্য অঞ্চলে হবে জলবায়ু শরণার্থী (Climate refugee)। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় নিম্নাঞ্চলের মানুষ হবে প্রথম শিকার।

গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া বিশ্বব্যাপী সমানভাবে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থবিরতায় এক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। উন্নত বিশ্ব তাদের উৎপাদিত শস্যের বাড়তি অংশ পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করবে। আর উন্নয়নশীল

গরিব দেশগুলোর মানুষ না খেয়ে কঙ্কালসার জীবনযাপনের মাধ্যমে নিজ দেশের সীমানা পেরিয়ে শরণার্থী হয়ে উঠবে। বাংলাদেশেও তার ব্যতিক্রম নয়। ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, চীন, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশের জলবায়ুর ধরন সাম্প্রতিক সময়ে অনেকটাই বদলে যাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার গ্রীষ্মকাল দীর্ঘতর হয়ে উঠেছে, শীতকালেও পূর্বের তুলনায় বর্ষাসিক্ত হয়ে উঠেছে। তাই সার্বিকভাবে বলা যায়, মানব জীবনে গ্রিনহাউস প্রক্রিয়ার যথেষ্ট প্রভাব পড়ছে।

প্রশ্ন ▶ ৩২ টুটুলের বাবা বাসার জন্য একটি নতুন ফ্রিজ কিনে এনেছেন। টুটুল ফ্রিজের গায়ে একটি স্টিকার দেখতে পেল। সেখানে লেখা রয়েছে CFC Free। টুটুল তার বাবাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি সুন্দরভাবে CFC কী এবং এর প্রভাবে কী হয় তা বুঝিয়ে দিলেন। তিনি আরও বললেন, কলকারখানার ধোঁয়া ও গাড়ির কালো ধোঁয়া ইত্যাদিতেও রয়েছে। একটি বিশেষ গ্যাস বায়ুমণ্ডলে মিশে আবহাওয়া ও জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। ঐ একটি মাত্র গ্যাসের বৃদ্ধি পৃথিবীকে বিপর্যস্ত করতে পারে। *◀ শিখনফল: ৮ [প্রফেসর মো: মোখলেছুর রহমান; অনু-১]*

ক. গ্রিনহাউস বলতে কী বোঝ? ১

খ. বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের উল্লিখিত বিশেষ গ্যাসটি বায়ুমণ্ডলে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে তা আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের উক্ত একটি মাত্র গ্যাস পৃথিবীকে বিপর্যস্ত করতে পারে— উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শীতকালে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের দেশগুলোতে সবুজ শাকসবজি উৎপাদনের লক্ষ্যে এক ধরনের কাচের বড় ঘর তৈরি করা হয়। এটিই মূলত গ্রিনহাউস।

খ মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড যেমন শিল্প-কারখানা স্থাপন, কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক সারের ব্যবহার, ফ্রিজ ও এসি ব্যবহার ইত্যাদির কারণে বায়ুমণ্ডলে প্রাকৃতিক বিভিন্ন গ্যাস যেমন- কার্বন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন গ্যাস ইত্যাদি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ফলে বায়ুমণ্ডলের ওপর নেতিবাচক চাপ পড়ছে যা সরাসরি বিশ্ব উষ্ণায়ন সৃষ্টি করছে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ গ্যাসটি হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস।

সূর্য হতে আগত রশ্মি পৃথিবীতে আপতিত হয়ে বিকিরণকালে কার্বন ডাইঅক্সাইড, ওজোন, জলীয় পদার্থ, মিথেন ইত্যাদি দ্বারা শোষিত হয়ে বায়ুমণ্ডলে উত্তাপ বৃদ্ধি করে। এর মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইডের তাপ ধারণ ক্ষমতা সর্বাধিক।

জ্বালানির জন্য গাছপালা ভস্মিভূতকরণ, বনভূমি ধ্বংস, জীবের শ্বসন ও পচন, প্রযুক্তিগত নিঃসরণ এসব নানা প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়ে প্রতিনিয়ত কার্বন ডাই-অক্সাইড (সেই সাথে নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন ইত্যাদি) গ্যাসের প্রভাবে ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর। গ্রিন হাউস গ্যাসগুলোর দ্বারা বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হচ্ছে। আবার এ গ্যাসীয় বিরূপ ক্রিয়ার ফলে ওজোনস্তর ছিদ্র হয়ে অতিবেগুনি রশ্মিসহ ক্ষতিকর রশ্মিগুলো সরাসরি ভূ-পৃষ্ঠে এসে আরও অধিক উত্তাপ সৃষ্টি করছে। এর ফলে পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে। সুতরাং বলা যায় কার্বন ডাইঅক্সাইডের দরুন বায়ুমণ্ডলের ব্যাপক পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে।

ঘ উদ্দীপকের যে গ্যাসটি পৃথিবীকে বিপর্যস্ত করতে পারে তা হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড।

CO_2 বৃদ্ধির দরুন বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা ক্রমশ বাড়ছে এবং গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে বিশ্ব উষ্ণায়ন ঘটেছে। গ্রিনহাউস প্রক্রিয়া অবিরত চলতে থাকলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ১.৫° সে. থেকে ৪.৫° সে. বৃদ্ধি পাবে। যার ফলে মেরু অঞ্চলের বিশাল বরফস্তর গলে সাগরের পানির উচ্চতার বৃদ্ধি ঘটাবে এবং উপকূলীয় ব্যাপক অঞ্চল সমুদ্রেগর্ভে চলে যাবে। এছাড়া বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তনসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি পাবে।

গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়ায় পৃথিবীর অর্ধেক এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বিশেষ করে CO_2 এর পরিমাণ বাড়লে শস্যের ক্ষতি হবে। উপকূলীয় বনভূমি ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে। এই গ্যাস বৃদ্ধি পেলে জীববৈচিত্র্য বিশেষ করে জলজ প্রাণী বিলুপ্ত হবে। তাপমাত্রা বাড়লে বিভিন্ন প্রকার রোগব্যাধি দেখা দিবে।

সুতরাং বলা যায় যে, CO_2 এর বৃদ্ধি পৃথিবীকে বিপর্যস্ত করে তুলতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ রুমা রাখাইনের মামার বয়স প্রায় ৯০ বছর। তাদের বাড়ি পটুয়াখালী। রুমার মামা তাকে জানায় তার ছোট বেলায় নদীর পানি এত লোনা ছিল না। তখন বর্ষাকালে আরও অধিক বৃষ্টিপাত হতো এবং এত ঘূর্ণিঝড়, বন্যা প্রভৃতি হতো না। রুমা তার মামাকে জিজ্ঞাসা করে এত সবের কারণ কী? মামা উত্তর দেয় বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন এর জন্য দায়ী।

◀ শিখনফল: ৯ [অবনীন্দ্রনাথ বৈদ্য; অনু-২]

ক. বিশ্ব উষ্ণায়ন কী? ১

খ. নদীর পানিতে লোনার মাত্রা বৃদ্ধি কীসের আভাস? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিহত করা সম্ভব? যুক্তি দাও। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৃথিবীর তাপমাত্রা স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে বেড়ে যাওয়াই বিশ্ব উষ্ণায়ন।

খ নদীর পানিতে লোনার মাত্রা বৃদ্ধি জলবায়ু পরিবর্তনের আভাস। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। গত ১০০ বছরে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়েছে ১০ থেকে প্রায় ১৫ সেন্টিমিটার। ফলে লোনা পানি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রায় ১০০ কি.মি. পর্যন্ত নদীতে প্রবেশ করেছে।

গ উদ্দীপকের আলোকে অর্থাৎ বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে বাংলাদেশের জলবায়ুতে বিরূপ প্রভাব পড়বে।

মানুষের নিয়ন্ত্রণহীন ব্যবহারের কারণে মাত্রাতিরিক্ত গ্রিনহাউস গ্যাস অর্থাৎ কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড এবং ক্লোরোফ্লুরো কার্বন (CFC) গ্যাসগুলো নির্গমনের কারণে বিশ্ব উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তনের যে ধারা শুরু হয়েছে তাতে বিশ্বের স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল অনেক দেশ ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়বে।

জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ আছে সবচেয়ে ঝুঁকির মধ্যে। অন্যান্য দেশ এ ক্ষতির মুখোমুখি হওয়ার আগেই বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখে পড়ে গেছে। আগামী দিনগুলোতে এর মাত্রা আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। পরবর্তী ৫০ বছরে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৩ ফুট বাড়লে তাতে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী একটি অংশ প্লাবিত হবে এবং প্রায় ১৭ শতাংশ ভূমি পানির নিচে চলে যাবে। আনুমানিক ৩ কোটি মানুষ তাদের ঘরবাড়ি, ফসলি জমি হারিয়ে জলবায়ু উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে। উচ্চ তাপমাত্রার প্রভাবে ঘন ঘন বন্যা, ঝড়, অনাবৃষ্টি এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। যা ইতোমধ্যেই বাংলাদেশে অনুভূত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরও বাড়বে।

সুতরাং আলোচনা হতে বলা যায় যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ উচ্চমাত্রার ঝুঁকিতে রয়েছে যা আমাদেরকে ভাবিয়ে তুলছে।

ঘ উদ্দীপকে বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ব্যক্ত করা হয়েছে।

হ্যাঁ, আমি মনে করি, উক্ত জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিহত করা সম্ভব। এর প্রভাব নিয়ন্ত্রণে যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে—

i. জ্বালানি ব্যবহারে পরিবর্তন আনতে হবে।
ii. শক্তি সম্পদ সংরক্ষণে মনোযোগী হতে হবে।
iii. তাপবিদ্যুৎ শক্তির পরিবর্তে জলবিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ নিতে হবে।
iv. সৌরশক্তিকে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করতে হবে।
v. জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমাতে হবে।
vi. CFC গ্যাসের নির্গমন কমাতে পারলে ওজোন স্তরের ক্ষতি কমানো সম্ভব।
vii. জৈব বর্জ্য পদার্থের খোলামেলা পচন রোধ এবং এগুলোকে জৈব সারে রূপান্তর করতে হবে।
viii. ইউরো প্রযুক্তি ব্যবহার করে মোটরযান থেকে দূষণ হ্রাস করতে হবে।
ix. প্রত্যেক দেশে বনভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।
x. শিল্পোন্নয়নের সাথে সাথে কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বন-মনোঅক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন এর মতো গ্যাসগুলোর নির্গমন কমাতে হবে।
xi. সর্বোপরি, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ সীমিত রেখে শিল্পোন্নতির জন্য প্রযুক্তি স্থানান্তর করতে হবে।

উল্লিখিত পদক্ষেপগুলো যথাযথ গ্রহণের মাধ্যমেই জলবায়ু পরিবর্তন অনেকাংশে প্রতিহত করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶৩৪ মকবুল মিয়া একজন কৃষক। ফসল ফলানোর জন্য তিনি পূর্বে প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তা আর সম্ভব হচ্ছে না। অনাবৃষ্টি, খরা প্রবণতা, নদীর পানি শুকিয়ে যাওয়ার ফলে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। ◀ *শিখনফল: ৯*

ক. বায়ুপ্রবাহ মাপক যন্ত্রের নাম কী? ১
খ. বর্ষাকালে দেশের পূর্বাঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের ঘটনাটি কোন দিকটি নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বায়ুপ্রবাহ মাপক যন্ত্রের নাম এ্যানিমোমিটার (Anemometer)।

খ বর্ষাকালে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয়। এ বায়ুতে প্রচুর জলীয়বাষ্প থাকে। এ সময় সূর্য লম্বভাবে কিরণ দিতে থাকে। অধিক তাপে দেশের অভ্যন্তরভাগের জলাশয় থেকে পানি বাষ্পে পরিণত হয়ে জলীয়বাষ্পপূর্ণ মৌসুমি বায়ুর সাথে মিলিত হয়। এ বায়ু পূর্বাঞ্চলের (সিলেট, মৌলভীবাজার প্রভৃতি জেলা) পর্বতের গায়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে উপরে উঠে যায় এবং ঠান্ডা হয়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়।

গ উদ্দীপকের ঘটনাটি জলবায়ু পরিবর্তনকে নির্দেশ করে।

মানুষের কর্মকান্ডের ফলে (যেমন: ফ্রিজ, এসি ব্যবহার) বায়ুমণ্ডলে গ্রিন হাউস গ্যাসসমূহের উপস্থিতির মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ গ্যাসগুলো হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন ইত্যাদি।

শিল্পায়ন, যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি, বনাঞ্চল উজাড়, পারমাণবিক পরীক্ষা ও কৃষির সম্প্রসারণ ইত্যাদি গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। যার ফলে অধিক বৃষ্টিপাত, ব্যাপক বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা প্রভৃতি জলবায়ুগত পরিবর্তন সাধিত হয়।

ঘ উদ্দীপকের ঘটনাটি দ্বারা জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টি বোঝানো হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনে বিশ্বের স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল অনেক দেশ ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়বে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়।

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বেশ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৩ ফুট বাড়লে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী একটি অংশ প্লাবিত হবে এবং প্রায় ১৭ শতাংশ ভূমি পানির নিচে তলিয়ে যাবে। অনেক মানুষ তাদের ঘরবাড়ি, ফসলি জমি হারিয়ে জলবায়ু উদ্বাস্তুতে (Climate refugee) পরিণত হবে। উচ্চ তাপমাত্রার প্রভাবে অনাবৃষ্টি, নদীর পানি শুকিয়ে যাওয়া প্রভৃতি লক্ষ করা যাবে। যা ইতোমধ্যে বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক মন্দাভাব দেখা দিতে পারে। দুর্যোগের প্রভাবে সহায় সম্পদ হারিয়ে অনেকেই মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হবে।

অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তন এদেশে প্রকৃতি ও পরিবেশে বিরূপ প্রভাব ফেলার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক জীবনকেও বিপর্যস্ত করবে।

সপ্তম অধ্যায়
বারিমণ্ডল

পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶ ১

সমুদ্র তলদেশের ভূমিরূপ	বৈশিষ্ট্য
K	স্থলভাগের শেষসীমা হতে শুরু।
L	K এর শেষ হতে শুরু।
S	L এর শেষ হতে সমুদ্র তলদেশ বিস্তৃত।

◀ *শিখনফল: ২*

ক. বারিমণ্ডল কাকে বলে? ১

খ. সমুদ্রখাত বলতে কী বোঝ? ২

গ. K এবং L অংশের বৈশিষ্ট্যসমূহের তুলনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের স্তর তিনটির মধ্যে কোনটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাপক? মতামতসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৃথিবীর সকল জলরাশির অবস্থানভিত্তিক বিস্তরণকে বারিমণ্ডল বলে।

খ গভীর সমুদ্রের সমভূমি অঞ্চলের মাঝে মাঝে গভীর খাত দেখা যায়। এ সকল খাতকে সমুদ্রখাত বলে।
পাশাপাশি অবস্থিত মহাদেশীয় ও সামুদ্রিক প্লেট সংঘর্ষের ফলে সমুদ্রখাত প্লেট সীমানায় অবস্থিত। এ প্লেট সীমানায় ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি অধিক হয় বলেই এ সকল খাত সৃষ্টি হয়েছে।

গ K ও L অংশে মহীসোপান ও মহীঢালের কথা বলা হয়েছে।
'K' ও 'L' ভূমিরূপ দুটো হলো সমুদ্রের তলদেশের মহীসোপান ও মহীঢাল। নিচে এগুলোর অমিলগুলো তুলে ধরা হলো:
স্থলভাগের মতো সমুদ্র তলদেশেও রয়েছে বৈচিত্র্যপূর্ণ বহু উঁচু নিচু ভূভাগ। সমুদ্র তলদেশের এসব বৈচিত্র্যপূর্ণ উঁচু নিচু ভূভাগের মধ্যে মহীসোপান ও মহীঢাল অন্যতম দুটি ভূমিরূপ। মহীসোপান ও মহীঢালের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ:

i. মহাদেশের বাইরের দিকের নিমজ্জিত অংশকে মহীসোপান বলে। অন্যদিকে মহীসোপানের শেষ প্রান্ত হতে ভূভাগ হঠাৎ খাড়াভাবে নেমে গেছে। এ ঢালু অংশকে মহীঢাল বলে।

ii. মহীসোপানের বৈশিষ্ট্য পার্শ্ববর্তী স্থলভাগের ভূপ্রকৃতির ও গঠনের ওপর নির্ভর করে। পক্ষান্তরে মহীঢালের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অসংখ্য আন্তঃসাগরীয় গিরিখাতের অবস্থান।

iii. মহীসোপান সমুদ্রের দিকে ক্রমশ ঢালু হওয়ায় বেশ প্রশস্ত। অপরদিকে মহীঢাল অধিক খাড়া হওয়ার জন্য খুব প্রশস্ত নয়।

iv. মহীসোপানে অবক্ষেপণ জমা হয়ে কালক্রমে পাললিক শিলার সৃষ্টি হয়। অপরদিকে মহীঢালে জলজ প্রকৃতির উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর দেহাবশেষ সঞ্চিত হয়ে থাকে।

v. মহীসোপানের উপরিভাগ সমান। কিন্তু মহীঢালের উপরিভাগ সমান নয়।

ঘ উদ্দীপকে K স্তরটি হলো মহীসোপান, L স্তরটি মহীঢাল এবং S স্তরটি গভীর সমুদ্রের সমভূমি।
উল্লিখিত তিনটি স্তরের মধ্যে মহীসোপানের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাপক। নিচে মহীসোপানের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হলো:
মহাদেশ ও মহাসাগরের সংযোগ স্থল থেকে সাগরের দিকে নিমজ্জিত মহাদেশের অংশই মহীসোপান।
মহীসোপান অঞ্চলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বেশি। মৎস্য খাদ্যের প্রাচুর্যহেতু মহীসোপান অঞ্চলেই মৎস্যের ব্যাপক সমাবেশ ঘটে এবং সেখানে মৎস্য শিকার ও মৎস্য ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। এছাড়া এ অঞ্চল খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডার হিসেবে গুরুত্ব বহন করে। মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পদ সরবরাহের জন্য মহীসোপান অঞ্চল বিপুল সম্ভাবনাময়।
সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলতে পারি উল্লিখিত ভূমিরূপগুলোর মধ্যে মহীসোপানের অর্থনৈতিক গুরুত্বই বেশি।

প্রশ্ন ▶ ২ মেঘলা তার ছোট বোনকে সমুদ্রের তলদেশের ভূমিরূপ পড়াতে গিয়ে দুটি চিত্র দেখাল। তার ছোট বোন প্রথম চিত্রে দেখতে পেল খাড়াভাবে নেমে আসা সমভূমির ন্যায় একটি ভূমিরূপ এবং দ্বিতীয় চিত্রে দেখতে পেল মহাদেশের সন্নিকটে অবস্থিত সমুদ্রের তলদেশের বৃহৎ অবনমিত ভূমিরূপ। ◀ *শিখনফল: ৪*

ক. মহীপ্রান্ত কাকে বলে? ১

খ. বঙ্গোপসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ ব্যাখ্যা করো? ২

গ. মেঘলার বোন প্রথম চিত্রে যে ভূমিরূপ দেখল তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দ্বিতীয় চিত্রে যে ভূমিরূপ দেখল তার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহীসোপান ও মহীঢালকে একসাথে মহীপ্রান্ত বলে।

খ পৃথিবীর বিভিন্ন সাগর মহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপের মতো বঙ্গোপসাগরের তলদেশে উল্লেখযোগ্য ভূমিরূপ রয়েছে।
৯০° পূর্ব শৈলশিরা, বেঙ্গল ডীপ সী ফ্যান, নিকোবর ফ্যান, সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড, বার্মা ট্রেন্স, চ্যাগোস পূর্ব উপকূল ট্রেন্স ইত্যাদি ভূমিরূপগুলো বঙ্গোপসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ।

গ মেঘলার বোন প্রথম চিত্রে গভীর সমুদ্রের সমভূমি অঞ্চল দেখতে পেয়েছে।

মহীঢালের পর হতে সমুদ্র তলদেশে যে বিস্তৃত সমভূমি দেখা যায় তাকে গভীর সমুদ্রের সমভূমি বলে। এর গভীরতা ৩ হতে ৫ কিলোমিটার হয়ে থাকে। একে সমভূমি বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি মোটেও সমতল নয়। কারণ এর উপর অনেক মালভূমি, পাহাড়-পর্বত অবস্থান করে। যেমন– আটলান্টিক সমুদ্র তলদেশীয় সমভূমি। এখানে সামুদ্রিক প্রাণী ও উদ্ভিদের মৃতদেহ হতে সৃষ্ট পলি, কর্দম ইত্যাদি সঞ্চিত হয়।

ঘ দ্বিতীয় চিত্রে মেঘলার বোন প্রান্তীয় সমুদ্রখাত ভূমিরূপটি দেখতে পেয়েছিল।

প্রান্তীয় সমুদ্রখাত মহাদেশের সন্নিকটে অবস্থিত সমুদ্রের তলদেশের বৃহৎ অবনমিত স্থান। এগুলো উন্মুক্ত সমুদ্র থেকে সামুদ্রিক শৈলশিরা, বদ্বীপ অথবা মহাদেশের অংশবিশেষ দ্বারা বিচ্ছিন্ন।

প্রান্তীয় সমুদ্র খাতে তিন ধরনের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। যে খাত দ্বীপমালা ও সামুদ্রিক শৈলশিরার দ্বারা সমুদ্রের উপরের স্তরের পানিকে আংশিকভাবে ও নিচের স্তরের পানিকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করতে পারে সে জাতীয় খাতই সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। দ্বিতীয় প্রকারের প্রান্তীয় সমুদ্রখাত দুই মহাদেশেই অবস্থিত। তৃতীয় ধরনের প্রান্তীয় সাগর লম্বা, সরু এবং মহাদেশের ভূভাগ দ্বারা বেষ্টিত। আমেরিকা ও ইউরোপের চারদিকে মহাদেশের প্রান্তে অগভীর সাগর অবনমিত এলাকা জুড়ে রয়েছে। উত্তর ইউরোপের উত্তর সাগর অপর এক নিমজ্জিত মহাদেশের অঞ্চলে যেখানে বর্তমানে একমাত্র ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জই সমুদ্র সমতলের উপরে অবস্থান করছে।

প্রশ্ন ▶৩

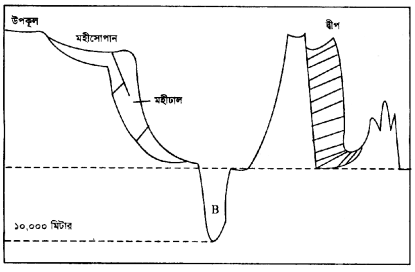

চিত্র-A

◀ শিখনফল-৪

ক. মহীসোপানের গড় প্রশস্ততা কত কিলোমিটার? ১

খ. সমুদ্রের নিমজ্জিত শৈলশিরা সৃষ্টির প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সমুদ্র তলদেশের 'B' চিহ্নিত ভূমিরূপটি সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অর্থনীতিতে প্রদত্ত চিত্র 'A' এ প্রাপ্ত সম্পদগুলোর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহীসোপানের গড় প্রশস্ততা ৭০ কিলোমিটার।

খ পৃথিবীব্যাপী সমুদ্রের অভ্যন্তরে অনেকগুলো আগ্নেয়গিরি অবস্থান করছে। এগুলো থেকে লাভা বেরিয়ে এসে সমুদ্রগর্ভে সঞ্চিত হয়ে শৈলশিরার ন্যায় ভূমিরূপ গঠন করে। এগুলো নিমজ্জিত শৈলশিরা নামে পরিচিত। এর মধ্যে আটলান্টিক শৈলশিরা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

গ চিত্রে 'B' চিহ্নিত ভূমিরূপটি হলো গভীর সমুদ্রখাত।

গভীর সমুদ্রের তলদেশে সমভূমি অঞ্চলের মধ্যে অনেক গভীর খাত দেখা যায়। চিত্রে 'B' চিহ্নিত ভূমিরূপটি তেমনি একটি খাত।

পাশাপাশি অবস্থিত মহাদেশীয় ও সামুদ্রিক প্লেট সংঘর্ষের ফলে সমুদ্রখাত সৃষ্টি হয়। ফলে প্রতিটি গভীর খাত প্লেট সীমানায় অবস্থিত। এ অঞ্চলে ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি অধিক হয় বলেই এ সকল খাত সৃষ্টি হয়েছে। এ খাতগুলো তত প্রশস্ত নয়। কিন্তু এদের ঢাল খুবই খাড়া। এদের গভীরতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ৫,৪০০ মিটারের অধিক। যেমন– প্রশান্ত মহাসাগরের ম্যারিয়ানা খাত (১০,৮৫০ মিটার)।

ঘ বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অর্থনীতিতে চিত্র 'A' তথা সমুদ্র ও এর তলদেশের ভূমিরূপে প্রাপ্ত সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। ক্রমবর্ধমান মানুষের চাহিদা মেটাতে এই সম্পদ বিশেষ অবদান রাখছে। যেমন–

মৎস্য আহরণ: খাদ্য হিসেবে মৎস্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্য চাহিদা মেটাতে সমুদ্র মৎস্যের যোগান দিয়ে থাকে। বাংলাদেশে মোট মৎস্য উৎপাদনের ১৯.৪ শতাংশ (২.৫৬ মিলিয়ন টন) সামুদ্রিক মৎস্য।

উপকূলবর্তী বনজ সম্পদ: সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠেছে ম্যানগ্রোভ বন। উপকূল জুড়ে এ সম্পদ রক্ষায় সংরক্ষিত (Marine reserve) রয়েছে ৬৯,৮০০ হেক্টর জমি।

পারমাণবিক খনিজ: বিভিন্ন পারমাণবিক খনিজ, যেমন- জিরকন, ইলমেনাইট, ম্যাগনেটাইট, রিউটাইল প্রভৃতি সমুদ্র তলদেশে (মহীসোপান, মহীঢাল) পাওয়া যায়।

প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ তেল: সমুদ্র তলদেশ হলো প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ তেলের আধার। বাংলাদেশের ২৩টি গ্যাস অনুসন্ধান ব্লকের ৬টি সমুদ্র অঞ্চলে (১৬-২১নং) অবস্থিত।

সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অর্থনীতিতে সমুদ্র সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶৪ ফাহিমা ডিসকভারি চ্যানেলে সমুদ্র তলদেশের একটি ভূমিরূপ দেখল যেখানে পানির সর্বোচ্চ গভীরতা ২০০ মিটার এবং ১ ডিগ্রি কোণে নিমজ্জিত। তবে এর বিস্তৃতি সর্বত্র সমান নয়।

◀ শিখনফল: ৪

ক. কীসের সাহায্যে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা হয়? ১

খ. কেন মানুষ বারিমণ্ডলের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে? ২

গ. উদ্দীপকে যে ভূমিরূপের কথা বলা হয়েছে তার অবস্থান ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আলোচ্য ভূমিরূপটির বিস্তৃতি সর্বত্র সমান নয়– বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শব্দ তরঙ্গের সাহায্যে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা হয়।

খ বারিমণ্ডল বলতে পৃথিবীর সকল জলরাশির অবস্থানভিত্তিক বিস্তরণকে বোঝায়। একটি পৃথিবীর ভূভাগের প্রায় ৭৫ শতাংশ স্থান দখল করে আছে।

বর্তমানে পৃথিবীতে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আবহাওয়ারও পরিবর্তন হচ্ছে ব্যাপকভাবে। সেই সাথে হ্রাস পাচ্ছে সম্পদের পরিমাণ। আর বারিমণ্ডলের (সাগর, মহাসাগর) তলদেশের রয়েছে বৈচিত্র্যপূর্ণ গঠন এবং সেখানে রয়েছে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ। এজন্যই মানুষ বারিমণ্ডলের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে।

গ উদ্দীপকটিতে যে ভূমিরূপের কথা বলা হয়েছে তার নাম মহীসোপান। মহাদেশ ও মহাসাগরের সংযোগ স্থল থেকে সাগরের দিকে ক্রমনিম্ন নিমজ্জিত অংশই হচ্ছে মহীসোপান।

সমুদ্র উপকূলের পর থেকে মহীসোপানের অবস্থান শুরু হয়। স্থলভাগের উপকূলবর্তী অঞ্চল থেকে আরম্ভ করে মহাদেশের অভ্যন্তরে বিস্তীর্ণ অঞ্চল সমতল ও প্লাবন ভূমি হলে মহীসোপান সংলগ্ন অঞ্চলও অত্যন্ত প্রশস্ত ও অল্প ঢালযুক্ত হয়। আর সমুদ্র উপকূলে পর্বতের অবস্থান থাকলে মহীসোপান খুবই সংকীর্ণ হয়।

মহীসোপান পার্শ্ববর্তী স্থলভাগের ভূপ্রকৃতি ও গঠনের ওপর নির্ভর করে। এর সর্বোচ্চ গভীরতা ২০০ মিটার, গড় প্রশস্ততা ৭০ কি. মি.এবং এটি ১ ডিগ্রি কোণে সমুদ্র তলদেশে নিমজ্জিত থাকে। মহীসোপানের সবচেয়ে উপরের অংশকে উপকূলীয় ঢাল বলে।

ঘ উদ্দীপকে আলোচ্য ভূমিরূপটি হলো মহীসোপান। পৃথিবীর মহাদেশসমূহের চারদিকে স্থলভাগের কিছু অংশ অল্প ঢালু হয়ে সমুদ্রের পানির মধ্যে নেমে গেছে। একে মহীসোপান বলে।

মহীসোপানের বিস্তৃতি সর্বত্র সমান নয়। উপকূল ভাগের বন্ধুরতার ওপর এর বিস্তৃতি নির্ভর করে। স্থলভাগের উপকূলবর্তী অঞ্চল থেকে আরম্ভ করে মহাদেশে অভ্যন্তরে বিস্তীর্ণ অঞ্চল সমতল ও প্লাবন ভূমি হলে তা প্রশস্ত হয়। যেমন– বঙ্গোপসাগরের উত্তর দিকের বাংলাদেশ সংলগ্ন মহীসোপান বেশ প্রশস্ত।

মহাদেশের উপকূলে পর্বত বা মালভূমি থাকলে মহীসোপান সরু প্রকৃতির বা সংকীর্ণ হয়। এ কারণে ভারতের পূর্ব উপকূলে বঙ্গোপসাগরের মহীসোপান অত্যন্ত খাড়া ঢালযুক্ত ও অপ্রশস্ত। ইউরোপের উত্তরে বিস্তীর্ণ সমভূমি থাকায় উত্তর মহাসাগরের মহীসোপান খুবই প্রশস্ত। এ মহাদেশের উত্তর-পশ্চিমে পৃথিবীর বৃহত্তম মহীসোপান অবস্থিত।

মহীসোপানের দ্বিতীয় বৃহত্তম অংশ উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলে দেখতে পাওয়া যায়। অথচ এর পশ্চিম উপকূল বরাবর উত্তর দক্ষিণে ভঙ্গিল রকি পর্বত অবস্থান করায় সেখানে মহীসোপান খুবই সংকীর্ণ। আফ্রিকা মহাদেশের অধিকাংশ স্থান মালভূমি বলে এর পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের মহীসোপান খুবই সরু। তাই বলা যায় মহীসোপানের বিস্তৃতি সর্বত্র সমান নয়।

প্রশ্ন ▶ ৫ কোপেনহেগেনে অবস্থিত সামুদ্রিক গবেষণার স্থায়ী আন্তর্জাতিক সমিতির তত্ত্বাবধানে বিখ্যাত ব্যক্তিগণের অনুসন্ধান কাজ এবং বিখ্যাত জাহাজের অভিযান উল্লেখযোগ্য। এর ফলে একদিকে যেমন বারিমণ্ডল সম্পর্কে অনেক অজ্ঞাত বিষয় জানা সম্ভব হয়েছে, অপরদিকে তেমনি মহাসাগরগুলোর তলদেশের গঠন প্রকৃতি সম্বন্ধেও বিশদ ধারণা পাওয়া গেছে।

[মোহাম্মদ আরিফুর রহমান; অনু-১] ◀ শিখনফল: ৪

ক. জোয়ার-ভাটা কী? ১

খ. বৈশ্বিক উষ্ণতা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে যে মহাসাগরের তলদেশের গঠন প্রকৃতির কথা বলা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি মানবজীবনের ওপর কতটুকু প্রভাব বিস্তার করে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমুদ্রের জলরাশির নির্দিষ্ট সময় অন্তর ফুলে ওঠা ও নেমে যাওয়ার প্রক্রিয়াই জোয়ার-ভাটা।

খ বিশ্ব উষ্ণায়ন বর্তমান পৃথিবীতে পরিবেশগত প্রধান সমস্যাসমূহের মধ্যে অন্যতম। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক মানুষের কাজকর্মের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যাওয়াকে বৈশ্বিক উষ্ণতা বলে।

এসি, ফ্রিজ প্রভৃতির ব্যবহার এবং বায়ুমণ্ডলে CO_2, নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন, CFC প্রভৃতি গ্যাসের আধিক্যের কারণে বায়ুমণ্ডলের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে যা সরাসরি বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য দায়ী।

গ সমুদ্রের বিভিন্ন স্থানের গভীরতার জন্য এর তলদেশের ভূমিরূপকে প্রধানত নিম্নলিখিত ৫টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন– ১. মহীসোপান, ২. মহীঢাল, ৩. গভীরসমুদ্রের সমভূমি, ৪. সমুদ্রের গভীর খাত এবং ৫. নিমজ্জিত শৈলশিরা। নিচে এদের আলোচনা করা হলো:

মহীসোপান: মহাদেশ ও মহাসাগরের সংযোগস্থল হতে সাগরের দিকে নিমজ্জিত অংশকে মহীসোপান বলে। মহীসোপানের সর্বোচ্চ গভীরতা ১৮০ মিটার। মহীসোপান সাধারণত এক ডিগ্রির (১°) কম কৌণিকভাবে ঢালু হয়ে সমুদ্রের তলদেশে বিস্তৃত হয়।

মহীঢাল: মহীসোপানের শেষসীমা থেকে হঠাৎ খাড়াভাবে যে ঢাল গভীর সমুদ্রে নেমে যায় তাকে মহীঢাল বলে। প্রকৃতপক্ষে মহীঢালই মহাদেশগুলোর শেষসীমা। মহীঢালের গভীরতা ১৮০ থেকে ৩,৬০০ মিটার পর্যন্ত হতে দেখা যায়।

গভীর সমুদ্রের সমভূমি: মহীঢাল শেষ হওয়ার পর থেকে সমুদ্র তলদেশে যে বিস্তৃত সমভূমি অবস্থিত তাকে গভীর সমুদ্রের সমভূমি বলে। এর গভীরতা ৩–৫ কি.মি.। একে সমুদ্রের সমভূমি বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি মোটেও সমতল নয়। কারণ, গভীর সমুদ্রের সমভূমির ওপর জলমগ্ন অনেক মালভূমি, পাহাড় পর্বত অবস্থান করে।

সমুদ্রের গভীর খাত: গভীর সমুদ্রের সমভূমি অঞ্চলের কোথাও কোথাও গভীর গর্ত দেখা যায়। এসব গর্তগুলোকে গভীর সমুদ্রখাত বলে। গভীর সমুদ্র খাত সাধারণত ৪০০০-৬০০০ মিটার (২.৫-৩.৫ মাইল) গভীর।

নিমজ্জিত শৈলশিরা: এগুলো আগ্নেয়গিরির লাভা থেকে সৃষ্ট। লাভা আগ্নেয়গিরি থেকে বেরিয়ে এসে সমুদ্রগর্ভে জমাট বেঁধে এই ভূমিরূপ সৃষ্টি করে।

সুতরাং বলা যায়, ভূপৃষ্ঠের উপরের ভূমিরূপ যেমন উঁচুনিচু তেমনি সমুদ্র তলদেশও অসমান। কারণ সমুদ্রতলে আগ্নেয়গিরি, শৈলশিরা, উচ্চভূমি ও গভীরখাত প্রভৃতি বিদ্যমান।

ঘ উদ্দীপকের উল্লিখিত বিষয়টি হলো বারিমণ্ডল।

পৃথিবী পৃষ্ঠে পানির উৎস হলো সাগর-মহাসাগর, নদ-নদী, খালবিল ইত্যাদি। মহাসাগর বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। এই সম্পদের সংরক্ষণ ও ব্যবহার মানবজীবনের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

সমুদ্রের তলদেশ মানবজীবনে অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। সমুদ্রের তলদেশের বিভিন্ন ভূমিরূপই মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলভিত্তি। মহীসোপান অঞ্চলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বেশি। মৎস্য খাদ্যের প্রাচুর্যহেতু মহীসোপান অঞ্চলেই মৎস্যের ব্যাপক সমাবেশ ঘটে এবং সেখানে মৎস্য শিকার ও মৎস্য ব্যবসার উন্নতি হয়েছে। এ ছাড়া এ অঞ্চল খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডার হিসেবে গুরুত্ব বহন করে।
মহীঢাল অঞ্চলে ম্যাঙ্গানিজ ও অন্যান্য ধাতু পাওয়া যায়। সমুদ্রের গভীর সমভূমি অঞ্চলে নানা প্রকার জৈব ও অজৈব সম্পদ পাওয়া যায়। এখানে ম্যাঙ্গানিজ, লোহা, সীসা, তামা, নিকেল, দস্তা ইত্যাদি বহু মূল্যবান ধাতু পাওয়া যায়। মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পদ সরবরাহের, জন্য সমুদ্র তলদেশ বিপুল সম্ভাবনাময়। শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহে খাদ্যের যোগানে, খনিজ সম্পদের ভাণ্ডার হিসাবে, পরিবহন ও বাণিজ্যে, কৃষি শিল্প, কর্মসংস্থান ইত্যাদিতে সমুদ্র ও সমুদ্র তলদেশের গঠন নানাভাবে সহায়তা করে থাকে। তাই বলা যায়, মানবজীবনে বারিমণ্ডলের ব্যাপক প্রভাব বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶ ৬ বাংলাদেশের তেল ও গ্যাস কোম্পানি পেট্রোবাংলার একজন কর্মকর্তা বঙ্গোপসাগরে জরিপ করতে গিয়ে দেখলেন, বঙ্গোপসাগরের উত্তরাংশে সমুদ্র-তলদেশে চড়াভূমি বা ক্ষুদ্র দ্বীপের মতো ভূমিরূপ রয়েছে। আবার উপকূল থেকে ২৪ কি.মি. দক্ষিণে রয়েছে অত্যন্ত গভীর খাড়া ভূমিরূপ। ◀ *শিখনফল: ৫ [মুমিনুন্নিছা সরকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ]*

ক. উপসাগর কাকে বলে? ১

খ. পৃথিবীর পানির উৎসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় উৎস সম্পর্কে লিখো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত স্থানে চড়াভূমি বা ক্ষুদ্র দ্বীপ গড়ে ওঠার সম্ভাব্য কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুটি ভূমিরূপের স্থানিক বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক তিন দিক স্থল এবং এক দিকে জল দ্বারা পরিবেষ্টিত জলরাশিকে উপসাগর বলে। যেমন– বঙ্গোপসাগর।

খ পৃথিবীর পানির উৎসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো সামুদ্রিক পানি।

পৃথিবীর মোট পানির শতকরা ৯৭ ভাগ পানির অবস্থান সমুদ্রে। সমুদ্রের এ পানি উত্তপ্ত হয়ে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে পৌঁছায় এবং পরবর্তীতে বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত স্থানটি হলো বঙ্গোপসাগর।

নিচে বঙ্গোপসাগরের তলদেশে চড়াভূমি বা ক্ষুদ্র দ্বীপ গড়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা করা হলো:

বঙ্গোপসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ তেমন বৈচিত্র্যময় নয়। বঙ্গোপসাগরের ভূপ্রকৃতি প্রায় সমতল। তবে বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উত্তরাংশের অবস্থা কিছুটা ভিন্ন ধরনের। কারণ গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও তার অসংখ্য শাখানদীর স্রোতধারা বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। উক্ত নদীগুলোর স্রোতধারা জোয়ারের আঘাতে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বেঁকে একটি মিলিত স্রোতধারার সৃষ্টি করে। এ স্রোতধারার সাথে বাহিত পলি সঞ্চিত হয়ে সমুদ্রগর্ভে চড়াভূমি বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে। এভাবেই মূলত বঙ্গোপসাগরে চড়াভূমি বা ক্ষুদ্রদ্বীপ গড়ে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বঙ্গোপসাগরের যে দুইটি ভূমিরূপের কথা বলা হয়েছে তা হলো চড়াভূমি বা ক্ষুদ্রদ্বীপ এবং সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড। নিচে ভূমিরূপ দুটির স্থানিক বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হলো–
চড়াভূমি বা ক্ষুদ্রদ্বীপ সৃষ্টি হয়েছে মূলত পলি সঞ্চয়ের মাধ্যমে। বঙ্গোপসাগরের ভূপ্রকৃতি প্রায় সমতল। তবে বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উত্তরাংশের অবস্থা কিছুটা ভিন্ন ধরনের। কারণ গঙ্গা, পদ্মা, মেঘনা ও তার অসংখ্য শাখা নদীর স্রোতধারা বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। উক্ত নদীগুলোর স্রোতধারা জোয়ারের আঘাতে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বেঁকে একটি মিলিত স্রোতধারার সৃষ্টি করে। এ স্রোতধারার সাথে বাহিত পলি সঞ্চিত হয়ে সমুদ্রগর্ভে চড়াভূমি বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে।
অন্যদিকে, বঙ্গোপসাগরের তলদেশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিরূপ গঙ্গা গিরিখাত যা সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড নামে পরিচিত। এটি একটি অত্যন্ত খাড়া তীর বিশিষ্ট সামুদ্রিক গিরিখাত। এটি উত্তর-পূর্ব দিক থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রশস্ত ও গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপ থেকে মাত্র ২৪ কি.মি. দক্ষিণে অবস্থিত। এই ভূমিরূপটি গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপের দক্ষিণ দিকের অগভীর মহীসোপান হতে আরম্ভ করে মহীঢালকে অতিক্রম করে গভীর সমুদ্রে মিশেছে।

প্রশ্ন ▶ ৭

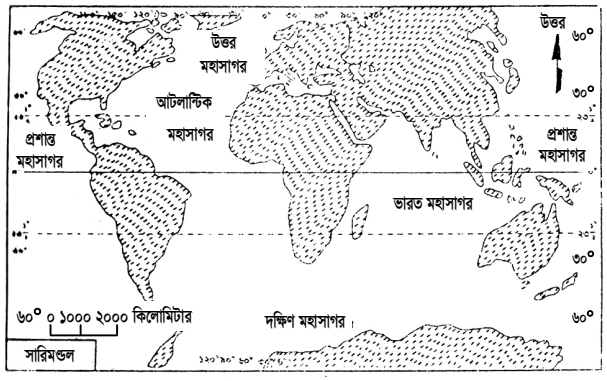

চিত্র : পৃথিবীর মহাসাগরসমূহের অবস্থান

[অবনীন্দ্রনাথ বৈদ্য; অনু-১] ◀ ***শিখনফল: ১ ও ৫***

ক. বারিমণ্ডল কী? ১

খ. আটলান্টিক মহাসাগরের অবস্থান লিখো। ২

গ. বারিমণ্ডলের উৎসসমূহের বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. বঙ্গোপসাগরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভূপৃষ্ঠের যে বিশাল অংশ পানিরাশি দ্বারা আবৃত রয়েছে তাই বারিমণ্ডল।

খ আয়তনে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসাগর আটলান্টিক মহাসাগর।

আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্বে ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশ, পশ্চিমে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ, উত্তরে গ্রিনল্যান্ড এবং দক্ষিণে দক্ষিণ মহাসাগর অবস্থিত। নিরক্ষরেখার নিকট এটি বেশি সংকীর্ণ কিন্তু নিরক্ষরেখা হতে এটি উত্তর ও দক্ষিণে ক্রমশ চওড়া।

গ পৃথিবীর সকল পানিরাশির সাধারণ নাম বারিমণ্ডল। ভূপৃষ্ঠের যে বিশাল অংশ পানি দ্বারা আবৃত রয়েছে তাকে বারিমণ্ডল বলে। বারিমণ্ডলের উৎসসমূহের বর্ণনা নিম্নরূপ:

বারিমণ্ডলের পানিরাশি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অবস্থায় আছে। কঠিন অবস্থায় বরফ হিসেবে আছে মেরু অঞ্চলে ও পর্বতশৃঙ্গে, গ্যাসীয় অবস্থায় জলীয়বাষ্প হিসেবে আছে বায়ুমণ্ডলে এবং তরল অবস্থায় আছে মহাসাগর, সাগর, নদী, হ্রদ, খাল, বিল, পুকুর, ডোবা, প্রভৃতি স্থানে। বারিমণ্ডলের প্রধান উৎস হচ্ছে মহাসাগর, সাগর, উপসাগর। এখানে প্রায় শতকরা ৯৭ ভাগ পানি জমা আছে। বাকি শতকরা ৩ ভাগ আছে নদী, হ্রদ, ভূগর্ভ, জীবমণ্ডল, বায়ুমণ্ডল, ভূপৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে।

বারিমণ্ডলের পানি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, উত্তর গোলার্ধ অপেক্ষা দক্ষিণ গোলার্ধে পানিরাশির পরিমাণ অধিক। অন্যভাবে দেখলে, পূর্ব গোলার্ধ অপেক্ষা পশ্চিম গোলার্ধে পানিরাশি অধিক পরিমাণে আছে।

ঘ বঙ্গোপসাগর পৃথিবীর তৃতীয় বৃহৎ মহাসাগর ভারত মহাসাগরের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। এটি অগভীর খাতের একটি উপসাগর। বঙ্গোপসাগরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো:

বঙ্গোপসাগরের আয়তন প্রায় ২২ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। এর গড় গভীরতা প্রায় ২৬০০ মিটার এবং সর্বাধিক গভীরতা প্রায় ৫২৫৮ মিটার। বঙ্গোপসাগরের আকৃতি কিছুটা ইংরেজি (U) অক্ষরের মতো। এর দক্ষিণ দিক উন্মুক্ত ও এর গভীরতা দক্ষিণ দিকে ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বঙ্গোপসাগরের তলদেশের ভূপ্রকৃতি প্রায় সমতল। উত্তর দিক ছাড়া অন্য সবদিকে মহীসোপান খুবই কম বিস্তৃত। তবে এটি বেশ ঢালু। উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকে এর মহীসোপান বেশ প্রশস্ত। এখানে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে পলি জমে। ফলে বিভিন্ন চরভূমি অগভীর সমুদ্রের সৃষ্টি করেছে।

বঙ্গোপসাগরের তলদেশের ভূপ্রকৃতির গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে—৯০° পূর্ব শৈলশিরা, বেঙ্গল ডীপ সী ফ্যান, নিকোবর ফ্যান, বার্মা ট্রেন্স, চ্যাগোস শৈলশিরা, পূর্ব-উপকূল ট্রেন্স, সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড প্রভৃতি। নিকোবর ফ্যানের পূর্ব প্রান্তে আন্দামান সুন্ডা ট্রেন্স অবস্থিত।

বঙ্গোপসাগরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিরূপ হচ্ছে— গঙ্গা গিরিখাত যা সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড নামে পরিচিত। এটি অধিক খাড়া তীর বিশিষ্ট সামুদ্রিক গিরিখাত। এটি উত্তর-পূর্ব দিক হতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রশস্ত, যা গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ব-দ্বীপ থেকে মাত্র ২৪ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। এটি সমুদ্রের গভীরের দিকে প্রায় ২০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রশ্ন ▶ ৮

◀ ***শিখনফল: ৬*** *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. জন্মগত পানি (Connate water) কাকে বলে? ১

খ. ভূগর্ভস্থ পানি কী? ২

গ. 'A' চিহ্নিত মহাসাগরের ভূপ্রকৃতির বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. 'A' মহাসাগরের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাললিক শিলা সৃষ্টির সময় শিলার মধ্যে যে সামান্য পানি থেকে যায় তাকে জন্মগত পানি বলে।

খ ভূপৃষ্ঠে বৃষ্টিপাত বা বরফগলা পানির অধিকাংশই নদীবাহিত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পতিত হয়। কিছু পানি সূর্যের তাপে বাষ্পে পরিণত হয় এবং সামান্য পরিমাণ পানি উদ্ভিদসমূহ মূল দ্বারা গ্রহণ করে। অবশিষ্ট পানি মৃত্তিকা ও শিলার মধ্য দিয়ে ভূগর্ভে প্রবেশ করে। একে ভূগর্ভস্থ পানি বলে।

গ উদ্দীপক 'A' দ্বারা আটলান্টিক মহাসাগরকে বুঝানো হয়েছে।

আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মহীসোপান মহীঢাল, দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ, প্রান্তদেশীয় সাগর, গভীর খাত প্রভৃতি।

মহীসোপান ও মহীঢাল: আটলান্টিকের উত্তর দিকে সুবিস্তৃত মহীসোপান অবস্থিত। কিন্তু দক্ষিণ আটলান্টিকের উপকূলে মহীসোপান খুবই সরু। এ কারণে উত্তর আটলান্টিক মহীঢালের পরিমাণ কম এবং দক্ষিণ আটলান্টিক মহীঢালই বেশি। উত্তর আটলান্টিকের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের অগভীর সাগর ও উপসাগরগুলো এ মহীসোপানেরই অংশবিশেষ। উত্তর আটলান্টিকের পূর্ব দিকের উত্তর সাগর, বাল্টিক সাগর প্রভৃতি এবং পশ্চিম দিকের বেফিন ও হাডসন উপসাগর এ মহীসোপানের অন্তর্গত। দক্ষিণ আটলান্টিকের উভয় উপকূলে মহীসোপান খুব কম বিস্তৃত। এরপর থেকে মহাসাগরের মহীঢাল ক্রমশ ঢালু হয়ে গভীর সমুদ্রতলে প্রবেশ করেছে।

গভীর খাত: আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় ভজ্গিল পর্বত নেই। এমনকি প্রশান্ত মহাসাগরের তুলনায় এ মহাসাগরে গভীর খাতও তেমন নেই। আটলান্টিক মহাসাগরের গভীরতম খাত পোর্টোরিকো পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে উত্তর পোর্টোরিকো দ্বীপের নিকট অবস্থিত। এর গভীরতা ৮,৪৭৪ মি.। নিরক্ষরেখা বরাবর ২০° পশ্চিম দ্রাঘিমারেখার কাছে অবস্থিত রোমানস খাত মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরাকে দ্বিখণ্ডিত করেছে।

সুতরাং বলা যায়, আটলান্টিক মহাসাগরের মহীসোপান পৃথিবীর অন্যান্য মহাসাগর অপেক্ষা বেশি, তবে প্রশান্ত মহাসাগরের তুলনায় এ মহাসাগরে গভীর খাত তেমন নেই।

ঘ চিত্রের 'A' আটলান্টিক মহাসাগর।

আটলান্টিক মহাসাগরে প্রবাহিত সমুদ্রস্রোতগুলোর প্রভাবে উত্তর আমেরিকার পূর্বাংশে এবং পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহ অপেক্ষাকৃত উষ্ণ থাকে। এ অঞ্চলের উষ্ণ স্রোতের উপর দিয়ে প্রবাহিত উত্তর-পূর্ব অয়ন বায়ুর প্রভাবে উত্তর আমেরিকার পূর্বাংশে এবং পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে বৃষ্টিপাত হয়। এতে কৃষিকাজের সুবিধা হয়ে থাকে। আটলান্টিক মহাসাগরের স্রোতগুলোর প্রভাবে উভয় অঞ্চলের বন্দরগুলো বার মাস বরফ মুক্ত থাকে। এ স্রোতের পানিতে হিমশৈল না থাকায় উভয় অঞ্চলের মধ্যে বার মাস জাহাজ চলাচল করে। পৃথিবীর মধ্যে এত বেশি পণ্যবাহী জাহাজ অন্য কোনো সমুদ্রপথে চলাচল করে না। এছাড়া আটলান্টিক মহাসাগরে উষ্ণ ও শীতল স্রোতের মিলনস্থলে শীতল স্রোতের সাথে ভেসে আসা হিমশৈল গলে নুড়ি, কাঁকর, বালি প্রভৃতি সমুদ্রের তলদেশ সঞ্চিত হয়ে মগ্নচড়ার সৃষ্টি করে। এরূপ মগ্নচড়ায় প্রচুর মৎস্যের সমাগম হয় এবং সেখানে মৎস্য শিকার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। সুতরাং বলা যায়, কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য আটলান্টিক মহাসাগরের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ৯

চিত্র: মহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ

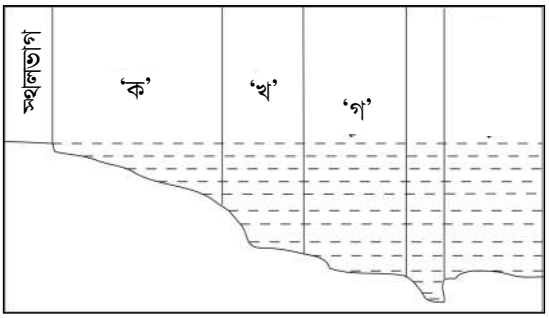

◀ *শিখনফল: ৬ [সরকারি এম.এম. কলেজ, যশোর]*

ক. শৈলশিলা কাকে বলে? ১

খ. মহীস্ফীতি বলতে কী বোঝ? ২

গ. ‘ক’ ও ‘খ’ অঞ্চলটির প্রধান পার্থক্য তুলে ধর। ৩

ঘ. ‘গ’ অঞ্চলটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক চারপাশের ভূ-পাগের শিলার চেয়ে কঠিন শিলায় তৈরি, প্রসারের চেয়ে দৈর্ঘ্য অনেক বেশি এ রকম রৈখিক উচ্চভূমিকে শৈলশিলা বলা হয়।

খ মহীঢালের শেষ প্রান্তে মহাদেশের ভূ-ভাগ থেকে বিপুল পরিমাণ ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থ জমা হয়; অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থানটি মহীস্ফীতি নামে পরিচিত। এ পুরু পলি সঞ্চিত অঞ্চলটি মহাদেশ ও সমুদ্র খাতের মধ্যবর্তী অবস্থান্তর অঞ্চল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

গ চিত্রে ‘ক’ দ্বারা মহীসোপান ও ‘খ’ দ্বারা মহীঢালকে বোঝানো হয়েছে। নিচে এ অঞ্চল দুটির প্রধান পার্থক্য তুলে ধরা হলো—

মহাদেশের কিয়দংশ উপকূল থেকে সাগরের পানির মধ্যে নিমজ্জিত আছে। মহাদেশের এ নিমজ্জিত ঝিনুক অঞ্চলের শেষ প্রান্ত থেকে মহীঢাল পর্যন্ত বিস্তৃত অংশই মহীসোপান। এ স্থানে সমুদ্রের গভীরতা সাধারণত ১৮০ মিটারের বেশি নয়। মহাদেশের এই ক্রমনিম্ন স্বল্প গভীর নিমজ্জিত অংশকে মহীসোপান বলে। মহীসোপান ধীরে ধীরে ১° অপেক্ষা কম কৌণিকভাবে সমুদ্রের দিকে ঢালু হয়ে যায়। ভূআলোড়নের প্রভাবে স্থলভাগের উপকূল অঞ্চল নিমজ্জিত হওয়ায় অথবা সমুদ্রপৃষ্ঠের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মহীসোপানের সৃষ্টি হয়। উপকূলে তরঙ্গের ক্ষয়ক্রিয়া মহীসোপান গঠনে সহায়তা করে।

অন্যদিকে, মহীসোপানের শেষ সীমা হঠাৎ খাড়াভাবে যে ঢাল গভীর সমুদ্রে নেমে যায় তাকে মহীঢাল বলে। এ ঢার এত খাড়া হয় যে তা কখনো ২-৫ ডিগ্রি কৌণিকভাবে, আবার কখনো বা সম্পূর্ণ খাড়া অবস্থায় সমুদ্রতলে নেমে যায়। প্রকৃতপক্ষেম মহীটালই মহাদেশের শেষ সীমা। মহীঢারের গভীরতা ১৮০ থেকে ৩৬০০ মিটার পর্যন্ত হতে দেখা যায় এবং মহীঢাল বেশি খাড়া হওয়ায় খুব একটা প্রশস্ত হতে পারে না। এরা গড়ে ১৬ থেকে ৩২ কি. মি. পর্যন্ত হয়ে থাকে।

ঘ চিত্রে 'গ' দ্বারা গভীর সমুদ্রের সমভূমিকে বোঝানো হয়েছে। নিচে এ অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো–

মহীঢাল শেষ হওয়ার পর হতে সমুদ্রের তলদেশে যে বিস্তৃত সমভূমি অবস্থিত তাকে গভীর সমুদ্রের সমভূমি বলে। এর গভীরতা ৩ থেকে ৫ কিলোমিটার। একে সমুদ্রের সমভূমি বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি মোটেও সমতল নয় । কারণ, গভীর সমুদ্রের সমভূমির উপর জমমগ্ন অনেক মালভূমি, পাহাড়-পর্বত অবস্থান করে। আবার কোথাও বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়গিরি রয়েছে। এসব উচ্চভূমির কোনো কোনোটি আবার পানিরাশির উপর দ্বীপ হিসেবে অবস্থিত। গভীর সমুদ্রের সমভূমির যে অসমতার সৃষ্টি হয়েছে তা ভূ-অভ্যন্তরীণ আগ্নেয়ক্রিয়া এবং ভূ-আন্দোলনের ফল হিসেবে পরিগণিত হয়। গভীর সমুদ্রের সমভূমিতে বিশেষ ধরনের সামুদ্রিক অবক্ষয়ের মাধ্যমে স্তরীভূত শিলা গটিত হয়ে থাকে। তবে এক্ষেত্রে নদীবাহিত পলি ও অন্যান্য পদার্থ এখানে সঞ্চিত হতে পারে না। এখানে অতিসূক্ষ্ম সামুদ্রিক প্রাণী ও উদ্ভিদের মৃতদেহ এবং জীবাশ্ম থেকে এক প্রকার সূক্ষ্ম পলি, সিন্ধু কর্দম বা সিন্ধুমল সঞ্চিত হয়। তাছাড়া সমুদ্র তলদেশের আগ্নেয়গিরিগুলো থেকে উৎপিক্ষপ্ত বিভিন্ন প্রকার পদার্থ, সূক্ষ্ম ভস্ম ও অন্যান্য পদার্থও গভীর সমুদ্রের সমভূমিতে স্তরীভূত আকারে সঞ্চিত হয়। এভাবে সমুদ্রের গভীরে সমভূমিতে স্তরায়নের মাধ্যমে পাললিক শিলা গঠিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ১০ পৃথিবীতে একটি মহাসাগর আছে যার আয়তন ১০ কোটি বর্গকিলোমিটারেরও বেশি। এই মহাসাগরে অনেকগুলো খাত রয়েছে। এমনকি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা গভীরতম খাতটি এ মহাসাগরে অবস্থিত।

◀ *শিখনফল: ৬ [ঢাকা মহানগর মহিলা কলেজ]*

ক. ভারত মহাসাগরের গড় গভীরতা কত? ১

খ. মহীঢাল বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত মহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ কেমন তা চিত্র এঁকে দেখাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শেষ দুটি বাক্যের যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারত মহাসাগরের গড় গভীরতা ৩,৯৬২ মিটার।

খ মহীসোপানের শেষ সীমা থেকে হঠাৎ খাড়াভাবে যে ঢাল গভীর সমুদ্রে নেমে যায় তাকে মহীঢাল বলে।

মহীঢালের গভীরতা ১৮০ থেকে ৩,৬০০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে মহীঢালই মহাদেশগুলোর শেষসীমা।

গ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত মহাসাগরটির নাম প্রশান্ত মহাসাগর।

প্রশান্ত মহাসাগরের আয়তন প্রায় ১৬ কোটি ৬০ লক্ষ বর্গ কি.মি.। এ মহাসাগরের ভূমিরূপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– মহীসোপান, মহীঢাল, মালভূমি, শৈলশিরা, দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ, গভীর খাত, প্রান্তদেশীয় সাগর প্রভৃতি। নিচে প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ চিত্র এঁকে দেখানো হলো:

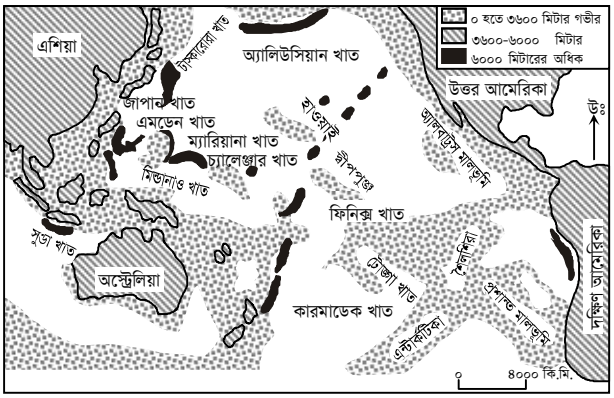

চিত্র: প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ১০ কোটি বর্গকিলোমিটারেরও বেশি আয়তনের মহাসাগরটি হলো প্রশান্ত মহাসাগর। উদ্দীপকের শেষ দুটি বাক্যে বলা হয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের অনেকগুলো খাতের পাশাপাশি পৃথিবীর গভীরতম খাতও এখানেই অবস্থিত।

প্রশান্ত মহাসাগরের পাত সীমানা বরাবর পাতগুলোর মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলেই খাতগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। গভীর সমুদ্রখাত মহাসাগরের পশ্চিম প্রান্তেই অধিক দেখতে পাওয়া যায়। এসব গভীর সমুদ্রখাতের মধ্যে গুয়াম দ্বীপের ৩২২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ম্যারিয়ানা খাত সর্বাপেক্ষা গভীর। এর গভীরতা প্রায় ১০,৮৭০ মিটার এবং এটাই পৃথিবীর গভীরতম খাত।

প্রশান্ত মহাসাগরের অন্যান্য খাতগুলোর মধ্যে ফিলিপাইনের উত্তর-পূর্বে এমডেন খাত, ফিলিপাইনের দক্ষিণ-পূর্বে মিন্ডানাও দ্বীপের পার্শ্ব মিন্ডানাও খাত (১০,৭৯৭ মিটার), জাপানের দক্ষিণ-পূর্বে জাপান খাত (১০,৫৬০ মিটার), কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জের পূর্বে কিউরাইল বা টাস্কারোরা খাত (৮,৫১৮ মিটার) এবং আরও উত্তরে অ্যালিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণে অ্যালিউসিয়ান খাত (৯,১৪৮ মিটার) অবস্থিত। এসব খাত এশিয়ার পূর্ব উপকূলে অনেকটা সারিবদ্ধভাবে অবস্থিত। এছাড়া দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের নিউজিল্যান্ডের উত্তর-পূর্বে কারমাডেক দ্বীপের নিকট কারমাডেক খাত (৯,৪২৪ মিটার) বা এর উত্তরে টোঙ্গা দ্বীপপুঞ্জের পাশে টোঙ্গা খাত (৪,৭১৫ মিটার) এবং আরও উত্তরে ফনিক্স দ্বীপের নিকট ফনিক্স খাত অবস্থিত।

সুতরাং প্রশান্ত মহাসাগরে অসংখ্য খাতের পাশাপাশি পৃথিবীর গভীরতম খাত এখানেই অবস্থিত যা উদ্দীপকের শেষ বাক্য দুটির যথার্থতা নির্দেশ করে।

প্রশ্ন ▶ ১১ ওসমান ন্যাশনাল জিওগ্রাফি চ্যানেলে সমুদ্রের তলদেশের বিভিন্ন ভূমিরূপ দেখছিল। সে দেখল আগ্নেয়গিরির লাভা থেকে সৃষ্ট দীর্ঘপথের মতো একটি চমৎকার ভূমিরূপ। সে আরো লক্ষ করল সমুদ্রের তলদেশে রয়েছে অনেকগুলো খাত।

◀ *শিখনফল: ৬*

ক. জোয়ার-ভাটার প্রধান কারণ কোনটি? ১
খ. হ্রদ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. ওসমানের দেখা সমুদ্র তলদেশের দীর্ঘপথের মতো ভূমিরূপটির ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকে ওসমান সমুদ্র তলদেশে দীর্ঘপথ ছাড়া আর যা দেখল তা বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জোয়ার-ভাটার প্রধান কারণ পৃথিবীর উপর চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণ বল।

খ যে জলভাগের চতুর্দিক স্থলভাগ দিয়ে পরিবেষ্টিত তাকে হ্রদ বলে।

অর্থাৎ মাঝখানে গভীর জলরাশি এবং তার চতুর্দিক স্থল দ্বারা বেষ্টিত যে জলভাগ তাকে হ্রদ বলে। যেমন– রাশিয়ার বৈকাল হ্রদ।

গ ওসমানের দেখা আগ্নেয়গিরির লাভা থেকে সৃষ্ট দীর্ঘপথের মতো ভূমিরূপটির নাম নিমজ্জিত শৈলশিরা।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ভূত্বকের দুর্বল অংশের ফাটলের মধ্য দিয়ে ভূগর্ভস্থ ধূম্র, গ্যাস, গলিত শিলা, ভস্ম এবং বিবিধ তরল ও কঠিন ধাতব পদার্থ নির্গত হয়। দীর্ঘকাল ধরে লাভা ও ভস্ম সমুদ্রগর্ভে জমা হয়ে পাহাড়, পর্বত বা উঁচু টিলা ও শৈলশিরার ন্যায় ভূমিরূপ গঠন করেছে। এগুলোই নিমজ্জিত শৈলশিরা নামে পরিচিত।

নিমজ্জিত শৈলশিরাগুলোর মধ্যে মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরা 'পানি শৈলশিরা', নামে পরিচিত। ভূমিবিজ্ঞানীদের মতে, আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যস্থান দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে একটি সুদীর্ঘ ফাটল ছিল এবং এই ফাটল দিয়ে ভূঅভ্যন্তরীণ পদার্থসমূহ উপরে উত্থিত ও সঞ্চিত হয়ে ঐ শৈলশিরার সৃষ্টি করেছে।

ঘ উদ্দীপকে ওসমান সমুদ্র তলদেশে দীর্ঘপথ ছাড়াও গভীর সমুদ্র খাত ভূমিরূপটি দেখতে পেয়েছিল।

গভীর সমুদ্রখাতগুলোর অধিকাংশই ভূপৃষ্ঠের উচ্চ পর্বতের নিকটতম স্থানে অবস্থিত। কোনো কোনো স্থানে সমুদ্র খাতগুলো পর্বতসমূহের সাথে সমান্তরালভাবে অবস্থিত। কারণ পাশাপাশি অবস্থিত মহাদেশীয় ও সামুদ্রিক প্লেট সংঘর্ষের ফলে সমুদ্র খাত প্লেট সীমানায় অবস্থিত হয়। এ সীমানায় ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি অধিক হয় বলেই এ সকল খাতের সৃষ্টি হয়েছে। এ খাতগুলো অধিক প্রশস্ত নয় তবে খাড়া ঢালবিশিষ্ট।

গভীর সমুদ্রখাত মহাসাগরের পশ্চিম প্রান্তেই অধিক দেখতে পাওয়া যায়। এ সকল গভীর সমুদ্রখাতের মধ্যে গুয়াম দ্বীপের ৩২২ কি. মি. দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত ম্যারিয়ানা খাত সর্বাপেক্ষা গভীর। এর গভীরতা ১০,৮৭০ মিটার এবং এটাই পৃথিবীর গভীরতম খাত। এছাড়া আটলান্টিকের পোর্টোরিকো, ভারত মহাসাগরের সুন্ডা খাত অন্যতম গভীর সমুদ্র খাত।

প্রশ্ন ▶ ১২ আটলান্টিক মহাসাগরের চেয়ে ছোট আয়তনবিশিষ্ট একটি মহাসাগর আছে যার উত্তরাংশ সম্পূর্ণরূপে স্থলভাগ দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই মহাসাগরটিতে অনেকগুলো দ্বীপও রয়েছে।

[ডা. সৈয়দ শাহজাহান আহমেদ, অনু-১১] ◀ শিখনফল-৬

ক. যেকোনো বৃত্তের কৌণিক মান কত? ১
খ. প্রশান্ত মহাসাগরের আকার ও আয়তন কেমন? ২
গ. উদ্দীপকে কোন মহাসাগরের দ্বীপসমূহের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে-ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ইঙ্গিতকৃত মহাসাগরটির কতিপয় উন্নত অংশ রয়েছে।-উক্তিটির যথার্থতা বিচার করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেকোনো বৃত্তের কৌণিক মান ৩৬০°।

খ প্রশান্ত মহাসাগরের আকৃতি একটি বৃহদাকার ত্রিভুজের মতো। এ মহাসাগরের পূর্বদিকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং পশ্চিমে এশিয়া, ওসেনিয়া ও অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ অবস্থিত। এর আয়তন ১৬ কোটি ৬০ লক্ষ বর্গ কি.মি. অর্থাৎ সমগ্র পানিরাশির ৪৫% ও সমগ্র ভূপৃষ্ঠের ৩৫%।

গ উদ্দীপকে ভারত মহাসাগরের দ্বীপসমূহকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ভারত মহাসাগরের পশ্চিমে ও উত্তরে অবস্থিত মাদাগাস্কার ও শ্রীলঙ্কা দ্বীপ। দুটি দ্বীপই মহাদেশের বিচ্ছিন্ন অংশ। জাঞ্জিবার, সকোত্রা এবং কামারো দ্বীপ ওয়ারদুদুই অন্তরীপে অবস্থিত এবং পূর্বদিকে বঙ্গোপসাগরের আন্দামান, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, সবগুলো দ্বীপই মহাদেশের বিচ্ছিন্ন অংশ।

ভারত মহাসাগরের মধ্যে ভগ্ন শৈলশিরাকে অবলম্বন করে কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ গড়ে উঠেছে, যার মধ্যে ভারত উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের কিছু দূরে মালদ্বীপ, লাক্ষা দ্বীপ প্রভৃতি প্রবাল দ্বীপের দেহাবশেষ থেকে গড়ে উঠেছে। এ ছাড়া মাদাগাস্কারের পূর্বে মরিশাস ও রিইউনিয়ন নামে দুটি আগ্নেয় দ্বীপ সৃষ্টি হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে ভারত মহাসাগরকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর কতিপয় উন্নত অংশ রয়েছে, তার প্রমাণ হলো-

এ মহাসাগরের তলদেশে অ্যান্টার্কটিকার মতো মগ্ন শৈলশিরা বর্তমান, যারা গভীর সমুদ্রাঞ্চলকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করেছে। এর মধ্যে দীর্ঘতম অংশটি ভারতের দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপের কাছ থেকে সোজাসুজি দক্ষিণ দিকে অ্যান্টার্কটিকা পর্যন্ত বিস্তৃত। এ উন্নত শৈলশিরাটি ভারত মহাসাগরের মধ্যভাগে অবস্থান করে এর তলদেশকে পূর্ব ও পশ্চিমে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে। এর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত। এর দক্ষিণাংশ সবচেয়ে বেশি বিস্তৃত। এ অংশের নাম আমস্টারডাম সেন্টপল শৈলশিরা। এর উত্তরের অংশ অধিক চওড়া। এ অংশের নাম চ্যাগস শৈলশিরা।

মাদাগাস্কার দ্বীপের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত সকোত্রা দ্বীপ থেকে অপর একটি প্রশস্ত শৈলশিরা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে চ্যাগস দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত। একে সকোত্রা চ্যাগস শৈলশিরা বলা হয়। মাদাগাস্কার দ্বীপের উত্তর-পূর্ব দিক থেকে অপর একটি শৈলশিরা

দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে চ্যাগস শৈলশিরার সাথে মিলিত হয়েছে, এর নাম সিচিলিস শৈলশিরা। মাদাগাস্কারের দক্ষিণ থেকে অপর একটি শৈলশিরা মাদাগাস্কার শৈলশিরা নামে দক্ষিণে বিস্তৃত। এর দক্ষিণ প্রান্ত অপর একটি বিস্তৃত শৈলশিরার সাথে মিলিত হয়েছে। এর নাম প্রিন্স এডওয়ার্ড ক্রোজেট শৈলশিরা।
সুতরাং উপরোক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় ভারত মহাসাগরটির কতিপয় উন্নত অংশ রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ ইউরোপ থেকে আমেরিকাগামী বাণিজ্য জাহাজগুলো যে মহাসাগর অতিক্রম করে তার আকৃতি অনেকটা ইংরেজি S অক্ষরের মতো এবং গড় গভীরতা প্রায় ৩,৯৩২ মিটার।

◀ শিখনফল: ৬

ক. পৃথিবীর গভীরতম খাতের নাম কী? ১
খ. মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরা বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মহাসাগরের অবস্থান ও আকার-আয়তন বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মহাসগরের তলদেশের ভূমিরূপ বিশ্লেষণ কর। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ম্যারিয়ানা খাত পৃথিবীর গভীরতম খাত।

খ আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশের সর্বাধিক বৈচিত্র্য হলো এর তলদেশের টিক মাঝ বরাবর দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত উচ্চভূমি। মহাসাগরের সাথে এ উচ্চভূমি উত্তর-দক্ষিণে সমান্তরালভাবে বিস্তৃত হওয়ায় এর আকৃতিও ইংরেজি 'S' অক্ষরের মতো। এ সুবিস্তৃত উচ্চভূমি মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরা নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত মহাসাগরটি হলো আটলান্টিক মহাসগার। নিচে এ মহাসগরের অবস্থান ও আকার-আয়তন বর্ণনা করা হলো—
আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্বদিকে ইউরোপ ও আফ্রিকা, পশ্চিম উপকূলে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তরের কিছু অংশ জুগে গ্রিনল্যান্ড ও আইসল্যান্ড দ্বীপ অবস্থিত এ মহাসাগরের ঠিক মাঝ বরাবর দিয়ে নিরক্ষরেখা অতিক্রম করেছে।
আয়তনে আটলান্টিক মহাসাগর প্রশান্ত মহাসগরের প্রায় অর্ধেক। এ মহাসগরের আকৃতি অনেকটা ইংরেজী বর্ণমালা S অক্ষরের মতো। এ মহাসাগরের আয়তন প্রায় ৮ কোটি ২৪ লক্ষ বর্গ কি. মি.। এর আয়তন পৃথিবীর সমগ্র ভূ-ভাগের প্রায় ১৬% এবং সমগ্র পানিরাশির প্রায় ২৫%। নিরক্ষরেখা বরাবর এ মহাসাগরের বিস্তৃতি কম। কিন্তু নিরক্ষরেখা থেকে উত্তর-দক্ষিণে ক্রমশ চওড়া।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত মহাসাগরটি হলো আটলান্টিক মহাসাগর। নিচে এ মহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ বিশ্রেষণ করা হলো—

মহীসোপান ও মহীঢাল ঃ উত্তর আটলান্টিক মহাসগরের মহীসোপান পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিস্তৃত; কিন্তু দক্ষিণ আটলান্টিক এর মহীসোপান খুবই সরু। এ কারণে উত্তর আটলান্টিকে মহীঢালের পরিমান কম এবং দক্ষিণ আটলান্টিকে মহীঢালের পরিমান বেশি।

শৈলশিরা ঃ আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশের সর্বাধিক বৈচিত্র হলো এর তলদেশের ঠিক মাঝ বরাবর দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত উচ্চভূমি। মহাসাগরের সাথে এ উচ্চভূমি উত্তর-দক্ষিণে সমান্তরালভাবে বিস্তৃত হওয়ায় এর আকৃতিও ইংরেজি S অক্ষরের মতো। এ সুবিস্তৃত উচ্চভূমি মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরা নামে পরিচিত। এটি প্রায় ২০,০০০ কি.মি. দীর্ঘ ও সমুদ্র তলদেশ ১,০০০-২,০০০ মিটার উচ্চে অবস্থিত।

মহাসাগরীয় দ্বীপসমূহ ঃ এ মহাসাগরে দ্বীপের সংখ্যা অনেক কম। উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্ব উপকূলে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ এবং পশ্চিম উপকূলে নিউফাউন্ডল্যান্ড দ্বীপ প্রকৃতপক্ষে, মহীসোপানের উচ্চতম অংশ। কতিপয় দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের উত্তর সীমা ও গ্রীনল্যান্ডের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত হয়ে অবস্থিত।

গভীর খাত ঃ আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় ভঙ্গিল পর্বত নেই। এ মহাসাগরের অগভীরতম খাত পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের উত্তরে পোর্টোরিকো দ্বীপের নিকট অবস্থিত। এর গভীরতা ৮,৪৭৪ মিটার।

প্রান্তদেশীয় সাগরসমূহ ঃ আটলান্টিক মহাসাগরে সাগর ও উপসাগরের সংখ্যা খুবই কম। এ মহাসাগরে অবস্থিত সাগর ও উপসাগরের প্রায় সবগুলো উত্তর আটলান্টিকে অবস্থিত। এ মহাসাগরের অবস্থিত উপসাগরের মধ্যে ইউরোপের উপকূলে বিস্কে উপসাগর, আফ্রিকার উপকূলে গিনি উপসাগর, উত্তর আমেরিকার উপকূলে মেক্সিকো উপসাগর প্রভৃতি।

প্রশ্ন ▶ ১৪

খাতের নাম	অবস্থান
ক	পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের পূর্বে পোর্টোরিকো দ্বীপের নিকটে
খ	হর্ন অন্তরীপের পূর্বে

[তাপস কুমার মজুমদার; ঢনু-২] ◀ শিখনফল: ৬

ক. পৃথিবীর বৃহত্তম মহাসাগর কোনটি? ১
খ. 'S' আকৃতির মহাসাগরটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে ক চিহ্নিত খাতটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে 'ক' ও 'খ' চিহ্নিত খাতের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৃথিবীর বৃহত্তম মহাসাগর হলো প্রশান্ত।

খ 'S' আকৃতির মহাসাগরটি হলো আটলান্টিক।
আটলান্টিক মহাসাগর পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম। প্রশান্ত মহাসাগরের পরেই এর অবস্থান। এ মহাসাগরের আয়তন প্রায় ৮ কোটি ২৪ লক্ষ বর্গ কি. মি.। এর গড় গভীরতা প্রায় ৩,৯৬২ মি.।

গ উদ্দীপকে 'ক' চিহ্নিত খাতটির নাম হলো পোর্টোরিকো।
গভীর সমুদ্রের সমভূমি অঞ্চলের মাঝে মাঝে গভীর খাত দেখা যায়। এগুলোকে গভীর সমুদ্র খাত বলে। পোর্টোরিকো আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত।
আটলান্টিকের খাতগুলোর গভীরতা সাধারণভাবে প্রশান্ত মহাসাগরের চেয়ে অনেক কম। তবে পোর্টোরিকো খাতের গভীরতা ৮,৪৭৪ মিটার। এটি পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের পূর্বে পোর্টোরিকো দ্বীপের নিকট অবস্থিত।

ঘ উদ্দীপকে 'ক' চিহ্নিত খাতটি হলো পোর্টোরিকো। এটি পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের পূর্বে পোর্টোরিকো দ্বীপের নিকটে অবস্থিত। অন্যদিকে 'খ' চিহ্নিত খাতটি হলো দক্ষিণ স্যান্ডউইচ যা হর্ন অন্তরীপের পূর্বে অবস্থিত।

উল্লিখিত দুটি খাতই আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত। প্রশান্ত মহাসাগরের তুলনায় আটলান্টিকের তলদেশে গভীর খাতের সংখ্যা অনেক কম। কেননা এর উপকূলে প্রশান্ত মহাসাগরের মতো ভঙ্গিল পর্বত নেই। এ মহাসাগরের গভীরতম খাত পোর্টোরিকো পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের পূর্বে পোর্টোরিকো দ্বীপের নিকট অবস্থিত। এর গভীরতা ৮,৪৭৪ মিটার।

দক্ষিণ স্যান্ডউইচ এ মহাসাগরের দ্বিতীয় বৃহত্তম খাত। আটলান্টিক মহাসাগরের দক্ষিণ অংশে হর্ন অন্তরীপের দক্ষিণ স্যান্ডউইচ দ্বীপের নিকট এটি অবস্থিত। এ খাতের গভীরতা ৮,২৩০ মিটার।

প্রশ্ন ▶ ১৫

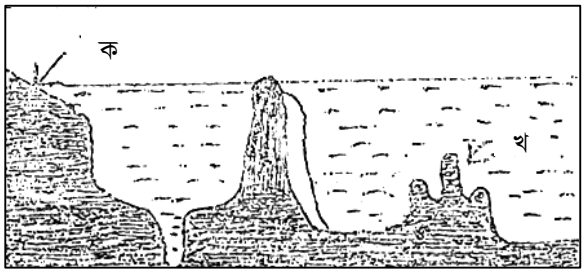

◀ *শিখনফল: ৫ ও ৬ [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]*

ক. উপসাগর কী? ১

খ. বারিমণ্ডল বলতে কী বোঝ? ২

গ. চিত্রে 'ক' চিহ্নিত ভূমিরূপটির নাম কী? বঙ্গোপসাগরের তলদেশে সৃষ্ট এ ধরনের ভূমিরূপটির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. চিত্রে 'খ' চিহ্নিত ভূমিরূপটি আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক একদিকে জল এবং তিন দিক স্থলভাগ দ্বারা পরিবেষ্টিত জলরাশিই উপসাগর। যেমন– বঙ্গোপসাগর।

খ বারিমণ্ডল বলতে পৃথিবীর সকল জলরাশির অবস্থানভিত্তিক বিস্তরণকে বোঝায়।

পৃথিবীর সকল জলরাশির শতকরা প্রায় ৯৭ ভাগ পানি রয়েছে সমুদ্রে এবং বাকি ৩ ভাগ রয়েছে নদী, হিমবাহ, ভূগর্ভস্থ হ্রদ, মৃত্তিকা, বায়ুমণ্ডল ও জীবমণ্ডলে।

গ চিত্রের 'ক' চিহ্নিত ভূমিরূপটি হলো মহীসোপান।

বঙ্গোপসাগরের তলদেশে সৃষ্ট এ ভূমিরূপটির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা হলো–

বঙ্গোপসাগরের স্থলভাগ সংলগ্ন প্রায় ৭ লক্ষ বর্গ কি.মি. মহীসোপান রয়েছে। এর গভীরতা অনধিক ২০০ মিটার। এই মহীসোপানের গভীরতার পরিমাণ উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে বেশি। ভারত মহাসাগরের সেন্ট পল শৈলশিরার বর্ধিত অংশ বঙ্গোপসাগরের মধ্যভাগ দিয়ে মিয়ানমার অতিক্রম করে কামচাটকা পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে। বাংলাদেশ সংলগ্ন উপকূলে অবস্থিত মহীসোপানের প্রশস্ততা ১২৮ থেকে ১৫০ কিলোমিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মিয়ানমার উপকূল বরাবর মহীসোপানের প্রশস্ততা ৫৪ থেকে ১৬০ কিলোমিটার, শ্রীলংকার পূর্ব উপকূল প্রান্তে ৪৫° ঢালবিশিষ্ট মহীসোপান সর্বাধিক খাড়া ঢালবিশিষ্ট।

ঘ চিত্রের 'খ' চিহ্নিত ভূমিরূপটি নিমজ্জিত শৈলশিরা।

আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য এর মধ্যভাগে অবস্থিত উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত শৈলশিরা। এটি মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরা নামে পরিচিত। এটি একটি পানিমগ্ন শৈলশিরা। এর আকৃতি ইংরেজি 'S' অক্ষরের মতো। এটি দুটি অংশে বিভক্ত। বিষুবরেখার উত্তরে অবস্থিত এর উত্তরাংশকে ডলফিন এবং দক্ষিণাংশকে চ্যালেঞ্জার শৈলশিরা বলা হয়। এ উচ্চভূমির গভীরতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে প্রায় ৩,০৪৮ মিটার।

ডলফিন শৈলশিরার উত্তরাংশ প্রশস্ত হয়ে সুবিস্তৃত মালভূমিতে পরিণত হয়েছে। এর নাম টেলিগ্রাফ মালভূমি। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিম দিকে এ মালভূমির পূর্বাংশ উইভিল টমসন এবং ফ্যারো আইসল্যান্ড শৈলশিরা নামে পরিচিত। গ্রীনল্যান্ড ও আইসল্যান্ডের মধ্যবর্তী উন্নত অংশের নাম গ্রীনল্যান্ড শৈলশিরা। গ্রীনল্যান্ডের পশ্চিম পাশ দিয়ে বেফিন উপসাগরের দিকে বিস্তৃত উন্নত ভূমিকে বেফিন গ্রীনল্যান্ড শৈলশিরা বলা হয়।

উত্তর আটলান্টিকের মতো দক্ষিণ আটলান্টিকেও কতিপয় শৈলশিরা রয়েছে। সেখানকার চ্যালেঞ্জার শৈলশিরার দক্ষিণ দিকের ত্রিস্তান-দা-কুন্‌হা দ্বীপের নিকট হতে একটি শৈলশিরা উত্তর পূর্ব দিকে প্রসারিত হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত। এর নাম ওয়ালভিস শৈলশিরা। এছাড়া ত্রিস্তান-দা-কুন্‌হা দ্বীপ হতে একটি বিচ্ছিন্ন ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি শৈলশিরা এর পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এটি রায়োগ্র্যান্ড শৈলশিরা (Riograndi Ridge) নামে পরিচিত। আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশের শৈলশিরা ও মালভূমি পরস্পরের সাথে সংযুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ১৬

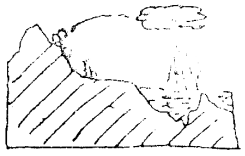

◀ *শিখনফল: ৭ [বি. এ. এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. উপসাগর (Bay) কাকে বলে? ১

খ. ঝিনুক অঞ্চল কী? ২

গ. চিত্রটি দ্বারা যা বুঝানো হয়েছে তার বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. চিত্রের চক্রটির মানব জীবনে প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক তিনদিকে স্থলভাগ দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং একদিকে জলভাগ তাকে উপসাগর বলে।

খ তটদেশীয় অঞ্চলের পর থেকে মহীসোপানের শেষসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত অংশকে ঝিনুক অঞ্চল বলা হয়। এ অঞ্চলে সমুদ্র তরঙ্গ সবচেয়ে বেশি ক্রিয়াশীল। সমুদ্র তরঙ্গের ক্ষয় ও গঠনক্রিয়া এ অঞ্চলে সুস্পষ্ট। সমগ্র পৃথিবীতে এর মোট আয়তন প্রায় ২৫০ লক্ষ বর্গ কি. মি.।

গ উপরের চিত্রটি দ্বারা যা বোঝানো হয়েছে তা হলো পানি চক্র। নিচে পানি চক্র বর্ণনা করা হলো–

পানি চক্র বলতে বোঝায় পানির রূপান্তরের মাধ্যমে স্থানান্তর এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আবার স্বস্থানে ফিরে আসা। পানির এই রূপান্তর ঘটে জলবায়ুর তারতম্যের ফলে। সূর্যরশ্মির তাপে সমুদ্র, হ্রদ, নদী ও ান্যান্য জলাশয় থেকে পানি বাষ্পীভবনের মাধ্যমে বাষ্পরূপে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে এং সেখান থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বারিপাতের মাধ্যমে পৃথিবীতে ফিরে আসে। এ প্রক্রিয়ার বৃহদাংশই সমুদ্রে সংগঠিত হয়। তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত কম অংশ সমুদ্র থেকে ভূ-ভাগে আসে আবার সমুদ্রেই প্রত্যাবর্তন করে। পানি চক্রের প্রক্রিয়া ভূ-ভাগে বেশ জটিল এবং আমাদের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ব পানি চক্রের নিরিখে আবর্তমান পানির পরিমান স্থির অর্থাৎ পানি চক্রের মাধ্যমে মোট পানির কোনো ঘাটতি বা সংযোজন কোনো কিছুই ঘটে না। পানি চক্র সূর্যরশ্মি দ্বারা পরিচালিত হয়। কঠিন ও দ্রবীভূত পদার্থের স্থানান্তরও পানি চক্রের কাজ। ভূপৃষ্ঠে পানি চক্র ৬টি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

ঘ চিত্রের চক্রটি হলো পানি চক্র। পানি চক্র মানবজীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে নিচে মানবজীবনে পানি চক্রের প্রভাব বিশ্লেষণ করা হলো–

i. পানিছাড়া জীব বাঁচতে পারে না। তাই পানির অপর নাম জীবন।
ii. জীবের উৎপত্তিস্থল হলো পানি।
iii. জীবন পানি চক্র নির্ভর।
iv. আমাদের শরীরের দুই-তৃতীয়াংশই হলো পানি।
v. পানির মাধ্যমেই মানব দেহের সব বিপাক ক্রিয়া সংঘটিত হয়।
vi. জীবের অনুকুল তাপমাত্রা বজায় রাখার জন্য পানি চক্র অপরিহার্য।
vii. পানি জীবের ক্ষরণ, রেচন, শোষণ, পরিবহন, শ্বসন ইত্যাদি জৈবনিক প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে।
viii. মানবদেহের যে শারীতাত্ত্বিক কার্যাবলি এনজাইমের সাহায্যে পরিচারিত হয় তা পানি ছাড়া সম্ভব নয়।
ix. জীবের জন্ম, বৃদ্ধি, বিস্তার ইত্যাদি পানি চক্রের দ্বারা সম্পন্ন হয়। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, পানি চক্রের সাথে মানব জীবনের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। পানি ছাড়া জীবন বাঁচতে পারে না। জীবনের উৎপত্তি স্থল হলো পানি।

প্রশ্ন ▶ ১৭ একটি চক্রের মাধ্যমে সূর্যরশ্মির তাপে সমুদ্র, হ্রদ, নদী ও অন্যান্য জলাশয় থেকে পানি বাষ্পীভবনের মাধ্যমে বাষ্পরূপে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বারিপাতের মাধ্যমে পৃথিবীতে ফিরে আসে। আর এ প্রক্রিয়ার বৃহদাংশই সমুদ্রে সংঘটিত হয়। *◀ শিখনফল: ৭*

ক. প্রশান্ত মহাসাগরের সর্বাধিক বিস্তৃতি কোথায়? ১
খ. প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশের গভীরতা কীরূপ? ২
গ. উদ্দীপকের চক্রটি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও জীবজগতে কীরূপ ভূমিকা পালন করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত চক্রটির প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রশান্ত মহাসাগরের সর্বাধিক বিস্তৃতি নিরক্ষরেখার কাছে।

খ পৃথিবীর বৃহত্তম ও গভীরতম মহাসাগর হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগর।

প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশ অন্যান্য মহাসাগর অপেক্ষা অধিক গভীর। এ মহাসাগরের সমভূমি অঞ্চলের গভীরতা ৭,২৫০ মিটার, সর্বোচ্চ গভীরতা ১০,৯৬০ মিটার।

গ উদ্দীপকের চক্রটি পানিচক্র। জীবজগতের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য যে তিনটি উপাদান আবশ্যক (মাটি, পানি, বায়ু) তন্মধ্যে পানি অন্যতম ও প্রধান।

যেহেতু, পানি ছাড়া জীবজগতের অস্তিত্ব সম্ভব নয়, তাই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এবং জীবজগতে পানিচক্রের ভূমিকা অপরিসীম।

সৃজনশীল ১৭ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

অতএব বলা যায়, পানি চক্র পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ও জীবজগতের জীবন প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রাখে।

ঘ উক্ত প্রক্রিয়াটি পানিচক্র।

পানি তার উৎসস্থল থেকে স্থানান্তরিত হয়ে বিভিন্ন রূপান্তরের মাধ্যমে আবার উৎসস্থলে ফিরে আসার প্রক্রিয়াকে পানিচক্র বলে।

সূর্যরশ্মির তাপে সমুদ্র, হ্রদ, নদী ও অন্যান্য জলাশয় থেকে পানি বাষ্পীভবনের মাধ্যমে বাষ্পরূপে প্রথমে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। বায়ুতে বাষ্পীভূত জলীয়বাষ্প ওপরে উঠে শীতল ও ঘনীভূত হয়ে জলকণার আকার ধারণ করে অবশেষে বারিপাত ঘটায়। বারিপাত পানিচক্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমুদ্র ও স্থলভাগ থেকে বাষ্পীভূত পানি তুষার, শিলা ও বৃষ্টিরূপে পৃথিবীপৃষ্ঠে আসে। স্থলভাগে পতিত বৃষ্টিরপানি বিভিন্ন অবস্থা অতিক্রম করে আবার সাগরে গিয়ে পড়ে। অতঃপর স্থলভাগে পতিত কিছু পানি চুঁইয়ে বা থিতিয়ে মাটির স্তরে প্রবেশ করে এবং এ পানিও কতিপয় প্রক্রিয়ায় সাগরে গিয়ে মিলিত হয়। অথবা উদ্ভিদকূল কিছু পানি গ্রহণ করে পরবর্তীতে প্রস্বেদনের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেয়। এভাবে বায়ুমণ্ডল থেকে ভূপৃষ্ঠে এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে বায়ুমণ্ডলে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ পানি চক্রাকারে আবর্তিত হয় এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে জীবজগতকে সচল রাখে।

প্রশ্ন ▶ ১৮ পৃথিবীর প্রায় ৭১ ভাগ জল আর ২৯ ভাগ স্থল। জল ও স্থলভাগের বিন্যাসের দিকে তাকালে এক অদ্ভুত সামঞ্জস্য দেখা যায়। পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে তাকালেই দেখতে পাওয়া যায় জলভাগের পর স্থলভাগ, আবার জলভাগ বা বারিমণ্ডল। প্রকৃতপক্ষে, জীবমণ্ডলের উপর বারিমণ্ডলের প্রভাব অপরিসীম।

[ড. সৈয়দ শাহজাহান আহমেদ; অনু-৩১] ◀ শিখনফল: ৭

ক. সাগর কাকে বলে? ১
খ. পানিচক্রে ঘনীভবনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিষয়টির অবস্থান মানচিত্র এঁকে দেখাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে জীবজগতের উপর বারিমণ্ডলের প্রভাব মূল্যায়ন করো। ৪

১৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহাসাগর অপেক্ষা স্বল্প আয়তন বিশিষ্ট জলরাশিকে সাগর বলে।

খ বায়ু শীতল হতে থাকলে উষ্ণতর অবস্থার মতো বেশি জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে না, তখন জলীয়বাষ্পের কিছু অংশ পানিতে পরিণত হয় একে ঘনীভবন বলে।

পানিচক্রে ঘনীভবনের ভূমিকা ব্যাপক। বায়ুমণ্ডলে জলীয়বাষ্পকে পানি বিন্দুতে পরিণত করতে ঘনীভবন সাহায্য করে থাকে। বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেলে ঘনীভবন এই পানিবিন্দুকে কঠিন শিলায় পরিণত করে। অসংখ্য পানিকণার মিলনে মেঘ হয় এবং এই মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। এভাবে ঘনীভবন পানিচক্রে ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিষয়টি হচ্ছে, জলভাগের পর স্থলভাগ আবার জলভাগ বা বারিমণ্ডল।

অর্থাৎ স্থলভাগ ও জলভাগের পারস্পরিক অবস্থান। উদ্দীপকে উল্লেখিত ইঙ্গিতকৃত বিষয়টির অবস্থান মানচিত্র এঁকে দেখানো হলো-

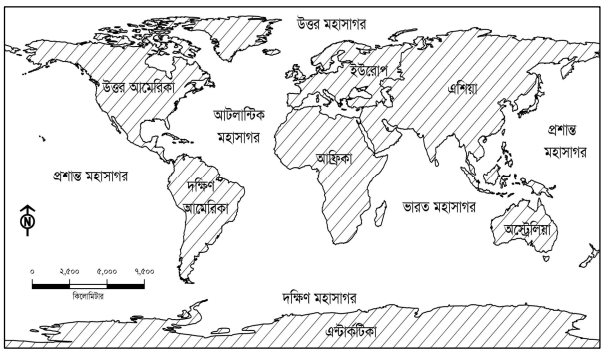

চিত্র: পৃথিবীর জল ও স্থলভাগের অবস্থান।

ঘ জীবজগতের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পানি যা বারিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। বারিমণ্ডল একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশীয় উপকরণ যা পরিবেশতন্ত্রের গঠন ও কার্য নির্ধারণ করে এবং উদ্ভিদ ও প্রাণী তথা জীবজগতের পরিবেশ বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করে।

বারিমণ্ডলের উপর জীবজগত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। জীবজগতের সকল বিপাকীয় কাজ পানির মাধ্যমেই সংঘটিত হয়। সালোকসংশ্লেষণে কার্বন বিজারণের জন্য পানি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। আর সালোকসংশ্লেষণ সম্ভব না হলে উদ্ভিদ খাদ্য তৈরি করতে পারবে না। আর উদ্ভিদের খাদ্য তৈরিতে বিঘ্ন ঘটলেই তা প্রাণিকূলের জন্য হুমকিস্বরূপ। কারণ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে না।

এছাড়াও বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য উপাদান হলো পানি। কারণ পানি ছাড়া বেঁচে থাকা অসম্ভব। এজন্য পানির অপর নাম জীবন। পানি চক্র যা বারিমণ্ডলের অন্যতম অনুসঙ্গ তা জীবজগতে অনুকূল তাপমাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে। জীবের ক্ষরণ, রেচন, শোষণ, পরিবহন, শ্বসন ইত্যাদি কাজে পানি ব্যাপক ভূমিকা রাখে। এছাড়াও জীবদেহে যে শারীরতাত্ত্বিক কার্যাবলি এনজাইমের সাহায্যে পরিচালিত হয় তা পানি ছাড়া একেবারে অসম্ভব।

সুতরাং, জীবজগতের অস্তিত্ব বারিমণ্ডল ছাড়া কল্পনাও করা যায় না। অর্থাৎ জীবজগতে বারিমণ্ডলের প্রভাব ব্যাপক।

প্রশ্ন ▶ ১৯ মি. রেজাউল সাহেব তার একাদশ শ্রেণিতে পড়ুয়া ছেলে রিপনকে এশিয়া ও আমেরিকার মধ্যবর্তী স্থানের মহাসাগরটি মানচিত্রে দেখিয়ে বললেন এটি হলো পৃথিবীর গভীরতম মহাসাগর। *[তাপস কুমার মজুমদার; ঢনু-১]* ◀ *শিখনফল: ৬*

ক. মহীসোপান কী? ১
খ. সমুদ্রে জোয়ার-ভাটার পানি উঠা নামাকারী অঞ্চলটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে রেজাউল সাহেব যে মহাসাগরটি দেখালেন সেটি কোন মহাসাগর? আলোচনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত মহাসাগরটির তলদেশের ভূপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহাদেশসমূহের বাইরে সমুদ্রের উপকূল রেখা থেকে তলদেশের দিকে ক্রমনিম্ন নিমজ্জিত অংশই মহীসোপান।

খ জোয়ারের সময় সমুদ্রের পানি সমুদ্র তীরের যতদূর পর্যন্ত উপরে ওঠে এবং সেখান থেকে ভাটার টানে তা যে স্থান পর্যন্ত নিচে নেমে যায় সে স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত অংশকে তটদেশীয় অঞ্চল বলে।

তটদেশীয় অঞ্চল স্থলভাগ থেকে সাগর পর্যন্ত প্রায় ৩ কি. মি পর্যন্ত বিস্তৃত। পৃথিবীতে এ অঞ্চলের মোট আয়তন প্রায় ১৫৫ হাজার বর্গকিলোমিটার।

গ রেজাউল সাহেব তার ছেলে রিপনকে এশিয়া ও আমেরিকার মধ্যবর্তী স্থানে যে মহাসাগরটি দেখালেন সেটি হলো প্রশান্ত মহাসাগর। প্রশান্ত মহাসাগর হলো পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মহাসাগর। প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমে এশিয়া মহাদেশ এবং পূর্বে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা অবস্থিত। প্রশান্ত মহাসাগর হলো পৃথিবীর মধ্যে গভীরতম মহাসাগর। সমগ্র ভূপৃষ্ঠের প্রায় ৩৫% জুড়ে এর বিস্তৃতি। মোট আয়তন ১৬ কোটি ৬০ লক্ষ বর্গ কি. মি.। যা ভূপৃষ্ঠের সমগ্র জলভাগের ৪৫% স্থান জুড়ে বিস্তৃত। এর সর্বোচ্চ গভীরতা ১০.৭৯ কি. মি. এবং গড় গভীরতা প্রায় ৪,২৭০ মিটার। আকৃতি অনেকটা ত্রিভুজের মতো। এই ত্রিভুজের শীর্ষ দেশ বেরিং প্রণালি থেকে ক্রমশ দক্ষিণ দিকে অধিক প্রশস্ত হয়ে গেছে।

নিরক্ষরেখার নিকট প্রশান্ত মহাসাগর সর্বাধিক প্রশস্ত। যেখানে পূর্ব-পশ্চিম এর বিস্তৃতি প্রায় ১৬৫,৩০০ কি. মি. এবং উত্তর দক্ষিণে বিস্তার ১৫,১৬০ কি. মি.। এ মহাসাগরের বিভিন্ন দিকে ছোট বড়

প্রায় বিশ হাজারের মতো দ্বীপ রয়েছে। এ মহাসাগরের পশ্চিম দিকে ওখস্টক সাগর, পীতসাগর, পূর্ব চীন সাগর এবং উত্তর দিকে বেরিং সাগর, প্রশান্ত মহাসাগরের মহীসোপান অন্তর্গত।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত মহাসাগরটি হলো প্রশান্ত মহাসাগর।

অন্যান্য মহাসাগরের তলদেশ অপেক্ষা প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশ খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ। এর তলদেশে অসংখ্য গিরিখাত, শৈলশিরা, দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ এবং বিপুল পরিমাণ গভীর সমুদ্রের সমভূমি রয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরের ভূমিরূপগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো:

মহীসোপান ও মহীঢাল: প্রশান্ত মহাসাগর আয়তনের তুলনায় বৃহত্তম হলেও অন্যান্য মহাসাগরের চেয়ে এর মহীসোপান খুবই কম। এশিয়ার উপকূলবর্তী সাগর ছাড়া সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরের চারদিকে মহীসোপান খুবই অপ্রশস্ত। কোনো কোনো স্থানে সমুদ্রের তীরস্থ অংশ খাড়াভাবে গভীর সমুদ্রে প্রবেশ করেছে। মহীসোপান কম হওয়ায় মহীঢালের পরিমাণ বেশি।

মালভূমি: প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশের মালভূমিগুলোর মধ্যে বিখ্যাত মালভূমি হলো দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম প্রান্তের অ্যালবাট্রস মালভূমি। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর গড় গভীরতা ৪,০০০ মিটার। চিলির পশ্চিম দিকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত অপর একটি মালভূমি রয়েছে। একে দক্ষিণ-পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় মালভূমি বলে।

শৈলশিরা: প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে উল্লেখযোগ্য যে শৈলশিরাগুলো রয়েছে সেগুলো হলো- মধ্যভাগের হাওয়াই দ্বীপের দক্ষিণে হাওয়াই উচ্চভূমি, ম্যারিয়ানা খাতের পূর্বে মার্কাস নেকার উচ্চভূমি, পূর্বদিকে উত্তর-দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিমদিকে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় উচ্চভূমি, কুমেরু মহাসাগরের উত্তরে প্রশান্ত কুমেরু শৈলশিরা, চিলি উপকূলের সমান্তরাল উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত স্যান ফেলিক্রুজুয়ান ফার্নান্ডেজ শৈলশিরা।

দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ: প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে অসংখ্য ছোট-বড় দ্বীপ বিভিন্ন আকৃতির দ্বীপমালা গঠন করেছে। পাত সীমানা বরাবর ভূঅভ্যন্তরস্থ লাভা নির্গত হয়ে এ সকল আগ্নেয় দ্বীপ গঠিত হয়েছে।

অববাহিকা বা বেসিন: এ মহাসাগরের গভীর সমুদ্রের সমভূমির অনেক স্থানের আকৃতি সরার (পাতিলের) মতো। এ স্থানগুলোর গড় গভীরতা প্রায় ৭,৩০০ মিটার।

চ্যুতি: উত্তর-দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত ৭টি চ্যুতি রয়েছে, যার প্রত্যেকটি প্রায় ৪,০০০-৪,৫০০ কি. মি. দীর্ঘ।

গভীর খাত: প্রশান্ত মহাসাগরের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো প্রান্তদেশে অবস্থিত বহু সুদীর্ঘ গভীর সমুদ্রখাত। এ গভীর সমুদ্রখাতগুলোর অধিকাংশই মহাসাগরের পশ্চিমপ্রান্তে দেখা যায়।

প্রান্তদেশীয় সাগরসমূহ: প্রশান্ত মহাসাগরের প্রান্তভাগে প্রধান পানিরাশি থেকে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি সাগর রয়েছে। এ বিচ্ছিন্ন সাগরগুলো মহাসাগরের পশ্চিমে এশিয়া মহাদেশ ও তৎসংলগ্ন দ্বীপমালার মধ্যবর্তী অঞ্চলেই অধিক দেখা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, এ মহাসাগরের তলদেশে যেসব ভূমিরূপ রয়েছে সেগুলো এ মহাসাগরের বৈচিত্র্যতাকে বৃদ্ধি করেছে।

প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ২০ মানচিত্রে সাগরের বিভিন্ন নামকরণ দেখে মাসুদ অবাক হয় কীভাবে এদের সীমানা নির্ধারিত হয়। এ সম্পর্কে জানতে গিয়ে সে বুঝতে পারে একটি সাগর সারা বছর বরফে আবৃত থাকে। ◀ *শিখনফল: ২*

ক. মহাসমুদ্র কী? ১

খ. পাইচিত্রের অসুবিধাগুলো লিখো। ২

গ. মাসুদের দেখা জলভাগের সীমানা কীভাবে নির্ধারিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মাসুদের জানা বরফে আবৃত জলভাগ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখো। ৪

২০নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহাদেশকে আবৃত করে অবস্থিত জলরাশিই মহাসমুদ্র।

খ বৃত্তের সাহায্যে তথ্য প্রদর্শনের পদ্ধতিকে পাইচিত্র বলে।

পাইচিত্রের অসুবিধাগুলো হলো– বিভিন্ন দ্রব্যের বৃদ্ধি বা উৎপাদনের প্রবণতা দেখানো যায় না। এটি দেখামাত্র সঠিক তথ্য জানা সম্ভব হয় না। এটি অঙ্কনেও অসুবিধা হয়ে থাকে।

সুপার টিপস্ : প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ সাগরের সীমানা নির্ধারিত হয় প্রাকৃতিকভাবে স্থলভাগের অবস্থান, দ্বীপ বা উপদ্বীপের অবস্থানের দ্বারা ব্যাখ্যা করো।

ঘ আর্কটিক সাগর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করো।

অষ্টম অধ্যায়

সমুদ্রস্রোত ও জোয়ার-ভাটা

পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶১ হারুন সাহেব সহকর্মীদের সাথে পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে গেলেন। বড় বড় ঢেউ সৈকতে এসে আছড়ে পড়ছে। এ অবস্থা দেখে তিনি বললেন, মহাসাগরগুলোতে তাপমাত্রার পার্থক্যের কারণে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়। ◀ *শিখনফল: ১*

ক. সমুদ্রস্রোত সম্পর্কিত ফেরেলের সূত্রটি লেখো। ১

খ. 'বায়ুপ্রবাহ সমুদ্রস্রোত সৃষ্টির প্রধান কারণ'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে হারুন সাহেব সমুদ্রস্রোত সৃষ্টিতে কীসের ভূমিকার কথা বলেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. হারুন সাহেবের উল্লেখিত কারণটি ছাড়াও সমুদ্রস্রোত সৃষ্টি হতে পারে– বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমুদ্রস্রোত সম্পর্কে আমেরিকান আবহাওয়াবিদ উইলিয়াম ফেরেলের সূত্রটি হলো— "সমুদ্রস্রোত উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বামদিকে বেঁকে প্রবাহিত হয়।"

খ সমুদ্রস্রোত সৃষ্টির প্রধান কারণ বায়ুপ্রবাহ।

মহাসাগরগুলোর উপরিভাগের পানিরাশি বায়ু দ্বারা তাড়িত হয়ে এক স্থান হতে অন্য স্থানে প্রবাহিত হয়। পৃথিবীর নিয়ত বায়ুপ্রবাহ নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হয়। সমুদ্রস্রোত এ বায়ুর গতিপথ অনুসরণ করে। অয়ন বায়ু প্রবাহিত এলাকায় সমুদ্রস্রোত বায়ুপ্রবাহের গতির সাথে সঙ্গতি রেখে পূর্ব হতে পশ্চিমে এবং প্রত্যয়ন বায়ু প্রবাহিত এলাকায় পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে ধাবিত হয়। যেমন– আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত।

গ হারুন সাহেব সমুদ্রস্রোত সৃষ্টিতে তাপমাত্রার পার্থক্যের কথা বলেছেন।

পানির উপরিতলে (upper surface) তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটলে সমুদ্রস্রোত সৃষ্টি হয়। যেমন— নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেওয়ায় এখানকার মহাসাগরগুলোর পানি উত্তপ্ত, আয়তনে প্রসারিত, হালকা এবং ঘনত্ব কমে যাওয়ায় সমুদ্রের পৃষ্ঠদেশে অবস্থান করে।

অপরদিকে, মেরু অঞ্চলে সূর্য তির্যকভাবে কিরণ দেওয়ায় এখানকার পানির ঘনত্ব বেড়ে যায়। ফলে উত্তপ্ত পানি পৃষ্ঠস্রোত হিসেবে মেরু অঞ্চলের দিকে এবং মেরু অঞ্চলের ভারি পানি অন্তঃস্রোত হিসেবে নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রস্রোতের সৃষ্টি করে। আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের এ ধরনের স্রোত দেখা যায়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সমুদ্রস্রোত সৃষ্টির কারণটি হচ্ছে তাপমাত্রা বা উষ্ণতার তারতম্য।

এছাড়াও সমুদ্রস্রোত সৃষ্টিতে কিছু নিয়ামক বা কারণ কার্যকর রয়েছে। যেমন–

পৃথিবীর আবর্তন (Rotation of the earth): পৃথিবী নিজ অক্ষের ওপর পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে আবর্তিত হয়। এ আবর্তনের ফলে সমুদ্রের পানি পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে আবর্তিত হয়ে সমুদ্রস্রোতের সৃষ্টি করে। ফেরেলের সূত্রানুসারে বায়ুপ্রবাহের মতো সমুদ্রস্রোতও উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বামদিকে বেঁকে প্রবাহিত হয়। যেমন: উত্তর গোলার্ধে উপসাগরীয় স্রোত ও ক্যানারী স্রোতের প্রবাহ ঘড়ির কাটার দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ব্রাজিল স্রোত ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়।

লবণাক্ততার তারতম্য (Variation of salinity): মহাসাগরগুলোর অধিক লবণাক্ত পানি কম লবণাক্ত পানি অপেক্ষা ঘন ও ভারি। এ জন্য চাপও বেশি। ফলে লবণাক্ত ভারি পানি নিচের দিকে নেমে যায়। অন্যদিকে, কম লবণাক্ত হালকা পানি ওপরের দিকে ভেসে উঠে। এভাবে লবণাক্ততার সমতা রক্ষা করার জন্য পানি এক স্থান হতে অন্য স্থানে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রস্রোতের সৃষ্টি করে। যেমন– কাস্পিয়ান সাগরের স্রোত।

বাষ্পীভবনের তারতম্য (Variation of evaporation): নিরক্ষীয় অঞ্চলে অধিক বাষ্পীভবন হওয়ায় সেখানে শূন্যতার সৃষ্টি হয়। ফলে কম বাষ্পীভবন হতে শীতল পানি অধিক বাষ্পীভবনের অঞ্চলে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রস্রোত সৃষ্টি করে। সাধারণত স্থলভাগ দ্বারা বেষ্টিত সাগরগুলোতে এ ধরনের সমুদ্রস্রোত দেখা যায়।

ভূভাগের অবস্থান (Presence of landmasses) : ভূভাগের অবস্থান সমুদ্রস্রোত সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে না। তবে ভূভাগের অবস্থানের ফলে একটি মূল স্রোত হতে একাধিক স্রোতের জন্ম হয়। যেমন: আটলান্টিক মহাসাগরের দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতটি দক্ষিণ আমেরিকার সেন্টরক অন্তরীপে বাধা পেয়ে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত ও ব্রাজিল স্রোতের সৃষ্টি করে।

শৈলশিরার অবস্থান (Presence of ridges) : সমুদ্রের তলদেশে শৈলশিরার অবস্থানের ফলে শৈলশিরার উভয়পাশের তলদেশে পানির লবণাক্ততা, ঘনত্ব ইত্যাদির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ঘটে, যা পৃষ্ঠস্রোতের গতিপ্রকৃতির ওপর প্রভাব ফেলে। যেমন: আফ্রিকার উত্তরাঞ্চল ও জিব্রাল্টার প্রণালির মধ্যভাগে একটি শৈলশিরা থাকায় আটলান্টিক মহাসাগর থেকে শীতল স্রোত ভূ-মধ্যসাগরে যেতে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

সমুদ্রের গভীরতা (Depth of ocean) : সূর্যের কিরণ সমুদ্রতলদেশে ২১০ মিটারের বেশি প্রবেশ করতে পারে না। এ কারণে গভীর ও অগভীর সমুদ্রের পানির উষ্ণতার পার্থক্য ঘটে। তাছাড়া গভীরতম অংশগুলো পৃথিবীর কেন্দ্রের নিকটবর্তী বলে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ বিবিধ কারণে সমুদ্রের গভীরতম অংশগুলো সমুদ্রস্রোত সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶২

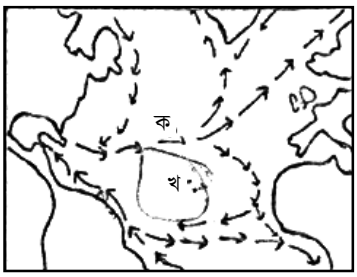

◀ *শিখনফল: ১ [পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]*

ক. ল্যাব্রাডর স্রোতের বর্ণ কী? ১

খ. সমুদ্রস্রোত সৃষ্টিতে বায়ুপ্রবাহের ভূমিকা লেখো। ২

গ. 'ক' চিহ্নিত স্রোতটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'খ' চিহ্নিত স্থানে যা সৃষ্টি হয় তার সৃষ্টির প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ল্যাব্রাডর স্রোতের বর্ণ সবুজ।

খ সমুদ্রস্রোত সৃষ্টির প্রধান কারণ বায়ুপ্রবাহ।

বায়ুপ্রবাহ সমুদ্রের উপরিভাগের পানির সঙ্গে ঘর্ষণ তৈরি করে এ ঘর্ষণের ফলে পানিতে ঘূর্ণন তৈরি হয়। এভাবে বায়ুপ্রবাহের দিক ও গতির সাথে সমুদ্রস্রোতের দিক ও গতি নিয়ন্ত্রিত হয়।

গ 'ক' চিহ্নিত স্রোতটি হলো উপসাগরীয় স্রোত।

উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের একটি প্রধান স্রোত হলো উপসাগরীয় স্রোত।

দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের একটি শাখা নিরক্ষরেখা অতিক্রম করে দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর উপকূল দিয়ে ক্যারিবিয়ান সাগরে প্রবেশ করে। সেখানে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের একটি শাখা এসে মিলিত হয়। এই মিলিত স্রোত মেক্সিকো উপসাগরে প্রবেশ করে উপসাগরীয় স্রোত নাম ধারণ করে।

ফ্লোরিডা প্রণালির মধ্য দিয়ে এই স্রোত প্রবলবেগে বের হয়ে আসলে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের আরেকটি শাখা এর সাথে মিলিত হয়। এই স্রোত যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূল দিয়ে অগ্রসর হয়ে সেন্ট হ্যাটেরস অন্তরীপের নিকট দক্ষিণ-পশ্চিম প্রত্যয়ন বায়ুর প্রভাবে উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়। এই বিখ্যাত সমুদ্রস্রোতের গতিবেগ ঘণ্টায় ৪.৫০ মাইল এবং বিস্তার ৪০—৩০০ মাইল। উষ্ণতা স্থানভেদে ৮৫°-৯০° ফারেনহাইট।

ঘ চিত্রের 'খ' স্থানটিতে শৈবাল সাগরের সৃষ্টি হয়।

'খ' স্থানটির পশ্চিমে উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের অবস্থান। আবার, এই সাগরের পূর্বে ক্যানারি স্রোত একটি শীতল স্রোত যা উষ্ণ উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের সাথে মিলিত হয়েছে। ফলে শৈবাল সাগরের চারপাশে উষ্ণ ও শীতল স্রোতের মিলনস্থলে ব্যাপক কুয়াশা ও তুষার ঝড়ের সৃষ্টি হয়। চারপাশে বিভিন্ন স্রোত থাকলেও শৈবাল সাগরে স্রোতের প্রবাহ না থাকায় এ অঞ্চলে জাহাজ চলাচল করে না। এ অঞ্চলের উপর দিয়ে কোনো জাহাজ চলাচল করতে গেলে অধিকাংশ সময় কুয়াশা ও তুষার ঝড়ের কবলে পড়ে।

প্রশ্ন ▶৩

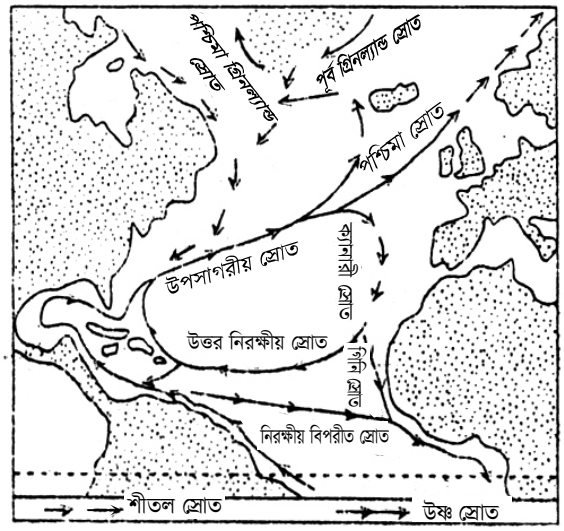

◀ *শিখনফল: ২ [অবনীন্দ্রনাথ বৈদ্য, অনু-২]*

ক. সমুদ্রস্রোত কী? ১

খ. সমুদ্রস্রোতের সৃষ্টিতে বায়ুপ্রবাহের ভূমিকা লিখো। ২

গ. উপসাগরীয় স্রোত সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উপসাগরীয় স্রোত, ক্যানারী স্রোত ও উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের ঘূর্ণনের ফলে যে অবস্থা সৃষ্টি হয় তার কারণসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমুদ্রের পানিরাশির এক স্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়মিতভাবে প্রবাহিত হওয়াই সমুদ্রস্রোত।

খ সমুদ্রের ওপর দিয়ে নিয়মিতভাবে নিয়ত বায়ু প্রবাহিত হয়। নিয়ত বায়ুর ধাক্কায় সমুদ্রের পানি এক দিক থেকে অন্য দিকে প্রবাহিত হতে থাকে।

নিয়ত বায়ুপ্রবাহের দিক অনুসারেই বেশির ভাগ সমুদ্রের স্রোত প্রবাহিত হয়। এভাবে সমুদ্রস্রোতের সৃষ্টিতে বায়ুপ্রবাহ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের একটি প্রধান স্রোত হলো উপসাগরীয় স্রোত।

দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের একটি শাখা নিরক্ষরেখা অতিক্রম করে দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর উপকূল দিয়ে ক্যারিবিয়ান সাগরে প্রবেশ করে। সেখানে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের একটি শাখা এসে মিলিত হয়। এই মিলিত স্রোত মেক্সিকো উপসাগরে প্রবেশ করে উপসাগরীয় স্রোত নাম ধারণ করে।

ফ্লোরিডা প্রণালির মধ্য দিয়ে এই স্রোত প্রবলবেগে বের হয়ে আসলে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের আরেকটি শাখা এর সাথে মিলিত হয়। এই স্রোত যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূল দিয়ে অগ্রসর হয়ে সেন্ট হ্যাটেরস অন্তরীপের নিকট দক্ষিণ-পশ্চিম প্রত্যয়ন বায়ুর প্রভাবে উত্তর-পূর্ব দিক প্রবাহিত হয়। এই বিখ্যাত সমুদ্রস্রোতের গতিবেগ ঘণ্টায় ৪.৫০ মাইল এবং বিস্তার ৪০—৩০০ মাইল। উষ্ণতা স্থানভেদে ৮৫°-৯০° ফারেনহাইট।

ঘ উপসাগরীয় স্রোত, ক্যানারী স্রোত ও উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের ঘূর্ণনের ফলে শৈবাল সাগরের সৃষ্ট হয়।

দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের মূল শাখাটি নিরক্ষরেখা অতিক্রম করে দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পূর্ব উপকূল ধরে অগ্রসর হয়। তারপর ক্যারিবিয়ান সাগরে প্রবেশ করে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের দক্ষিণ শাখার সাথে মিলিত হয়ে কিউবার পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মেক্সিকো উপসাগরে প্রবেশ করে।

মেক্সিকো উপসাগর থেকে ফ্লোরিডা প্রণালির মধ্য দিয়ে ঐ স্রোত প্রবল বেগে উত্তর-পূর্ব মুখে প্রবাহিত হয়। উপসাগরীয় স্রোতের দক্ষিণ শাখা পর্তুগালের উপকূলে প্রতিহত হয়ে প্রথমে বেঁকে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের সাথে মিলিত হয়। এই স্রোতটিকেই ক্যানারী স্রোত বলে।

উপসাগরীয় স্রোতের এই শাখাটি ডিম্বাকারে ঘুরে এসে উত্তরে নিরক্ষীয় স্রোতের সাথে মিলিত হয় যার ফলে এর মধ্যবর্তী পানিরাশি একেবারে স্রোতহীন থাকে। এই স্রোতহীন পানিতে ভাসমান আগাছা ও শৈবাল সঞ্চিত হয় এবং কিছু কিছু উদ্ভিদ জন্মায়। সেজন্য একে শৈবাল সাগর বলে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, উক্ত স্রোত তিনটির ঘূর্ণনের ফলে এই স্রোতহীন শৈবাল সাগরের সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন ▶ ৪ একাদশ শ্রেণির ভূগোল ক্লাসে ভূগোল বিষয়ের শিক্ষক শাহাদাৎ স্যার আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোতের মানচিত্র দেখিয়ে বললেন মহাসাগরের স্রোতগুলো দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশের স্রোতগুলো ফকল্যান্ড, ব্রাজিল ও আফ্রিকার পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এবং দ্বিতীয় অংশের পর্তুগিজ উপকূল, নরওয়ের উপকূল, গ্রিনল্যান্ডের উভয় পার্শ্ব দিয়ে কিছু স্রোত প্রবাহিত হয়েছে।

◀ *শিখনফল: ২ [তাপস কুমার মজুমদার; জনু-১]*

ক. জোয়ার কী? ১

খ. চন্দ্রের আকর্ষণে যে জোয়ার সংঘটিত হয় তা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে প্রথম অংশের স্রোতগুলো আটলান্টিক মহাসাগরের কোন অংশের স্রোত নির্ণয় করে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে আটলান্টিক মহাসাগরের দ্বিতীয় অংশের স্রোতগুলোর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমুদ্রের পানির নিয়মিতভাবে ফুলে ওঠাকে জোয়ার বলে।

খ চন্দ্রের আকর্ষণে মূখ্য জোয়ার সংঘটিত হয়।

চন্দ্র এক স্থলে স্থির থাকে না। তা পৃথিবীর চারদিকে সর্বদা ঘুরছে। আবর্তমানকালে পৃথিবীর যে অংশ চন্দ্রের নিকটবর্তী হয়, সেখানে চন্দ্রের অকর্ষণ সর্বাপেক্ষা বেশী হয়। এ আকর্ষণে চারদিক হতে পানি এসে চন্দ্রের দিকে ফুলে ওঠে এবং জোয়ার হয়।

গ উদ্দীপকের প্রথম অংশের স্রোতগুলো হলো ফকল্যান্ড স্রোত, ব্রাজিল স্রোত এবং আফ্রিকার পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে প্রবাহিত বেঙ্গুয়েলা স্রোত। উক্ত স্রোতগুলো দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোতের অন্তর্ভূক্ত। নিম্নে উক্ত স্রোতগুলোর ব্যাখ্যা দেওয়া হলো:

বেঙ্গুয়েলা স্রোত: কুমেরু স্রোতের যে শাখা আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে বেঙ্গুয়ালার নিকট দিয়ে উত্তরে অগ্রসর হয় তা বেঙ্গুয়েলা স্রোত নামে পরিচিত। এই শীতল স্রোত ক্রমে উষ্ণ হয়ে পৃথিবীর আবর্তন ও দক্ষিণ পূর্ব অয়ন বায়ুর প্রভাব পশ্চিমে বেঁকে যায়।

ব্রাজিল স্রোত: দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের যে শাখাটি দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূল ব্রাজিলের পূর্ব পার্শ্ব দিয়ে দক্ষিণ পশ্চিমে প্রবাহিত হয়েছে সে স্রোতটিকে ব্রাজিল স্রোত বলে। এটি একটি শীতল স্রোত। ফকল্যান্ড দ্বীপের নিকট পৌঁছিয়ে পৃথিবীর আবর্তন গতি ও পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে পূর্ব দিকে বেঁকে এটি কুমেরু স্রোতের সাথে মিলিত হয়েছে।

ফকল্যান্ড স্রোত: কুমেরু স্রোতের ক্ষুদ্র একটি শাখা ফকল্যান্ড দ্বীপের পূর্ব পার্শ্ব দিয়ে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়েছে। এ স্রোতটিকে ফকল্যান্ড স্রোত বলে। এ স্রোতটি উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়ে শক্তিশালী ব্রাজিল স্রোতের সাথে মিলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশের স্রোতগুলো উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোতের অন্তর্ভুক্ত উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের শাখা।

উদ্দীপকে আটলান্টিক মহাসাগরের দ্বিতীয় অংশের স্রোতগুলো হলো পর্তুগিজ উপকূল দিয়ে প্রবাহিত ক্যানারি স্রোত, নরওয়ে উপকূল দিয়ে প্রবাহিত উত্তর আটলান্টিক স্রোত এবং গ্রীনল্যান্ডের উভয় পাশ নিয়ে প্রবাহিত পশ্চিম গ্রীনল্যান্ড স্রোত এবং পূর্ব গ্রীনল্যান্ড স্রোত।

উক্ত স্রোতগুলোর প্রভাবে উত্তর আমেরিকার পূর্বাংশ এবং পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহ অপেক্ষাকৃত উষ্ণ থাকে। এ অঞ্চলের উষ্ণ স্রোতের ওপর দিয়ে প্রবাহিত উত্তর পূর্ব অয়ন বায়ুর প্রভাবে উত্তর আমেরিকার পূর্বাংশে এবং পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে বৃষ্টিপাত হয়। এতে কৃষিকার্যের সুবিধা হয়ে থাকে। এছাড়া শীত ও গ্রীষ্মের পার্থক্য কম থাকায় এরূপ সমভাবাপন্ন আরামদায়ক জলবায়ুতে শ্রমিকগণ কৃষিক্ষেত্রে এবং শিল্প কারখানায় অধিক সময় কাজ করতে পারে। উক্ত স্রোতগুলোর প্রভাবে উভয় অঞ্চলের বন্দরগুলো বার মাস বরফ মুক্ত থাকে। এ স্রোতের পানিতে হিমশৈল না থাকায় উভয় অঞ্চলের মধ্যে বার মাস জাহাজ চলাচল করে। পৃথিবীর মধ্যে এত বেশি পণ্যবাহী জাহাজ অন্য কোনো সমুদ্রপথে চলাচল করে না। এছাড়া ক্যানারি স্রোতের উপর দিয়ে বায়ু শুষ্ক ও শীতল থাকে বলে আফ্রিকার উত্তর পশ্চিম উপকূলে বৃষ্টিপাত হয় না। তাই এ স্রোতটি সাহারা মরুভূমি সৃষ্টিতে প্রভাব বিস্তার করেছে।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় উক্ত স্রোতগুলোর যথাযথ গুরুত্ব রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৫ নিরক্ষরেখা আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে অতিক্রম করায় মহাসাগরটি উত্তর ও দক্ষিণ আটলান্টিক নামে বিভক্ত হয়েছে। স্রোতের গতিবেগ, পানির বৈশিষ্ট্য, পার্শ্ববর্তী সাগর ও উপসাগরের সংখ্যার দিক থেকে এ দুই অংশের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগের ক্ষেত্রেও এ মহাসাগরের স্রোতগুলোর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।

◀ *শিখনফল: ২ [অধ্যাপক মোঃ আব্দুল কুদ্দুস; জনু-৫]*

ক. সমুদ্রস্রোত বলতে কী বোঝ? ১
খ. হিমপ্রাচীর কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের দ্বিতীয় লাইনে সমুদ্রস্রোতের যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে এতে ক্যানারি স্রোত সাহারা মরুভূমি সৃষ্টির জন্য দায়ী। যুক্তি দেখাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকের তৃতীয় লাইনের মতে কোন স্রোত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের বাণিজ্যে প্রভাব ফেলে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমুদ্রস্রোত বলতে সমুদ্র বা সাগরের এক জায়গা হতে অন্য জায়গায় পানির নির্দিষ্ট ও সর্বদা প্রবাহকে বোঝায়।

খ উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোত ও ল্যাব্রাডর স্রোতের মধ্যবর্তী সীমারেখাই হিমপ্রাচীর।
উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের পানির রং গাঢ় নীল এবং এ স্রোত উত্তর-পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়। অপরদিকে ল্যাব্রাডর স্রোতের পানির রং সবুজ এবং এ স্রোত দক্ষিণদিকে অগ্রসর হয়। দুই বিপরীতমুখী দুই রঙের স্রোতপ্রবাহ বিপরীত দিকে প্রবাহিত হওয়ার সময় তাদের সীমারেখা দৃষ্টিগোচর হয় ফলে হিমপ্রাচীর সৃষ্টি হয়।

গ উদ্দীপকে দ্বিতীয় লাইনে সমুদ্রস্রোতের যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে এর আলোকে ক্যানারি স্রোত যে সাহারা মরুভূমি সৃষ্টির জন্য দায়ী তার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা হলো:
উপসাগরীয় স্রোত আটলান্টিক মহাসাগরের ঠিক মাঝখানে পৃথিবীর আবর্তনে তিনটি শাখায় বিভক্ত হয় এবং একটি শাখা পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল ভাগের ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের পাশ দিয়ে পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয় এবং নিরক্ষীয় স্রোতের সাথে মিলিত হয়। ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয় বলে একে ক্যানারি স্রোত বলে।
এ স্রোতটি নিরক্ষীয় অঞ্চলের প্রভাবে উষ্ণ স্রোত হওয়ার কথা কিন্তু সুমেরু স্রোতের সাথে মিলিত হয়ে ক্যানারি স্রোতকে শীতল স্রোতে পরিণত করে। ক্যানারি স্রোতের প্রভাবে বায়ু শুষ্ক ও শীতল থাকে বলে আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় না। তাই এই ক্যানারি স্রোত সাহারা মরুভূমি সৃষ্টির জন্য দায়ী।

ঘ উদ্দীপকের তৃতীয় লাইনের মতে উপসাগরীয় স্রোত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের বাণিজ্যে প্রভাব ফেলে। অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে এ মহাসাগরের উপসাগরীয় স্রোতের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।
উপসাগরীয় স্রোতটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলের হ্যাটেরাস অন্তরীপের নিকটে অগ্রসর হওয়ার পর দক্ষিণ-পশ্চিম প্রত্যয়ন বায়ুর প্রভাবে উত্তর-পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়। এ স্রোত নিউফাউন্ডল্যান্ড দ্বীপ পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার পর এর গতিবেগ পূর্বের তুলনায় অনেক কম হয়। পৃথিবীর আবর্তন গতির ফলে প্রত্যয়ন বায়ু বা পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে উপসাগরীয় স্রোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের মধ্যে জাহাজ চলাচলে সুবিধা হয় যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের বাণিজ্যে প্রভাব বিস্তার করে। বিশ্বের সমুদ্রপথে সর্বাধিক যাত্রী ও পণ্য এই স্রোতপথে পরিবাহিত হয়। এছাড়াও এ স্রোতের প্রভাবে নরওয়ে উপকূল বরফমুক্ত থাকে এবং উপকূলে বৃষ্টিপাত ঘটায়। ফলে কৃষিকার্যে সহায়ক পরিবেশ ছাড়াও শৈত্যের প্রভাব কমে যাওয়ায় শিক্ষা ও বাণিজ্যের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হয়।
সুতরাং বলা যায় যে, উপসাগরীয় স্রোত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের বাজারে বাণিজ্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

প্রশ্ন ▶ ৬ শফিকুল ছুটিতে নরওয়ে থেকে দেশে আসায় তার মামা জানতে চাইল সে নরওয়েতে কী কাজ করে? শফিকুল জানাল— সে নরওয়ের উপকূল এলাকায় মৎস্যচারণ ক্ষেত্রে কাজ করে। সে আরো জানালো উপসাগরীয় স্রোতের প্রভাবে নরওয়ের এলাকা বরফমুক্ত থাকে এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটে। স্রোত উপকূল এলাকাকে প্রভাবিত করে এটা জেনে মামা অবাক হলেন।

◀ *শিখনফল: ২*

ক. বাহামা স্রোত কাকে বলে? ১
খ. দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের গতিপথ ব্যাখ্যা করো। ২
গ. শফিকুল তার মামাকে যে স্রোতের কথা বলেছে উক্ত স্রোত প্রবাহিত এলাকায় এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত স্রোতটি যে মহাসাগরীয় স্রোত তার উত্তরের উষ্ণ স্রোতগুলোর গতিপথ বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের যে শাখা বাহামা দ্বীপপুঞ্জের পাশ দিয়ে উপসাগরীয় স্রোতের সাথে মিলিত হয়েছে তা বাহামা স্রোত বলে।

খ বেঞ্জুয়েলা স্রোত নিরক্ষরেখার দক্ষিণ দিয়ে সোজা পশ্চিমে দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত নামে প্রবাহিত হয়।

এই স্রোত দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূলে সেন্টরক অন্তরীপে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে দু'শাখায় বিভক্ত হয়। একটি ক্যারিবিয়ান সাগরে প্রবেশ করে এবং অপরটি দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূল দিয়ে প্রবাহিত হয়।

গ শফিকুল তার মামাকে উপসাগরীয় স্রোতের কথা বলেছে। উষ্ণ এই স্রোতটি যেসব এলাকার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় সেখানে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।
উপসাগরীয় স্রোতের প্রভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয়। তাছাড়া এই স্রোতপথে অতি সহজে উত্তর আমেরিকা থেকে ইউরোপে পৌঁছানো যায়। সমুদ্রপথে বিশ্বের সর্বাধিক যাত্রী ও পণ্য এ স্রোতপথে পরিবাহিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও ইংল্যান্ড ও নরওয়ের পশ্চিম উপকূল এ স্রোতের প্রভাবে বরফমুক্ত থাকে। উপকূলীয় এলাকায় বৃষ্টিপাত ঘটানোর মাধ্যমে কৃষিকার্যে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা ছাড়াও স্রোতটি উচ্চ অক্ষাংশে (নরওয়ে, আমেরিকা) শীতের প্রভাব কমায়। ফলে শিল্প ও বাণিজ্যের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হয়।
তাই বলা যায়, আটলান্টিক মহাসাগরের উপসাগরীয় স্রোত উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলোর জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত স্রোতটি তথা উপসাগরীয় স্রোত একটি আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত। এর উত্তরে তথা উত্তর আটলান্টিকের উষ্ণ স্রোতগুলো হচ্ছে– উপসাগরীয়, উত্তর আটলান্টিক, উত্তর নিরক্ষীয়, বাহামা, গিনি ও নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোত। উক্ত স্রোতগুলোর গতিপথ নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো:

উপসাগরীয় স্রোত (Gulf Current) : দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের একটি শাখা নিরক্ষরেখা অতিক্রম করে দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর উপকূল দিয়ে ক্যারিবিয়ান সাগরে প্রবেশ করে। সেখানে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের একটি শাখা এসে মিলিত হয়। এই মিলিত স্রোত মেক্সিকো উপসাগরে প্রবেশ করে উপসাগরীয় স্রোত নাম ধারণ করে। ফ্লোরিডা প্রণালির মধ্য দিয়ে এই স্রোত প্রবলবেগে বের হয়ে আসলে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের আরেকটি শাখা এর সাথে মিলিত হয়। এই স্রোত যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূল দিয়ে অগ্রসর হয়ে সেন্ট হ্যাটেরাস অন্তরীপের নিকট দক্ষিণ-পশ্চিম প্রত্যয়ন বায়ুর প্রভাবে উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়। এই বিখ্যাত সমুদ্রস্রোতের গতিবেগ ঘণ্টায় ৪.৫০ মাইল এবং বিস্তার ৪০-৩০০ মাইল। উষ্ণতা স্থানভেদে ৮৫°-৯০° ফারেনহাইট।

উত্তর আটলান্টিক প্রবাহ (North atlantic current): পশ্চিমা বায়ু দ্বারা তাড়িত হয়ে উপসাগরীয় স্রোতের যে শাখা আটলান্টিকের উত্তর দিকে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও নরওয়ের উপকূলের দিকে যায়, তা উত্তর আটলান্টিক প্রবাহ নামে পরিচিত। এর প্রভাবে ব্রিটিশ ও নরওয়ের উপকূল বরফমুক্ত থাকে।

উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত (North equatorial current): ক্যানারি স্রোত উত্তর-পূর্ব অয়ন বায়ুর প্রভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বেঁকে নিরক্ষরেখার উত্তর দিয়ে সোজা পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়। এই উষ্ণ স্রোতটি উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত নামে পরিচিত। এটি পশ্চিমে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নিকট দু'ভাগে বিভক্ত হয়। পরবর্তীতে দুটি শাখাই উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের সাথে মিলিত হয়।

বাহামা স্রোত (Bahama current): উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের যে শাখাটি বাহামা দ্বীপপুঞ্জের পাশ দিয়ে উপসাগরীয় স্রোতের সাথে মিলিত হয় তা বাহামা স্রোত নামে পরিচিত।

গিনি স্রোত (Guinea current): নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোত আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে এসে ক্যানারি স্রোতের একটি শাখার সাথে মিলিত হয়ে গিনি উপসাগরে প্রবেশ করে। গিনি স্রোত নাম নিয়ে তা নিরক্ষরেখা ও গিনি উপসাগর অতিক্রম করে পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল দিয়ে বেঞ্জুয়ালা স্রোতের পূর্বপার্শ্বে বিলীন হয়ে যায়।

নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোত (Equatorial counter current): উত্তর ও দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের মধ্যবর্তী স্থানে নিরক্ষরেখার ঈষৎ উত্তরে সোজা পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে যে স্রোত প্রবাহিত হয় তাকে নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোত বলে।

প্রশ্ন ▶ ৭

◀ শিখনফল: ২ [কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ, নাটোর]

ক. সহ জোয়ারী রেখা কী? ১

খ. জোয়ারের সময় পানি নদীর মোহনা দিয়ে প্রবেশ করলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়– তা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. চিত্রে "গ" চিহ্নিত স্থানে বিশেষ ধরনের সাগরের সৃষ্টি হয়– ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. চিত্রে "ক" এবং "খ" স্রোতের মধ্যে কোনটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ– বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানচিত্রে একই সময়ে সংঘটিত জোয়ারের স্থানগুলোকে যে রেখা দ্বারা যুক্ত করা হয় তাই সহ জোয়ারী রেখা।

খ জোয়ারের প্রভাবে সমুদ্রের পানি মহীসোপানের অগভীর অংশে ও দ্বীপে প্রতিহত হলে জোয়ারের ঢেউ তীরে আছড়ে পড়ে। এ ঢেউ কোনো কোনো নদীর (হুগলি) মোহনা দিয়ে খুব প্রবল বেগে স্থলভাগের মধ্যে প্রবেশ করে। এতে অনেক সময় নৌকা, লঞ্চ ইত্যাদি ডুবে গিয়ে মানুষের প্রাণহানি ঘটে। এছাড়াও নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় জানমালের ব্যাপক ক্ষতি হয়।

গ চিত্রে 'গ' চিহ্নিত স্থানে শৈবাল সাগরের সৃষ্টি হয়।

শৈবাল সাগর আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত। চারপাশে বিভিন্ন স্রোত থাকলেও শৈবাল সাগরে স্রোতের প্রবাহ না থাকায় এ অঞ্চলে জাহাজ চলাচল করতে পারে না।

পশ্চিমে উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের সাথে উত্তর দিক থেকে আসা শীতল ল্যাব্রাডর স্রোতের মিলনস্থলে শৈবাল সাগরের সৃষ্টি হয়েছে। এই সাগরের পূর্বে শীতল ক্যানারি স্রোত উষ্ণ উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের সাথে মিলিত হয়েছে। ফলে শৈবাল সাগরের চারপাশে উষ্ণ ও শীতল স্রোতের মিলনস্থলে ব্যাপক কুয়াশা ও তুষার ঝড়ের সৃষ্টি হয়। এ অঞ্চল দিয়ে কোনো জাহাজ চলাচল করতে গেলে অধিকাংশ সময় কুয়াশা ও তুষার ঝড়ের কবলে পড়ে ডুবে যায়।

ঘ চিত্রের 'ক' স্রোতটি ব্রাজিল স্রোত এবং 'খ' স্রোতটি বেঞ্জুয়েলা স্রোত।

ব্রাজিল স্রোতের প্রভাবে দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূল সারা বছর উষ্ণ থাকে এবং বন্দরগুলোতে জাহাজ চলাচলে কোনো বিঘ্ন ঘটে না। এ স্রোতের উপর থেকে আগত বায়ুতে জলীয়বাষ্প থাকায় এ অঞ্চলে সারা বছর বৃষ্টিপাত হয়। তবে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টির পরিমাণ বেশি। ফলে দক্ষিণ আমেরিকার পূর্বাংশ

কৃষিকাজের জন্য খুবই উপযোগী। কৃষির ওপর ভিত্তি করে এ অঞ্চলে শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য উন্নতি লাভ করেছে। তাই এ স্রোতটির যথেষ্ট অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে।

অপরদিকে শীতল বেঙ্গুয়েলা স্রোতের উপর হতে আগত বায়ুতে জলীয়বাষ্প না থাকায় আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল প্রায় সারা বছর বৃষ্টিহীন অবস্থায় থাকে। ফলে এ অঞ্চলের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি সবকিছুই অনুন্নত।

প্রশ্ন ▶৮ রিয়া বিভিন্ন মহাসাগরের স্রোতগুলোর গতিপথ মনে রাখতে পারে না। বাবা তাকে একটি মানচিত্র দেখালেন, নিরক্ষরেখার দক্ষিণ দিয়ে একটি স্রোত পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত নামে প্রবাহিত হয়েছে। এভাবে মানচিত্র দেখে তিনি অন্যান্য স্রোতগুলোর গতিপথ শিখে নিতে বললেন।

◀ *শিখনফল: ২*

ক. হিমপ্রাচীর কী? ১

খ. উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের উষ্ণ স্রোতগুলোর নাম লেখো। ২

গ. রিয়ার বাবা ম্যাপে যে স্রোতটি দেখিয়েছেন তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত স্রোতটি প্রধান যে স্রোতচক্রের অন্তর্ভুক্ত তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক উষ্ণ (উপসাগরীয়) ও শীতল (ল্যাব্রাডর) স্রোতের সীমারেখাই হিমপ্রাচীর।

খ নিরক্ষরেখার উত্তরে উত্তর আটলান্টিক স্রোতচক্র (cycle of currents) প্রবাহিত।

এ মহাসাগরের উষ্ণ স্রোতগুলো হলো—

(১) উত্তর নিরক্ষীয়, (২) নিরক্ষীয় বিপরীত, (৩) বাহামা, (৪) উপসাগরীয়, (৫) উত্তর আটলান্টিক প্রবাহ এবং (৬) গিনি স্রোত।

গ উদ্দীপকে রিয়ার বাবা মানচিত্রে যে স্রোতটি দেখিয়েছেন সেটি হলো দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত।

বেঙ্গুয়েলা স্রোত যখন নিরক্ষরেখার দক্ষিণ দিয়ে সোজা পশ্চিমে অগ্রসর হয় তখন তা দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত নামে অভিহিত হয়।

এই স্রোত দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূলে সেন্টরক অন্তরীপে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়। একটি ক্যারিবিয়ান সাগরে প্রবেশ করে যা উপসাগরীয় স্রোত নামে পরিচিত। অপরটি দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূল দিয়ে প্রবাহিত হয় যাকে ব্রাজিল স্রোত বলে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত স্রোতটি দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত যা দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোতচক্রের (cycle of currents) অন্তর্ভুক্ত।

এ মহাসাগরের অন্যান্য স্রোতগুলো হলো– বেঙ্গুয়েলা, ব্রাজিল এবং ফকল্যান্ড স্রোত। নিচে উক্ত স্রোতগুলো বর্ণিত হলো:

বেঙ্গুয়েলা স্রোত: কুমেরু স্রোতের যে শাখা আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে বেঙ্গুয়েলার নিকট দিয়ে উত্তরে অগ্রসর হয় তা বেঙ্গুয়েলা স্রোত নামে পরিচিত। এই শীতল স্রোত ক্রমে উষ্ণ হয়ে পৃথিবীর আবর্তন ও দক্ষিণ- পূর্ব অয়ন বায়ুর প্রভাবে পশ্চিমে বেঁকে যায়।

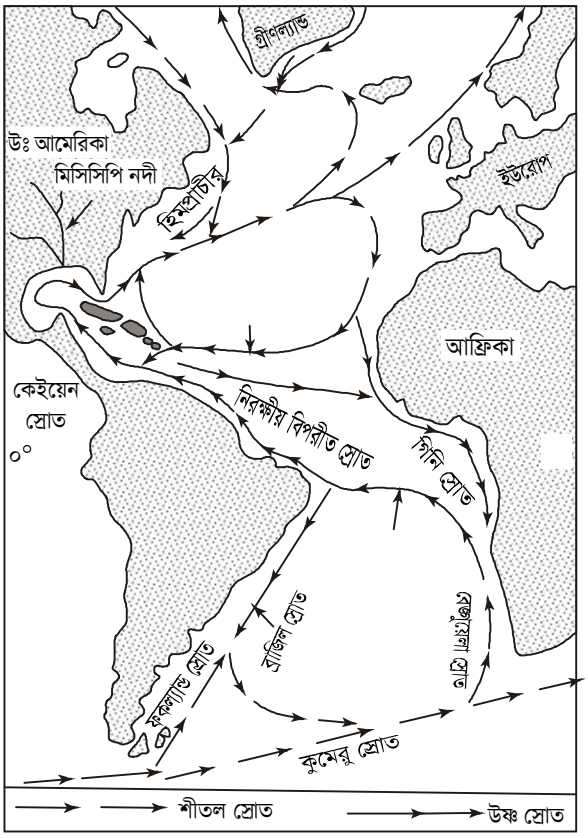

ব্রাজিল স্রোত: দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের যে শাখা দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল, উরুগুয়ে ও আর্জেন্টিনা উপকূল দিয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয় তা ব্রাজিল স্রোত নামে পরিচিত। এই স্রোত দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে পৃথিবীর আবর্তনগতি ও পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে আবার শীতল কুমেরু স্রোতের সাথে মিলিত হয়।

ফকল্যান্ড স্রোত: দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরে প্রধান স্রোতচক্রের চারটি স্রোত ছাড়াও কুমেরু স্রোতের একটি ক্ষুদ্র শাখা ফকল্যান্ড দ্বীপের নিকট দিয়ে উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে ব্রাজিল স্রোতের সাথে মিলিত হয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। এটি ফকল্যান্ড স্রোত নামে পরিচিত।

প্রশ্ন ▶৯ মিঃ লিউয়েন কানাডার নিউফাউন্ডল্যান্ডে থাকেন। একদিন তিনি পার্শ্ববর্তী ল্যাব্রাডর সাগরে ঘুরতে গিয়ে দেখেন সেখানকার পানির রং সবুজ। তিনি এতে বিস্মিত হলেন।

◀ *শিখনফল: ২*

ক. দক্ষিণ আটলান্টিকে ফকল্যান্ড স্রোতকে কোন স্রোতের সাথে তুলনা করা হয়? ১

খ. উপসাগরীয় স্রোত বলতে কী বোঝ? ২

গ. মি. লিউয়েনের ঘুরতে যাওয়া সাগরের নামানুসারে যে বিখ্যাত স্রোত আছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উক্ত মহাসাগরের অন্যান্য চারটি স্রোত বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দক্ষিণ আটলান্টিকের ফকল্যান্ড স্রোতকে উত্তর আটলান্টিকের ল্যাব্রাডর স্রোতের সাথে তুলনা করা হয়।

খ উপসাগরীয় স্রোত উত্তর আটলান্টিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্রোত। দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের একটি শাখা নিরক্ষরেখা অতিক্রম করে দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর উপকূল দিয়ে ক্যারিবিয়ান সাগরে প্রবেশ করে। সেখানে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের একটি শাখা এসে মিলিত হয়। এই মিলিত স্রোত মেক্সিকো উপসাগরে প্রবেশ করলে একে উপসাগরীয় স্রোত বলে।

গ মি. লিউয়েন যে সাগরে ঘুরতে গিয়েছিলেন তার নাম ল্যাব্রাডর সাগর এবং এর নামানুসারে যে বিখ্যাত স্রোত আছে তা হলো ল্যাব্রাডর স্রোত।

পূর্ব ও পশ্চিম গ্রিনল্যান্ড স্রোত কানাডার ল্যাব্রাডর উপদ্বীপের নিকট মিলিত হয়ে ল্যাব্রাডর স্রোত নামে দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে নিউফাউন্ডল্যান্ডের নিকট দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছে। একটি শাখা উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূল দিয়ে প্রবাহিত এবং অপর শাখা উপসাগরীয় স্রোতের সাথে মিলিত হয়। নিউফাউন্ডল্যান্ডের নিকট উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের নীলপানি ও শীতল ল্যাব্রাডর স্রোতের সবুজ পানির সীমারেখাকে হিমপ্রাচীর বলে। দুই স্রোতের মিলনস্থলে প্রায়ই ঝড় ঝঞ্ঝা ও ঘন কুয়াশা সৃষ্টি হয়। নিউফাউন্ডল্যান্ডের অদূরে শীতল ল্যাব্রাডর স্রোতের আনিত হিমশৈল উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের সংস্পর্শে গলে গিয়ে অগভীর মহীসোপানে 'গ্রান্ড ব্যাংকস' নামে মগ্নচড়া সৃষ্টি করেছে। প্রচুর প্লাঙ্কটন (Plankton) থাকায় এই গ্রান্ড ব্যাংকস বিশ্বের অন্যতম সেরা মৎস্যচারণক্ষেত্র।

ঘ উদ্দীপকে মি. লিউয়েন যে মহাসাগরে গিয়েছিলেন তার নাম উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর। ল্যাব্রাডর স্রোত ব্যতীত এই মহাসাগরের আরও চারটি স্রোত হলো:

উত্তর আটলান্টিক প্রবাহ: পশ্চিমা বায়ু দ্বারা তাড়িত হয়ে উপসাগরীয় স্রোতের যে শাখা আটলান্টিকের উত্তর দিকে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও নরওয়ের উপকূলের দিকে যায়, তা উত্তর আটলান্টিক প্রবাহ নামে পরিচিত।

ক্যানারি স্রোত: উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের একটি শাখা পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে ফেরেলের সূত্রানুসারে দক্ষিণে বেঁকে ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়। একে ক্যানারি স্রোত বলে।

উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত: ক্যানারি স্রোত উত্তর-পূর্ব অয়ন বায়ুর প্রভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বেঁকে নিরক্ষরেখার উত্তর দিয়ে সোজা পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়। এ উষ্ণ স্রোতটি উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত হিসেবে পরিচিত।

বাহামা স্রোত: উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের যে শাখাটি বাহামা দ্বীপপুঞ্জের পাশ দিয়ে উপসাগরীয় স্রোতের সাথে মিলিত হয় তা বাহামা স্রোত নামে পরিচিত।

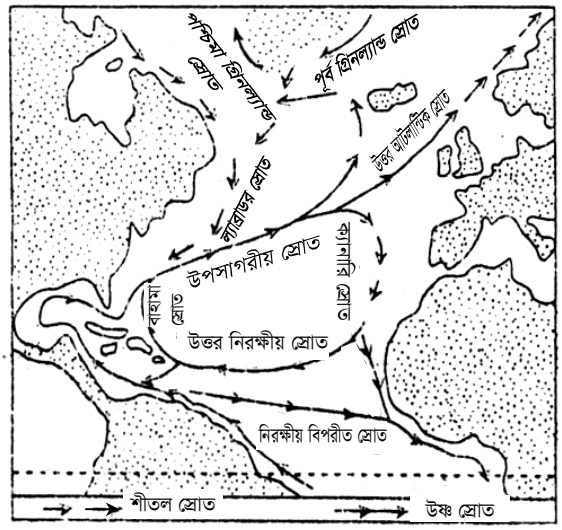

চিত্র : আটলান্টিক মহাসাগরের স্রোত

প্রশ্ন ▶ ১০ লিমন দেখল 'রহস্যে ভরা জলরাশি' বইটিতে পৃথিবীর সকল মহাসাগরকে উত্তর-দক্ষিণ দুটি অংশে ভাগ করে এসব সাগরের বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। বইটি পড়ে সে আরও বুঝতে পারল যে একটি মহাসাগরের এক অংশ ভূভাগ দ্বারা পরিবেষ্টিত, এই অংশের স্রোতগুলোর দিক ঋতুভেদে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যায়। কিন্তু অপর অংশের স্রোতগুলো সারা বছর প্রায় একই দিকে প্রবাহিত হয়।

◀ শিখনফল-৩ [ড. সৈয়দ শাহজাহান আহমেদ; অনু-৫]

ক. মহাকর্ষ শক্তি কয়টি নিয়ামকের উপর নির্ভর করে? ১

খ. বেঞ্জুয়েলা স্রোতের গতিপ্রকৃতি কীরূপ? ২

গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত মহাসাগরের যে অংশের স্রোত সারা বছর একই দিকে প্রবাহিত হয় সেই স্রোতসমূহ বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত স্রোতসমূহ জনজীবনে কোনোরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে কি? মতামত দাও। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহাকর্ষ শক্তি দুটি নিয়ামকের উপর নির্ভর করে।

খ বেঞ্জুয়েলা স্রোত হলো কুমেরু স্রোতের সেই শাখা যেটি আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল বরাবর বেঞ্জুয়েলার নিকট দিয়ে সোজা উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়।

কুমেরু স্রোত হতে উৎপত্তি হয় বলে এটি একটি শীতল স্রোত। উষ্ণমণ্ডলের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় তা ক্রমশ উষ্ণ হয় এবং পৃথিবীর আবর্তন গতি ও দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ুর প্রভাবে পশ্চিম দিকে বেঁকে নিরক্ষরেখার দক্ষিণ দিক দিয়ে সোজা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়।

গ উদ্দীপকে ভূভাগ দ্বারা পরিবেষ্টিত মহাসাগর বলতে ভারত মহাসাগরকে বোঝানো হয়েছে। এ মহাসাগরের দক্ষিণাংশের স্রোতসমূহ সারা বছর একই দিকে প্রবাহিত হয়। নিচে এ স্রোতসমূহের বর্ণনা দেওয়া হলো-

কুমেরু ও পশ্চিমা স্রোত : প্রবল পশ্চিমা বায়ুর তাড়নায় দক্ষিণ মহাসাগরের একটি শীতল স্রোত পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়, এ স্রোতটিই কুমেরু স্রোত বা পশ্চিমা স্রোত নামে পরিচিত। পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে এটি ভারত মহাসাগর অতিক্রম করে অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূলে উপনীত হয়ে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়।

দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত : দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু এবং পৃথিবীর আবর্তন গতির প্রভাবে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া স্রোতটি পশ্চিম দিকে বেঁকে প্রবাহিত হতে থাকে। ঐসময় অস্ট্রেলিয়ার নিউগিনির নিকটবর্তী টরেস প্রণালির মধ্য দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণে নিরক্ষীয় স্রোতের একটি শাখা এসে এর সাথে মিলিত হয়। পরে এ মিলিত স্রোত দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত নামে সোজা পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়, যা মাদাগাস্কার দ্বীপের কাছে পৌঁছে তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়।

মোজাম্বিক ও মাদাগাস্কার স্রোত : দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের যে শাখাটি মাদাগাস্কার দ্বীপের পূর্ব পাশ দিয়ে দক্ষিণে প্রবাহিত হয় তাকে মাদাগাস্কার স্রোত বলে। মাদাগাস্কার ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী মোজাম্বিক প্রণালির মধ্যে দিয়ে যে শাখাটি দক্ষিণে প্রবাহিত হয় তাকে মোজাম্বিক স্রোত বলে।

আগুলহাস স্রোত : মাদাগাস্কার দ্বীপের দক্ষিণে মোজাম্বিক এবং মাদাগাস্কার স্রোত মিলিত হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়। এ মিলিত স্রোতকে আগুলহাস স্রোত বলে।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত স্রোতসমূহ হলো ভারত মহাসাগরীয় স্রোত, যা জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। নিচে এদের প্রভাব বিশ্লেষণ করা হলো-

ভারত মহাসাগরের স্রোতগুলোর বৈশিষ্ট্য কিছুটা হলেও অন্যান্য মহাসাগর থেকে পৃথক। উত্তর ভারত মহাসাগরের গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি স্রোত সম্পূর্ণ ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। এ স্রোতের প্রভাবে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়াতে প্রবল বৃষ্টিপাত হয় এবং বর্ষা ঋতুর আবির্ভাব ঘটে। বর্তমানে কৃষি পদ্ধতির পরিবর্তন সত্ত্বেও বাংলাদেশ ও ভারতের কৃষির একটি বড় অংশ এবং মৎস্য প্রজনন বর্ষার উপর নির্ভরশীল। গ্রীষ্ম ও শীতকালীন মৌসুমি স্রোত সামুদ্রিক পরিবহনের উপরও প্রভাব বিস্তার করে, গ্রীষ্মের শুরুতে বিশেষত ভারত ও বাংলাদেশে খাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানিতে গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি স্রোতের গতিপথে অল্প সময়ে জাহাজ উপকূলে পৌঁছাতে পারে। আবার শীতকালীন মৌসুমি স্রোত প্রবাহিত হয় পূর্ণ উৎপাদন মৌসুমের পর এবং উক্ত স্রোত পথে মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, ইউরোপ বা আমেরিকাতে কম সময়ে জাহাজে পণ্য পরিবাহিত হয়।

আফ্রিকার উপকূলে উষ্ণ সোমালি, মোজাম্বিক, মাদাগাস্কার ও আগুলহাস স্রোত প্রবাহিত থাকার কারণে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং এ এলাকাগুলো কৃষিকাজে যথেষ্ট উন্নত। বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের কারণে উক্ত এলাকাগুলোতে যথেষ্ট বর্ষজীবী উদ্ভিজ্জও জন্মাতে দেখা যায় ও উষ্ণ স্রোতের গতিপথে সামুদ্রিক জাহাজগুলোও দ্রুত যাতায়াত করতে পারে। উষ্ণ স্রোত প্রবাহিত থাকার কারণে মিয়ানমার, মালয়েশিয়ায় ও সুমাত্রা উপকূলের জাহাজ চলাচল নির্বিঘ্ন থাকে এবং উপকূলীয় এলাকার বৃষ্টিপাতে স্রোতগুলো প্রভাব বিস্তার করে। অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূলে প্রবাহিত স্রোতটি পর্যায়ক্রমে উষ্ণতাপ্রাপ্ত হয় বিধায় ওই উপকূলে বৃষ্টিপাত কম হয়। ফলে উপকূলীয় এলাকায় জলাভূমি (দক্ষিণ পার্শ্বে) সৃষ্টি হয়েছে এবং স্রোতের উত্তরাংশে উপকূল এলাকায় বৃষ্টিপাত বেশি বলে (উষ্ণতা বাড়ার কারণে) ঘন বনাঞ্চল সৃষ্টি হয়েছে। উষ্ণ দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতপথে অস্ট্রেলিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে জাহাজ আফ্রিকার পথে এবং আফ্রিকা থেকে নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোত কিংবা গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি স্রোত পথে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাহাজ চলাচল করে।

সবদিক বিবেচনায় ভারত মহাসাগরীয় স্রোতগুলো উপকূলীয় এলাকার জলবায়ু, কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ১১ বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা নিরক্ষরেখার দক্ষিণে যে মহাসাগর তা দিয়ে লোহিত সাগর, ইথিওপিয়া হয়ে তিনি আফ্রিকার মোজাম্বিক পর্যন্ত পৌঁছান। এরপরে মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, সুমাত্রা এবং ভারতে দীর্ঘকালব্যাপী বিস্তৃত অঞ্চল পর্যটনের পর তিনি চীনে পৌঁছান। ◀ *শিখনফল: ৩*

ক. দক্ষিণ ভারত মহাসাগরের শীতল স্রোত কয়টি ও কী কী? ১

খ. ভারত মহাসাগরের উষ্ণ স্রোতগুলোর নাম লেখো। ২

গ. ইবনে বতুতা নিরক্ষরেখার দক্ষিণে যে স্রোত দিয়ে মোজাম্বিক পৌঁছান সে স্রোতের গতিপথ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকটিতে ইবনে বতুতা যে মহাসাগরের সমুদ্রস্রোত ব্যবহার করেছেন তার উত্তর দিকের সমুদ্রস্রোতগুলোর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দক্ষিণ ভারত মহাসাগরের শীতল স্রোত দুইটি। যথা– (১) কুমেরু ও (২) পশ্চিম অস্ট্রেলিয় স্রোত।

খ ভারত মহাসাগরের উষ্ণ স্রোতগুলোকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়।

দক্ষিণ ভারত মহাসাগরীয় উষ্ণ স্রোত : এই মহাসাগরে ৪টি উষ্ণ স্রোত দেখতে পাওয়া যায়। যথা– (i) দক্ষিণ নিরক্ষীয়, (ii) মোজাম্বিক, (iii) মাদাগাস্কার ও (iv) আগুলহাস স্রোত।

উত্তর ভারত মহাসাগরীয় উষ্ণ স্রোত : এই মহাসাগরীয় স্রোতে ৪টি উষ্ণ স্রোত দেখা যায়। যথা– (i) সোমালি, (ii) শীতকালীন মৌসুমি, (iii) গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি ও (iv) নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোত।

গ ইবনে বতুতা নিরক্ষরেখার দক্ষিণে 'দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত' দিয়ে মোজাম্বিক পৌঁছান।

দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতটি দক্ষিণ ভারত মহাসাগরীয় স্রোতচক্রের (currents) একটি গুরুত্বপূর্ণ স্রোত।

পশ্চিম অস্ট্রেলিয় স্রোত দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু প্রবাহ ও পৃথিবীর আবর্তনে পশ্চিমে বেঁকে নিরক্ষরেখার দক্ষিণ দিক দিয়ে আফ্রিকার

পূর্ব উপকূলে পৌঁছে। এই স্রোতটি দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত নামে পরিচিত। মাদাগাস্কার দ্বীপের নিকট স্রোত দু'ভাগে বিভক্ত হয়। একটি দ্বীপের উভয় দিক দিয়ে দক্ষিণমুখী এবং অপরটি উত্তরমুখী হয়।

ঘ উদ্দীপকটিতে ইবনে বতুতা ভারত মহাসাগরীয় স্রোত ব্যবহার করেছেন।

ভারত মহাসাগরীয় স্রোতচক্রটি (currents) ২টি ভাগে বিভক্ত। যথা– উত্তর ভারত মহাসাগরীয় এবং দক্ষিণ ভারত মহাসাগরীয় স্রোত। মহাসাগরের উত্তরের স্রোতগুলোই মূলত উত্তর ভারত মহাসাগরীয় স্রোত হিসেবে পরিচিত। নিচে এই স্রোতগুলো আলোচনা করা হলো:

সুমেরু স্রোত : পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে এন্টার্কটিকা অঞ্চলে একটি স্রোত সৃষ্টি হয়ে সমগ্র অঞ্চলে চক্রাকারে প্রবাহিত হয়। এই স্রোত প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে আফ্রিকার দক্ষিণ দিয়ে ভারত মহাসাগর অতিক্রম করে এবং সোজা অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে উপনীত হয়। সেখানে একটি শাখা অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ উপকূল দিয়ে পুনরায় প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবেশ করে কুমেরু স্রোতচক্র তৈরি করে। অপর শাখা অস্ট্রেলিয়ার লিউইন অন্তরীপে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে উত্তরে অগ্রসর হয়।

পশ্চিম অস্ট্রেলিয় স্রোত : কুমেরু স্রোতের যে শাখা অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে দেশটির পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে উত্তরে অগ্রসর হয় তা পশ্চিম অস্ট্রেলিয় স্রোত হিসেবে পরিচিত। এই শীতল স্রোতটি ক্রমান্বয়ে উত্তরগামী হয়ে ক্রান্তীয় অঞ্চলে ক্রমে উষ্ণস্রোতে পরিণত হয়।

মাদাগাস্কার ও মোজাম্বিক স্রোত : দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের যে শাখা মাদাগাস্কার দ্বীপের পূর্ব দিয়ে দক্ষিণে অগ্রসর হয় তা মাদাগাস্কার স্রোত এবং যে শাখাটি দ্বীপের পশ্চিম পার্শ্বে মোজাম্বিক প্রণালির মধ্য দিয়ে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয় তা মোজাম্বিক স্রোত নামে পরিচিত।

আগুলহাস স্রোত : মাদাগাস্কার দ্বীপের দক্ষিণে মাদাগাস্কার ও মোজাম্বিক স্রোত একত্রে মিলিত হয়ে আগুলহাস স্রোত নামে আফ্রিকার পূর্ব উপকূল দিয়ে উত্তমাশা অন্তরীপের নিকট পৌঁছে। সেখানে পশ্চিমা বাঁক দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পূর্ব দিকে বাঁক নিয়ে পুনরায় শীতল কুমেরু স্রোতের সাথে মিলিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ১২

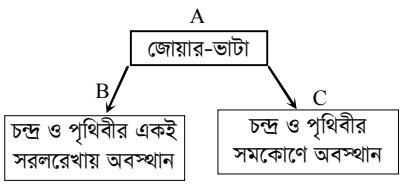

◀ *শিখনফল: ৪ [অধ্যাপক মো: আব্দুল কুদ্দুস; অনু-২]*

ক. ভাটা কী? ১

খ. গৌণ জোয়ার কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ছকের 'B' অংশে যে তথ্য দেওয়া আছে সে কারণে তেজকাটাল সংঘটিত হয়— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ছকের 'C' অংশের জোয়ার ছকের 'B' অংশের মতো নয়। বিশ্লেষণ করো। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর

ক জোয়ারের পানি নেমে যাওয়ার প্রক্রিয়াই ভাটা।

খ গৌণ জোয়ারের অপর নাম পরোক্ষ জোয়ার।

মুখ্য জোয়ারের ফলে বিপরীত দিকের পানিরাশির ওপর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব কমে এবং এর কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রভাবে চারপাশের পানিরাশির সেই স্থানে প্রবাহিত হয়ে যে জোয়ারের সৃষ্টি করে তাই গৌণ জোয়ার।

গ ছকের 'B' অংশে উল্লেখ আছে চন্দ্র ও পৃথিবী একই সরলরেখায় অবস্থান করে। চন্দ্র ও পৃথিবীর একই সরলরেখায় থাকলে তেজকটাল সংঘটিত হয়।

চাঁদ ও সূর্যের জোয়ার উৎপন্ন করার ক্ষমতা ১১ ঃ ৫। অর্থাৎ সূর্য যদি ৫ গুণ জোয়ারের সৃষ্টি করে তবে চাঁদ ১১ গুণ জোয়ার সৃষ্টি করে।

পৃথিবী ও চাঁদের আকর্ষণের একপর্যায়ে সূর্য ও চাঁদ পৃথিবীর একই দিকে অবস্থান করে। এ সময় অমাবস্যার সৃষ্টি হয়। আবার পূর্ণিমার সময় পৃথিবীর একদিকে সূর্য ও অন্যদিকে চাঁদ থাকে এবং এরা একই সরলরেখায় অবস্থান করে। ফলে চাঁদ ও সূর্যের আকর্ষণ শক্তি একই সাথে কার্যকরী হয়। সূর্যের আকর্ষণ চাঁদের আকর্ষণের তুলনায় কম হলেও উভয়ের মিলিত আকর্ষণ প্রবল। পূর্ণিমা তিথিতে ভূপৃষ্ঠের যে স্থানে চাঁদের প্রভাবে মুখ্য জোয়ার হয়, সেই স্থানে সূর্যের প্রভাবে গৌণ জোয়ার হয়। আবার অমাবস্যায় চাঁদ ও সূর্য উভয়ের মিলিত আকর্ষণে শক্তিশালী মুখ্য জোয়ার হয়। এভাবে তেজকটাল সংঘটিত হয়।

ঘ ছকের 'C' অংশের জোয়ার ছকের 'B' অংশের মতো নয়। কারণ, চন্দ্র ও পৃথিবীর অবস্থানগত পার্থক্যের কারণে B অংশে তেজকটাল এবং C অংশে মরাকটাল সংঘটিত হয়েছে।

C অংশে অমাবস্যা ও পূর্ণিমার অষ্টমী তিথিতে চাঁদ ও সূর্য পৃথিবীর সাথে একই সরলরেখায় অবস্থান না করে উভয়ে পৃথিবীর সাথে পরস্পর সমকোণে অবস্থান করে এবং পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। ফলে এ সময় চাঁদের আকর্ষণে চাঁদের দিকে ও বিপরীত দিকে জোয়ার এবং সূর্যের আকর্ষণে সূর্যের দিকে ও তার বিপরীত দিকে জোয়ার সংঘটিত হওয়ার কথা, কিন্তু দেখা যায় চাঁদের আকর্ষণে চাঁদের দিকে ও তার বিপরীত দিকে জোয়ার এবং সূর্যের দিকে ও সূর্যের বিপরীত দিকে ভাটা সংঘটিত হয়। এরূপ ঘটনাকে মরাকটাল বলে।

অপরদিকে 'B' অংশে চন্দ্র ও পৃথিবীয় একই সরলরেখা অবস্থান করে তখন তাদের মিলিত শক্তিতে জোয়ার-ভাটার প্রভাব সবচেয়ে বেশি। ফলে পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে উভয়ের মিলিত শক্তিতে জোয়ার অত্যন্ত প্রবল হয় ফলে তেজকটাল এর সৃষ্টি হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, 'C' অংশের জোয়ার ছকের 'B' অংশের চেয়ে ভিন্ন প্রকৃতির।

প্রশ্ন ▶ ১৩ 'ক' বিদ্যালয়ের কয়েকজন বন্ধু মিলে কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে গেল। সেখানে যাওয়ার পর গোসল করার সময় তারা যেখানে পানির অবস্থান দেখল। পরবর্তী সময়ে আবার যখন তারা সৈকতে গেল তখন তারা দেখল পানি অনেক নিচে অবস্থান করছে। এ অবস্থা দেখে তাদের মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টি হলো।

◀ *শিখনফল: ৪*

ক. সাগর কাকে বলে? ১
খ. ক্যানারি স্রোতকে শৈবাল সাগর বলা হয় কেন? ২
গ. বন্ধুদের দেখা ঘটনার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মানবজীবনে উক্ত ঘটনার প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহাসাগর অপেক্ষা সল্প আয়তন বিশিষ্ট জলরাশিকে সাগর বলে।

খ ক্যানারি স্রোতটি সাধারণত ডিম্বাকারে ঘুরে এবং উত্তরে নিরক্ষীয় স্রোতে মিলিত হয়।
ফলে এর মধ্যবর্তী পানিরাশি একেবারে স্রোতহীন থাকে। এই স্রোতহীন পানিতে ভাসমান আগাছা ও শৈবাল সঞ্চিত হয় এবং কিছু উদ্ভিদ জন্মায় এ জন্য ক্যানারি স্রোতকে শৈবাল সাগর বলা হয়।

গ বন্ধুদের দেখা পানির এরূপ আচরণের কারণ হলো জোয়ার-ভাটা।
সমুদ্রের এবং উপকূলবর্তী পানি রাশি প্রতিদিন ফুলে ওঠে আবার তা ধীরে নেমে যায়। জলরাশির নিয়মিত ফুলে ওঠাকে বলে জোয়ার এবং নেমে যাওয়াকে বলে ভাটা। নিম্নে জোয়ার ভাটার কারণ ব্যাখ্যা করা হলো।
সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে গিয়ে সবুজ সমুদ্রের যে রূপটি দেখেছিল তা হলো জোয়ার ও ভাটা। সাধারণত সমুদ্রের পানি ফুলে উঠাকে জোয়ার ও নেমে যাওয়াকে ভাটা বলে। পৃথিবীর উপর চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণ এবং পৃথিবীর আবর্তনের দরুন সৃষ্ট কেন্দ্রাতিগ শক্তি ও কেন্দ্রাবিমুখী শক্তি জোয়ার-ভাটার জন্য দায়ী।
মহাকাশের প্রতিটি গ্রহ-উপগ্রহ পরস্পরকে আকর্ষণ করছে। এই আকর্ষণের ফলে পৃথিবীসহ সকল গ্রহ সূর্যের চারদিকে এবং সকল উপগ্রহ গ্রহগুলোর চারদিকে ঘুরছে। এ আকর্ষণ শক্তির প্রভাবে পৃথিবীর উপরিভাগের তরল পানিরাশি পৃথিবী হতে চ্যুত হতে পারে না। সূর্য চাঁদ অপেক্ষা বড় হলেও পৃথিবী হতে চাঁদের দূরত্ব সূর্য হতে কম থাকায় চাঁদের আকর্ষণ শক্তি সূর্য হতে বেশি। তাই চাঁদের আকর্ষণে পানি অধিক ফুলে উঠে এবং জোয়ার হয়। আবার পৃথিবী ও চাঁদের আবর্তনের জন্য ভূপৃষ্ঠের তরল ও হালকা পানিরাশির ওপর কেন্দ্রাবিমুখী শক্তির প্রভাব অধিক হয়। এর ফলে পানিরাশি ভূভাগ হতে বিচ্ছিন্ন হতে চায়। এভাবে কেন্দ্রাবিমুখী শক্তি জোয়ার সৃষ্টিতে সহায়তা করে।
অপরদিকে, পৃথিবীর মোট পানিরাশির পরিমাণ সর্বত্র সমান না হওয়ায় পৃথিবীর একপাশে মুখ্য জোয়ার অপর পাশে গৌণ জোয়ার হয়। তখন এ দুই জোয়ারের মধ্যবর্তী সমকোণে অবস্থিত অংশে দূর হতে পানিরাশি সরে যায় বলে ঐ দুই স্থানে তখন ভাটা হয়।

ঘ সমুদ্রের পানির ফুলে ওঠাকে জোয়ার এবং নেমে যাওয়াকে ভাটা বলে। উক্ত অবস্থা তথা জোয়ার-ভাটার প্রভাবে বাংলাদেশের উপকূলের ঘরবাড়ি প্লাবিত হয়। ফলে বহুদূর পর্যন্ত নদীর অভ্যন্তরে লবণাক্ত পানি প্রবেশ করে মাঠের ফসল, গবাদিপশু ও শিল্পের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে থাক। উপকূলবর্তী এলাকায় জোয়ার-ভাটার নিম্নোক্ত প্রভাবসমূহ লক্ষ্য করা যায়।
নিচে উপকূলীয় অঞ্চলে জোয়ার-ভাটার প্রভাব বিশ্লেষণ করা হলো–
i. জোয়ার-ভাটার মাধ্যমে ভূখণ্ড থেকে আবর্জনাসমূহ নদীর মধ্যে দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পতিত হয়।
ii. দৈনিক দুবার জোয়ার-ভাটার ফলে নদীর মোহনায় পলি ও আবর্জনা জমতে পারে না।
iii. জোয়ার-ভাটার ফলে সৃষ্ট স্রোতের সাহায্যে নদীখাত গভীর হয়।
iv. বহু নদীতে ভাটার স্রোতের বিপরীতে বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। যেমন– কর্ণফুলী নদীতে সৃষ্ট জলবিদ্যুৎ প্রকল্প।
v. জোয়ারের পানি সেচে সহায়তা করে। যেমন : অনেক সময় খাল খনন করে জোয়ারের পানি আটকিয়ে সেচকার্যে ব্যবহার
vi. করা হয়।
শীতপ্রধান দেশে সমুদ্রের লবণাক্ত পানি জোয়ারের সাহায্যে নদীতে প্রবেশ করে। ফলে নদীর পানি সহজে জমে না।
vii. জোয়ার-ভাটার ফলে নৌযান চলাচলের মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা হয়। বাংলাদেশের দুটি প্রধান সমুদ্র বন্দর পতেঙ্গা ও মংলা এবং অন্যান্য উপকূলীয় নদীবন্দর সচল রাখতে জোয়ার-ভাটার ভূমিকা রয়েছে।

জোয়ার-ভাটার উপকারিতার পাশাপাশি কিছু ক্ষতিকর প্রভাবও লক্ষণীয়। মাঝে মাঝে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে নদীতে জোয়ারের সময় অনেক সময় বান ডাকে। ফলে নৌকা, লঞ্চ প্রভৃতি ডুবে যায় এবং নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় জানমালের ক্ষতি হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৪

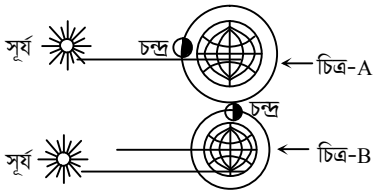

◀ *শিখনফল: ৪ [মধুপুর শহীদ স্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, টঙ্গাইল]*

ক. সমুদ্রখাত কী? ১
খ. জোয়ারের বান বলতে কী বোঝ? ২
গ. চিত্র A ও B এর মধ্যে কোন জোয়ার প্রবল হবে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মানবজীবনে চিত্র A ও B এর কোন অর্থনৈতিক গুরুত্ব আছে কি? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গভীর সমুদ্রের সমভূমি অঞ্চলের মাঝে অবস্থিত খাতই সমুদ্রখাত।

খ জোয়ারের প্রভাবে সমুদ্রের পানি মহীসোপানের অগভীর অংশে ও দ্বীপে প্রতিহত হলে জোয়ারের তরঙ্গের চূড়া ভেঙ্গে পড়ে। এ প্রবাহ কোনো কোনো নদীর (যেমন– হুগলি, ভগিরথী) মোহনা দিয়ে খুব প্রবল বেগে স্থলভাগের মধ্যে প্রবেশ করে। এরূপ অবস্থাই হলো জোয়ারের বান।

অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে নদীতে জোয়ারের সময় বান ডাকার ফলে অনেক সময় নৌকা, লঞ্চ প্রভৃতি ডুবে যায়। এতে নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় জানমালের ক্ষতি হতে পারে।

গ চিত্র A ও B দ্বারা যথাক্রমে তেজকটাল ও মরাকটাল দেখানো হয়েছে।

অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী প্রায় একই সরলরেখায় অবস্থান করে। ফলে চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণ শক্তি একই সাথে কার্যকরী হয়। উভয়ের মিলিত আকর্ষণ শক্তি প্রবল হয়। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার এই দুই দিন চন্দ্রের আকর্ষণে যে স্থানে জোয়ার হয় সূর্যের আকর্ষণেও সে স্থানে জোয়ার হয়। তখন চন্দ্র, সূর্যের মিলিত শক্তির আকর্ষণের ফলে পৃথিবীর দুই দিকের জলরাশি খুব বেশি মাত্রায় ফুলে ওঠে। ফলে জোয়ার প্রবল হয়। একে তেজকটাল বলে।

আবার, অষ্টমী তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য সমসূত্রে না থেকে পৃথিবীর সাথে সমকোণে থেকে আকর্ষণ করে। ঐ দিন চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীকে আড়াআড়িভাবে আকর্ষণ করে বলে আকর্ষণ বেগ অনেক কম হয়। তখন চন্দ্রের আকর্ষণে যেখানে জোয়ার হয় সূর্যের আকর্ষণে সেখানে ভাটা হয়। সূর্যের আকর্ষণের কারণে চন্দ্রের দিকে পানি বেশি স্ফীত হতে পারে না বলে জোয়ার প্রবল হয় না। একে মরা কটাল বলে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, চিত্র A ও B এর মধ্যে A অর্থাৎ তেজ কটাল প্রবল হয়।

ঘ চিত্র A ও B অর্থাৎ জোয়ার-ভাটা মানব জীবনের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।

জোয়ার ভাটার ফলে নৌযান চলাচলের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা হয়। জোয়ারের সময় নদীর মোহনায় ও তার অভ্যন্তরে পানি অধিক হয়। ফলে বড় বড় সমুদ্রগামী জাহাজের পক্ষে নদীতে প্রবেশ করা সহজ হয়। আবার, ভাটার টানে ঐ জাহাজ অনায়াসে সমুদ্রে নেমে আসতে পারে। যেমন– চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর। উপকূলীয় অঞ্চলে জোয়ারের সময় সামুদ্রিক লবণাক্ত পানি পার্শ্ববর্তী খণ্ড খণ্ড জমিতে ধরে রেখে সূর্যতাপে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে পানি দূর করে প্রাকৃতিকভাবে লবণ উৎপাদন করা হয়। এই লবণ বিক্রির মাধ্যমে অনেক মানুষ জীবিকানির্বাহ করে। বাংলাদেশের খুলনায় এরূপ লবণ চাষ দেখা যায়। এছাড়াও জোয়ার ভাটার প্রভাবে উপকূলীয় এলাকায় মৎস্যের প্রাচুর্যহেতু শতশত লোক মৎস্য আহরণ সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত রয়েছে। এসকল মৎস্য দেশ ও বিদেশের বাজারে বিক্রি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা যায়। সুতরাং বলা যায়, মানব জীবনে জোয়ার ভাটার অর্থনৈতিক গুরত্ব রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৫ সুবর্ণা কক্সবাজার সমুদ্র তীরে বসে দেখল সমুদ্রের পানি ফুলে উঠে তীরের দিকে ছুটে আসছে। কিছুক্ষণ পর কোস্টগার্ড সমুদ্রতীরের সবাইকে চলে যেতে বলল।

◀ *শিখনফল: ৪ [সরকারি এম. এম. কলেজ, যশোর]*

ক. ভাটা কাকে বলে। ১

খ. পানিবিদ্যুৎ উৎপাদনে জোয়ার-ভাটার ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ঘটনাটি সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাটির অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর প্রভাব আলোচনা কর। ৪

১৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমুদ্রের পানি নির্দিষ্ট সময় অন্তর ফুলে ওঠে এবং এক সময়ে নেমে যায়। পানির এ নেমে যাওয়াকে ভাটা বলে।

খ জোয়ার শক্তি হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর অনেক অংশে বিরাট আকারের জলাধার নির্মাণ করে জোয়ারের সময় পানিতে ভর্তি করে রাখা হয়। ভাটার সময় ওই পানি সরু পথে নিচে নির্গত করে টারবাইনের সাহায্যে পানিবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

গ উদ্দীপকে সুবর্ণা যে ঘটনাটি দেখল তা হলো জোয়ার-ভাটা। নিচে জোয়ার-ভাটার কারণ ব্যাখ্যা করা হলো–

প্রধানত দুটি কারণে জোয়ার-ভাটার সৃষ্টি হয়। এগুলো হলো– (১) চাঁদ ও সূর্যের মহাকর্ষ শক্তির প্রভাব এবং (২) পৃথিবীর আবর্তনের ফলে উৎপন্ন কেন্দ্রাতিগ শক্তি।

চাঁদ ও সূর্যের মকাকর্ষ শক্তির প্রভাব ঃ মহাকর্ষ সূত্র অনুযায়ী মহাকাশে বিভিন্ন গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র প্রতিটি জ্যোতিষ্ক পরস্পরকে আকর্ষণ করে। তাই এর প্রভাবে সূর্য ও চাঁদ পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। কিন্তু পৃথিবীর উপর সূর্য অপেক্ষা চাঁদের আকর্ষণ বল বেশি হয়। কারণ, সূর্যের ভর অপেক্ষা চাঁদের ভর অনেক কম হলেও চাঁদ সূর্য অপেক্ষা পৃথিবীর অনেক নিকটে অবস্থিত। তাই সমুদ্রের জল তরল বলে চাঁদের আকর্ষণেই প্রধানত সমুদ্রের জল ফুলে ওঠে জোয়ার হয়। সূর্যের আকর্ষণে জোয়ার তেমন জোরালো হয় না। চাঁদ ও সূয একই সরলরেখায় অবস্থিত হলে চাঁদ ও সূর্য উভয়ের আকর্ষণে জোয়ার অত্যন্ত প্রবল হয়।

পৃথিবীর আবর্তনের ফলে উৎপন্ন কেন্দ্রাতিগ শক্তি ঃ পৃথিবী নিজ মেরুরেখার চারদিকে অনবরত আবর্তন করে বলে কেন্দ্রাতিগ শক্তি বা বিকর্ষণ শক্তির সৃষ্টি হয়। এই কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রভাবে পৃথিবীর প্রতিটি অণূই মহাকর্ষ শক্তির বিপরীত দিকে বিকর্ষিত হয় বা ছিটকে যায়। তাই পৃথিবীর কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রভাবে যেখানে মহাশক্তির প্রভাবে জোয়ারের সৃষ্টি হয়, তার বিপরীত দিকে সমুদ্রের জল বিক্ষিপ্ত হয়েও জোয়ারের সৃষ্টি করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাটি হলো জোয়ার-ভাটা। নিচে অর্থনৈতিক উন্নয়নে জোয়ার-ভাটার প্রভাব আলোচনা করা হলো–

i. জোয়ার-ভাটার মাধ্যমে ভূখন্ড থেকে আবর্জনাসমূহ নদীর মধ্য দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পতিত হয়।

ii. দৈনিক দু'বার জোয়ার-ভাটা হওয়ার ফলে ভাটার টানে নদীর মোহনায় পলি ও আবর্জনা জমতে পারে না।

iii. জোয়ার-ভাটার ফলে সৃষ্ট স্রোতের সাহায্যে নদীখাত গভীর হয়।

iv. বহু নদীতে ভাটার স্রোতের বিপরীত বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

v. জোয়ারের পানি নদীর মাধ্যমে সেচে সহায়তা করে এবং অনেক সময় খার খনন করে জোয়ারের পানি আটকিয়ে সেচকার্যে ব্যবহার করা হয়।

vi. শীতপ্রধান দেশে সমুদ্রের লবণাক্ত পানি জোয়ারের সাহায্যে নদীতে প্রবেশ করে এবং এর ফলে নদীর পানি সহজে জমে না।

vii. জোয়ার-ভাটার ফলে নৌযান চলাচলের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা হয়। জোয়ারের সময় নদীর মোহনায় ও তার অভ্যন্তরে পানি অধিক হয় বলে বড় বড় সমুদ্রগামী জাহাজের পক্ষে নদীতে প্রবেশ করা সুবিধা হয়। আবার জোয়ারের টানে ঐ জাহাজ অনায়াসে সমুদ্রে নেমে আসতে পারে। বাংলাদেশের দুটি প্রধান সমুদ্রবন্দর পতেঙ্গা ও মংলা এবং অন্যান্য উপকূলবর্তী নদীবন্দর সচল রাখতে জোয়ার-ভাটার ভূমিটা রয়েছে।

viii. অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে নদীতে অধিক মাত্রায় জোয়ারের সময় নৌকা, লঞ্চ প্রভৃতি ডুবে যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এতে নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় জানমালের ক্ষতি হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৬ পূর্ণিমার সময় কাশেম ও নিয়াজ সমুদ্রসৈকতে বেড়াতে গেছে। সমুদ্রের নিকটে একটি হোটেলে তারা উঠেছে। রাতে কাশেম বারান্দা হতে দেখল সাগরের পানি একেবারে হোটেলের নিকট। অথচ সকালে পানি অনেক দূরে ছিল। নিয়াজ জানাল, সবসময় পানি হোটেল পর্যন্ত আসে না। পরের দিন ফেরার পথে কিছুদূর পরপর তারা দেখল রাস্তার দু'পাশে খণ্ড খণ্ড জমিতে পানি আটকানো। নিয়াজকে জিজ্ঞেস করলে জানা গেল এগুলো এলাকাবাসীর জীবিকা অর্জনের অন্যতম মাধ্যম।

◀ শিখনফল: ৪ [নুরুল আমিন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, মাদারীপুর]

ক. সমুদ্রস্রোত কী? ১

খ. জোয়ার ভাটার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে এলাকাবাসীর কোন ধরনের জীবিকার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'সবসময় পানি হোটেল পর্যন্ত আসে না'—নিয়াজের এ বক্তব্যের কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সমুদ্রের পানির নির্দিষ্ট ও নিয়মিত প্রবাহকে সমুদ্রস্রোত বলে।

খ চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণ এবং পৃথিবীর কেন্দ্রাতিগ শক্তির কারণে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে সাগরের পানি দুইবার এক জায়গায় ফুলে ওঠে ও অন্য স্থানে নেমে যায়। সমুদ্রের পানির এরূপ ফুলে ওঠাকে জোয়ার এবং নেমে যাওয়াকে ভাটা বলে।

গ উদ্দীপকে এলাকাবাসীর লবণ চাষের মাধ্যমে জীবিকার কথা বলা হয়েছে।

উপকূলীয় অঞ্চলে জোয়ার-ভাটার সময় সামুদ্রিক লবণাক্ত পানি পার্শ্ববর্তী খণ্ড খণ্ড জমিতে ধরে রেখে সূর্যতাপে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে পানি দূর করে প্রাকৃতিকভাবে লবণ উৎপাদন করা হয়। এই লবণ রন্ধকার্য ছাড়াও মাটির ক্ষারীয় প্রভাব কমাতে ও পুকুরে মাছ চাষের কাজে ব্যবহৃত হয় বলে এর চাহিদাও ব্যাপক। লবণ চাষীদের এই প্রক্রিয়ায় লবণ উৎপাদনে তেমন কোনো খরচ নেই বলে তারা বেশ লাভবান হয় এবং এই লবণ বিক্রির মাধ্যমে তারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করে।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় লবণ চাষ উপকূলীয় এলাকাবাসীর জীবিকা অর্জনের অন্যতম মাধ্যম।

ঘ উদ্দীপকে সংঘটিত ঘটনাটি হলো জোয়ার-ভাটা।

উদ্দীপক অনুসারে কাশেম ও নিয়াজ সমুদ্রসৈকতে বেড়াতে গিয়ে দেখল রাতে পানি হোটেলের নিকট অথচ সকালে পানি অনেক দূরে ছিল। কাশেম এ সম্পর্কে জানতে চাইলে নিয়াজ বলে, 'সবসময় পানি হোটেল পর্যন্ত আসে না'। নিয়াজের এ বক্তব্যের কারণ হলো জোয়ার-ভাটা।

চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণ এবং পৃথিবীর কেন্দ্রাতিগ শক্তির কারণে সমুদ্র এবং উপকূলবর্তী নদীর জলরাশি প্রতিদিনই একটি নির্দিষ্ট সময়ে ফুলে ওঠছে এবং নির্দিষ্ট সময় তা আবার ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে। জলরাশির এ রকম নিয়মিত স্ফীতি বা ফুলে ওঠাকে জোয়ার ও নেমে যাওয়াকে ভাটা বলে। প্রতি ২৪ ঘণ্টায় দুইবার জোয়ার এবং দুইবার ভাটা সংঘটিত হয়। এরূপে সমুদ্রে যখন জোয়ার সংঘটিত হয় তখন পানি জোয়ারের প্রভাবে হোটেলের নিকটবর্তী চলে যায় আবার যখন ভাটা সংঘটিত হয় তখন পানি ভাটার প্রভাবে হোটেল থেকে অনেক দূরে চলে যায়।

সুতরাং নিয়াজের বক্তব্য অর্থাৎ 'সবসময় পানি হোটেল পর্যন্ত আসে না, এর যথার্থ কারণ হলো জোয়ার-ভাটার প্রভাব।

প্রশ্ন ▶ ১৭

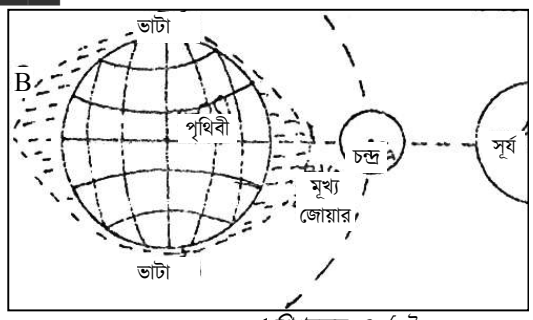

◀ শিখনফল: ৪ [নটরডেম কলেজ, ঢাকা]

ক. জোয়ার-ভাটা কাকে বলে? ১

খ. মাধ্যাকর্ষণ শক্তি জোয়ারের উপর কীরূপ প্রভাব বিস্তার করে? ২

গ. 'B' চিহ্নিত জোয়ারের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পানির উচ্চতার ভিত্তিতে চিত্রে উল্লিখিত জোয়ার ব্যাখ্যা করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নদী বা সমুদ্রের পানিরাশির ফুলে ওঠাকে জোয়ার এবং নেমে যাওয়াকে ভাটা বলে।

খ মহাকাশে বিভিন্ন গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি একে অপরকে আকর্ষণ করে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণেই এমনটি হয়। এর প্রভাবেই সূর্য ও চাঁদ পৃথিবীকে আকর্ষণ করে।

পৃথিবীর উপর সূর্য ও চাঁদের আকর্ষণ বল ক্রিয়াশীল হলে সমুদ্রের জল ফুলে ওঠে ও জোয়ার হয়। সুতরাং বলা যায়, জোয়ারের উপর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

গ 'B' চিহ্নিত জোয়ারটি গৌণ জোয়ার।
চন্দ্র পৃথিবীর যে পাশে আকর্ষণ করে তার বিপরীত দিকে আকর্ষণ শক্তির প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু পানির নিচে যে কঠিন স্থলভাগ রয়েছে তার ওপর চন্দ্রের আকর্ষণ ক্রিয়াশীল। ফলে বিপরীত দিকের জলরাশি অপেক্ষা স্থলভাগ চন্দ্রের দিকে বেশি আকৃষ্ট হয়।
এ সময় চন্দ্রের বিপরীত দিকের জলরাশির ওপর মহাকর্ষণ শক্তির প্রভাব কমে যায় এবং কেন্দ্রাতিগ শক্তির (centrifugul force) সৃষ্টি হয়। এতে চারদিক হতে পানি ঐ স্থানে এসে জোয়ারের সৃষ্টি করে। এভাবে চন্দ্রের বিপরীত দিকে যে জোয়ার হয় তা গৌণ জোয়ার বা পরোক্ষ জোয়ার।

ঘ পানির উচ্চতার ভিত্তিতে জোয়ারকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ভরা ও মরা কটাল। চিত্রে ভরা কটাল দেখানো হয়েছে।
জোয়ার সৃষ্টিতে চাঁদ ও সূর্যের আকর্ষণ ক্ষমতার অনুপাত ১১ ঃ ৫। অমাবস্যায় চাঁদ ও সূর্য পৃথিবীর একই দিকে থেকে সমসূত্রে (same line) অবস্থান করে। আবার পূর্ণিমার সময় পৃথিবীর এক দিকে সূর্য ও অপরদিকে চাঁদ থাকে এবং সমসূত্রে অবস্থান করে। এর ফলে চাঁদ ও সূর্যের আকর্ষণশক্তি একই সঙ্গে কার্যকর হয়। ফলে উভয়ের মিলিত আকর্ষণ প্রবল হয়।

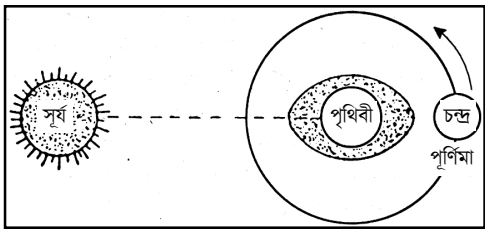

চিত্র : পূর্ণিমায় তেজ বা ভরা কটাল

পূর্ণিমা তিথিতে ভূপৃষ্ঠের যে স্থানে চাঁদের প্রভাবে মুখ্য জোয়ার হয়, সেই স্থানে সূর্যের প্রভাবে গৌণ জোয়ার হয়। আবার অমাবস্যায় চাঁদ ও সূর্য উভয়ের মিলিত আকর্ষণে শক্তিশালী মুখ্য জোয়ার হয়। আর একই স্থানে চাঁদ ও সূর্যের মিলিত আকর্ষণে প্রবল জোয়ার হলে পানি খুব উঁচু হয়ে ওঠে। একেই ভরা কটাল বলে।

প্রশ্ন ▶ ১৮ সৌমিত্র তার বাড়িতে আসা খালাতো ভাই তাপসকে নিয়ে মেঘনা নদীর পাড়ে বসে গল্প করছে আর নদী দেখছে। মেঘনার পানি ধীরে ধীরে ফুলে উঠতে দেখে সৌমিত্র তাপসকে জানালো গত বছর এরূপ পানি ফুলে উঠার সময় বান ডাকায় একটি লঞ্চ ডুবে গিয়েছিল এবং ১৫/২০ জন মানুষও মারা গিয়েছিল। ◀ *শিখনফল: ৫*

ক. জোয়ার-ভাটার স্থিতিকাল কত? ১
খ. ভরা কটাল বলতে কী বোঝ? ২
গ. সৌমিত্র মেঘনায় যে বিষয়টা লক্ষ করলো, উপকূলবর্তী নদী বা খাঁড়িতে তার কী প্রভাব পড়ে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে মেঘনায় পানি ফুলে উঠার ফলে উপকূলীয় অঞ্চলে আর কী কী প্রভাব পড়বে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জোয়ার-ভাটার স্থিতিকাল প্রায় ৬ ঘণ্টা।

খ অমাবস্যায় চাঁদ ও সূর্য পৃথিবীর একই দিকে এক সঙ্গে সমসূত্রে অবস্থান করে। আবার পূর্ণিমার সময় পৃথিবীর একদিকে সূর্য ও অপরদিকে চাঁদ থাকে এবং সমসূত্রে অবস্থান করে। এর ফলে চাঁদ ও সূর্যের আকর্ষণ শক্তি একই সঙ্গে কার্যকর হয়।
সূর্যের আকর্ষণ চাঁদের তুলনায় পৃথিবীর উপর কম হলেও উভয়ের মিলিত আকর্ষণ প্রবল হয়। ফলে এ দু'সময় জোয়ারের পানি খুব বেশি ফুলে উঠে। একে ভরা কটাল (spring tide) বলে।

গ সৌমিত্র মেঘনায় যে বিষয়টা লক্ষ করল তা হলো জোয়ার।
উপকূলবর্তী নদী বা খাঁড়িতে এই জোয়ারের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। উপকূলবর্তী নদী বা খাঁড়িতে ঋতুভেদে নদীর পানির প্রবাহের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে এর ফলাফলগত ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। সমুদ্রের জোয়ারের পানি বাংলাদেশের উপকূলের খাঁড়ি থেকে বহুদূরে নদীর অভ্যন্তরে প্রায় গোয়ালন্দের নিকট পর্যন্ত পৌঁছে। খাঁড়ি অঞ্চলে শীত ঋতুতে নদীবাহিত পানির পরিমাণ গ্রীষ্মের তুলনায় অত্যন্ত কম। এজন্য এ ঋতুতে জোয়ারের লবণাক্ত পানি নদীর অভ্যন্তরে বহুদূরে অগ্রসর হতে পারে। এতে করে বহুদূর পর্যন্ত নদীর অভ্যন্তরে লবণাক্ত পানি প্রবেশ করে। ফলে মাঠের ফসল, গবাদি পশু ও শিল্পের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে।

ঘ উদ্দীপকে মেঘনায় যে লঞ্চডুবি হয়ে প্রাণহানি ঘটেছে তা মূলত জোয়ার-ভাটার ফলে।
নিচে উপকূলীয় অঞ্চলে জোয়ার-ভাটার প্রভাব বিশ্লেষণ করা হলো–

i. জোয়ার-ভাটার মাধ্যমে ভূখণ্ড থেকে আবর্জনাসমূহ নদীর মধ্যে দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পতিত হয়।
ii. দৈনিক দুবার জোয়ার-ভাটার ফলে নদীর মোহনায় পলি ও আবর্জনা জমতে পারে না।
iii. জোয়ার-ভাটার ফলে সৃষ্ট স্রোতের সাহায্যে নদীখাত (যেমন– মেঘনা) গভীর হয়।
iv. বহু নদীতে ভাটার স্রোতের বিপরীতে বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। যেমন– কর্ণফুলী নদীতে সৃষ্ট জলবিদ্যুৎ প্রকল্প।
v. জোয়ারের পানি সেচে সহায়তা করে। যেমন : খাল খনন করে জোয়ারের পানি আটকিয়ে সেচকার্যে ব্যবহার করা হয়।
vi. শীতপ্রধান দেশে (কানাডা) সমুদ্রের লবণাক্ত পানি জোয়ারের সাহায্যে নদীতে প্রবেশ করে। ফলে নদীর পানি সহজে জমে না।
vii. জোয়ার-ভাটার ফলে নৌযান চলাচলের মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা হয়। বাংলাদেশের দুটি প্রধান সমুদ্র বন্দর পতেঙ্গা ও মংলা এবং অন্যান্য উপকূলীয় নদীবন্দর সচল রাখতে জোয়ার-ভাটার ভূমিকা রয়েছে।

জোয়ার-ভাটার উপকারিতার পাশাপাশি কিছু ক্ষতিকর প্রভাবও লক্ষণীয়। মাঝে মাঝে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে নদীতে জোয়ারের সময় অনেক সময় বান ডাকে। ফলে নৌকা, লঞ্চ প্রভৃতি ডুবে যায় এবং নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় জানমালের ক্ষতি হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৯ সৌমিত্র তার বাড়িতে আসা খালাতো ভাই তাপসকে নিয়ে মেঘনা নদীর পাড়ে বসে গল্প করছে আর নদী দেখছে। মেঘনার পানি ধীরে ধীরে ফুলে উঠতে দেখে সৌমিত্র তাপসকে জানালো গত বছর এরূপ পানি ফুলে উঠার সময় বান ডাকায় একটি লঞ্চ ডুবে গিয়েছিল এবং ১৫/২০ জন মানুষও মারা গিয়েছিল। ◀ *শিখনফল: ৫*

ক. জোয়ার-ভাটার স্থিতিকাল কত? ১

খ. ভরা কটাল বলতে কী বোঝ? ২

গ. সৌমিত্র মেঘনায় যে বিষয়টা লক্ষ করলো, উপকূলবর্তী নদী বা খাঁড়িতে তার কী প্রভাব পড়ে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে মেঘনায় পানি ফুলে উঠার ফলে উপকূলীয় অঞ্চলে আর কী কী প্রভাব পড়বে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জোয়ার-ভাটার স্থিতিকাল প্রায় ৬ ঘণ্টা।

খ অমাবস্যায় চাঁদ ও সূর্য পৃথিবীর একই দিকে এক সঙ্গে সমসূত্রে অবস্থান করে। আবার পূর্ণিমার সময় পৃথিবীর একদিকে সূর্য ও অপরদিকে চাঁদ থাকে এবং সমসূত্রে অবস্থান করে। এর ফলে চাঁদ ও সূর্যের আকর্ষণ শক্তি একই সঙ্গে কার্যকর হয়।

সূর্যের আকর্ষণ চাঁদের তুলনায় পৃথিবীর উপর কম হলেও উভয়ের মিলিত আকর্ষণ প্রবল হয়। ফলে এ দু'সময় জোয়ারের পানি খুব বেশি ফুলে উঠে। একে ভরা কটাল (spring tide) বলে।

গ সৌমিত্র মেঘনায় যে বিষয়টা লক্ষ করল তা হলো জোয়ার।

উপকূলবর্তী নদী বা খাঁড়িতে এই জোয়ারের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। উপকূলবর্তী নদী বা খাঁড়িতে ঋতুভেদে নদীর পানির প্রবাহের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে এর ফলাফলগত ভিন্নতা লক্ষ করা যায়।

সমুদ্রের জোয়ারের পানি বাংলাদেশের উপকূলের খাঁড়ি থেকে বহুদূরে নদীর অভ্যন্তরে প্রায় গোয়ালন্দের নিকট পর্যন্ত পৌঁছে। খাঁড়ি অঞ্চলে শীত ঋতুতে নদীবাহিত পানির পরিমাণ গ্রীষ্মের তুলনায় অত্যন্ত কম। এজন্য এ ঋতুতে জোয়ারের লবণাক্ত পানি নদীর অভ্যন্তরে বহুদূরে অগ্রসর হতে পারে। এতে করে বহুদূর পর্যন্ত নদীর অভ্যন্তরে লবণাক্ত পানি প্রবেশ করে। ফলে মাঠের ফসল, গবাদি পশু ও শিল্পের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে।

ঘ উদ্দীপকে মেঘনায় যে লঞ্চডুবি হয়ে প্রাণহানি ঘটেছে তা মূলত জোয়ার-ভাটার ফলে।

নিচে উপকূলীয় অঞ্চলে জোয়ার-ভাটার প্রভাব বিশ্লেষণ করা হলো–

i. জোয়ার-ভাটার মাধ্যমে ভূখণ্ড থেকে আবর্জনাসমূহ নদীর মধ্যে দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পতিত হয়।

ii. দৈনিক দুবার জোয়ার-ভাটার ফলে নদীর মোহনায় পলি ও আবর্জনা জমতে পারে না।

iii. জোয়ার-ভাটার ফলে সৃষ্ট স্রোতের সাহায্যে নদীখাত (যেমন– মেঘনা) গভীর হয়।

iv. বহু নদীতে ভাটার স্রোতের বিপরীতে বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। যেমন– কর্ণফুলী নদীতে সৃষ্ট জলবিদ্যুৎ প্রকল্প।

v. জোয়ারের পানি সেচে সহায়তা করে। যেমন : খাল খনন করে জোয়ারের পানি আটকিয়ে সেচকার্যে ব্যবহার করা হয়।

vi. শীতপ্রধান দেশে (কানাডা) সমুদ্রের লবণাক্ত পানি জোয়ারের সাহায্যে নদীতে প্রবেশ করে। ফলে নদীর পানি সহজে জমে না।

vii. জোয়ার-ভাটার ফলে নৌযান চলাচলের মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা হয়। বাংলাদেশের দুটি প্রধান সমুদ্র বন্দর পতেঙ্গা ও মংলা এবং অন্যান্য উপকূলীয় নদীবন্দর সচল রাখতে জোয়ার-ভাটার ভূমিকা রয়েছে।

জোয়ার-ভাটার উপকারিতার পাশাপাশি কিছু ক্ষতিকর প্রভাবও লক্ষণীয়। মাঝে মাঝে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে নদীতে জোয়ারের সময় অনেক সময় বান ডাকে। ফলে নৌকা, লঞ্চ প্রভৃতি ডুবে যায় এবং নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় জানমালের ক্ষতি হয়।

প্রশ্ন ▶ ২০

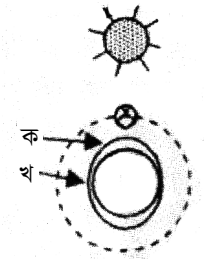

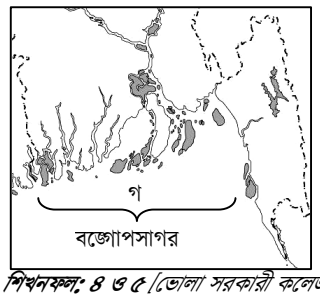

◀ *শিখনফল: ৪ ও ৫ [ভোলা সরকারী কলেজ]*

ক. সমুদ্রস্রোত কী? ১

খ. কোনো স্থানে বেলা ১২টার সময় জোয়ার হলে উক্ত স্থানে পরবর্তী জোয়ার কখন হবে? ২

গ. 'ক' ও 'খ' অবস্থা সংঘটনের কারণ লেখো। ৩

ঘ. 'গ' অঞ্চলের উপর 'ক' ও 'খ' অবস্থার প্রভাব বর্ণনা করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমুদ্রের উপরিভাগের পানিরাশি বায়ুপ্রবাহের একটি নির্দিষ্ট গতিপথ অনুসরণ করে এক স্থান হতে অন্য স্থানে প্রবাহিত হওয়াকে সুমদ্রস্রোত বলে।

খ আহ্নিক গতির ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে প্রতিদিন দুবার করে জোয়ার ও ভাটা হয়ে থাকে। তবে জোয়ার ভাটা ঠিক ৬ ঘণ্টা পরে না হয়ে ৬ ঘণ্টা ১৩ মিনিট পরে হয়। এজন্য কোনো স্থানে বেলা ১২ টার সময় জোয়ার হলে উক্ত স্থানে রাত ১২ টা ২৬ মিনিটে পরবর্তী জোয়ার হবে।

গ চিত্রে 'ক' ও 'খ' অবস্থা হলো জোয়ার ও ভাটা। সাধারণত সমুদ্রের পানি ফুলে উঠাকে জোয়ার ও নেমে যাওয়াকে ভাটা বলে। পৃথিবীর উপর চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণ এবং পৃথিবীর আবর্তনের দরুন সৃষ্ট কেন্দ্রাতিগ শক্তি ও কেন্দ্রাবিমুখী শক্তি জোয়ার-ভাটার জন্য দায়ী।

মহাকাশের প্রতিটি গ্রহ-উপগ্রহ পরস্পরকে আকর্ষণ করছে। এই আকর্ষণের ফলে পৃথিবীসহ সকল গ্রহ সূর্যের চারদিকে এবং সকল উপগ্রহ গ্রহগুলোর চারদিকে ঘুরছে। এ আকর্ষণ শক্তির প্রভাবে পৃথিবীর উপরিভাগের তরল পানিরাশি পৃথিবী হতে চ্যুত হতে পারে না। সূর্য চাঁদ অপেক্ষা বড় হলেও পৃথিবী হতে চাঁদের দূরত্ব সূর্য হতে কম থাকায় চাঁদের আকর্ষণ শক্তি সূর্য হতে বেশি। তাই চাঁদের আকর্ষণে পানি অধিক ফুলে উঠে এবং জোয়ার হয়। আবার পৃথিবী ও চাঁদের আবর্তনের জন্য ভূপৃষ্ঠের তরল ও হালকা পানিরাশির উপর কেন্দ্রাবিমুখী শক্তির প্রভাব অধিক হয়। এর ফলে পানিরাশি ভূভাগ হতে বিচ্ছিন্ন হতে চায়। এভাবে কেন্দ্রাবিমুখী শক্তি জোয়ার সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

অপরদিকে, পৃথিবীর মোট পানিরাশির পরিমাণ সর্বত্র সমান না হওয়ায় পৃথিবীর একপাশে মুখ্য জোয়ার অপর পাশে গৌণ জোয়ার হয়। তখন এ দুই জোয়ারের মধ্যবর্তী সমকোণে অবস্থিত অংশে দূর হতে পানিরাশি সরে যায় বলে ঐ দুই স্থানে তখন ভাটা হয়।

ঘ চিত্রের 'গ' অঞ্চলটি হচ্ছে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল এবং 'ক' ও 'খ' দ্বারা জোয়ার ও ভাটা বোঝানো হয়েছে।

সাধারণত সমুদ্রের পানি ফুলে ওঠাকে জোয়ার এবং নেমে যাওয়াকে ভাটা বলে। জোয়ার-ভাটা উপকূলবর্তী এলাকার অধিবাসীদের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। জোয়ার-ভাটার ফলে নৌযান চলাচলের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা হয়। জোয়ারের সময় নদীর মোহনায় ও তার অভ্যন্তরে পানি অধিক থাকে। ফলে বড় বড় সমুদ্রগামী জাহাজের পক্ষে নদীতে প্রবেশ করা সুবিধাজনক হয়। আবার, ভাটার টানে ঐ জাহাজ অনায়াসে সমুদ্রে নেমে আসতে পারে। জোয়ার-ভাটার মধ্য দিয়ে ভূখণ্ড থেকে ময়লা আবর্জনাসমূহ সাগরে গিয়ে পতিত হয়। উপকূলীয় অঞ্চলে জোয়ার-ভাটার প্রভাবে মৎস্যের প্রাচুর্যহেতু শতশত লোক মৎস্য আহরণ সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত আছে। এ সকল মৎস্য দেশ ও বিদেশের বাজারে বিক্রি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন হয়।

স্বাভাবিক জোয়ার-ভাটার কোনো কুফল নেই। এটি নিতান্তই প্রাকৃতিক। তবে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে জোয়ারের সময় বান ডাকার ফলে অনেক সময় নৌকা, লঞ্চ প্রভৃতি ডুবে যায় এবং উপকূলবর্তী অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে জানমালের ক্ষতি হয়। এছাড়া শীত ঋতুতে জোয়ারের লবণাক্ত পানি নদীর অভ্যন্তরে বহুদূরে অগ্রসর হতে পারে। ফলে নদীর পার্শ্ববর্তী মাঠের ফসল, গবাদিপশু ও বিভিন্ন শিল্পের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখি, জোয়ার-ভাটা স্বাভাবিকভাবে মানুষের কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে। জোয়ার-ভাটার এ প্রভাব ইতিবাচক। তবে বিশেষ বিশেষ সময়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে জোয়ার-ভাটার যে কুফল তা মানুষের কর্মকাণ্ডেও সাময়িক প্রভাব ফেলে।

প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ২১ সমুদ্রস্রোত কোন স্থানের জলবায়ুর ওপর বিশাল প্রভাব বিস্তার করে। দক্ষিণ আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ধরে উত্তরদিকে প্রবাহিত শীতল স্রোতের প্রভাবে বিস্তৃত কালাহারি মরুভূমির সৃষ্টি হয়েছে। অপরদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত স্রোতের প্রভাবে টেবিল মালভূমি অঞ্চলে অনেক বৃষ্টিপাত হয়। ◀ *শিখনফল: ২*

ক. জোয়ার-ভাটার সংজ্ঞা দাও। ১

খ. মহীসোপান ও মহীঢালের মধ্যে তিনটি পার্থক্য লিখো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শীতল ও উষ্ণ স্রোত সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শীতল স্রোত থেকে শুরু করে দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরীয় সমুদ্র স্রোতের চক্রটি চিত্রসহ আলোচনা করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমুদ্র সমতল থেকে পানির নিয়মিত নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী ওঠানামাকে জোয়ার-ভাটা বলে।

খ মহীসোপান ও মহীঢালের তিনটি পার্থক্য হলো:

১. মহাদেশগুলোর বাইরের দিকের সমুদ্রের অগভীর অঞ্চলকে মহীসোপান বলে। অন্যদিকে মহীসোপানের শেষসীমা থেকে হঠাৎ খাড়াভাবে যে ঢাল গভীর সমুদ্রে নেমে যায় তাকে মহীঢাল বলে।

২. মহীসোপান এক ডিগ্রির কম কৌণিকভাবে ঢালু হয়ে সমুদ্রের তলদেশে বিস্তৃত হয়। অন্যদিকে মহীঢাল ২-৫° কৌণিকভাবে বা সম্পূর্ণ খাড়া অবস্থায় সমুদ্রতলে নেমে যায়।

৩. মহীপালের সর্বোচ্চ গভীরতা ১৮০ মিটার এবং মহীঢালের সর্বোচ্চ গভীরতা ৩,৬০০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে।

সুপার টিপস্ : প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ আটলান্টিক মহাসাগরে শীতল ও উষ্ণ স্রোত সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করো।

ঘ দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরীয় সমুদ্রস্রোতের চক্রটি চিত্রসহ আলোচনা করো।

নবম অধ্যায়
জীবমণ্ডল

পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶১ 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' উপলক্ষে লিখিত এক প্রবন্ধে বিজ্ঞানী স্টুয়ার্ড উল্লেখ করেছেন, "আমাদের এই ধরণীতে বসবাসকারী জীবসমূহের মাঝে প্রজাতিগত, জিনগত ও পারিবেশিক যে বিভিন্নতা রয়েছে তা আমাদের অস্তিত্বের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।" তাই আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে জীবের এই বিভিন্নতাকে ধরে রাখার জন্য তথা সংরক্ষণের জন্য তিনি বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান জানান। *◀শিখনফল-১*

ক. ইকোসিস্টেম কী? ১

খ. প্রজাতি বৈচিত্র্য কী? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. বিজ্ঞানী স্টুয়ার্ড কোন বিষয়ের গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন- ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. স্টুয়ার্ড সাহেব যে কাজ করার জন্য বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন কোন উপায়ে সে কাজটি করা যায়? মতামত দাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো স্থানের জীব (উদ্ভিদ, প্রাণী, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি) ও এদের পরিবেশ নিজেদের মধ্যে এবং পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া-বিক্রিয়ার গতিময় পদ্ধতিই ইকোসিস্টেম।

খ কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে বিভিন্ন প্রজাতির সমাবেশকে প্রজাতি বৈচিত্র্য বলে। প্রজাতির প্রাচুর্য জীব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রজাতির সংখ্যা নির্দেশ করে। বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে প্রত্যেক জীবের বণ্টন হলো সে প্রজাতির অভিন্নতা।

গ উদ্দীপকে বিজ্ঞানী স্টুয়ার্ড মূলত জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। মানবগোষ্ঠীর প্রয়োজনে জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব অপরিসীম। জীববৈচিত্র্য পরিবেশের জড় ও জীব উপাদান দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

মানুষ বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ উৎস থেকে খাদ্য, বস্তু, ওষুধ, শিল্পজাত পণ্য, জ্বালানি, বাসস্থান তৈরির সরঞ্জাম ইত্যাদি সংগ্রহ করে থাকে। প্রায় সাত হাজার উদ্ভিদ প্রজাতিকে মানুষ খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। মাটিতে যেসব বিশ্লেষক ব্যাকটেরিয়া এবং অণুজীব রয়েছে তারা উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহ পচিয়ে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। আবার মাটিতে বসবাসকারী কিছু ব্যাকটেরিয়া ও নীলাভ সবুজ শৈবাল বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনকে ধারণ করে জমিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। বিভিন্ন প্রকার ওষুধের উৎস হিসেবেও উদ্ভিদ ও অণুজীব ব্যবহৃত হয়। কৃষিকাজ, মৎস্য চাষ, বনজ সম্পদ, রেশম চাষ, কুটির শিল্প, মৌমাছি চাষ, শিল্পের কাঁচামাল, ওষুধপত্র, কৃত্রিম প্রজনন, জাতীয় উদ্যান, অভয়ারণ্য, চিড়িয়াখানা স্থাপন ইত্যাদি নানাবিধ উপায়ে জীববৈচিত্র্য বিশ্ব অর্থনীতিতে বিরাট ভূমিকা রেখে চলেছে।
উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, মানবগোষ্ঠীর প্রয়োজনে জীববৈচিত্র্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিজ্ঞানী স্টুয়ার্ড বিশ্ববাসীকে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। মানুষের প্রয়োজনেই আজ জীববৈচিত্র্যকে টিকিয়ে রাখা জরুরি হয়ে পড়েছে, যা সংরক্ষণ করতে নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে-

বনাঞ্চলের সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন : জীববৈচিত্র্যের প্রধান বাসস্থান হলো বনাঞ্চল- যা সংরক্ষণের মাধ্যমে বিপুলসংখ্যক উদ্ভিদ প্রজাতিকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। উদ্ভিদ না বাঁচলে প্রাণীরা বাঁচে না বিধায় জাতীয় পার্ক, বিনোদন উদ্যান, অভয়ারণ্য ও শিকার সংরক্ষিত এলাকায় কতিপয় সংরক্ষিত এলাকা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

বৈজ্ঞানিক কৌশল প্রয়োগ : কোষ আবাদ ও জিন প্রকৌশল সম্পর্কীয় আধুনিক জ্ঞান বা প্রযুক্তির মাধ্যমে বিপন্ন জীব প্রজাতিকে শনাক্ত করা যায়। এর মাধ্যমে প্রজাতি শনাক্তকরণ ও তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অতিমাত্রায় প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার রোধ : অতিমাত্রায় প্রাকৃতিক তথা জৈবসম্পদ ব্যবহার রোধ করে সুষ্ঠু ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থায় সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের সীমিত ব্যবহার : কৃষি জমিতে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহারের ফলে খাল-বিলের গাছ, অন্যান্য জলজ প্রাণী, পাখিসমূহ ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় পোকামাকড়ের উপদ্রব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব রাসায়নিক দ্রব্যের পরিবর্তে জৈব সার ও জৈব প্রতিষেধকের ব্যবহার বাড়াতে হবে।

সুপরিকল্পিত আবাসন ব্যবস্থা : বন কর্তন, জলাভূমি ভরাট, পাহাড় কর্তন ও জলাভূমি বিনষ্ট করে প্রতিবছর আবাসন তৈরিতে লাখ লাখ একর জমি ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ায় বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী বিলুপ্ত হচ্ছে। তাই সুপরিকল্পিত আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে জমির

ব্যবহার সীমিত করা এবং সেই সাথে যত দূর সম্ভব নিসর্গকে অবিকৃত রেখে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

গণসচেতনতা সৃষ্টি ও আইন প্রণয়ন : পরিবেশ ও জীবকুলের ভূমিকা সম্পর্কে মিডিয়ার মাধ্যমে দেশের জনসাধারণকে সচেতন করার পাশাপাশি জীব সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন এবং এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

বন্য প্রাণী নিধন বন্ধ করা : বাণিজ্যিক কারণে বা শখের বশে মাত্রাতিরিক্ত বন্য প্রাণী নিধন বন্ধ করতে হবে। বাঘ, সিংহ, হাতি, হরিণ, শিম্পাঞ্জিসহ সব ধরনের স্থলজ ও জলজ প্রাণী নির্বিচারে হত্যা করা থেকে সকলকে বিরত থাকতে হবে।

এছাড়াও খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ, স্বস্থান ও অন্য স্থানে জীব সংরক্ষণ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উদ্যাগ গ্রহণের মাধ্যমে বিপন্নপ্রায় প্রজাতিকে সংরক্ষণ করতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ২

ক. বাংলাদেশের বনভূমি

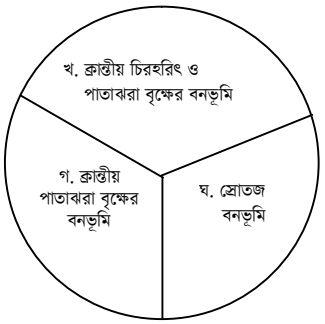

◀ *শিখনফল: ২*

ক. বাংলাদেশে বনভূমির আয়তন কত? ১

খ. বনভূমি কীভাবে কৃষি উন্নয়নে সহায়তা করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করে ছকে উল্লিখিত খ, গ ও ঘ বনভূমি অঞ্চলগুলো দেখাও। ৩

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে 'ক' এর গুরুত্ব অপরিসীম। বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে বনভূমির আয়তন প্রায় ২৫,৯৭২.৫২ বর্গ কি.মি.।

খ বনভূমি থেকে কৃষির যাবতীয় যন্ত্রপাতি তৈরিতে ব্যবহৃত উপাদান যেমন- কাঠ, বাঁশ ও বেত সরবরাহ করা হয়। এছাড়া বনভূমি বন্যা প্রতিরোধ ও বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। উদ্ভিদের দেহাবশেষ উত্তম জৈব সার হিসেবে কাজ করে। এভাবে বনভূমি কৃষি উন্নয়নে সাহায্য করে।

গ বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করে ছকে উল্লিখিত খ, গ ও ঘ বনভূমি অর্থাৎ ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পাতাঝরা, ক্রান্তীয় পাতাঝরা এবং স্রোতজ বনভূমির অবস্থান দেখানো হলো:

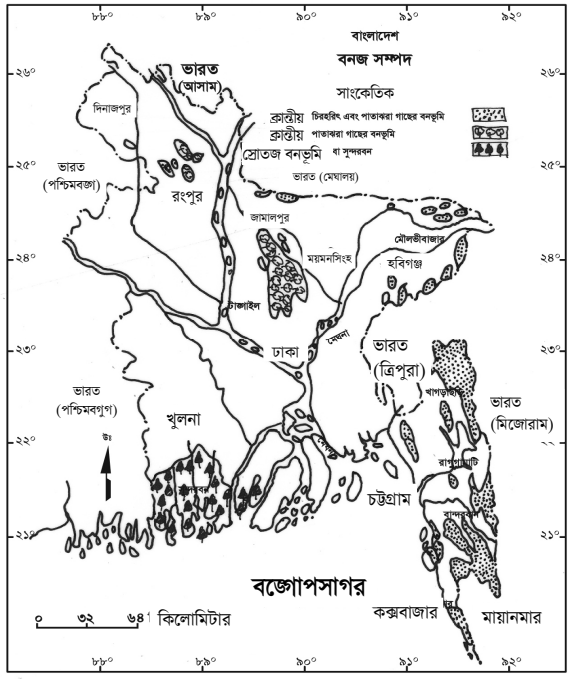

চিত্র : বাংলাদেশের বনভূমি

ঘ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে 'ক' অর্থাৎ বনভূমির গুরুত্ব ব্যাপক। দেশের মোট আয়ের শতকরা ৫ ভাগ আসে বনজ সম্পদ থেকে। নিম্নে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বনজ সম্পদের গুরুত্ব তুলে ধরা হলো:

১. **প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ:** মানুষ বাংলাদেশের বিভিন্ন বনাঞ্চল থেকে জ্বালানি কাঠ, বাঁশ, বেত, হুগলা, গোলপাতা, মোম, মধু, বন্য পশুপাখি, ভেষজ প্রভৃতি সংগ্রহ করে থাকে।

২. **শিল্পের উন্নতি:** কাগজ, নিউজপ্রিন্ট, রেয়ন, বোর্ড, দিয়াশলাই, খেলাধুলার সামগ্রী প্রভৃতি শিল্পের কাঁচামাল বনভূমি থেকে সংগ্রহ করা হয়।

৩. **কৃষি উন্নয়ন:** বনভূমি বন্যা প্রতিরোধ ও বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কৃষিকাজে সাহায্য করে। উদ্ভিদের দেহাবশেষ উত্তম জৈব সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৪. **পরিবহন ও যোগাযোগের উন্নতি:** সেতু নির্মাণ থেকে শুরু করে রেলের স্লিপার, বাস, ট্রাক, লঞ্চ, নৌকা প্রভৃতির কাঠামো, বৈদ্যুতিক খুঁটি, বাঁধ প্রভৃতি নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রচুর কাঠের প্রয়োজন হয়।

৫. **পর্যটন শিল্প:** বাংলাদেশের বনাঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। প্রতিবছর বহু সংখ্যক পর্যটক এ দেশে আগমন করায় প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়।

৬. **সরকারের আয়ের উৎস:** সরকার নিয়ন্ত্রিত বনভূমির বনজ সম্পদ বিক্রি করে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা আয় হয়। এছাড়া বনজ সম্পদের ওপর কর ধার্য করায় সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পায়।

৭. **কর্মসংস্থান:** বনজ সম্পদ আহরণ ও বিক্রি করে দেশের বহু লোক জীবিকা নির্বাহ করে। এছাড়া নতুন বন সৃষ্টি, সংরক্ষণ, পরিচর্যা প্রভৃতি কাজে বহু শ্রমিক-কর্মচারী নিয়োজিত আছে, যা এ দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে খুবই সহায়ক।

৮. **বৈদেশিক মুদ্রার্জন:** বনজ সম্পদ যেমন সাপ ও অন্যান্য জীবজন্তুর চামড়া, শিং, লোম, শিল্পের কাঁচামাল, বন্যপ্রাণী বিদেশে রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

উপরের আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বনজ সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶৩ ২০১৭ সালে জানুয়ারি মাসে তেলবাহী একটি জাহাজ বঙ্গোপসাগরে ডুবে যায়। এর ফলে পাশের নদী ও পার্শ্ববর্তী উপকূলবর্তী সকল নদীগুলোর পানি নষ্ট হয়ে যায়। জাতিসংঘের একটি পর্যবেক্ষক দল অত্র এলাকা ঘুরে দেখার সময় উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর ঝুঁকিসমূহ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ◀ *শিখনফল: ২*

ক. ইকোসিস্টেম কী? ১

খ. Endemic প্রাণী বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে আলোচিত অঞ্চলটির বৈশিষ্ট্য ও অবস্থান ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের অঞ্চলটির ঝুঁকিসমূহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় সকল সজীব উপাদানসমূহের এবং তার সাথে সেই স্থানের পরিবেশের সকল অজীব উপাদানসমূহের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াই একত্রে ইকোসিস্টেম বা বাস্তুসংস্থান।

খ Endemic প্রাণী হলো পৃথিবীর নির্দিষ্ট কোনো অঞ্চলে অভিযোজিত প্রাণী যা ঐ অঞ্চল ব্যতীত অন্য কোনো অঞ্চলে পাওয়া যায় না।

ভৌগোলিক পরিবেশের নিয়ামকের (geographic factors) প্রভাবে নির্দিষ্ট কিছু প্রাণী কোনো অঞ্চলে বহুযুগ ধরে জীবনযাপন করছে। যেমন, দোয়েল পাখি, কুনোব্যাঙ, গিরগিটি শুধুম প্রাচ্যদেশীয় (oriental) অঞ্চলে পাওয়া যায়। এরা এ অঞ্চলের Endemic প্রাণী।

গ উদ্দীপকে বঙ্গোপসাগরে তেলবাহী জাহাজ ডুবে যাওয়ার কারণে উপকূবর্তী এলাকায় উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর ঝুঁকির কথা বলা হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, অঞ্চলটি হলো সুন্দরবন।

এ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

১. এ স্থানে প্রচুর বৃষ্টিপাত (বার্ষিক ১৭০-২০০ সে.মি.) , পরিমিত তাপমাত্রা (সর্বোচ্চ ৩১° থেকে সর্বনিম্ন ২১° সে.) ও বিরল জনবসতি দেখা যায়।

২. এ এলাকার মাটি লবণাক্ত, কর্দমাক্ত ও জলাবদ্ধ; পলিযুক্ত দোঁআশ মৃত্তিকার প্রধান গঠন উপাদান।

৩. প্রাত্যহিক জোয়ার-ভাটা একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশীয় নিয়ামক (environmental factor)।

৪. প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য এখানকার গাছগুলোর কিছু অভিযোজনিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন– শ্বাসমূল।

৫. এ অঞ্চলে প্রতিবছর বর্ষাকালে নতুন পলি পড়ে। ফলে লবণাক্ততা হ্রাস পায়।

৬. এখানে বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষ (সুন্দরী), লতাগুল্ম, ঘাস, পরাশ্রয়ী (স্বর্ণলতা) ইত্যাদি জন্মে থাকে।

৭. রয়েল বঙ্গোল টাইগার, চিতা ও মায়া হরিণ এবং বক, সারস, হাড়গিলা প্রভৃতি পাখি এখানে দেখা যায়।

অবস্থান: এ বনভূমি খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটে এবং বরগুনায় জেলায় সামান্য পরিমাণে বিস্তৃত। অঞ্চলটি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে সমুদ্র উপকূলের লবণাক্ত ও জোয়ার ধৌত গরান বনভূমি।

ঘ উদ্দীপকে আলোচিত অঞ্চলটি হলো সুন্দরবন যা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল।

বঙ্গোপসাগরে একটি তেলবাহী জাহাজ ডুবে যাওয়ার ফলে সুন্দরবন ও পার্শ্ববর্তী নদী ও উপকূলীয় অঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণীসমূহ ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। এসব ঝুঁকিসমূহ হলো–

i. এ অঞ্চলের পানি দূষণ ঘটবে।

ii. জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্ষতিসাধন হবে।

iii. খাদ্যশৃঙ্খল ও বাস্তুতন্ত্র নষ্ট হয়ে যাবে।

iv. জলজ পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে।

v. জোয়ার-ভাটার সময় তেল বনভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে মৃত্তিকা, উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্ষতিসাধন করবে।

সর্বোপরি, এ বনাঞ্চলের পরিবেশের স্বাভাবিক ভারসাম্য অবস্থা (eological balance) নষ্ট হবে, যা মানুষসহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উদ্ভিদ প্রজাতি ও প্রাণীর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করবে।

প্রশ্ন ▶৪ দৈনিক পত্রিকায় একটি খবর পড়ে তাসনুভা খুব মর্মাহত হলো। খবরে প্রকাশ–বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একটি নৌ চ্যানেলে তেলবাহী ট্যাংকের ডুবিতে তার নিকটবর্তী বনাঞ্চল ক্ষতির সম্মুখীন। ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে ওঠার জন্য প্রশাসন ও পরিবেশবাদীরা বেশ সোচ্চার। কেননা উক্ত বনভূমি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

◀ *শিখনফল: ২ [মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. ইকোসিস্টেম কী? ১
খ. পরিবেশ দূষণ কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ২
গ. উদ্দীপকে কোন বনভূমির কথা উল্লেখ করা হয়েছে? বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বনভূমি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে—মূল্যায়ন করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো স্থানের জীব ও এদের পরিবেশ নিজেদের মধ্যে এবং পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া-বিক্রিয়ার গতিময় পদ্ধতিকে ইকোসিস্টেম বলে।

খ পরিবেশ দূষণ সংঘটিত হয় মূলত প্রাকৃতিক উপায়ে এবং মনুষ্য কর্মকাণ্ডের ফলে। প্রাকৃতিক উপায়ে সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয় তবে সামাজিক সচেতনতা, বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ সংরক্ষণ আইন করা এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমেই মনুষ্যসৃষ্ট পরিবেশ দূষণ অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

গ উদ্দীপকে স্রোতজ বনভূমির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সম্প্রতি দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সুন্দরবন নৌ চ্যানেলে তেলবাহী ট্যাংকের ডুবিতে এর নিকটবর্তী বনাঞ্চল ক্ষতির সম্মুখীন হয়। নিম্নে স্রোতজ বনভূমির বর্ণনা দেওয়া হলো:

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে সমুদ্র উপকূলের লবণাক্ত ও জোয়ার-ভাটা প্রভাবিত শুষ্ক বিন্যাসের উদ্ভিদকে স্রোতজ বনভূমি বলা হয়। এ বনভূমি খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলায় অধিক পরিমাণ এবং বরগুনা জেলায় সামান্য পরিমাণ রয়েছে। বাংলাদেশের বৃহত্তম এ বনভূমি সুন্দরবন নামে খ্যাত। এ বনভূমির আয়তন প্রায় ৬,৭৮৬ বর্গ কি.মি.। সুন্দরী, গরান, গেওয়া, ধুন্দল, কেওড়া, আসুর, গোলপাতা, পশুর ইত্যাদি এ বনভূমির উল্লেখযোগ্য বৃক্ষ। এ বনভূমিতে বানর, হরিণ, বাঘ, কুমির, বনবিড়াল, সাপ ও বিভিন্ন ধরনের পাখি পাওয়া যায়। UNESCO ১৯৯৭ সালে সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বনভূমি হলো স্রোতজ বনভূমি। নিম্নে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এ বনভূমির ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হলো:

গরান বা স্রোতজ বনভূমির ব্যবহারিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ বাংলাদেশে মোট উৎপাদিত কাঠের প্রায় ৬০ শতাংশ এ বনভূমি থেকে সংগ্রহ করা হয়। এ বনভূমির সুন্দরী বৃক্ষের আর্থিক মূল্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি জ্বালানি হিসেবে অধিক ব্যবহৃত হয়। ঘরের খুটি, বিদ্যুৎ এবং নৌকা নির্মাণে এ বৃক্ষ ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়াও গেওয়া নিউজপ্রিন্ট ও কাগজ শিল্পে এবং দিয়াশলাই কারখানায় কাঁচামাল হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এ বনভূমি হতে মোম, মধু, বিভিন্ন ধরনের ওষুধী গাছ ও ফলমূল সংগ্রহ করা হয়। এসব মানুষের নানাকাজে প্রয়োজন হয়।

সুতরাং, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ বনভূমি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶৫

A	বিভিন্ন প্রজাতির উচ্চ বৃক্ষ জন্মে। একক কোনো প্রজাতি আধিপত্য বিরাজ করে না।
B	বিস্তীর্ণ তরঙ্গায়িত তৃণভূমির বায়োম, যার মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে গাছ ও ঝোপ রয়েছে, যা সাধারণত ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল অরণ্যের প্রান্তসীমায় দেখা যায়।

◀ *শিখনফল: ৩*

ক. বায়োম কাকে বলে? ১
খ. স্থলজ ইকোসিস্টেম বলতে কী বোঝ? ২
গ. 'A' চিহ্নিত বায়োমের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'B' চিহ্নিত বায়োমের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইকোসিস্টেম যখন বৃহৎ এলাকাব্যাপী গড়ে উঠে তখন তাকে বায়োম বলে। যেমন— মরুভূমির বায়োম।

খ স্থলভাগের উপরে গড়ে উঠা ইকোসিস্টেমকে স্থলজ ইকোসিস্টেম বলা হয়। এ জাতীয় ইকোসিস্টেম প্রধানত চার প্রকার। যথা: অরণ্যের, ২. তৃণভূমির, ৩. মরুভূমির এবং ৪. মেরু প্রদেশের ইকোসিস্টেম।

গ ছক 'A' তে চিহ্নিত বৈশিষ্ট্যগুলো বনভূমির বায়োমে দেখা যায়। নিচে এ বায়োমের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা হলো—

আমাজান নদীর অববাহিকায় এবং ইন্দোনেশিয়ায় বনভূমির বায়োম দেখা যায়। এছাড়া আফ্রিকা, ভারত, বার্মা, মধ্য আমেরিকায়ও বৃহৎ বনভূমির বায়োম দেখা যায়।

- এখানকার তাপমাত্রা গড়ে ২০-৩০° সে. এবং বার্ষিক বৃষ্টিপাত প্রায় ২৫০-৪৫০ সে.মি. যা সারা বছরই হয়। এ কারণে এখানকার মাটি ভেজা ও স্যাঁতসেঁতে থাকে।
- এখানে বিভিন্ন প্রজাতির উচ্চ বৃক্ষ জন্মে। একক কোনো প্রজাতির আধিপত্য বিস্তার করে না। এখানকার অধিকাংশ বৃক্ষই চিরসবুজ (গর্জন, ওক, জারুল) তবে বিচ্ছিন্ন কিছু পর্ণমোচী বৃক্ষও (শাল) জন্মে।
- এ বন প্রাণীবৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। এখানে বানর, পাখি, সরীসৃপ ইত্যাদি প্রাণীর আধিক্য দেখা যায়।

ঘ ছক 'B' তে চিহ্নিত বৈশিষ্ট্যগুলো সাভানা বায়োমে দেখা যায়। নিম্নে সাভানা বায়োমের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হলো—

সাভানা একধরনের বিস্তীর্ণ তৃণভূমি, যার মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে গাছ ও ঝোপ বিদ্যমান। একে ক্রান্তীয় তৃণভূমিও বলা হয়। এখানকার তৃণগুলো অনেক সময় ৫মিটার পর্যন্ত দীর্ঘ হয়ে থাকে। এ তৃণের উপর অনেক গবাদি পশু নির্ভরশীল। এখানে অনেক বড় বড় চারণভূমি গড়ে উঠেছে। তাই পশুপালনের জন্য এ বায়োমের গুরুত্ব অধিক। দীর্ঘ খরায় টিকে থাকার জন্য সাভানা অঞ্চলের উদ্ভিদ বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এখানকার গাছসমূহের শিকড় দীর্ঘ ও বাকল বেশ পুরু। আফ্রিকার সাভানা অঞ্চলে ৪০ প্রজাতির ঊর্ধ্বে খুরওয়ালা পশু রয়েছে যার মধ্যে তৃণভোজী ১৬ প্রজাতির। এখানে সিংহ, জেব্রা, হাতি, জিরাফসহ নানা জাতের পশু দেখতে পাওয়া যায়। কাজেই পশুর বংশবৃদ্ধিতে এ বায়োমের গুরুত্ব অপরিসীম। এ ছাড়া এ অঞ্চলে বাজ ও অন্যান্য শিকারি পাখি রয়েছে। এ বিপুল জীববৈচিত্র্যের জন্য এ বায়োমের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ৬ সাভানা মরুভূমিতে জিরাফ, ক্যাঙ্গারু, মহিষ, সিংহ ইত্যাদি প্রাণীর প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। আবার আরবের মরুভূমিতে ক্যাঙ্গারু, উট, খেকশিয়াল ইত্যাদি প্রাণীর আধিক্য লক্ষ করা যায়। ◀ *শিখনফল: ৩*

ক. মরুভূমি কী? ১

খ. তৃণভূমির বায়োম বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত স্থান দুটির উদ্ভিদ সামান্য ভিন্ন প্রকৃতির কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. স্থান দুটির প্রাণীবৈচিত্র্যে পরিবেশগত প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ৫০ সে.মি. এর কম এবং বাষ্পায়ন বৃষ্টিপাতের চেয়ে বেশি হয় এরূপ ভৌগোলিক অঞ্চলই মরুভূমি।

খ পৃথিবীর যে অঞ্চলে প্রধানত ঘাস জন্মে কিন্তু বড়গুল্ম বা বৃক্ষ দেখা যায় না তেমন এলাকাকে তৃণভূমির বায়োম বলা হয়।

মহাদেশের পূর্বাংশে তৃণভূমির বায়োম দেখা যায়। এ অঞ্চলের প্রধান উদ্ভিদগুলো ঘাষ জাতীয়। তৃণভূমি বায়োমের প্রধান প্রাণী হলো বাইসন, এন্টিলোপ, জেব্রা, জিরাফ, হরিণ, ঘোড়া, ক্যাঙ্গারু ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকে আলোচিত মরুভূমি অঞ্চলের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য প্রায় একই রকম। তাই উক্ত অঞ্চলগুলোর উদ্ভিদও প্রায় একই শ্রেণির। তবে বেশির ভাগ উদ্ভিদ একই প্রজাতির হলেও আঞ্চলিক তারতম্যের কারণে আরবের মরুভূমি অঞ্চলে সামান্য কিছু উদ্ভিদের ভিন্নতা রয়েছে।

আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে প্রায় একই প্রজাতির উদ্ভিদ বিরাজমান। অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার মরুভূমিতে গুল্ম, ঝোপ, ক্যাকটাস, মস, লাইকেন, কিছু সায়ানোব্যাকটেরিয়া, ব্রিটস বুস ইত্যাদির প্রাধান্য দেখা যায়। এছাড়া আরবের মরুভূমিতে ছোট ঝোপ ও গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদের পাশাপাশি বাবলা, খেজুর উল্লেখযোগ্য হারে পাওয়া যায়।

উল্লিখিত উদ্ভিদগুলো মরুভূমির বর্ষজীবী ও বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। বর্ষজীবী উদ্ভিদের জীবনকাল খুব সীমিত আর বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদগুলোর পানির অপচয় রোধের ব্যবস্থা রয়েছে। তাই এসব এলাকার প্রধান উদ্ভিদ হলো ক্যাকটাস, ইউফরবিয়া, কম্পোজিটি ও লিগুম। সুতরাং বলা যায় মরুভূমি হওয়া সত্ত্বেও স্থান দুটির উদ্ভিদ সামান্য ভিন্ন প্রকৃতির।

ঘ মরুভূমি হওয়া সত্ত্বেও স্থান দুটিতে পরিবেশগত পার্থক্য বিরাজ করায় প্রাণী বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রেও কিছুটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

আফ্রিকায় শীত, গ্রীষ্ম ও কিছুটা বর্ষাকাল দেখা যায়। ফলে এখানে কম বৃষ্টিপাত ও দীর্ঘ শুষ্ককাল থাকে। এখানে বছরে প্রায় ৫০-১২৭ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয় এবং জলবায়ু উষ্ণ থাকে। তবে গ্রীষ্মকালেও সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। মাটিতে পাতলা হিউমাস থাকায় এখানকার বেশির ভাগ এলাকা তৃণভূমি অঞ্চল হলেও মাঝে মাঝে বৃক্ষ বা ঝোপ জাতীয় গাছ থাকে। সুতরাং উদ্ভিদের প্রাধান্য বেশি থাকায় ইন্টিলোপ, জেব্রা, জিরাফ, মহিষ, সিংহ, চিতাবাঘ, হায়েনা, হাতি প্রধান। ছোট প্রাণীর মধ্যে রয়েছে সাপ, ইঁদুর, কাঠবিড়াল, উই, গুবরে পোকা ইত্যাদি।

আরব মরুভূমিতে জলবায়ু ও পরিবেশে বিপরীত অবস্থা বিরাজ করায় বিভিন্ন প্রকার প্রাণীর আধিক্য লক্ষ করা যায় না। দুম্বা, উট মরুভূমির প্রধান প্রাণী হিসাবে বিবেচিত। তবে ছোট প্রাণীর ক্ষেত্রে সাপ, ইঁদুরসহ বিভিন্ন প্রকার প্রাণী প্রধান।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে বলা যায়, স্থান দুটির প্রাণীবৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

প্রশ্ন ▶ ৭ বাংলাদেশের সুন্দরবনে রয়েছে বাঘ, শৃগাল, পাখি ও অন্যান্য মাংসাশী (carnivores) প্রাণী। কানাডার বিস্তৃত সমতলভূমিতে রয়েছে তৃণভোজী (herbivores) জীবজন্তু গরু, ভেড়া, হরিণ ইত্যাদি। ◀ *শিখনফল: ৩*

ক. পৃথিবীর কত ভাগ এলাকা জুড়ে অরণ্য রয়েছে? ১

খ. তৃণক্ষেত্রের ইকোসিস্টেমের খাদক শ্রেণি (consumers) কীরূপ? ২

গ. দুটি স্থানের প্রাণিবৈচিত্র্যের কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বাংলাদেশের ইকোসিস্টেমে এর প্রধান বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৃথিবীর শতকরা প্রায় ৩১ ভাগ এলাকা (৪ বিলিয়ন হেক্টর) জুড়ে অরণ্য রয়েছে।

খ তৃণক্ষেত্রের ইকোসিস্টেমের প্রাথমিক (primary) খাদক হলো– শুশুক, ইঁদুর, পাখি, গবাদি পশু। গৌণ খাদকের (secondary) মধ্যে রয়েছে প্রথম স্তরের মাংসাশী প্রাণী যেমন- ব্যাঙ, পাখি যারা পোকামাকড় খেয়ে বাঁচে। সর্বোচ্চ স্তরের (tertiary) খাদকের মধ্যে রয়েছে– সাপ, বাজপাখি, ব্যাঙ ও ছোট পাখি।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের সুন্দরবন এবং কানাডার বিস্তৃত সমতলভূমির (প্রেইরি) প্রাণীবৈচিত্র্য সম্পর্কে বলা হয়েছে। জলবায়ুর ভিন্নতার কারণে এ দুটি স্থানে প্রাণীবৈচিত্র্য দেখা যায়।

বাংলাদেশের সুন্দরবন এলাকার বায়ুতে আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি ও মাটি স্যাঁতসেঁতে, এখানকার তাপমাত্রা খুব বেশি নয় এবং পুরো এলাকা বৃক্ষ দ্বারা আবৃত। এ বনভূমি নিয়মিত জোয়ার-ভাটায় প্রবাহিত হয়। পৃথিবীর অন্যান্য অরণ্য ভূমির মতো এখানেও নির্দিষ্ট ধরনের শ্বাসনমূল বিশিষ্ট উদ্ভিদ (সুন্দরি) ও প্রাণী রয়েল বেঙ্গল টাইগার রয়েছে।

কানাডার বিস্তৃর্ণ এলাকা (প্রেইরি) তৃণ দ্বারা আবৃত। যেসব এলাকায় বার্ষিক ২৫-৭৫ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয় সেসব স্থানে প্রচুর ঘাস জন্মে। ফলে সেখানে তৃণভোজী জীবজন্তু বিচরণ করে।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে ভৌগোলিক কারণে সুন্দরবন এবং কানাডার সমভূমিতে প্রাণিবৈচিত্র্য দেখা যায়।

ঘ উদ্দীপকে বাংলাদেশের সুন্দরবনের উল্লেখ রয়েছে। স্থানটির ইকোসিস্টেমের বৈশিষ্ট্য নিচে দেওয়া হলো–

সুন্দরবনের ইকোসিস্টেম

অজীব (abiota) উপাদান: আবাসস্থলে (habitat) জৈব ও অজৈব রাসায়নিক উপাদান (organic and inorganic chemical compounds) বিদ্যমান থাকে। বনাঞ্চলের অবস্থাভেদে আলো ও তাপের প্রাপ্যতা লক্ষণীয়। অর্থাৎ বনের গভীরে সহজে সূর্যালোক পৌঁছায় না। আবার বনের মাঝখানে কোথায় নদী প্রবাহিত। সেখানে আলো ও তাপের আধিক্য রয়েছে। এ বনের মাটিতে প্রচুর হিউমাস (humus) রয়েছে বলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি সহজে ঘটে।

সজীব উপাদান: সজীব উপাদানকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়–

i. **উৎপাদক (produce):** উদ্ভিদই বনের উৎপাদক শ্রেণি। বনাঞ্চলের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে উদ্ভিদরাজি ভিন্নতর হয়। যেমন– গোলপাতা বনের কিনারে বেশি দেখা যায়। আবার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় উদ্ভিদের পাতা বড় হওয়ায় এর নিচে বাঁশ, ফার্ণ এবং গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ জন্মে।

ii. **খাদক (consumer):** প্রথম স্তরের (primary) খাদক- পিঁপড়া, মাছি, গুবরে পোকা, মাকড়সা, পাতা ফড়িং ইত্যাদি। গৌণ (secondary) খাদক- শৃগাল, সাপ, পাখি প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণী এবং সর্বোচ্চ স্তরের (tertiary) খাদক- সিংহ, বাঘ, হায়েনা ইত্যাদি।

iii. **বিয়োজক:** ব্যাকটেরিয়া ও কয়েক শ্রেণির ছত্রাক প্রধান বিয়োজক হিসাবে কাজ করে। বিয়োজক ছত্রাকের মধ্যে রয়েছে Aspergillus, Coprinus, polyporus, Fusarium।

প্রশ্ন ▶ ৮ আফ্রিকার কালাহারিতে প্রচণ্ড গরম ও পানির অভাব রয়েছে। তবে সেখানে ক্যাকটাস, মস, লাইকেন ইত্যাদি উদ্ভিদ জন্মে। ◀ *শিখনফল: ৩*

ক. পৃথিবীর কত ভাগ এলাকা মরুভূমির অন্তর্গত? ১

খ. সমুদ্রের বিয়োজক শ্রেণি কীরূপ? ২

গ. উক্ত উদ্ভিদগুলো কোনো একটি ইকোসিস্টেমের উৎপাদক শ্রেণি হলে ইকোসিস্টেমটির খাদক শ্রেণি কীরূপ হবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত অঞ্চলের ইকোসিস্টেমের সজীব উপাদান বিশ্লেষণ করো। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৃথিবীর শতকরা ১৭ ভাগ এলাকা মরুভূমির অন্তর্গত।

খ সাগরের মৃত জীবের একমাত্র বিয়োজক হলো ব্যাকটেরিয়া ও কিছু ছত্রাক। সাগরে ১ লিটার পানিতে ৫০,০০,০০০ পর্যন্ত ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে। এসব ব্যাকটেরিয়া জীবের বর্জ্য ও মৃতদেহের ওপর ক্রিয়া করে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় অজৈব দ্রব্য সৃষ্টি করে।

গ ক্যাকটাস, মস, লাইকেন ইত্যাদি উৎপাদক শ্রেণি হলে উক্ত ইকোসিস্টেম হবে মরুভূমির ইকোসিস্টেম।

মরুভূমির ইকোসিস্টেমে উৎপাদকের সংখ্যা খুবই কম। ফলে এদের ওপর নির্ভরশীল খাদকের সংখ্যাও কম হয়।

মরু খাদকের মধ্যে রয়েছে সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী (হর্ন লিজার্ড, গিলা মনস্টার), কীটপতঙ্গ, নৈশরোডেন্ট পাখি, উট প্রভৃতি। যারা গাছপালার কচি অংশ খেয়ে জীবন ধারণ করে। তাদের এ অঞ্চলে দেখা যায়।

ঘ উদ্দীপকে আলোচিত মরুভূমির ইকোসিস্টেমে বিভিন্ন রকমের সজীব উপাদান রয়েছে। এগুলোর বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো :

উৎপাদক : মরুভূমির ইকোসিস্টেমে উৎপাদক শ্রেণির মধ্যে গুল্ম, ঝোপ, ক্যাকটাস, মস, লাইকেন, সায়ানো ব্যাকটেরিয়া, ব্রিটল বুস ইত্যাদি অন্যতম। এসব উদ্ভিদের মূল বহু শাখা-প্রশাখা যুক্ত থাকে এবং মাটির একটু নিচে থাকে। যার ফলে এরা অল্প বৃষ্টিপাত হলে পানি গ্রহণ করতে পারে। কিছু মরু উদ্ভিদের পাতা সুঁচের আকার হয়।

খাদক : এই পরিবেশে উৎপাদক সংখ্যা কম। ফলে এদের উপর নির্ভরশীল খাদকের সংখ্যাও কম। মরু খাদকের মধ্যে রয়েছে সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী, কীট-পতঙ্গ, নৈশরোডেন্ট পাখি, উট ইত্যাদি। যারা গাছপালার কচি অংশ খেয়ে জীবন ধারণ করে এমন প্রাণীই এ অঞ্চলে দেখা যায়।

বিয়োজক : মরুভূমিতে বিয়োজকের সংখ্যা খুবই অল্প থাকে। সে জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহ পাবে হিউমাস তৈরি না হয়ে অত্যধিক তাপে এগুলো শুকিয়ে যায়। এজন্য মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পেতে পারে না।

প্রশ্ন ▶ ৯

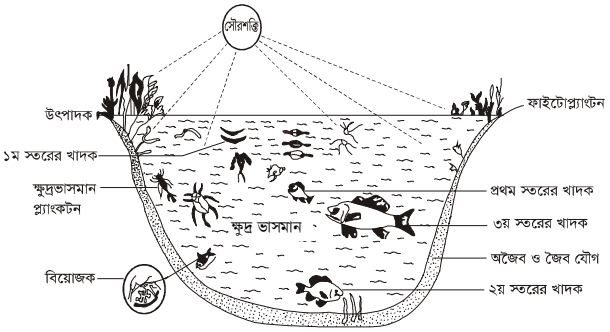

একটি পুকুরের বাস্তুসংস্থান

◀ *শিখনফল: ৩*

ক. সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ইকোসিস্টেম কোনটি? ১

খ. ইকোসিস্টেম বলতে কী বোঝ? ২

গ. চিত্রের ইকোসিস্টেমের সাথে সাগরের ইকোসিস্টেমের তুলনা করো। ৩

ঘ. চিত্রের ইকোসিস্টেমটি কোন ধরনের? বিশ্লেষণ করো। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাগরের ইকোসিস্টেম সর্বাপেক্ষা বৃহৎ।

খ পৃথিবীর সর্বত্র জীবমণ্ডলীয় পরিবেশ একই রকম হয় না। কারণ জীবেরা কোথাও সমুদ্রে, কোথাও নদী, হ্রদ বা পুকুরে বসবাস করছে, আবার কখনও কখনও বায়ুমণ্ডল, বৃষ্টিবহুল গভীর বনাঞ্চল বা মরুভূমিতে বাস করছে।

কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় সকল সজীব উপাদানসমূহের এবং তার সাথে সেই স্থানের পরিবেশের সকল অজীব উপাদানসমূহের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে একত্রে ইকোসিস্টেম (Ecosystem) বা বাস্তুতন্ত্র বলে।

গ চিত্রে একটি পুকুরের ইকোসিস্টেম দেখানো হয়েছে। কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় সকল সজীব উপাদানসসূহ এবং তার সাথে সেই স্থানের পরিবেশের সকল অজৈব উপাদানসমূহের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াই ইকোসিস্টেম (Ecosystem)। সুতরাং, একটি পুকুর ও একটি সাগরের বাস্তুসংস্থানের কার্য প্রক্রিয়া একই প্রকৃতির। শুধু উপাদানগত কিছুটা ভিন্নতা লক্ষ করা যায়।

সাগরের সকল উৎপাদকগুলোই স্বভোজী এবং অধিকাংশই ফাইটোপ্লাঙ্কটন। প্রাথমিক উৎপাদনকারীদের মধ্যে প্লাঙ্কটন উদ্ভিদই প্রধান। এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন রংয়ের শৈবাল। সাগরের প্রাথমিক খাদকগুলো তৃণভোজী। যেমন— ক্রাস্টেশিয়ান, মোলাস্ক ইত্যাদি এবং গৌণ খাদকগুলো মাংসভোজী যেমন– cod, Haddock, Halibut ইত্যাদি।

অপরদিকে, পুকুরের উৎপাদক হচ্ছে ভাসমান ও অগভীর পানির নানা প্রকার উদ্ভিদ, যেমন– শাপলা, কচুরিপানা, হাইড্রিলা, ফাইটোপ্লাঙ্কটন, ভাসমান ক্ষুদ্রপোকা, মশার শুককীট প্রভৃতি। ২য় স্তরের খাদকগুলোর মধ্যে ছোট মাছ, জলজ পতঙ্গ, চিংড়ি, ব্যাঙ ইত্যাদি। সর্বোচ্চ স্তরের খাদক বড় মাছ, বক, গাংচিল ইত্যাদি। বিয়োজক শ্রেণিতে সাগর ও পুকুরের ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা একই হলেও পুকুরের তলায় কাদার মধ্যে বসবাসকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকাও বিয়োজকের কাজ করে থাকে।

ঘ চিত্রে একটি পুকুরের আদর্শ ইকোসিস্টেম দেখানো হয়েছে। নিম্নে তা বিশ্লেষণ করা হলো–

পুকুরে বসবাসকারী জীব সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বপ্রধান হলো ভাসমান ক্ষুদ্রজীব বা প্লাঙ্কটন। এছাড়া রয়েছে সবুজ শেওলা ও ক্ষুদ্র জলজ প্রাণী। এর জড় উপাদানগুলো মাটি, পানি, সৌরশক্তি ইত্যাদি।

পুকুরের বাস্তুসংস্থানের উৎপাদক হচ্ছে ভাসমান ও অগভীর পানির নানা ধরনের উদ্ভিদ, যেমন— শাপলা, কচুরিপানা ইত্যাদি। বিভিন্ন প্রকার ভাসমান ক্ষুদ্রপোকা, মশার শুককীট প্রভৃতি প্রথম স্তরের খাদক। প্রাথমিক খাদককে ভক্ষণকারী দ্বিতীয় স্তরের মাংসাশী খাদক হলো— ছোট মাছ, জলজ পতঙ্গ, চিংড়ি, ব্যাঙ ইত্যাদি। সর্বোচ্চ বা ৩য় স্তরের খাদকের মধ্যে থাকে বড় মাছ, বক, গাংচিল প্রভৃতি।

মৃত্যুর পর মৃতজীবী ছত্রাক, জীবাণু, এমনকি পুকুরের তলায় কাদার মধ্যে বসবাসকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকাও বিয়োজকের কাজ করে। সাধারণ নিয়মে বিয়োজিত অজৈব লবণ পুনরায় পুকুরের উৎপাদক শ্রেণি খাদ্য উপাদান হিসাবে গ্রহণ করে।

প্রশ্ন ▶ ১০ দৃশ্যকল্প-১: সাইবেরিয়ার উত্তরাংশে ও আলাস্কায় মস ও লাইকেন জাতীয় উদ্ভিদ জন্মে এবং সেখানে উষ্ণ রক্তের স্তন্যপায়ী প্রাণী দেখা যায়।

দৃশ্যকল্প-২: আমেরিকার প্রেইরি ও আর্জেন্টিনায় ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ বেশি জন্মে। এখানে জেব্রা, জিরাফ, ঘোড়া ইত্যাদি প্রাণী বেশি থাকে। *◀ শিখনফল: ৩*

ক. স্থলজ বায়োম কী? ১

খ. বায়োম বলতে কী বোঝ? ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এর বায়োমের পরিবেশ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর বায়োমের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সকল বায়োম (Biome) স্থলভাগে অবস্থিত এবং প্রচুর উদ্ভিজ্জ বিদ্যমান তাই স্থলজ বায়োম। যেমন– সুন্দরবন।

খ পৃথিবীতে উদ্ভিদ বা প্রাণী কোথায় অভিযোজিত (adapted) হবে তা অনেকগুলো প্রভাবকের (যেমন– ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু) ওপর নির্ভর করে। জীবের সাথে জড়ের নির্দিষ্ট পরিবেশে এই আন্তঃক্রিয়া (Interaction) বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেম (ecosystem) নামে পরিচিত। ইকোসিস্টেম যখন কোনো বৃহৎ অঞ্চলে বিস্তৃত হয় তখন একে বায়োম বলা হয়। যেমন– নিরক্ষীয় অঞ্চলের (ইন্দোনেশিয়ার, মালয়েশিয়া) বায়োম।

গ বায়োম-১ তুন্দ্রা অঞ্চলকে নির্দেশ করে। নিচে এর পরিবেশ ব্যাখ্যা করা হলো :

এ অঞ্চলে চরম শীত (extreme cold) ও ঠাণ্ডা আবহাওয়ার কারণে বছরের দীর্ঘ সময় মাটি বরফে ঢাকা থাকে। ৬-৮ সপ্তাহ গ্রীষ্মকাল এবং তখন উপরের কিছু বরফ গলে ছোট ছোট জলাভূমির সৃষ্টি হয়। বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ১৫ সে.মি যা বরফ (snow fall) আকারে পড়ে।

এ অঞ্চলের উদ্ভিদের (মস) জীবন অতি সংক্ষিপ্ত। এখানে উষ্ণ রক্তের স্তন্যপায়ী প্রাণী (শ্বেত ভল্লুক) দেখা যায়। পৃথিবীব্যাপী এ বায়োম দুটি অংশে বিভক্ত। যেমন— উত্তর মেরু (arctic) তুন্দ্রা এবং আলপাইন (Alpine)।

ঘ বায়োম-২ তৃণভূমি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। উক্ত বায়োমের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হলো :

i. পরিবেশ : এখানে বছরে গড়ে ২৫-৭৫ সে.মি. বৃষ্টিপাত হয়। সে কারণে এখানে ঘন বৃক্ষলতাদি যেমন নেই তেমনি আবার মরুভূমিও নাই। মাটি হিউমাস (humus) সমৃদ্ধ, দিনে ও রাতে তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি (৮°–১৫° সে.) ঘটে। এখানে শীতে তাপমাত্রা ১৫° সে. এ নেমে যায় আর গ্রীষ্মকালে ৩২° সে. এর

উপরে ওঠে। তৃণভূমি বায়োমকে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সাভানা (আফ্রিকার সাহারা) এবং শীত প্রধান তৃণভূমি (কানাডার প্রেইরি) এ দুইটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়।

ii. উদ্ভিদ : ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ এ অঞ্চলের প্রধান উদ্ভিদ। বড় ঘাস ১২ থেকে ১৫ সে.মি. লম্বা হয়। এরা গুচ্ছাকারে জন্মায়। এখানে যব, গম, রাই ইত্যাদি ভালো জন্মে।

প্রাণী : তৃণভূমি বায়োমে উৎপাদক উদ্ভিদ (Producer) হলো ঘাস। প্রধান প্রাণী হলো বাইসন, জেব্রা, জিরাফ, হরিণ, ঘোড়া, ক্যাঙ্গারু ইত্যাদি তৃণভোজী জন্তু (herbivores)। এদের ভক্ষক (carnivores) হলো সিংহ, হায়েনা ও খেকশিয়াল। কীটপতঙ্গের মধ্যে উঁইপোকা, ঘাসফড়িং, মৌমাছি ও এদের খাদক (consumer) হিসাবে পাখি, সাপ, টিকটিকি, ব্যাঙ বাস করে।

প্রশ্ন ▶ ১১ যুক্তরাজ্য সরকার তাদের পরিবেশবিষয়ক সংস্থার আন্তর্জাতিক ডিভিশনকে যেসব বায়োমের গাছগুলো বৃষ্টিহীন ঋতুতে গাছের পাতা ঝরায়, সেসব বায়োমের সংরক্ষণের দায়িত্ব দিয়েছে। অন্যদিকে, মার্কিন সরকার তাদের দেশের একই ডিভিশনকে যেসব বায়োমে প্রচুর বৃষ্টি হয়, সেসব সম্প্রদায়ের উপর নজরদারির দায়িত্ব দিয়েছে।

[ড. সৈয়দ শাহজাহান আহমেদ, ঢনু-২] ◀ শিখনফল-৩

ক. ইকোসিস্টেমের সজীব উপাদান কত প্রকার? ১

খ. ইকোসিস্টেমের ভৌত উপাদান বলতে কী বোঝ? ২

গ. যুক্তরাজ্য সরকার যে বিষয়টি সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. মার্কিন সরকার যে সম্প্রদায়ের উপর নজরদারি করতে বলেছে সে সম্প্রদায়ের গুরুত্ব কতটুকু? বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইকোসিস্টেমের সজীব উপাদান সাধারণত তিন প্রকার।

খ ভৌত উপাদান ইকোসিস্টেমের একটি অজীব উপাদান।

নির্দিষ্ট অঞ্চলের জলবায়ু, ভূপ্রকৃতি ও মাটি সম্পর্কিত উপাদান নিয়ে ভৌত উপাদান গঠিত হয়। জলবায়ুতে আলো, তাপ, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত থাকে। ভূপ্রকৃতিতে নির্দিষ্ট জায়গার অক্ষাংশ, পর্বতমালা ও উপত্যকার দিক, ঢাল বা খাড়া অবস্থা প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। মাটিতে নির্দিষ্ট জায়গার মাটির গঠন, এর ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ এবং এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত।

গ যুক্তরাজ্য সরকার পত্রপতনশীল অরণ্য বায়োম রক্ষার উদ্যোগ নিয়েছে।

পত্রপতনশীল বৃক্ষের অরণ্য সাধারণত ২০°-৩০° অক্ষাংশের মধ্যে দেখা যায়। এটি দুই ভাগে বিভক্ত। একটি মৌসুমি এবং অন্যটি নাতিশীতোষ্ণ অরণ্য। এর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বৃষ্টিহীন ঋতুতে বিশেষত শীতকালে এর পাতা ঝরে যায়। দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে পত্রপতনশীল বৃক্ষের অরণ্য বায়োম দেখতে পাওয়া যায়। এ অঞ্চলের গড় তাপমাত্রা ২৭°-৩০° সে.। এখানকার বৃক্ষের মধ্যে সেগুন, অর্জুন, মেহগনি, শাল প্রভৃতি বৃক্ষ উল্লেখযোগ্য। নাতিশীতোষ্ণ অরণ্যে ওক, বিচ ও বার্চ গাছের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়।

অপরদিকে এখানকার প্রাণীসমূহ জলবায়ুর সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। এখানে স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ, উভচর এবং বিভিন্ন জাতের পাখি দেখা যায়। কিছু কিছু প্রাণী শীতকালে দীর্ঘকালীন নিদ্রায় চলে যায়। এর মধ্যে সাপ ও ব্যাঙ উল্লেখযোগ্য। বাঘ, হরিণ, বানর, হাতি ও অজগর সাপসহ বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী এ অঞ্চলে বসবাস করে।

ঘ মার্কিন সরকার বৃষ্টিবহুল অরণ্যের বায়োমের কথা বলেছে।

সাধারণভাবে নিরক্ষরেখার ৫° উত্তর ও ৫° দক্ষিণ আয়তনের শতকরা প্রায় ৬ ভাগ এ বনভূমি দখল করে রয়েছে। পৃথিবীর প্রায় সকল প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর অর্ধেকের বেশির ভাগ আবাস হচ্ছে এই বৃষ্টিবহুল অরণ্য। তা ছাড়া পৃথিবীর মোট চাহিদার শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ অক্সিজেন এ অরণ্য সরবরাহ করে থাকে। অক্সিজেন ছাড়া কোনো প্রাণী জীবনধারণ করতে পারে না; কাজেই বলা যায় এ বায়োমের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

আফ্রিকার কঙ্গো নদীর অববাহিকা ও গিনি উপকূল, দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদীর অববাহিকা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় এই বায়োমের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুযায়ী এ অঞ্চলে হেক্টরপ্রতি ১০০-৩০০ প্রজাতির গাছ রয়েছে। পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ ওষুধের উপকরণ আসে এই অরণ্য থেকে। এক্ষেত্রেও এ বায়োমের গুরুত্ব অপরিসীম।

এ অরণ্যে বহু প্রজাতির প্রাণীর মধ্যে স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ, উভচর এবং বিভিন্ন ধরনের পাখি রয়েছে। এখানে প্রতি একরে ৪০-১০০ প্রজাতির প্রাণী বসবাস করে। এ অরণ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রজাতি, মশা, বিষাক্ত সেৎসি মাছি ও নানা জাতের পোকামাকড় রয়েছে। বৃষ্টিপাতের জন্য এখানে বিশেষ ধরনের বৃক্ষ জন্মে। এ বৃক্ষ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানাভাবে কাজে লাগে। এ বনভূমি সৌন্দর্য রক্ষার ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাই বলতে হয়, এর গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ১২ ভূগোল স্যার ক্লাসে একটি গ্যাসীয় চক্রের আলোচনায় বললেন। এর মূল উৎস বায়ুমণ্ডল হলেও এটি ভূগর্ভে খনিজ হিসেবেও পাওয়া যায়। তবে এটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস নয়। এ গ্যাস সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে জটিল শর্করা তৈরি করে। এটি ছাড়া জীবন সম্ভব নয়। সকল জীব বেঁচে থাকার জন্য এই চক্রের ওপর নির্ভরশীল।

◀ শিখনফল: ৪ [দনিয়া কলেজ, ঢাকা]

ক. পানি চক্র কী? ১
খ. কতিপয় ব্যাকটেরিয়া কীভাবে নাইট্রোজেন এ পরিণত হয়? ২
গ. উদ্দীপকের চক্রের চিত্র অংকন করে বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. উদ্ভিদ ও প্রাণি এ চক্রের ওপর নির্ভরশীল কীভাবে যুক্তি দাও। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর

ক পানি রূপান্তরের মাধ্যমে স্থানান্তর এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ার (বাষ্পীভবন, ঘনীভবন, বৃষ্টিপাত) মাধ্যমে আবার স্বস্থানে ফিরে আসাই পানিচক্র।

খ মাটি ও পানিতে অবস্থিত ডিনাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়ার কার্যকারিতার ফলে নাইট্রেট প্রথমে নাইট্রাইটে রূপান্তরিত হয় এবং পরে নাইট্রোজেন মুক্ত হয়ে বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। এ প্রক্রিয়াকে ডিনাইট্রিফিকেশন (Denitrification) বলে। অ্যামোনিয়া ও নাইট্রেট নির্দিষ্ট কিছু ব্যাকটেরিয়ার (যেমন– *Pseudomonus, Micrococcus denitrificans*) কার্যকারিতায় মুক্ত নাইট্রোজেনে পরিণত হয়।

গ উদ্দীপকে কার্বন চক্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নিচে চক্রটির চিত্র অঙ্কন করা হলো–

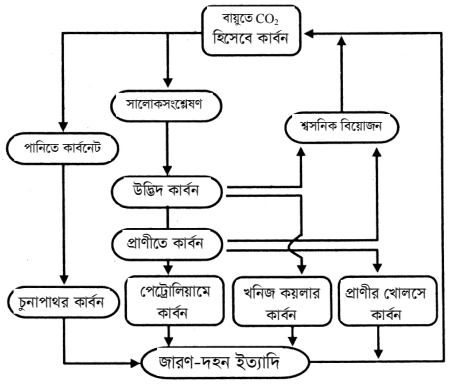

চিত্র: কার্বন চক্র

প্রকৃতিতে কার্বনের মূল উৎস হলো CO_2। জীবদেহ কোষ গঠনের জন্য এবং সবুজ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার অঙ্গার আত্তীকরণের জন্য কার্বনের প্রয়োজন।

সবুজ উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল ও পানিতে মিশে থাকা CO_2 গ্যাস গ্রহণ করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় এদের দেহে কার্বন সমন্বিত যৌগ তথা গ্লুকোজ উৎপন্ন করে। প্রাণী এই গ্লুকোজ কার্বন হিসাবে গ্রহণ করে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহে এই গ্লুকোজ জারিত হয়ে CO_2 উৎপন্ন হয় যা প্রকৃতিতে ফিরে যায়।

উদ্ভিদ জাত পদার্থ যেমন— কাঠ, কয়লা, কাগজ, পেট্রোল ইত্যাদি পদার্থের দহনক্রিয়ায় কার্বন যৌগ ভেঙে CO_2 গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং প্রকৃতিতে মুক্ত হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যুর পর পচনশীল জৈব বিয়োজন কর্তৃক বিয়োজিত হয়ে CO_2 গ্যাস নির্গত হয় ও প্রকৃতিতে ফিরে যায়।

এছাড়া বিভিন্ন ক্ষুদ্র জীবের শ্বসন প্রক্রিয়ায় আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যুর পর রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে CO_2 গ্যাসের পরিমাণ স্বাভাবিক থাকে। বাতাসে যে পরিমাণ কার্বন থাকে তার চেয়ে ৫০ গুণ বেশি কার্বন সমুদ্রের পানিতে বাইকার্বনেট রূপে জমা থাকে এবং পরবর্তীতে বায়ু ও সমুদ্রের পানির মধ্যে CO_2 এর আদান-প্রদান ঘটে।

ঘ উদ্দীপকে আলোচিত বিষয়টি কার্বন চক্র।

সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডল হতে মুক্ত CO_2 গ্রহণ করে এবং জটিল শর্করা তৈরি করে।

$$6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{আলোক}} C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O$$

এসব সবুজ উদ্ভিদ খেয়ে বেঁচে থাকে শাকাশী প্রাণী এবং এসব প্রাণী খেয়ে বেঁচে থাকে মাংসাশী প্রাণী। এভাবে উদ্ভিদ হতে প্রাণিদেহে শর্করা স্থানান্তরিত হয়। এসব শর্করা ($C_6H_{12}O_6$) উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে শ্বসন প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণরূপে জারিত হয়ে CO_2 গ্যাস উৎপন্ন করে। আবার কিছু সংখ্যক অণুজীব (ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া) উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহকে পচন ঘটিয়ে পচনশীল জৈব শ্বসন প্রক্রিয়ায় CO_2 গ্যাস তৈরি করে। এভাবে উৎপন্ন CO_2 পুনরায় বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়।

জলজ প্রাণী যেমন– শামুক, ঝিনুক ইত্যাদির খোলক কার্বনেট দিয়ে গঠিত। উক্ত প্রাণীদের মৃত্যুর পর নানা প্রকার রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে CO_2 গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং পানিতে মিশে যায়। ফলে CO_2 জ্বালানিরূপে দহন ক্রিয়ায় CO_2 গ্যাসরূপে পুনরায় বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়।

সুতরাং বায়ুমণ্ডল থেকে জীবদেহে এবং জীবদেহ থেকে বায়ুমণ্ডলে কার্বন CO_2 গ্যাসরূপে চক্রাকারে আবর্তন ঘটে। এ আবর্তনই কার্বন চক্র। কার্বন ছাড়া কোনো জৈব পদার্থ তৈরি হতে পারে না। সুতরাং কার্বন ছাড়া জীবন সম্ভব নয়। তাই দেখা যাচ্ছে, উদ্ভিদ ও প্রাণি বেঁচে থাকার জন্য কার্বন চক্রের ওপর নির্ভরশীল।

প্রশ্ন ▶ ১৩

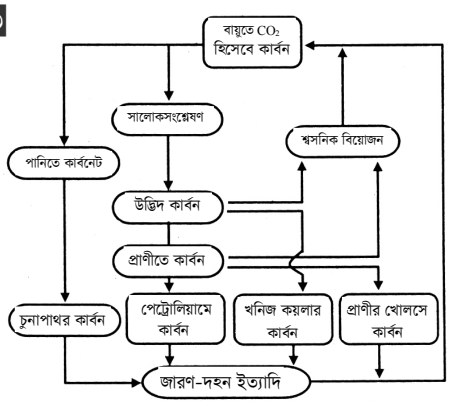

◀ *শিখনফল: ৪*

ক. কার্বন চক্র কাকে বলে? ১
খ. পরিবেশে কীভাবে কার্বনের ভারসাম্য বজায় থাকে? ২
গ. চক্রটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. চক্রটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে চক্রাকার পদ্ধতিতে পরিবেশে কার্বনের সমতা বজায় থাকে তাকে কার্বন চক্র বলে।

খ প্রকৃতিতে কার্বনের মূল উৎস হলো বায়ুমণ্ডলের CO_2 গ্যাস। সবুজ উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল ও (জলজ উদ্ভিদ) পানিতে মিশে থাকা CO_2 গ্রহণ করে।

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বন উদ্ভিদদেহে সঞ্চিত হয়। অপতপর প্রাণীতে, প্রাণীর মৃত্যুর পর পচনশীল জৈব হিসেবে বিয়োজিত হয়ে প্রকৃতিতে ফিরে যায়। আবার শ্বসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাণিকূল বায়ুমণ্ডলে CO_2 গ্যাস ফিরিয়ে দেয়। এভাবে কার্বন পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের (CO_2, HCO_3) চক্রাকার আবর্তনের মাধ্যমে ভারসাম্য বজায় রাখছে।

গ উদ্দীপকের চক্রটি কার্বন চক্র।

জড় পরিবেশ ও জীবদেহের মধ্যে কার্বন-এর চক্রাকার আবর্তন প্রক্রিয়াকে কার্বনচক্র বলা হয়। কার্বন সকল জৈব পদার্থের অপরিহার্য মৌল এবং এটি সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে (উদ্ভিদ কর্তৃক) বাস্তুতন্ত্রে (eco system) প্রবেশ করে। জীবন এবং জীবদেহের জন্য কার্বন আবশ্যক।

কার্বন ছাড়া কোনো জীবদেহ এমনকি কোনো জৈব যৌগ (গ্লুকোজ, সুক্রোজ) গঠিত হতে পারে না। এ উপাদানটি সকল জৈব রাসায়নিক যৌগের মূল গাঠনিক উপাদান। এসব জৈব রাসায়নিক যৌগ দ্বারাই কোষপ্রাচীর, কোষঝিল্লি, প্রোটোপ্লাজম এবং এনজাইম গঠিত। অর্থাৎ কার্বন জীবদেহের কাঠামো গঠনে সাহায্য করে। বিভিন্ন জৈব যৌগের উপাদান হিসেবে জীবদেহের বৃদ্ধি, বিপাক ও বংশবৃদ্ধিতে কার্বন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সবুজ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার প্রধান উপাদান হলো CO_2। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পৃথিবীতে শক্তির সংবন্ধন ঘটে। সবুজ উদ্ভিদ কার্বন আত্তীকরণ (Assimilation) করে। কিন্তু বায়ুমণ্ডলে সামান্য পরিমাণ CO_2 (আয়তন অনুপাতে ০.০৩%) রয়েছে। ভূপৃষ্ঠের বিকিরিত আলোকরশ্মি এর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং এর সামান্য অংশ বায়ুমণ্ডলে থেকে যায়। ফলে পৃথিবী উত্তপ্ত হয়, যা জীবনযাপনের অনুকূল। কার্বন ছাড়া পৃথিবীতে জীবন সৃষ্টি হওয়া, বেঁচে থাকা এবং যাবতীয় জৈবিক কার্যাবলি পরিচালনা সম্ভব হতো না।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনধারণ এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য কার্বন চক্রের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকা আবশ্যক।

ঘ উদ্দীপকে কার্বন চক্র দেখানো হয়েছে।

প্রকৃতিতে কার্বনের মূল উৎস হলো CO_2। বাতাসে যে পরিমাণ কার্বন (CO_2 গ্যাসরূপে) থাকে তার চেয়ে ৫০ গুণ বেশি কার্বন সমুদ্রের পানিতে বাইকার্বনেট (HCO_3) রূপে জমা থাকে এবং পরবর্তীতে বায়ু ও সমুদ্রের পানির মধ্যে কার্বনের আদান-প্রদান ঘটে। জীবদেহে কোষ গঠন জন্য এবং সবুজ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শক্তি উৎপাদনের জন্য কার্বনের প্রয়োজন।

সবুজ উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল ও পানিতে মিশে থাকা CO_2 গ্যাস গ্রহণ করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় দেহে কার্বন সমন্বিত যৌগ তথা গ্লুকোজ উৎপন্ন করে। প্রাণী এই কার্বন, গ্লুকোজ হিসাবে গ্রহণ করে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহে গ্লুকোজ জারিত হয়ে CO_2 উৎপন্ন হয় যা প্রকৃতিতে ফিরে যায়।

উদ্ভিদজাত পদার্থ যেমন— কাঠ, কয়লা, কাগজ, পেট্রোল ইত্যাদি পদার্থের দহনক্রিয়ায় (combustion) কার্বন যৌগ ভেঙে CO_2 গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং প্রকৃতিতে মুক্ত হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যুর পর পচনশীল জৈব বিয়োজক (ব্যাকটেরিয়া) কর্তৃক বিয়োজিত হয়ে CO_2 গ্যাস নির্গত হয় ও প্রকৃতিতে ফিরে যায়।

এছাড়া বিভিন্ন ক্ষুদ্র জীবের শ্বসন প্রক্রিয়ায়, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যুর পর রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে বাতাসে CO_2 গ্যাসের পরিমাণ স্বাভাবিক থাকে।

প্রশ্ন ▶১৪ শশীর গৃহ শিক্ষক শশীকে একটি চক্র বুঝাতে গিয়ে বললেন, বাতাসে যে উপাদানটি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে থাকে, সেটি উদ্ভিদ ও প্রাণী বাতাস থেকে সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না। উক্ত উপাদানটি জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদ ও প্রাণীর গ্রহনের উপযোগী হয়। অতঃপর মৃত্তিকার মাধ্যমে উপাদানটি আবার বাতাসে ফিরে যায়। এভাবে একটি চক্রের মাধ্যমে উপাদানটি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। *◀ শিখনফল-৪*

ক. 'Biodiversity' শব্দটি সর্বপ্রথম কে ব্যবহার করেন? ১
খ. পানিচক্রের মাধ্যমে স্থলভাগ ও সাগর-মহাসাগরের মধ্যে কিভাবে পানির বিনিময় হয়? ২
গ. উদ্দীপকে যে চক্রের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা বর্ণনা করো। ৩
ঘ. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় উক্ত চক্রটির ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৮৫ সালে আমেরিকার Walter Rosen জীববৈচিত্র্যে (Biodiversity) শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন।

খ পানিচক্রে পানি সাগর হতে বায়ুমণ্ডলে, বায়ুমণ্ডল হতে স্থলভাগ এবং স্থলভাগ হতে পুনরায় সাগরে যায়।

সমুদ্রে অধঃক্ষেপনের চেয়ে বাষ্পীভবন এবং স্থলভাগে বাষ্পীভবনের চেয়ে অধঃক্ষেপণ বেশি হয়। সেজন্য সমুদ্রের

বাষ্পীভূত জলীয়বাষ্প স্থলভাগের দিকে গিয়ে মহাদেশের জলীয় পদার্থের ঘাটতি পূরণ করা পানি চক্রের মূল কাজ। এভাবে পানিচক্রের মাধ্যমে স্থলভাগ ও সাগর মহাসাগরের মধ্যে পানির বিনিময় ঘটে।

গ উদ্দীপকে নাইট্রোজেন চক্রের কথা বলা হয়েছে।

নাইট্রোজেনের উৎস হচ্ছে বায়ুমণ্ডল। বায়ুমণ্ডল গঠনকারী উপাদানগুলোর ৭৮ শতাংশ নাইট্রোজেন। উদ্ভিদ ও প্রাণী খাদ্যের মাধ্যমে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে; বায়ু থেকে গ্যাসীয় নাইট্রোজেন করতে পারে না।

নাইট্রোজেন চক্র নিম্নলিখিত পদ্ধতির মাধ্যমে হয়ে থাকে। যথা–

i. বায়ুমণ্ডলীয় গ্যাসীয় নাইট্রোজেন (N_2) কে উদ্ভিদের ব্যবহার উপযোগী করার জন্য মৃত্তিকা ও উদ্ভিদের মূলে বসবাসকারী ব্যাকটেরিয়া নাইট্রোজেন গ্যাসকে আমোনিয়া (NH_3) ও নাইট্রেট অক্সাইড (NO_3)-এ রূপান্তরিত করে।

ii. উদ্ভিদ NO_3 যৌগের মাধ্যমে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে এবং আত্মীকৃত নাইট্রোজেনের সাহায্যে প্রোটিন RNA ও DNA প্রভৃতি জৈব অণু সংশ্লেষ করে। খাদ্যের মাধ্যমে উদ্ভিদ থেকে তৃণভোজী প্রাণী এবং তৃণভোজী প্রাণী থেকে মাংসাশী প্রাণীর মাধ্যমে N_2 সংগ্রহ করে।

iii. প্রাণিজ N_2 ঘটিত মলমূত্র এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত দেহাবশেষ থেকে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাকের মাধ্যমে অ্যামোনিয়ার এবং পরবর্তী ধাপে অ্যানোমিয়া থেকে নাইট্রেট উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন NO_3-এর কিছু অংশ N_2 গ্যাসরূপে বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে এবং অবশিষ্ট অংশ উদ্ভিদ গ্রহণ করে।

iv. মৃত্তিকা ও সমুদ্রে স্থায়ীকৃত নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড (NO_2) এর কিছু অংশ ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে প্রথমে নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O) পরে N_2 গ্যাস পরিবর্তিত হয় এবং উৎপন্ন N_2 ভুগর্ভে ফিরে আসে। এভাবে নাইট্রোজেন চক্র সম্পন্ন হয়।

ঘ সব জীবের জন্য নাইট্রোজেন একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। প্রাকৃতিক নাইট্রোজেন চক্রে নাইট্রোজেন মৌল বিভিন্ন আকারে বায়ু থেকে মাটি, মাটি থেকে উদ্ভিদ ও উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে সঞ্চারিত হয়। নিম্নে নাইট্রোজেন চক্রের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হলো।

নাইট্রোজেন চক্র জীবমণ্ডল ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নাইট্রোজেন চক্রের ফলে মৃত্তিকা, উদ্ভিদমণ্ডল ও প্রাণীমণ্ডল সর্বদা সঞ্চারিত থাকে।

বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেনের পরিমাণ খুবই সীমিত। জীবদেহের নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডল থেকেই আসে। যদি বায়ুমণ্ডল থেকে ব্যবহৃত নাইট্রোজেন পুনরায় বায়ুমণ্ডলে ফিরে না যায় তবে কয়েক বছরের মধ্যেই বায়ুমণ্ডলের সব নাইট্রোজেন শেষ হয়ে যাবে। কাজেই জীবদের বেঁচে থাকার জন্য নাইট্রোজেন অত্যাবশ্যক।

তাই দেখা যায়, নাইট্রোজেন চক্রের সহায়তায় জীব কর্তৃক নাইট্রোজেন গ্রহণ এবং পরিবেশে নাইট্রোজেনের বিমুক্তির মাধ্যমে ভারসাম্য রক্ষিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৫ রহিমা পৃথিবীর বৈচিত্র্যময় প্রাণীজগত বই পড়ে জানতে পাড়লো তুন্দ্রা অঞ্চলে ভাল্লুক, পেঙ্গুইন বাস করে; প্রেইরী অঞ্চলে হরিণ, গরু, বাছুর, ভেড়া প্রভৃতি তৃণভোজী প্রাণী বাস করে। আবার ম্যানগ্রোভ অঞ্চলে বাঘ, কুমির বানর প্রকৃতি প্রাণী অবাধে বংশ বিস্তার করে থাকে।

◀ *শিখনফল: ৪ [সিলেট সরকারি কলেজ]*

ক. জীব বৈচিত্র্য কাকে বলে? ১

খ. ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনভূমি বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বৈচিত্র্যতার কথা বলা হয়েছে তার কারণ কি? ৩

ঘ. উদ্দীপকের বৈচিত্র্যতা সংরক্ষণের উপায় বর্ণনা কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একই পরিবেশে বহু ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্বাভাবিক অবস্থানকে জীববৈচিত্র্য বলে।

খ পাহাড়ের অধিক বৃষ্টিপ্রবণ অঞ্চলে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনভূমি দেখা যায়। যেমন– চাপালিশ, তেলসুর ইত্যাদি।

বেলে পাথর, শোল ও কর্দম দ্বারা গঠিত পাহাড়ি অঞ্চলে পরিণত তাপমাত্রা (৩০° সে.), অত্যাধিক বৃষ্টিপাত (৩০০ সেন্টিমিটারের বেশি), স্বল্প জনবসতি ইত্যাদি বর্তমান থাকায় চিরহরিৎ বনভূমি গড়ে উঠেছে।

গ জীববৈচিত্র্যের স্থানিক ভিন্নতা বলতে স্থানভেদে জীবের (উদ্ভিদ ও প্রাণী) প্রজাতিগত ভিন্নতাকে বোঝায়। এর কারণ মূলত দুটি। যথা– পরিবেশগত ও বংশগত।

বিভিন্ন স্থানে জলবায়ুর তারতম্যে যে পরিবেশগত ভিন্নতা তা অঞ্চলভেদে নির্দিষ্ট প্রজাতির অভিযোজন ঘটায়। যেমন– ম্যানগ্রোভ অঞ্চলের রয়েল বেঙ্গল টাইগার। আবার, বংশগতির কারণে উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রজাতিগত বৈচিত্র্যতা সৃষ্টি হয়। কিন্তু তা নির্দিষ্ট স্থানে অভিযোজিত হয়। পরিবর্তনশীল পরিবেশ ও বিভিন্ন নির্বাচনীয় চাপে বংশগতীয় ভিন্নতাই প্রজাতিতে টিকে রাখতে সাহায্য করে। যেমন– তুন্দ্রা অঞ্চলের ভাল্লুক, পেঙ্গুইন এবং প্রেইরী অঞ্চলের তৃণভোজী প্রাণী (হরিণ, গরু)। এভাবে জীববৈচিত্র্যের স্থানিক ভিন্নতা দেখা যায়।

ঘ মানুষের অদূরদর্শী ক্রিয়াকলাপের দরুণ বনভূমি আজ ধ্বংসের সম্মুখীন।

উদ্দীপকে আলোচিত বিলুপ্তির সম্মুখীন বন্যপ্রাণীগুলোকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যেসব পদক্ষেপ নেয়া উচিত সেগুলো হলো—

১. জীববৈচিত্র্যের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য জাতীয় পর্যায়ে সমীক্ষা গ্রহণ;

২. জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহারের জন্য জাতীয় কৌশল প্রণয়ন করে জাতীয় উন্নয়ন কৌশলের সঙ্গে তা সম্পৃক্তকরণ;

৩. ভোগ্যপণ্য ও অন্যান্য পরিবেশগত সুবিধা প্রদানকারী পরিবেশ ব্যবস্থায় জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব সম্পর্কে দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ;

৪. জীববৈচিত্র্যের ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির জন্য জনগণকে উৎসাহিত ও সম্পৃক্তকরণ;

৫. সংরক্ষিত এলাকা চিহ্নিত করার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ নিশ্চিত করা;

৬. সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ইকোসিস্টেম-এর উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ;

৭. আন্তঃদেশীয় সীমানায় অবৈধ বন্যপ্রাণী ব্যবসা বন্ধ এবং বিভিন্ন সংরক্ষিত এলাকায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনার জন্য প্রকল্প গ্রহণ।

উল্লিখিত পদক্ষেপগুলো যথাযথভাবে গ্রহণ করলে বন্যপ্রাণী বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা যাবে।

প্রশ্ন ▶ ১৬

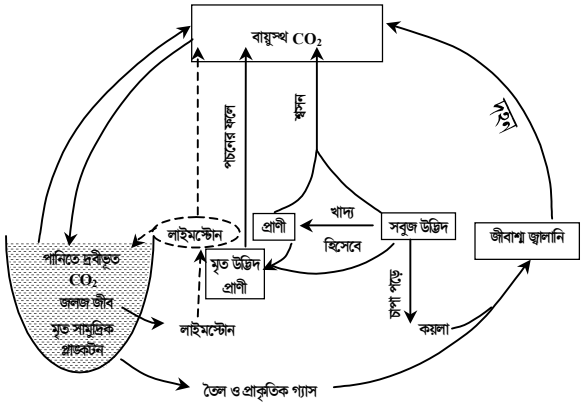

[অবনীন্দ্রনাথ বৈদ্য; অনু-১] ◀ ***শিখনফল: ৪***

ক. কার্বন চক্র কাকে বলে? ১

খ. CFC গ্যাস কীভাবে ওজোন স্তরের ক্ষতি করে? ২

গ. শ্বসন কীভাবে কার্বন চক্রে অংশ নেয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কার্বন চক্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রকৃতির কার্বন যে প্রক্রিয়ায় CO_2 গ্যাসরূপে পরিবেশ থেকে জীবদেহে এবং জীবদেহ থেকে পরিবেশে আবর্তিত হয়ে প্রকৃতিতে কার্বনের সমতা বজায় রাখে তাকে কার্বন চক্র বলে।

খ CFC (Chloro-Fluoro-Carbon) হলো কার্বন, ফ্লোরিন ও ক্লোরিনের একটি যৌগ। এটি মূলত রেফ্রিজারেটর, এয়ারকন্ডিশনার, প্লাস্টিক ও রং তৈরির কারখানা হতে নির্গত হয়ে থাকে। এক অণু CFC গ্যাস তাপমাত্রাভেদে ২০০ থেকে ২০০০০ ওজোন (O_3) অণুকে ধ্বংস করতে পারে। এভাবে CFC গ্যাস ওজোন স্তরের ক্ষতি করে থাকে।

গ জীব ও জড় পরিবেশের মধ্যে কার্বন প্রতিনিয়ত আবর্তিত হয়। জীবদেহের কোষ গঠন এবং সবুজ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার জন্য কার্বন প্রয়োজন হয়। সবুজ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার প্রধান উপাদান হলো CO_2।

উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জড় পরিবেশ থেকে CO_2 গ্যাসকে জৈব যৌগে পরিণত করে। যেমন—

$$6\,CO_2 + 12H_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{আলো}} C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O$$

গ্লুকোজ উদ্ভিদদেহে জ্বালানি হিসেবে কাজ করে। অন্যদিকে, উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে যে সকল প্রাণী বাঁচে তাদেরও কোষীয় শ্বসনে গ্লুকোজ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এভাবে শ্বসন প্রক্রিয়ায় কার্বন পুনরায় বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। এ প্রক্রিয়ায় শ্বসন কার্বনচক্রে অংশ নেয়।

ঘ জড় পরিবেশ ও জীবদেহের মধ্যে কার্বন-এর চক্রাকার আবর্তন প্রক্রিয়াকে কার্বনচক্র বলা হয়। কার্বন সকল জৈব পদার্থের অপরিহার্য মৌল এবং এটি সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্রে প্রবেশ করে। জীবন এবং জীবদেহের জন্য কার্বন আবশ্যক।

কার্বন ছাড়া কোনো জীবদেহ এমনকি কোনো জৈব যৌগ (গ্লুকোজ, সুক্রোজ) গঠিত হতে পারে না। কার্বন সকল জৈব রাসায়নিক যৌগের মূল সাংগঠনিক উপাদান। এসব জৈব রাসায়নিক যৌগ দ্বারাই কোষপ্রাচীর, কোষঝিল্লি, প্রোটোপ্লাজম এবং এনজাইম গঠিত। কাজেই কার্বন জীবদেহের কাঠামো গঠনে সাহায্য করে। বিভিন্ন জৈব যৌগের উপাদান হিসেবে জীবদেহের বৃদ্ধি, বিপাক ও বংশবৃদ্ধিতে কার্বন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সবুজ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার প্রধান উপাদান হলো CO_2। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পৃথিবীতে শক্তির সংবন্ধন ঘটে। সবুজ উদ্ভিদ বছরে বিপুল পরিমাণ কার্বন আত্তীকরণ (Assimilation) করে। বায়ুমণ্ডলে সামান্য পরিমাণ CO_2 থাকার কারণে ভূপৃষ্ঠের বিকিরিত আলোকরশ্মি তার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং এ রশ্মির কিয়দংশ বায়ুমণ্ডলে থেকে যায়। ফলে পৃথিবী সামান্য পরিমাণ উত্তপ্ত থাকে, যা জীবন সৃষ্টির অনুকূল। কার্বন ছাড়া পৃথিবীতে জীবন সৃষ্টি হওয়া, জীবের বেঁচে থাকা এবং যাবতীয় জৈবিক কার্যাবলি পরিচালনা সম্ভব হতো না।

পরিশেষে বলা যায়, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য কার্বন চক্রের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন ▶ ১৭

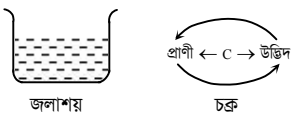

◀ ***শিখনফল: ৩ ও ৪ [বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]***

ক. ইকোসিস্টেম কাকে বলে? ১

খ. বায়োম কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের জলাশয়টির ইকোসিস্টেমের বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকের চক্রটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় সকল সজীব উপাদানসমূহের এবং তার সাথে সেই স্থানের পরিবেশের সকল অজীব উপাদানসমূহের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে একত্রে ইকোসিস্টেম বলে।

খ জীবের সাথে জড় মাধ্যম ও পরিবেশের মিথস্ক্রিয়া বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেম নামে পরিচিত। ইকোসিস্টেমকে যখন বিশ্ব মাত্রায় প্রকাশ করা হয় তখন তাকে বায়োম বলে। জলবায়ুর ভিত্তিতে সমগ্র পৃথিবী বিভিন্ন বায়োম অঞ্চলে বিভক্ত। যেমন– মরুভূমি, তুন্দ্রা ইত্যাদি বায়োম।

গ চিত্রের ইকোসিস্টেমটি জলজ বাস্তুতন্ত্রের উদাহরণ। কারণ, এটি একটি পুকুরের ইকোসিস্টেম।

একটি পুকুরের বাস্তুতন্ত্রে অজীব ও সজীব উপাদান থাকে। অজীব উপাদানসমূহ নিম্নরূপ:

- অজৈব পদার্থ, যেমন- পানি, CO_2 প্রভৃতি;
- জৈব পদার্থ, যেমন- শর্করা, প্রোটিন প্রভৃতি;
- ভৌত পদার্থ, যেমন— সূর্যালোক, তাপ প্রভৃতি।

সজীব উপাদান: ইকোসিস্টেমের সজীব উপাদানগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

উৎপাদক: যেসব জীবজ উপাদান খাদ্য ও শক্তি উৎপাদন করে থাকে তাদেরকে উৎপাদক বলে। সকল সবুজ উদ্ভিদই উৎপাদক।

খাদক: যেসব জীবজ উপাদান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উৎপাদক কর্তৃক উৎপাদিত খাদ্য খেয়ে বেঁচে থাকে তাদেরকে খাদক বলে। খাদক আবার তিন শ্রেণিতে বিভক্ত—

- **প্রাথমিক খাদক:** জুপ্লাঙ্কটন, ফাইটোপ্লাঙ্কটন প্রভৃতি;
- **সেকেন্ডারি খাদক:** মলা, খালিশা প্রভৃতি মাছ;
- **টারশিয়ারি খাদক:** চিতল, শোল, বোয়াল প্রভৃতি মাছ।

বিয়োজক: বিয়োজকের ফলে মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের জৈব ও অজৈব পদার্থসমূহ পুনরায় ইকোসিস্টেমের জড় উপাদানে পরিণত হয় এবং সবুজ উদ্ভিদ পুনরায় এদেরকে গ্রহণ করে থাকে।
চিত্রে উপরিউক্ত প্রতিটি বিষয়ই পরিলক্ষিত হয় বলে স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, এটি একটি আবদ্ধ জলের জলজ বাস্তুতন্ত্র।

ঘ উদ্দীপকে কার্বন চক্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নিচে চক্রটির চিত্র অঙ্কন করা হলো–

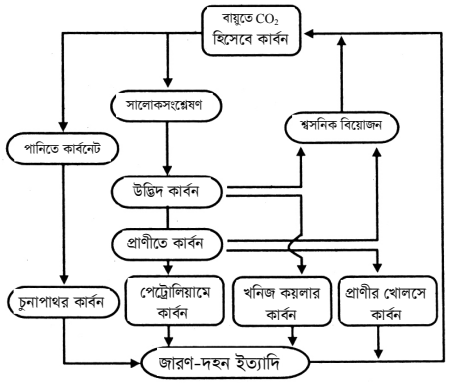

চিত্র: কার্বন চক্র

প্রকৃতিতে কার্বনের মূল উৎস হলো CO_2। জীবদেহ কোষ গঠনের জন্য এবং সবুজ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার অঙ্গার আত্তীকরণের জন্য কার্বনের প্রয়োজন।

সবুজ উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল ও পানিতে মিশে থাকা CO_2 গ্যাস গ্রহণ করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় এদের দেহে কার্বন সমন্বিত যৌগ তথা গ্লুকোজ উৎপন্ন করে। প্রাণী এই গ্লুকোজ কার্বন হিসেবে গ্রহণ করে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহে এই গ্লুকোজ জারিত হয়ে CO_2 উৎপন্ন হয় যা প্রকৃতিতে ফিরে যায়।

উদ্ভিদ জাত পদার্থ যেমন— কাঠ, কয়লা, কাগজ, পেট্রোল ইত্যাদি পদার্থের দহনক্রিয়ায় কার্বন যৌগ ভেঙে CO_2 গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং প্রকৃতিতে মুক্ত হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যুর পর পচনশীল জৈব বিয়োজন কর্তৃক বিয়োজিত হয়ে CO_2 গ্যাস নির্গত হয় ও প্রকৃতিতে ফিরে যায়।

এছাড়া বিভিন্ন ক্ষুদ্র জীবের শ্বসন প্রক্রিয়ায় আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যুর পর রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে CO_2 গ্যাসের পরিমাণ স্বাভাবিক থাকে। বাতাসে যে পরিমাণ কার্বন থাকে তার চেয়ে ৫০ গুণ বেশি কার্বন সমুদ্রের পানিতে বাইকার্বনেট রূপে জমা থাকে এবং পরবর্তীতে বায়ু ও সমুদ্রের পানির মধ্যে CO_2 এর আদান-প্রদান ঘটে।

প্রশ্ন ▶ ১৮ কয়েকজন আমেরিকান পরিবেশ বিজ্ঞানী দক্ষিণ এশিয়ায় একটি দেশে এসে দেখল এখানকার ভূমিরূপ বা ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত স্থলজ বায়োম (biome) সৃষ্টি করেছে এবং এখানকার অধিকাংশ উদ্ভিদ চিরসবুজ (evergreen) তবে বিচ্ছিন্ন কিছু পর্ণমোচী (deciduous) বৃক্ষ জন্মে। ◀ *শিখনফল: ৫*

ক. বাংলাদেশ কোন বায়োমের অন্তর্ভুক্ত? ১
খ. সাভানা বায়োমের অবস্থান ব্যাখ্যা করো? ২
গ. বিজ্ঞানীদের দেখা বায়োমের পরিবেশ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. আমেরিকান বিজ্ঞানীদের দেখা বায়োমের উদ্ভিদ প্রজাতি আলোচনা করো। ৪

১৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ স্থলজ বায়োম (land biome) এর অন্তর্ভুক্ত।

খ ক্রান্তীয় (tropical) অঞ্চলের তৃণভূমি সাভানা বায়োম হিসেবে পরিচিত।

আফ্রিকা (সুদান, ঘানা, মালি), দক্ষিণ আমেরিকা (ব্রাজিল) ও অস্ট্রেলিয়া এবং এশিয়ার ভারতে সাভানা তৃণভূমি রয়েছে। আফ্রিকায় সবচেয়ে বড় সাভানা তৃণভূমি রয়েছে।

গ বিজ্ঞানীদের দেখা বায়োমটি বাংলাদেশ বায়োম। নিচে এর পরিবেশ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হলো–

এখানকার তাপমাত্রা গড়ে ২০°-২৫° সেলসিয়াস। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২৫০ সে.মি.। সে কারণে মাটি ভেজা ও স্যাঁতসেঁতে থাকে। নদীবাহিত পলি দিয়ে এ অঞ্চলের মাটি গঠিত। কাজেই

মাটি বেশ উর্বর। এ অঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা (সমতল ভূমি) বর্ষার সময় প্লাবিত হয়। তবে শীতকালে পানি কমে যায় এবং অনেক নিচু স্থানে (সিলেটের হাওর অঞ্চল) ধান চাষ হয়। এখানকার উচ্চভূমির (বরেন্দ্র ভূমি, রাজশাহী) মাটি অনুর্বর, অম্লীয়, লাল এবং কোথাও কোথাও ধূসর বর্ণের।

খাড়ি অঞ্চল জুড়ে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল এ অঞ্চলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন (সুন্দরবন) এখানে অবস্থিত। এছাড়া জোয়ার-ভাটা এ অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশীয় নিয়ামক (environmental factor)। প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য এখানকার গাছগুলোর (সুন্দরি, গরান) কিছু অভিযোজনিক বৈশিষ্ট্য (যেমন– শ্বাসমূল) আছে।

ঘ বিজ্ঞানীদের দেখা বায়োমটি বাংলাদেশ বায়োম।

বিভিন্ন ধরনের উচ্চ বৃক্ষ প্রজাতির উদ্ভিদ এখানে জন্মে এবং একক কোনো প্রজাতি (species) আধিপত্য বিস্তার করে না। এখানে প্রজাতিবৈচিত্র্য বেশি। নিচে তা বর্ণনা করা হলো–

এ অঞ্চলের বায়োমে অধিকাংশ গাছ চিরসবুজ (সেগুন) তবে বিচ্ছিন্ন কিছু পর্ণমোচী বৃক্ষ (শাল) জন্মে। বৃক্ষগুলো ২-৩ স্তর ক্যানোপি গঠন করে। বৃক্ষের গায়ে অনেক কাষ্ঠল লতা এবং পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ (স্বর্ণলতা) জন্মে। এছাড়া ফার্ন, মস ও তাল জাতীয় গাছ জন্মে।

নিম্নাঞ্চলে জলজ উদ্ভিদের মধ্যে শাপলা, পদ্ম, কলমি, শোলা, ক্ষুদিপানা, কচুরিপানা, পানিফল ও বিভিন্ন জাতের ঘাস প্রধান। দেশজুড়ে গ্রামের বাড়ির আশপাশে সুপারি, নারিকেল, আম, কাঁঠাল, কলা, লিচু, জাম, বাঁশ, বড়ই ইত্যাদি প্রধান।

এছাড়া গ্রীষ্মমণ্ডলের বৃষ্টিবহুল অরণ্যের গাছগুলো লম্বা, চওড়া পাতা বিশিষ্ট এবং চিরসবুজ। এসব বনে সব গাছ সমান উঁচু হয় না। গাছগুলো সর্বোচ্চ ৬০ মি. (২০০ ফুট) পর্যন্ত লম্বা হয়। যেমন— গর্জন, চাপালিশ, গামার, জারুল। এছাড়া এ অঞ্চলের বনভূমিতে চিরসবুজ, মিশ্র সবুজ, পাতাঝরা বৃক্ষ বেত ও বাঁশ দেখা যায়। ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের প্রধান উদ্ভিদ হলো সুন্দরি, গরান, গোলপাতা, নোনালতা প্রভৃতি।

প্রশ্ন ▶ ১৯ সুমন শীত মৌসুমে যশোর থেকে ঢাকা যাওয়ার সময় সাভার এলাকায় পৌঁছানোর পর দেখল প্রচুর ইটভাঁটা। তা থেকে কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশের দিকে যাচ্ছে। সেখানকার পরিবেশ যেন একটু অন্য রকম। অত্যন্ত গভীরভাবে উপলব্ধি করল এ এলাকায় যেন শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

[তাপস কুমার মজুমদার; অনু-২] ◀ শিখনফল: ৬

ক. দূষণ কী? ১

খ. বায়োম বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সুমনের শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সাভার এলাকার দূষণের কারণ তোমার নিজের যুক্তিতে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক পরিবেশের উপাদানগুলোতে (বায়ু, পানি, মাটি) বিষাক্ত পদার্থের সংযোজনই দূষণ।

খ জীবের সাথে জড় মাধ্যম ও পরিবেশের মিথস্ক্রিয়া বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেম নামে পরিচিত। ইকোসিস্টেমকে যখন বিশ্ব মাত্রায় প্রকাশ করা হয় তখন তাকে বায়োম বলে। জলবায়ুর ভিত্তিতে সমগ্র পৃথিবী বিভিন্ন বায়োম অঞ্চলে বিভক্ত। যেমন– মরুভূমি, তুন্দ্রা ইত্যাদি বায়োম।

গ সুমনের শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হওয়ার কারণ হলো উক্ত এলাকার বায়ু দূষণ।

সাভারে প্রচুর ইটভাঁটা থাকায় এগুলোতে যে কাঠ ও কয়লা পোড়ানো হচ্ছে তা থেকে প্রচুর ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়, যা বায়ুর সাথে মিশে উক্ত এলাকায় বায়ু দূষণ ঘটাচ্ছে। নতুন চিমনিগুলোতে যেসব জ্বালানি ব্যবহৃত হয় তা থেকেই শুধু যে বায়ু দূষণ ঘটে তা নয়, পুরোনো চিমনি ও ইটভাঁটার নিষ্ফল তাপীয় অবস্থার জন্যও বায়ু দূষণ হয়। বর্তমানে বড় বড় শহরগুলোতে পুঞ্জীভূতভাবে ইটভাঁটা গড়ে উঠেছে, যা শহরগুলোর বায়ু দূষণের অন্যতম কারণ। যেমন: সাভার, আমিনবাজারে ইটের ভাঁটার কারণে এ এলাকাসহ রাজধানী ঢাকা বায়ু দূষণের শিকার। এই বায়ু দূষণের ফলে উক্ত এলাকার জীবজগৎ তথা মানবজীবনে রোগসৃষ্টিসহ নানা ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, সুমনের শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হওয়ার কারণ হলো উক্ত এলাকার বায়ু দূষণ।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে সাভার এলাকার বায়ু দূষণের কারণগুলো নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো:

কলকারখানার ধোঁয়া: সাভার এলাকায় বিভিন্ন ধরনের কলকারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া উক্ত এলাকার বায়ুকে দূষিত করছে। কারণ কলকারখানার নির্গত কালো ধোঁয়া হতে সালফার ডাইঅক্সাইড, কার্বন-ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি সৃষ্টি হয়ে সহজেই বায়ু দূষণ করে।

যানবাহন থেকে নির্গত দূষিত পদার্থ: সাভার এলাকায় শিল্প কারখানার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের যানবাহন চলাচল করায় এসবে ব্যবহৃত পেট্রোল, ডিজেল দহনের কারণে নির্গত বিষাক্ত গ্যাস সহজেই বায়ু দূষণে সহায়তা করে থাকে।

ইটের ভাঁটা: সাভারের ইটের ভাটায় যেসব কাঠ ও কয়লা পোড়ানো হয় তা থেকে প্রচুর ধোঁয়ার সৃষ্টি হয় যা উক্ত এলাকার বায়ুর সাথে মিশে বায়ু দূষণ ঘটাচ্ছে।

এছাড়া সাভারে নগরায়ণ বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে, নতুন নতুন কল-কারখানা সৃষ্টি হচ্ছে। জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে মানুষ বিভিন্ন অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হচ্ছে। যেসব কর্মকাণ্ড সাভারে বিভিন্ন ধরণের দূষণে সহায়তা করছে।

প্রশ্ন ▶ ২০ মানিক 'বুড়িগঙ্গা বাঁচাও' আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী। ঐতিহ্যবাহী এই নদীর পানি এখন বিষাক্ত দুর্গন্ধময়, ব্যবহারের অযোগ্য, কালো বর্ণের এবং জলজপ্রাণিহীন। অথচ ১৯৮৭ সালে মানিক চাঁদপুর থেকে এসে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোল বিভাগে ভর্তি হয়। তখন নদীটির নির্মল পানি, মানুষের নৌ-বিহার, মাছ ধরা, নদীতে গোসল এবং লঞ্চের পেছনে শুশুক ভেসে ওঠার দৃশ্য তার স্পষ্ট মনে আছে। *◀ শিখনফল-৬*

ক. বায়োম কী? ১

খ. কার্বন চক্র বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত নদীটির বর্তমান অবস্থার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মানিকের আন্দোলন সফল করার জন্য কী কী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে?– মতামত দাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বৃহৎ এলাকাব্যাপী গড়ে ওঠা ইকোসিস্টেমই বায়োম। যেমন– তুন্দ্রা, সাভানা ইত্যাদি বায়োম।

খ প্রকৃতির কার্বন যে প্রক্রিয়ায় CO_2 গ্যাসরূপে পরিবেশ থেকে জীবদেহে এবং জীবদেহ থেকে পরিবেশে আবর্তিত হয়ে প্রকৃতিতে কার্বনের সমতা বজায় রাখে তাই কার্বন চক্র।

যেমন– উদ্ভিজ্জাত পদার্থ (কাঠ, কয়লা, পেট্রোল ইত্যাদি) দহন ক্রিয়ায় কার্বন যৌগ ভেসে CO_2 গ্যাস নির্গত হয়ে বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়।

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + C_6H_2O \longrightarrow 6CO_2 + 12H_2O + \text{শক্তি}$$

গ উদ্দীপকে বুড়িগঙ্গা নদীর পানি দূষিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

বুড়িগঙ্গা নদীর আশপাশে অনেক শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছে এবং এসব কারখানার বর্জ্য বুড়িগঙ্গায় এসে পড়ছে। এছাড়া নদীতে লঞ্চ, স্টিমার চলার ফলে বুড়িগঙ্গার পানি দূষিত হচ্ছে।

শিল্পকারখানায় ব্যবহৃত রং, গ্রিজ, রাসায়নিক দ্রব্য, উষ্ণ পানি, বর্জ্য নদীতে এসে পড়ছে। এতে নদীর পানি দূষিত হচ্ছে। এছাড়াও নদীতে চলা বড় বড় লঞ্চ, স্টিমার থেকে নির্গত তেল, বর্জ্য নদীর পানির সাথে মিশে যাচ্ছে। এভাবে বুড়িগঙ্গা নদীর পানি দূষিত হওয়ার ফলে জলজ উদ্ভিদ, প্লাঙ্কটন, কচুরিপানা, শেওলা প্রভৃতি জন্মাতে পারে না। এদের ভক্ষণ করে যে সকল ক্ষুদ্র মাছ বেঁচে থাকে তাদেরও খাদ্যের অভাব হচ্ছে। ফলে নদীতে ছোট মাছ কমে যাচ্ছে। এতে করে বড় মাছগুলোরও খাদ্যের অভাব দেখা দিচ্ছে। যার ফলে বুড়িগঙ্গা জলজ প্রাণিহীন হয়ে পড়েছে।

ঘ উদ্দীপকে বুড়িগঙ্গা নদী বাঁচাতে তথা দূষণমুক্ত রাখতে যেসব পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে সেগুলো হলো–

i. নদীর তীরবর্তী ফসলি জমিতে কীটনাশক প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে।

ii. যানবাহনের নির্গত বর্জ্য যাতে নদীর পানিতে না মিশে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

iii. শিল্প-কারখানার রং, গ্রিজ, রাসায়নিক দ্রব্য, উষ্ণ পানি যাতে নদীর পানিতে না মিশে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

iv. আবাসস্থলের বর্জ্য নদীর পানিতে ফেলা যাবে না।

v. নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

vi. বিভিন্ন উৎস থেকে দূষিত পানি 'শোধনকেন্দ্র' বা 'ট্রিটমেন্ট প্লান্ট'– এ পাইপ যোগে সরবরাহ করে এ কেন্দ্রগুলোতে ময়লা পানিকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আবর্জনা ও দূষণমুক্ত করার পর নদীতে ছেড়ে দিতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ২১ বিগত বছরের তুলনায় সোহান তার জমিতে ফলন কম পাওয়ায় এ বছর প্রচুর রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করতে শুরু করে। কিন্তু তারপরও ভালো ফল না পাওয়ায় সে গাছপালা কেটে আবাদি জমির পরিমাণ বাড়াতে থাকে।

◀ শিখনফল: ৬

ক. মাটিতে মিশে না এমন একটি পদার্থের নাম লেখো? ১

খ. CFC কীভাবে ওজোনস্তর ধ্বংস করছে? ২

গ. সোহানের কাজগুলো পরিবেশের কোন উপাদানকে দূষিত করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত দূষণের ফলাফল বিশ্লেষণ করো। ৪

২১নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাটিতে মিশে না এমন একটি পদার্থ হলো– পলিথিন।

খ CFC হচ্ছে ক্লোরিন, ফ্লোরিন ও কার্বনের একটি উদ্বায়ী যৌগ (Volatile matter) যা ওজোন স্তরকে ধ্বংস করতে পারে।
রেফ্রিজারেটর, এয়ারকন্ডিশনার, প্লাস্টিক ও রং তৈরির কারখানা হতে CFC নির্গত হয়। এক অণু CFC গ্যাস তাপমাত্রাভেদে ২০০-২০,০০০ ওজোন (O_3) অণুকে ধ্বংস করতে পারে। এভাবে নির্গত CFC গ্যাস বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরকে ক্রমশ ধ্বংস করছে।

গ সোহানের কাজগুলো মাটি দূষণ ঘটায়।
সোহান তার জমিতে ফলন কম পাওয়ায় প্রচুর রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করেন। কিন্তু তারপরও ফলন ভালো না হওয়ায় তিনি তার বাড়ির পাশের বনভূমি কেটে আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করেন। এ সকল কাজের ফলে মাটি দূষণ ঘটে।
বন ও গাছপালার ধ্বংস, অতিমাত্রায় কৃষিকাজ এবং জমিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে মাটি দূষিত হয়। কারণ গাছপালা না থাকলে এবং অতিমাত্রায় কৃষিকাজ করলে মাটির উর্বর স্তর ক্ষয় হয়ে অনুর্বর হয়ে পড়ে। এর ফলে মাটি ধীরে ধীরে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এভাবে সোহানের কাজগুলো মাটির দূষণ ঘটায়।

ঘ উক্ত দূষণটি হলো মাটি দূষণ।
শিল্প ও কৃষিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্য ভূমিতে নিঃসরণের মাধ্যমে মৃত্তিকার গুণগত মানের যে পরিবর্তন হয় তাকে মাটি দূষণ বলে।
মাটি পরিবেশের অন্যতম উপাদান। মাটির উপর প্রাণী বিচরণ করে, উদ্ভিদ জন্মায় এবং কৃষি কাজ করা হয়। তাই মাটি দূষণের ফলাফল মানবজীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে।
নিচে মাটি দূষণের ফলাফল তুলে ধরা হলো:

i. মাটি দূষণের ফলে মাটিতে যেসব অণুজীব, ক্ষুদ্রজীব (কেঁচো) বাস করে তাদের বৃদ্ধি ও বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়;
ii. মাটির উর্বরা শক্তি হ্রাস পায়;
iii. ক্ষুদ্র প্রাণিগুলোর (ইঁদুর) আবাসস্থল নষ্ট হয়;
iv. দূষিত মাটিতে উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না;
v. ভূমি মরুকরণ হতে পারে;
vi. জমির ফসল উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়।

প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্যতম উপাদান মাটি। মূলত এটি সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের আধার। তাই মাটি দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ২২ রোহানের বাবা মধুপুরের বন অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা। সে তার বাবার কর্মস্থলে হাতি দেখতে যায়। তার বাবা তাকে বলে আগে এখানে অনেক হাতি ছিল কিন্তু বর্তমানে এগুলো অন্যত্র সরে গেছে। হাতি ছাড়াও অন্যান্য জীববৈচিত্র্যও সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। এ জন্য জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বন অধিদপ্তরসহ সকলের এগিয়ে আসা উচিত। *◀ শিখনফল: ১*

ক. তুন্দ্রা বায়োম কী? ১
খ. কার্বন চক্র গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. রোহান মধুপুরে হাতি দেখতে পেল না কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত সংকুচিত হয়ে আসা বিষয়টির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

২২নং প্রশ্নের উত্তর

ক তুন্দ্রা বায়োম হলো পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উত্তরের শীতলতম বায়োম।

খ কার্বন ছাড়া কোনো জীবদেহ এমনকি কোনো জৈব যৌগ গঠিত হতে পারে না। কার্বন সকল জৈব রাসায়নিক যৌগের মূল সাংগঠনিক উপাদান। এটি জীবদেহের বৃদ্ধি, বিপাক ও বংশবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
সবুজ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার প্রধান উপাদান হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড। এর মাধ্যমে প্রকৃতি ও জীবের মাঝে কার্বন চক্রের শুরু। কার্বন ছাড়া পৃথিবীতে জীবন সৃষ্টি হওয়া, জীবের বেঁচে থাকা এবং যাবতীয় জৈবিক কার্যাবলি পরিচালনা সম্ভব হতো না। তাই কার্বন চক্র এত গুরুত্বপূর্ণ।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ মধুপুরে জীববৈচিত্র্য হ্রাস পাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো।

ঘ জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো।

প্রশ্ন ▶ ২৩ আকরাম সাহেব বন বিভাগের একজন কর্মকর্তা। কাজের জন্য তিনি কয়েকদিন চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থান করেন। এসময় তিনি দেখতে পান এখানে সল্প বসতি, অত্যধিক বৃষ্টি, পরিমিত উত্তাপ বিরাজ করে এবং এখানে তিনি আরও বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের বৃক্ষ ও প্রাণীর সমাহার লক্ষ করেন। *◀ শিখনফল-২*

ক. জলজ বায়োম কত প্রকার? ১
খ. স্রোতজ বনভূমি গড়ে ওঠার কারণ কী? ২
গ. আকরাম সাহেবের দেখা বনভূমি মানচিত্রে প্রদর্শন করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উক্ত বনভূমির গুরুত্ব পর্যালোচনা করো। ৪

২৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুই প্রকার।

খ স্রোতজ বনভূমি গড়ে ওঠার পিছনে যে নিয়ামকগুলো ভূমিকা রাখে তা হলো প্রচুর বৃষ্টিপাত (২০০ – ৩০০ সে.মি.) পরিমিত তাপমাত্রা, বিরল জনবসতি, সমুদ্রের জোয়ার ভাটা ও লবণাক্ত পানির প্রভাব।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং পতনশীল পত্রযুক্ত বৃক্ষের বনভূমি মানচিত্রে প্রদর্শন করো।

ঘ ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং পতনশীল পত্রযুক্ত বৃক্ষের বনভূমির অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা করো।

দশম অধ্যায়

ব্যবহারিক মানচিত্র ও স্কেল

পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶১ আফরোজার মামা কলেজে শিক্ষকতা করে। আফরোজা তার মামার বাসায় গিয়ে ভূচিত্রাবলি নামে একটি মানচিত্রের বই দেখতে পায়। সে ভূচিত্রাবলিতে প্রতিটি মানচিত্রে স্কেল লেখা থেকে তার মামার কাছে বিষয়টি জানতে চায়। মামা তাকে জানায় এটি মানচিত্র তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। এটি নানাভাবে প্রকাশ করা যায়। মানচিত্র পাঠে এর গুরুত্ব অনেক।

[অবনীন্দ্রনাথ বৈদ্য; জনু-১] ◀ *শিখনফল: ২*

ক. স্কেল কী? ১

খ. স্কেল প্রকাশের পদ্ধতি কয়টি ও কী কী? ২

গ. সরল স্কেল ও কর্ণীয় স্কেলের পার্থক্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. স্কেলের ব্যবহার বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানচিত্রে দুটি স্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব এবং ভূমিতে বা ভূপৃষ্ঠে ঐ দুটি স্থানের মধ্যবর্তী প্রকৃত দূরত্বের অনুপাতকে স্কেল বলে।

খ মানচিত্র স্কেল ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থবহ হয়।

মানচিত্রে স্কেল প্রকাশের পদ্ধতি তিনটি। যথা:

১. কথায় বা বর্ণনার (১″ = ১ মাইল) সাহায্যে ও

২. রেখাচিত্র বা রৈখিক স্কেলের সাহায্যে

৩. প্রতিভূ অনুপাত বা সংখ্যাসূচক ভগ্নাংশের (১ ঃ ৩৬) সাহায্যে।

গ সরল ও কর্ণীয় স্কেল উভয়টি রৈখিক স্কেল। তবে এদের পার্থক্য গঠন ও ব্যবহারে।

নির্দিষ্ট স্কেল অনুসারে একটি সরল রেখাকে কতিপয় সমান ভাগে ভাগ করে এবং বামদিকের সর্বশেষ ভাগকে আরও সমান ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করে সরল স্কেল অঙ্কন করা হয়। অন্যদিকে সরল স্কেলের গৌণভাগকে কর্ণের মাধ্যমে আরও বিভক্ত করে কর্ণীয় স্কেল অঙ্কন করা হয়।

সরল স্কেল ও কর্ণীয় স্কেলের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ:

১. সরল স্কেলে একই সঙ্গে দুটি একক ব্যবহার করা হয়। অপরদিকে কর্ণীয় স্কেলে একই সঙ্গে তিনটি একক ব্যবহার করা হয়।

২. সরল স্কেল দ্বারা সহজেই দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা যায়। অপরদিকে জমির আয়তন ও সীমানা নির্ধারণের কাজে এ স্কেল ব্যবহৃত হয়।

৩. এ স্কেলের সাহায্যে দূরত্ব সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করা যায় না। অপরদিকে কর্ণীয় স্কেলের সাহায্যে অধিকতর সূক্ষ্ম পরিমাপ সঠিকভাবে নেওয়া যায়।

ঘ মানচিত্রে দুটি স্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব এবং ভূমিতে বা ভূপৃষ্ঠে ঐ দুটি স্থানের মধ্যবর্তী প্রকৃত দূরত্বের অনুপাতকে স্কেল বলে। স্কেল বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়। যেমন—

১. মানচিত্র অঙ্কনে স্কেল দরকার।

২. মানচিত্রকে ছোট বা বড় করতে স্কেল প্রয়োজন।

৩. মানচিত্রের দু'টি স্থানের মধ্যকার প্রকৃত দূরত্ব নির্ণয়ে স্কেল প্রয়োজন।

৪. ক্ষেত্রফল বা আয়তন বের করার জন্য স্কেল প্রয়োজন।

৫. কোনো এলাকায় বা অঞ্চলে জরিপ কার্য করার জন্য স্কেল দরকার।

৬. মানচিত্রে প্রদর্শিত রেলপথ, নৌ-পথ ও কাঁচা-পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের জন্য স্কেল দরকার।

৭. কোনো বৃহৎ এলাকার মানচিত্র স্বল্প পরিসর কাগজে অঙ্কনের জন্য স্কেল প্রয়োজন।

৮. মানচিত্র পঠন-পাঠনে স্কেল প্রয়োজন।

৯. স্কেলের প্র. অ. দেওয়া থাকলে মানচিত্র যে কোনো দেশে ব্যবহার করা যাবে।

প্রশ্ন ▶২

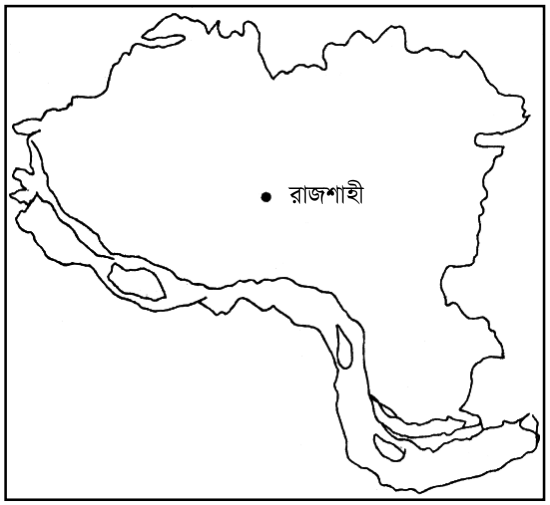

প্র. অ. ১ঃ৬০,০০০

◀ *শিখনফল: ৩*

ক. গুণগত মানচিত্র কী? ১
খ. মানচিত্রে স্কেল ব্যবহারের দুটি সুবিধা লেখো। ২
গ. উদ্দীপকে রাজশাহী জেলার মানচিত্রকে ১ঃ১,০০,০০০০ স্কেলে বর্গীয় পদ্ধতিতে পুনঃঅঙ্কন করো। ৩
ঘ. 'তোমার খাতায় পুনঃঅঙ্কিত মানচিত্রটি সংকুচিত হয়েছে'— সত্যতা যাচাই করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো অঞ্চলের প্রাকৃতিক বা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশক মানচিত্রকে গুণগত মানচিত্র বলে। যেমন— পৃথিবীর জলবায়ু মানচিত্র।

খ মানচিত্রে স্কেল ব্যবহারের দুটি সুবিধা নিম্নরূপ—

১. স্কেলের মাধ্যমে দুটি স্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় করা যায়।

২. স্কেল অনুসারে মানচিত্র ছোট বা বড় করা যায়।

গ সূত্রানুযায়ী, $\frac{\text{নতুন মানচিত্রের স্কেল}}{\text{পুরাতন মানচিত্রের স্কেল}}$ = পরিবর্তিত মানচিত্রের অনুপাত

$\therefore \frac{১ঃ১,০০,০০০}{১ঃ৬০,০০০}$ বা, $\frac{১}{১০০,০০০} \times \frac{৬০,০০০}{১}$

বা, $\frac{৩}{৫}$ বা, ০.৬ গুণ

∴ মূল মানচিত্রের তুলনায় নতুন মানচিত্র ০.৬ গুণ সংকুচিত হবে এবং বর্গ পদ্ধতিতে প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য ০.৬ গুণ সংকুচিত হবে।

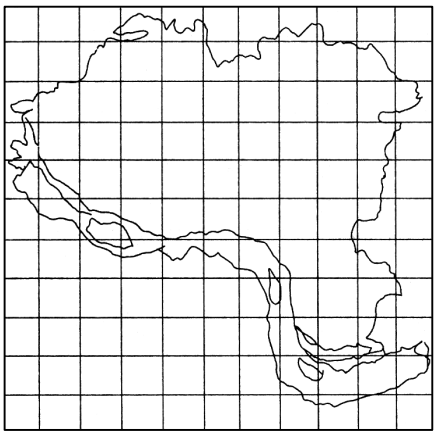

প্র.অ.১ঃ৬০,০০০

সংকুচিত মানচিত্র

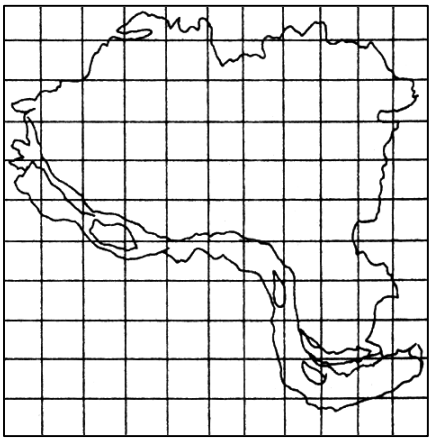

প্র. অ. ১ঃ১০,০০০

ঘ খাতায় পুনঃঅঙ্কিত মানচিত্রটি সংকুচিত হয়েছে। নিচে এর সত্যতা যাচাই করা হলো—

মানচিত্রের সংকোচন নির্ভর করে প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্যের উপর এবং বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ভর করে নতুন ও মূল মানচিত্রের স্কেলের অনুপাতের উপর। নতুন ও মূল মানচিত্রের স্কেলের অনুপাত নির্ণয়ের মাধ্যমে পরিবর্তিত মানচিত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা হয়। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সূত্র ব্যবহার করা হয়—

$\frac{\text{নতুন মানচিত্রের স্কেল}}{\text{পুরাতন মানচিত্রের স্কেল}}$ = পরিবর্তিত মানচিত্রের অনুপাত

উল্লেখ্য যে, উল্লিখিত সূত্রের প্রয়োগে নতুন মানচিত্রের অনুপাত ১ অপেক্ষা কম হলে তা সংকুচিত হবে। উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রশ্নে নতুন মানচিত্রের অনুপাত ০.৬। সুতরাং তা সংকুচিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৩

চিত্র-ক

চিত্র-খ

◀ শিখনফল: ৩

ক. map শব্দটি ল্যাটিন কোন শব্দ থেকে এসেছে? ১
খ. সামরিক অভিযানে মানচিত্রের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে প্রদত্ত 'ক' ও 'খ' চিত্রে যে মানচিত্রের কথা বলা হয়েছে তাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের তুলনা করো। ৩
ঘ. "চিত্র 'ক' এ প্রদত্ত মানচিত্রটি বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত" —উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক map শব্দটি ল্যাটিন mappa শব্দ থেকে এসেছে।

খ সামরিক অভিযানের সময় শত্রুর গতিবিধি ও অবস্থান মানচিত্রের সহায়তায় জেনে কর্তব্য নির্ধারণ করতে হয়। বর্তমান বিশ্বে সামরিক অভিযানগুলোতে যে ধরনের অত্যাধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করা হয় সেগুলোও মানচিত্র নির্ভর। কারণ শত্রুর অবস্থান জানা, আক্রমণের স্থান থেকে লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব নির্ণয় ইত্যাদি মানচিত্রের সাহায্যেই হয়ে থাকে।

সুতরাং, সামরিক অভিযানে মানচিত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকে প্রদত্ত 'ক' চিত্রটি হচ্ছে ক্যাডাস্ট্রাল বা মৌজা এবং 'খ' চিত্রটি দেয়াল মানচিত্র।

মৌজা মানচিত্র রেজিস্ট্রিকৃত ভূমি বা বিল্ডিং এর সীমানা চিহ্নিত করতে বৃহৎ স্কেলে অঙ্কন করা হয় যা ১৬ বা ৩২ ইঞ্চিতে ১ মাইল। দেয়াল মানচিত্র তৈরি করা হয় শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করার জন্য এবং বড় অথবা ছোট স্কেলে প্রকাশ করা হয়। এতে চাহিদামতো একটি দেশ অথবা একেকটি মহাদেশকে আলাদাভাবে প্রকাশ করা হয়। সারাবিশ্বকে অথবা কোনো গোলার্ধকেও দেখানো যায়। অন্যদিকে মৌজা মানচিত্রে গ্রামের

বিবিধ তথ্য (রাস্তাঘাট, প্রশাসনিক ভবন, রেল ও স্টেশন) প্রকাশ করা হয় এবং শহরের পরিকল্পনার জন্য বিভিন্ন বিষয় (যেমন– পরিবহন রুট) দেখানো যায়।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে উদ্দীপকের মানচিত্র দুটি ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

ঘ চিত্র 'ক' মানচিত্রটি মূলত মৌজা বা ক্যাডাস্ট্রাল মানচিত্র।

ক্যাডাস্ট্রাল শব্দটি এসেছে ফ্রেঞ্চ শব্দ ক্যাডাস্ট্রে থেকে, যার অর্থ হচ্ছে রেজিস্ট্রিকৃত নিজের সম্পত্তি। বাংলাদেশ গ্রাম প্রধান দেশ এবং গ্রামীণ জনপদের সাথে জমি বা ভূমি জড়িত। গ্রামে সাধারণত কৃষিজমির পরিমাণ অধিক এবং ঘরবাড়ি বিস্তৃত ভূমির ওপর গড়ে ওঠে। এসব জমি ও ভিটেবাড়িগুলোর সঠিক পরিমাপের প্রয়োজন হয়। জমির মালিককে তার জমি সঠিক প্রক্রিয়ায় হস্তান্তর (বিক্রি অথবা উত্তরাধিকারের মাধ্যমে) করতে হলে মানচিত্র সঠিকভাবে অঙ্কনের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে মৌজা মানচিত্র সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য। কেননা এই মানচিত্র রেজিস্ট্রিকৃত ভূমির সীমানা চিহ্নিত করে। এ মানচিত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদের মানুষ হিসাব করে সরকারকে ভূমির কর দিয়ে থাকে। এই মানচিত্র নিখুঁতভাবে সীমানা চিহ্নিত করে বলে গ্রামীণ ভূমিগুলোর জন্য তা যথার্থ।

সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদের সাথে মৌজা মানচিত্র অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত।

প্রশ্ন ▶ ৪

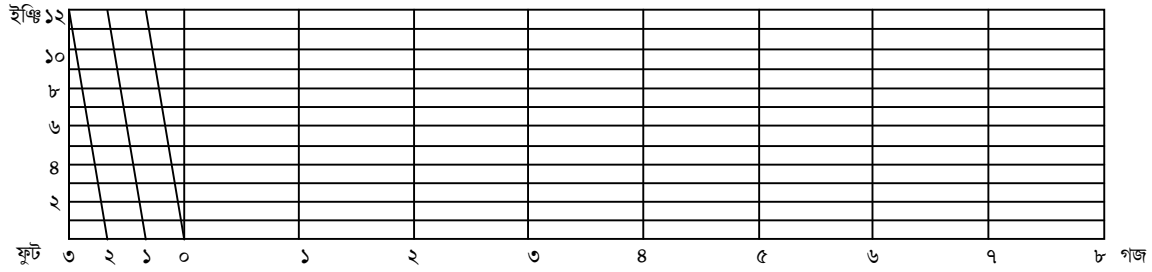

প্র. অ. ১ : ৬০

◀ শিখনফল: ৪

ক. রৈখিক স্কেল কাকে বলে? ১

খ. রৈখিক স্কেলের সুবিধাগুলো ব্যাখ্যা করো? ২

গ. স্কেলটিতে প্রতিভূ অনুপাতকে কীভাবে গজ, ফুট ও ইঞ্চিতে প্রকাশ করবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত স্কেলটির অঙ্কন পদ্ধতি বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানচিত্রের স্কেল রেখাচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করলে তাকে রৈখিক স্কেল বলে।

খ রৈখিক স্কেলে ভূমিভাগের দূরত্বের পরিপ্রেক্ষিতে মানচিত্রের দূরত্ব অতি সহজেই পরিমাপ করা যায়।

মানচিত্রে রৈখিক স্কেলের সুবিধা হলো যে মানচিত্রটিকে ছোট বা বড় করা হলে সে অনুপাতে স্কেলটিও ছোট বা বড় হয়ে সঠিকভাবে মাপ নির্দেশ করে থাকে, যা অন্য ধরনের স্কেলে সম্ভব হয় না।

গ উদ্দীপকের স্কেলটিতে প্রতিভূ অনুপাতকে গজ, ফুট ও ইঞ্চিতে কর্ণীয় স্কেলে প্রকাশ করা হয়েছে, গাণিতিক হিসাব করেই তা পাওয়া যায়।

স্কেলটির প্রতিভূ অনুপাত **১:** ৬০।

মানচিত্রে দূরত্ব ১″=ভূমির দূরত্ব ৬০″

,, ,, ১″ $= \frac{৬০}{৩৬}$ [∴ ৩৬″ = ১ গজ]

$= ১.৬৬$ গজ

আবার

ভূমির দূরত্ব ১.৬৬ গজ হলে মানচিত্রে দূরত্ব = ১″

∴ ,, ,, ১ ,, ,, ,, ,, $= \frac{১}{১.৬}$″

∴ ,, ,, ৯ ,, ,, ,, ,, $= \frac{১\times৯}{১.৬৬}$″

∴ স্কেলের দূরত্ব = ৫.৪″

সুতরাং উদ্দীপকে ৫.৪″ দৈর্ঘ্যের রেখাকে কর্ণীয় স্কেলে ৩ পর্যায়ে ভাগ করে মূখ্য ভাগে গজ এবং গৌণভাগে ফুট ও ইঞ্চি দেখানো হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের স্কেলটি একটি কর্ণীয় স্কেল।
উক্ত কর্ণীয় স্কেলটি পরিমাপ অনুযায়ী ৫.৪´ দৈর্ঘ্যের। যার মূখ্য ভাগে গজ এবং গৌণভাগে ফুট দেখানো হয়েছে, উল্লম্বভাবে ইঞ্চি নির্দেশিত হয়েছে।
অঙ্কন পদ্ধতি: ৫.৪ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য নিয়ে একটি সরল রেখা অঙ্কন করে তাকে সমান ৯ ভাগে ভাগ করতে হবে। প্রতি ভাগের মধ্যবর্তী দূরত্ব হবে ০.৬´´ এবং ভাগের মান হবে ১ গজ। এরপর সর্ব বাম দিকের ঘরটি ৩ ভাগে ভাগ করলে প্রতি ভাগের মধ্যবর্তী দূরত্ব ০.২´ এবং মান হবে ১ ফুট। পরবর্তীতে সরল রেখার উভয় প্রান্তে লম্ব টেনে তাতে সমান ১২টি রেখা অঙ্কন করতে হবে (যেহেতু ১২´=১ ফুট)। প্রতি রেখার মান হবে ০.১´ করে। বাম পাশের ঘরটিকে সমান তিনভাগ (ফুট দেখানোর জন্য) করে উপরে নিচে আড়াআড়ি যোগ করতে হবে। সর্বশেষে বাম পার্শ্বের ওপরের দিকে ইঞ্চি নিচের দিকে ফুট এবং স্কেলের সর্ব নিচে প্রতিভু অনুপাত ১: ৬০ লিখতে হবে।
কর্ণীয় স্কেলের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মভাবে দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা হয়। তাই স্কেলটি অঙ্কনের ক্ষেত্রে সতর্কতা জরুরি।

প্রশ্ন ▶৫ ব্যবহারিক ক্লাসে শিক্ষক নয়নকে একটি মানচিত্র দিয়ে পরবর্তী ক্লাসে ১ ঃ ১০০ স্কেলে মানচিত্রটি এঁকে আনতে বললেন। ◀ *শিখনফল: ৫*

ক. বৃত্তের পরিধির দৈর্ঘ্য জানা যায় কোন যন্ত্রের সাহায্যে? ১
খ. সামরিক অভিযানে মানচিত্র গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২
গ. নয়ন কীভাবে বুঝবে মানচিত্রটি ছোট বা বড় করতে হবে? ব্যাখ্যা করো ৩
ঘ. মানচিত্রটিকে ছোট বা বড় করার প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ওপিসোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে বৃত্তের পরিধির দৈর্ঘ্য জানা যায়।

খ যেসব জায়গার মানচিত্র পাওয়া যায় না সেখানে সামরিক অভিযান পরিচালনা বিপদ ও ঝুঁকিবহুল।

সামরিক অভিযানের সময় বিভিন্ন পথ ও শত্রুর সম্ভাব্য অবস্থানগুলো মানচিত্রের সহায়তায় জেনে কর্তব্য নির্ধারণ করা হয়। এ জন্য সামরিক অভিযান পরিচালনা করার জন্য স্থানীয় বৈচিত্র্যসূচক মানচিত্রগুলো গুরুত্বপূর্ণ।

গ মানচিত্রের সংকোচন ও সম্প্রসারণ করতে হলে সর্বপ্রথম নির্ণয় করতে হয় মানচিত্রটিকে কতগুণ সম্প্রসারণ বা কতটুকু সংকোচন করতে হবে।

নতুন মানচিত্রের স্কেলকে পুরাতন মানচিত্রের স্কেল দিয়ে ভাগ করলেই নতুন মানচিত্র কত গুণ বড় বা ছোট হবে তা পাওয়া যায়।

যেমন- $\frac{\text{নতুন মানচিত্রের স্কেল}}{\text{পুরাতন মানচিত্রের স্কেল}} = \text{অনুপাত}$

এক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে যে, নতুন ও পুরাতন মানচিত্রের স্কেলের অনুপাত ১ অপেক্ষা বড় হলে মানচিত্রটিকে বড় বা সম্প্রসারণ করতে হবে এবং স্কেলের অনুপাত ১ অপেক্ষা ছোট হলে মানচিত্রটি ছোট বা সংকোচন করতে হবে। এভাবে নতুন ও পুরাতন মানচিত্রের স্কেলের অনুপাত দেখে নয়ন বুঝবে মানচিত্রটিকে ছোট বা বড় করতে হবে।

ঘ ভৌগোলিক তথ্যাদি সঠিকভাবে উপস্থাপনের জন্য মানচিত্রের বিকল্প হয় না। এক্ষেত্রে শুধু এক জাতীয় ও একই আকারে মানচিত্র ব্যবহার করলে চলে না।

ভৌগোলিক তথ্যাদি সঠিকভাবে প্রকাশ ও বিচার বিশ্লেষণ করার জন্য প্রয়োজনে মানচিত্রকে ছোট ও বড় করা হয়। প্রধানত মানচিত্র সম্প্রসারণ বা বৃহদীকরণ করা হয় যেন মানচিত্রের ওপর জরিপ কার্যের মাধ্যমে অধিক বিষয় উপস্থাপন করা যায় এবং লিখবার জন্য পর্যাপ্ত স্থান পাওয়া যায়।
অন্যদিকে মানচিত্র সংকোচন বা মানচিত্রের আকৃতি হ্রাস করা হয় প্রয়োজন অনুযায়ী এটিকে নানা কাজে ব্যবহার করবার জন্য। অনেক সময়ই দুই বা ততোধিক মানচিত্র পরস্পর সংযুক্ত করার জন্যও মানচিত্র সংকোচন করার প্রয়োজন হয়।

তাই মানচিত্র সংকোচন ও সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶৬ রতনের বাবা তাকে নিয়ে মাঠে গেলেন। একটি মানচিত্র দেখিয়ে তিনি বললেন, ঐ জমিগুলো আমাদের।
◀ *শিখনফল: ৪ ও ৫*

ক. মানচিত্রের উপাদানগুলো কী কী? ১
খ. মৌজা মানচিত্র বলতে কী বোঝ? ২
গ. রতনের বাবার হাতের মানচিত্রটি অঙ্কনে স্কেলের ব্যবহার ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মৌজা মানচিত্রের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানচিত্রের উপাদানগুলো হলো: স্কেল, সাংকেতিক চিহ্ন, দিক নির্দেশক চিহ্ন, অক্ষ ও দ্রাঘিমারেখা, সীমানা এবং শিরোনাম ইত্যাদি।

খ যে মানচিত্রে প্রতিটি মৌজার জমি জরিপ করে মালিকানা চিহ্নিত করা হয় এবং কৃষিভূমি, বসতবাড়ি, জলাভূমি (খাল-বিল), পুকুর প্রভৃতির সীমানা অঙ্কন করে দেখানো হয় তাকে মৌজা মানচিত্র বলে।

সাধারণত মৌজা মানচিত্র ১৬´ = ১ মাইল; এই স্কেলে অঙ্কন করা হয়।

গ রতনের বাবার হাতের মানচিত্রটি হলো মৌজা মানচিত্র।
উক্ত মানচিত্র অঙ্কনে স্কেলের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যথা–
i. মানচিত্রের দুটি স্থানের মধ্যে দূরত্ব নির্ণয়ে;
ii. জরিপ কাজের সুবিধার্থে;
iii. মানচিত্রে অঙ্কিত রেল, নদী ও সড়ক পথের দৈর্ঘ্য পরিমাপে;

iv. মানচিত্র পুনরায় অঙ্কন ও পঠনে (Reading);
v. বস্তুগুলোর (Objects) পারস্পরিক দূরত্ব জানতে এবং
vi. মানচিত্রকে ছোট বা বড় করার জন্য।

ঘ পৃথিবীপৃষ্ঠকে সমতল কাগজে সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করার মাধ্যম হলো মানচিত্র। এ বিশাল ভূপৃষ্ঠের যাবতীয় বৈচিত্র্য (landscape) জানার জন্য মানচিত্র ব্যবহার করা হয়।

একটি দেশের প্রতিটি মৌজার জায়গা (area) জরিপ করে সীমানা চিহ্নিতকরণ, কৃষিক্ষেত্র, বসতবাড়ি, দালানকোঠা, জলাভূমি (পুকুর), বাগান প্রভৃতি দেখানোর জন্য মৌজা মানচিত্রের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এছাড়া ঐ এলাকার আপেক্ষিক অবস্থান (যেমন– কোন থানার অন্তর্গত মৌজা), প্রকৃত অবস্থান (অক্ষ ও দ্রাঘিমা রেখার সাহায্যে) ও দূরত্ব (গ্রাম থেকে গ্রাম) নির্ণয়ের জন্য এ মানচিত্রের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কোনো এলাকার প্রাকৃতিক (নদীর অবস্থান), সাংস্কৃতিক (বিদ্যালয়ের অবস্থান) ও প্রশাসনিক (থানার অবস্থান) তথ্য জানতে হলেও মৌজা মানচিত্র সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। এ ধরনের মানচিত্র সম্পর্কে ধারণা থাকলে জমির বণ্টন, (উত্তরাধিকার সূত্রে ভাগ-বাটোয়ারা) খুব সহজেই করা যায়।

সুতরাং মৌজা মানচিত্রের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক।

প্রশ্ন ▶ ৭

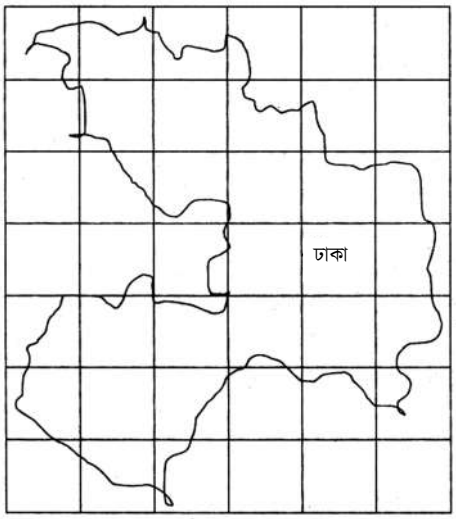

প্র. অ. ১ ঃ ৬০,০০০

◀ শিখনফল: ৬

ক. মানচিত্র সংকোচন কাকে বলে? ১
খ. বর্গ পদ্ধতিতে মানচিত্রকে কীভাবে সম্প্রসারণ করা যায়? ২
গ. সরবরাহকৃত মানচিত্রটি প্র.অ. ১ ঃ ৮০,০০০ স্কেলে পুনরায় অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উক্ত মানচিত্রটির সম্প্রসারণ পদ্ধতি বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নির্দিষ্ট মানচিত্র থেকে মানচিত্রকে ছোট করার পদ্ধতিকে মানচিত্রের সংকোচন বলে।

খ ছোট ও বড় ছক বা বর্গ অঙ্কনের সাহায্যে যখন মানচিত্র ছোট ও বড় করা হয় তাকে ছক বা বর্গ পদ্ধতি বলে।

মানচিত্রের সম্প্রসারণ নির্ভর করে সূত্রের অনুপাতের উপর। মানচিত্রটি কত গুণ বড় হবে তা বের করে মানচিত্রের উপর বর্গক্ষেত্রের ছক অঙ্কন করতে হবে। তারপর অপর একটি সাদা কাগজে যতগুণ বড় করার প্রয়োজন বর্গক্ষেত্রের প্রতিটি বাহুকে ঠিক ততটুকু বড় করে সমান সংখ্যক বর্গক্ষেত্র অঙ্কন করতে হবে। এর পর পুরাতন মানচিত্রের যে অংশ বর্গক্ষেত্রের যে স্থান দিয়ে যেভাবে গেছে নতুন বর্গক্ষেত্রগুলোর মধ্য দিয়ে ঠিক সেভাবে অঙ্কন করলেই মানচিত্রটি সম্প্রসারিত হয়ে হুবহু অঙ্কিত হবে।

গ সরবাহকৃত মানচিত্রটির প্রতিভু অনুপাত ১ : ৬০,০০০ একে ১ : ৮০,০০০ স্কেলে পুনরায় অঙ্কন করতে হবে। সূত্রানুসারে,

$$\frac{\text{নতুন মানচিত্রের স্কেল}}{\text{পুরাতন মানচিত্রের স্কেল}} = \frac{১:৮০,০০০}{১:৬০,০০০}$$

$$= \frac{\frac{১,৮০}{০০০}}{\frac{১,৬০}{০০০}}$$

$$= \frac{১}{৮০,০০০} \times \frac{৬০,০০০}{১}$$

$$= \frac{৬০,০০০}{৮০,০০০}$$

$$= ০.৭৫$$

অর্থাৎ মানচিত্রটি ০.৭৫ গুণ সংকুচিত হবে। এবার সরবরাহকৃত মানচিত্রের বর্গের বাহু ০.৭৫ গুণ করে নতুন মানচিত্র অঙ্কন করি–

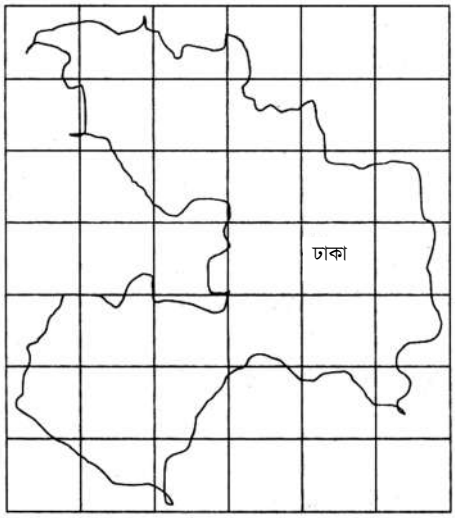

প্রতিভু অনুপাত ১ ঃ ৮০,০০০

ঘ ছক বা বর্গ পদ্ধতিতে মানচিত্রের যেমন সম্প্রসারণ হয় তেমনি সংকোচনও হয়।

ছক বা বর্গ পদ্ধতির সাহায্যে মানচিত্রের সংকোচনের জন্য সর্বপ্রথম মানচিত্রকে নির্দিষ্ট মাপের বাহু বিশিষ্ট কতিপয় বর্গক্ষেত্রে বিভক্ত করতে হয়। এর পর প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন

মানচিত্রের স্কেল অনুসারে অন্য কাগজে তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র আকৃতির বাহু বিশিষ্ট সমপরিমাণ বর্গক্ষেত্র অঙ্কন করতে হবে। এক্ষেত্রে মানচিত্রটি কতগুণ সংকুচিত হবে সূত্রের সাহায্যে তার মান নির্ণয় করতে হবে।

সূত্র: $\frac{\text{নতুন মানচিত্রের স্কেল}}{\text{পুরাতন মানচিত্রের স্কেল}}$ = অনুপাত

মান নির্ণয়ের পর মানচিত্রের উপর কতগুলো বর্গক্ষেত্রের ছক অঙ্কন করার পর অপর একটি সাদা কাগজে যতগুণ ছোট করার প্রয়োজন বর্গক্ষেত্রের প্রতিটি বাহুকে ঠিক ততটুকু ছোট করে সমান সংখ্যক বর্গক্ষেত্র অঙ্কন করতে হবে। যেমন: প্রদত্ত মানচিত্রকে সংকুচিত করতে প্রতিটি বর্গক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ০.৭৫ একক। এর পর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রগুলোর মধ্যে নতুন মানচিত্রটি পুরাতন মানচিত্র অনুযায়ী অঙ্কন করতে হবে। পুরাতন মানচিত্রের যে অংশ বর্গক্ষেত্রের যে স্থান দিয়ে যেভাবে গেছে নতুন বর্গক্ষেত্রগুলোর মধ্য দিয়ে ঠিক সেভাবে অঙ্কন করলে নতুন মানচিত্রটি হুবহু অঙ্কিত হবে।

এভাবে উপরিউক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে উক্ত সরবরাহকৃত মানচিত্রটিকে সংকুচিত করা যায়।

প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ৮ একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা বাংলাদেশের দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলগুলো চিহ্নিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গেলেন। অঞ্চল চিহ্নিত করার সুবিধার্থে তারা প্রত্যেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সাথে নিলেন। *◀ শিখনফল-১*

ক. এটলাস (Atlas) কাকে বলে? ১

খ. মানচিত্রের স্কেল বলতে কী বোঝ? ২

গ. অঞ্চল চিহ্নিত করার জন্য গবেষণা কর্মীদের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপকরণ কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কর্মচারীদের অঞ্চল চিহ্নিত করার প্রয়োজনীয় প্রধান উপকরণটির ব্যবহারিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একক বা বিভিন্ন বিষয়ের উপর তৈরি অনেকগুলো মানচিত্র সম্বলিত বইকে এটলাস বা মানচিত্রের বই বলে।

খ মানচিত্রে যেকোনো দুটি স্থানের দূরত্ব এবং ভূপৃষ্ঠে বা ভূমিভাগে ঐ দুটি স্থানের মধ্যে প্রকৃত দূরত্বের যে অনুপাত তাকে মাপনী বা স্কেল বলে।

সাধারণত মানচিত্রে দুটি স্থানের দূরত্বের সাথে প্রকৃত দূরত্বের সম্পর্ককে অনুপাতে বোঝানো হয়। যেমন: মানচিত্রের স্কেল যদি ১″= ১০ মাইল হয় তবে এর অর্থ হলো মানচিত্রের দুই স্থানের দৈর্ঘ্য বা দূরত্ব যেখানে ১″, তার প্রকৃত দূরত্ব হলো ১০ মাইল। বর্ণনার মাধ্যমে, রেখা অঙ্কন করে বা প্রতিভূ অনুপাতের সাহায্যে মানচিত্রের স্কেল নির্দেশ করা হয়।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ মানচিত্র কী? ব্যাখ্যা করো।

ঘ মানচিত্রের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো।

প্রশ্ন ▶ ৯

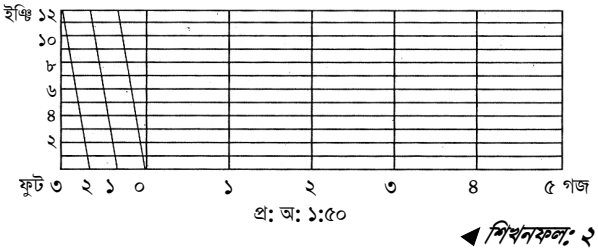

◀ শিখনফল: ২

ক. 'মানচিত্র স্কেল' কাকে বলে? ১

খ. যে স্কেলের সাহায্যে তিনটি একক জানা যায় তার ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. উদ্দীপকের স্কেলটি থেকে ফার্লং ও চেইন দেখিয়ে একটি সরল স্কেল অঙ্কন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের স্কেলটির ব্যবহার বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানচিত্রে দুটি স্থানের মধ্যবর্তী দুরত্ব এবং ভূমিতে ঐ দুটি স্থানের মধ্যবর্তী প্রকৃত দুরত্বের অনুপাত বা সমঙ্ককে 'মানচিত্র স্কেল' বলে।

খ আয়তক্ষেত্রের বা বর্গক্ষেত্রের পরস্পর বিপরীত কোনদ্বয় সংযোজক সরলরেখাকে কর্ণ বলে।

কতিপয় কর্ণের সাহায্যে যে স্কেল অঙ্কন করা হয় তাকে কর্ণীয় স্কেল বলে। কর্ণীয় স্কেলের সাথে তিনটি একক দেখানো যায়।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ ১ : ৫০ স্কেলের সাহায্যে ৪ ফার্লং ও চেইন দেখিয়ে সরল স্কেল অঙ্কন করো।

ঘ কর্ণীয় স্কেলের ব্যবহার আলোচনা করো।